সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান

উনিশ শতকের কলকাতার নানা রঙের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি থেকে কিছু অজ্ঞাতকুলশীল, যশোহীন, ধিক্কৃত ও ব্যতিক্রমী সাংস্কৃতিক কাজকর্ম নিয়ে এই প্রবন্ধ সংকলন। বহু-আলোচিত ঝলমলে বাঈনাচ, জেল্লাদার বাবু কালচার, 'স্টার-মিনার্ভা'-য় বাংলা নাটকের রোশনাই আর জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরবাড়িতে আধুনিক বাংলা শিল্প-সাহিত্যের গোড়াপত্তন—এ-সবের আড়ালে, অথচ পাশাপাশি প্রবহমাণ ছিল এই ভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির দ্রষ্টা ও উপভোক্তা ছিলেন শহরের নিম্নবর্গের খেটেখাওয়া মানুষ—রাস্তার ফেরিওলা, বেশ্যা, কবিয়াল, পাঁচালীকার, সং ও যাত্রার গায়ক-অভিনেতা, সস্তা বই-এর স্বল্প শিক্ষিত লেখক ও পাঠক-পাঠিকা, গলিঘুঁজির বস্তির বাসিন্দারা। সোনাগাজি থেকে বটতলা, তারপর জেলেপাড়া ঘুরে, ভবাণীর ঝুমুর গান ও দাশু রায়ের পাঁচালী শুনিয়ে, গোপাল উড়ের যাত্রা দেখিয়ে। লেখক এ-যুগের পাঠক সম্প্রদায়ের কাছে এক বিরাট তথ্যভাণ্ডার তুলে ধরেছেন। সহজ ভাষায় এই তথ্যের যে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রবন্ধগুলিকে মননযোগ্য করে তুলেছে, তা ইতিহাস-পাঠক ও গবেষকদের কাছে সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

ISBN-978-81-85479-60-6

দাম ৫৫০ টাকা

উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

উনিশ শতকের কলকাতা

ও

সরস্বতীর ইতর সন্তান

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুষ্টুপ

২ই নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা ৭০০ ০০৯

Unis Sataker Kolkata

O

Saraswatir Itar Santan

by

Sumanta Bandyopadhyay

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০৮

দ্বিতীয় পরিবর্ধিত অনুষ্টুপ সংস্করণ জানুয়ারি, ২০১৩

প্রকাশক : *অনিল আচার্য*

অনুষ্টুপ

২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ : রাতুল চন্দ রায়

বর্ণবিন্যাস : কমল পাঁজা, অনুষ্টুপ

মুদ্রণ : বেঙ্গল ফটোটাইপ কোম্পানি

৪৬/১ রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা-৯

ISBN-978-81-85479-60-6

মূল্য : ৫৫০ টাকা

মু খ ব ন্ধ

সরস্বতীর ইতর সন্তানেরা বারংবার মাথা ঝাঁকিয়ে ওঠে! তাই, এই প্রবন্ধ সংকলনের পুনঃপ্রকাশ। প্রথম সংস্করণ ২০০১ সালে; দ্বিতীয় ২০০৮-এ, এবং পাঁচ বছর পরে বর্তমান সংস্করণ। ইতর সন্তানদের কপালে বরাবর যা জোটে—অর্থাৎ ছাপাখানার ভূত, প্রবন্ধগুলিকে এতদিন ধরে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আশা করি, বর্তমান সংস্করণ মুদ্রণ-প্রমাদ থেকে কিছুটা মুক্ত।

এ বই-এ সংকলিত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত। চল্লিশ বছরের ওপর হয়ে গেল, কালীঘাটের পটের উপর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। উনিশ শতকের কলকাতার লোকসংস্কৃতির পর্যালোচনায় সেই আমার হাতেখড়ি। এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত এই প্রবন্ধটি ('কালীঘাটের পট : তৎকালীন সমাজ ও আধুনিক মূল্যায়ন') প্রথম প্রকাশ করেন আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু ও সহকর্মী প্রয়াত অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন ঘোষ তাঁর সম্পাদিত অধুনালুপ্ত প্রবন্ধ পত্রিকাতে বঙ্গাব্দ ১৩৬৮-তে। আমার পরবর্তী গবেষণার আলোকে, এখন মনে হয় ঐ প্রবন্ধে, পটুয়া ও শিক্ষিত উচ্চ সমাজের সম্পর্কের আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু মন্তব্যে অনবধানতা ঘটেছিল। আমার পরের লেখায় উচ্চারিত মতামতের সঙ্গে এর হয়তো কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়বে। এ সত্ত্বেও পুরোনো এই প্রবন্ধটি সংকলিত হল এই কারণে যে ওর মূল বক্তব্য একটা ধারাবাহিকতার ইঙ্গিত বহন করে। এর পরে, উনিশ শতকের বাংলা লোকসংস্কৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছি, নানা ভাবনা-চিন্তার আদান-প্রদান করেছি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডার আসরে। কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনে উঞ্ছবৃত্তির চাপে, দীর্ঘকাল এ নিয়ে লেখার সময় পাইনি। ১৯৮৫-৮৬-তে *Indian Council of Social Science Research (ICSSR)*-এর এক গবেষণাবৃত্তির আনুকূল্যে, প্রিয় বিষয়টিতে ফিরে আসার সুযোগ ঘটল। আবার লিখতে শুরু করলাম। প্রায় সব লেখাগুলি-ই বেরিয়েছিল *অনুষ্টুপ* ও *বারোমাস* পত্রিকায় ১৯৮০-র শেষার্ধ থেকে ২০০০-এর শুরু পর্যন্ত। *বারোমাস*-এর সম্পাদক, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও সাহিত্য-সমালোচক অশোক সেন মশাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার একটি লেখার নামকরণ করেছিলেন 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা'। এটা এত-ই যথোপযুক্ত হয়েছিল, যে তাই আমি ওঁর দেওয়া ঐ শিরোনামটি-ই রেখে দিয়েছি বর্তমান সংকলনে। 'সারজন, থানাদার, চৌকিদার' আমি লিখেছিলাম আমার বন্ধু প্রয়াত পূর্ণেন্দু পত্রীর অনুরোধে ১৩৯৬ (বঙ্গাব্দ)-এ *আজকাল* পত্রিকার 'কলকাতা' বিশেষ সংখ্যার জন্য, যার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন পূর্ণেন্দু স্বয়ং। 'মানুষ চলে কলের বলে' প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা *আকাদেমি* পত্রিকা-য়।

এ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত সবকটি প্রবন্ধ-ই, প্রথমে যেভাবে ছাপা হয়েছিল সেই আকারেই পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে—কিছু ভ্রম সংশোধন ছাড়া। 'সোনাগাজি ও বটতলা—দুই যমজের কাহিনী' প্রথম বার হয়েছিল *অনুষ্টুপ*-এর ১৯৯২-এর শারদীয় সংখ্যায়। বর্তমান সংকলনের জন্য এটিকে একটু পরিবর্ধিত করেছি।

এ সংকলনে নতুন সংযোজন—দুটি প্রবন্ধ। এক, 'স্বপ্নরাজ্যের সন্ধানে : প্রান্তিক সমাজের ব্রাত্য ধর্ম ও রাজনীতি' যেটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল *আরশিনগর* নামে সংকলনে ২০১১ সালে,

বাউল ফকির উৎসব কমিটির উদ্যোগে। দুই, 'উনিশ শতকের বাংলায় লোকশিক্ষা ও বটতলা সাহিত্য।' এ প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'সাম্প্রতিক ইতিহাস চর্চা'য় (২০০৫; সম্পাদনা : শেখর ভৌমিক। মহিষাদল রাজ কলেজ। পূর্ব মেদিনীপুর)।

প্রবন্ধগুলি যখন বিভিন্ন সময় লিখি, তখন সেগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার প্রয়াসে বক্তব্য সমর্থনের জন্য নানা উদ্ধৃতি ও তথ্যসূত্রের নির্দেশ দিয়েছিলাম। এখন, একটি সংকলনের মলাটের মধ্যে এই প্রবন্ধগুলিকে একত্রিত করতে গিয়ে দেখছি যে একই বক্তব্যের অংশ-বিশেষ, কোনো গান বা ছড়ার উদ্ধৃতি ও সূত্রনির্দেশ অনেক সময়ই পুনরাবৃত্ত হয়েছে বিভিন্ন প্রবন্ধে। কিন্তু নতুন করে যে সম্পাদনার প্রয়োজন, তার ধৈর্য ও সময় আপাতত নেই। তাই পাঠক-পাঠিকারা যদি এই বিরক্তিকর পুনরুক্তি দোষ অগ্রাহ্য করে প্রবন্ধগুলির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অনুধাবনে সচেষ্ট হন তাহলেই অনুগৃহীত হব।

আরও একটা কথা স্বীকার করা দরকার। এ প্রবন্ধগুলি উনিশ শতকের বাঙালি লোকসংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে আমি কখনোই দাবি করি না। তরুণ গবেষকেরা নিত্য-নতুন তথ্য আবিষ্কার করছেন ঐ যুগ সম্বন্ধে। তাঁদের গবেষণার আলোকে হয়তো আমার অনেক তথ্য ও সিদ্ধান্ত-ই পুনর্বিবেচ্য হতে পারে।

শেষে বলি, এ বইটির প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে আমার বন্ধু অনুষ্টুপ-এর সম্পাদক অনিল আচার্যের উৎসাহে ও জেদের ফলে! আমার একটি প্রবন্ধের শিরোনামটি বেছে নিয়ে অনিল আমার ছড়ানো-ছেটানো লেখাগুলোর মধ্যে যে মূল সূত্র রয়ে গেছে, সেটি সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন।

এর পর-ই নাম করতে হয় আমার স্নেহাস্পদ লেখক ও গবেষক অদ্রীশ বিশ্বাসের। ও এগিয়ে না এলে এ প্রবন্ধগুলি পূর্বতন সংস্করণ (২০০৮)-এর পাতার মধ্যেই বস্তাবন্দী হয়ে থাকত। বর্তমান নতুন সংস্করণের নেপথ্যে রয়েছে অদ্রীশের অধ্যবসায় ও যত্ন। এই সংস্করণের প্রচ্ছদটি করে দিয়েছেন তরুণ শিল্পী ও কবি রাতুল চন্দ রায়।

এ প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই *Centre for Studies in Social Sciences*-এর প্রদীপ বসু, কেয়া দাশগুপ্ত, তপতী গুহঠাকুরতা, প্রবীর বসু ঐ সংস্থার অন্যান্য গবেষক ও কর্মীবৃন্দকে এবং Victoria Memorial-এর কর্তৃপক্ষকে, কিছু মূল্যবান ছবি প্রকাশের অনুমতি দানের।

এখানে ব্যবহৃত পটগুলোর জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ শ্রীমতী মণি গুপ্তের কাছে। এছাড়াও আলাদা করে উল্লেখ করতে হয় CSSS-এর অঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্যের কথা, যিনি হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও দুটি মানচিত্র তৈরি করে দিয়েছেন। বিশিষ্ট শিল্পী হিরণ মিত্র বন্ধুজন, প্রচ্ছদের জন্য তাঁকে আলাদা করে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অন্য বহু বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় কমল পাঁজা, গৌতম সেনগুপ্ত ও সাহানা আচার্যের নাম।

দেহরাদুন সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১২

সূচি

উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান

প্রস্তাবনা

চিন্তার জগতে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম ও চিত্তবিনোদনের জগতে বাঈ-নাচ ও হঠাৎ রাজাদের 'বাবু' কালচার—এই দুই নিয়ে উনিশ শতকের কলকাতার সমাজ গড়ে উঠেছিল বলে একটা ধারণা প্রচলিত আছে। এই দ্বিমাত্রিক অনুধ্যানের সূত্র ধরে আধুনিক কালে প্রধানত দু'ধরনের সাহিত্যচর্চা চোখে পড়ে। এক, ষাটের দশক থেকে বাংলা ভাষায় দেখতে পাই সে যুগের তথাকথিত 'রেনেসাঁস'-এর মোহমুক্ত পুনর্মূল্যায়নের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ নতুন তথ্যের আলোকে তৎকালীন বিদ্বৎসমাজের বিচার-বিশ্লেষণ।[১] দুই, এরও কিছু আগে থেকে দেখা যায় কিছুটা চটুল রসসাহিত্য বা সংবাদপত্রের জন্য লঘু রচনা ও ইতিহাসধর্মী উপন্যাস এবং ঐ জাতীয় রচনার প্রাদুর্ভাব—যার মূল উপজীব্য ওযুগের কলকাতার আরামপ্রিয় সমাজের মাইফেল, বাঈজি-বিলাস, নেশাখুরি ও বেশ্যাসক্তি, বা ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নিয়ে কাল্পনিক আষাঢ়ে গপ্পো ফাঁদা।[২]

বিদ্বজ্জনদের চিন্তাভাবনা ও সমাজসংস্কার এবং নব্য-ধনীদের বাবুগিরি ও শৌখিনতা এই দুই-এর পাশাপাশি কিন্তু আর একটা অন্য সংস্কৃতিও সে যুগের কলকাতাতে প্রবহমান ছিল। এটা ছিল কলকাতার নিজস্ব ধাঁচে গড়ে ওঠা লোকসংস্কৃতি। রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে, খেটে-খাওয়া নাগরিকদের দৈনিক পেশা ও বৃত্তির অনুসৃতিতে তৈরি ও নিজেদের বিনোদনের জন্য সৃষ্ট ব্যঙ্গ-কৌতুক, নাচ-গান, সঙ-পুতুলনাচ, এই

সব নানা ধরনের অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনের মিছিল নিয়ে এ শহরের লোকসংস্কৃতি বেড়ে উঠেছিল। যেহেতু উনিশ শতকের কলকাতার শ্রমজীবী ও কারিগররা গ্রাম থেকে সদ্য-আগত ছিলেন, তাঁদের অবসর বিনোদনের এই সব অভিব্যক্তিতে পাওয়া যায় অতীত গ্রামীণ সংস্কৃতির ঐতিহ্যের পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত রূপ। নাগরিক পরিবেশে কবিগান, পাঁচালি, যাত্রা, কীর্তন—এগুলি কিছুটা রূপান্তরিত হয়ে কলকাতার লোকসংস্কৃতির আসরে এসে হাজির হয়েছিল। উনিশ শতকের কলকাতার এই সব গীতিশৈলী ও নাট্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে বহু তথ্য আজ সহজলভ্য, গবেষকদের গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনার কল্যাণে।[৩]

সেই সময়ের কলকাতার বহুধাবিস্তৃত, লৌকিক বিচিত্রানুষ্ঠান ও প্রবাদ-প্রবচনের দিকে নজর দিলে উনিশ শতকের নাগরিক অন্য সাংস্কৃতিক চেহারাটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। জনগণের মুখে মুখে প্রচলিত ছড়া ও প্রবাদ ছাড়াও, শহরে ঐ সময় শোনা যেত নানা ধরনের গান—কীর্তন, রাস্তায় ভিখিরির গান, ফেরিওয়ালার গান, হাস্য-কৌতুক, ঝুমুর গান; দেখতে পাওয়া যেত বিভিন্ন পাড়ায় বিচিত্র সব অনুষ্ঠান—জেলে পাড়ার বা কাঁসারিদের সঙ, গোয়ালাদের যাত্রা, চড়ক, রাসের মেলা, পুতুল নাচ, খেমটা নাচ, ইত্যাদি।

এগুলিকে শিল্প-সাহিত্যের মর্যাদা দিতে আজকে আমরা ইতস্তত করলেও, মনে রাখা দরকার যে এরা এক লৌকিক সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারাবাহী। এদের গুরুত্ব দুদিক থেকে বিচার্য। প্রথমত, এতে সমসাময়িক কলকাতার নাগরিক সমাজজীবনের আচার-আচরণ ও ভাবনা-চিন্তার প্রতিফলনের ফলে, সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রয়োজনে এগুলির মূল্য অসাধারণ। দ্বিতীয়ত, এদের কিছু কিছু নিদর্শনে লোকশিল্পীদের নিজস্ব সৃজনশীলতা ও অপূর্ব রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, যা যে-কোনো নন্দনতাত্ত্বিক মাপকাঠির বিচারে অনিন্দনীয় বলে বিবেচিত হবে।

প্রথমত লক্ষণীয়, লৌকিক সংস্কৃতির এই শাখাপ্রশাখাগুলি মূলত কথ্য বা oral culture-এর অঙ্গীভূত। কবিগান, পাঁচালি, কীর্তন, ইত্যাদি কথানির্ভর হলেও, কিছুটা বিধিবদ্ধ—বাঁধাধরা সুর ও আনুপূর্বিক বর্ণনার কাঠামোর আঙ্গিকে পরিবেশন করতে হতো। এই কারণেই, শ্রুতি ও স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে পরবর্তী যুগে এগুলিকে লিপিবদ্ধ করা সহজ হয়েছিল। কিন্তু কলকাতার লোকসংস্কৃতির অন্য যে ধারা—অর্থাৎ লোকপরম্পরায় আগত মৌখিক প্রবাদ ও ছড়া, রাস্তার গান ও নাচ, সে যুগের নানা ধরনের চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনী—এগুলি ছিল মূলত স্বতঃস্ফূর্ত; এর আঙ্গিকও ছিল সদা-পরিবর্তনশীল; ধরাবাঁধা শিল্পশৈলীর নিয়মবহির্ভূত।

দ্বিতীয়ত, যদিও কলকাতার লোকসংস্কৃতি একটা বিকল্প জগতের (অর্থাৎ, শহরের নিম্নবর্গের) অভিব্যক্তি হয়ে গড়ে উঠেছিল, মনে রাখা দরকার যে ঐ সময়কার কলকাতার সমাজজীবনের অন্য যে দুটি জগৎ ছিল (অর্থাৎ, রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখ চিন্তানায়ক ও বিদ্বজ্জনদের জগৎ ও 'বাবু কালচারের' জগৎ) তা থেকে এই লোকসংস্কৃতি সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য ছিল না। সমাজের উপরতলার মনস্বীদের তর্ক-বিতর্কের শোরগোল, 'বাবু'দের চাল-চলন, কাণ্ড-কারখানা প্রায়শই নিচুতলার মানুষের প্রবাদ-প্রবচন বা গান-বাজনায় স্থান পেয়েছে। শুধু তাই নয়, দুই স্তরের মানুষদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানও ঘটেছে অনেক সময়। জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ধনী ও অভিজাত সিংহ পরিবারের সন্তান কালীপ্রসন্ন এই রাস্তার মানুষদের ভাষা, প্রবচন ও গান ধার করেই তাঁর *হুতোম প্যাঁচার নকশা* রচনা করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

টীকা

১. এ অনুশীলনের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ হিসেবে যাঁদের নাম করতে হয়, তাঁদের মধ্যে প্রথম, প্রয়াত শ্রদ্ধেয় বিনয়কৃষ্ণ দত্ত মশাই, যাঁর একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা—*ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বরূপ*—ষাটের দশকে প্রকাশিত হয়েছিল, এবং যাতে লেখক উনিশ শতকের বাঙালি চিন্তানায়ক ও সমাজ সংস্কারকদের ভাবনাধারার সীমাবদ্ধতা ও অতীতাশ্রয়ী ভক্তি ও আধুনিক যুক্তিবাদের আপোশপন্থার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন। উনিশ শতকের কলকাতার সমাজজীবনের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষ মশাইও ঐ সময় থেকেই পুনর্মূল্যায়নের কাজে এগুতে থাকেন এবং বহু যত্নশীল গবেষণার সাহায্যে নতুন তথ্য আমাদের সামনে উপস্থিত করেন, সংবেদনশীল বিশ্লেষণের সঙ্গে। ষাটের দশকের বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহলে, উনিশ শতকের 'মনীষীদের' চিন্তাধারা ও কার্যকলাপের পুনর্বিচারের প্রবণতার পিছনে তৎকালীন নকশালবাড়ি আন্দোলনের ভূমিকা (যা ছিল ঐ সব 'মনীষীদের' বিরুদ্ধে অতিমাত্রায় সোচ্চার) অস্বীকার করা যায় না। সরোজ দত্ত ('শশাঙ্ক'-নামে)-র লেখা ও তাঁর নকশালপন্থী শিষ্যদের কালাপাহাড়ি কাজকর্ম (যেমন বিদ্যাসাগরের মূর্তির মুণ্ডচ্ছেদ) ঐ সময়কার বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের চিরাচরিত ধ্যান-ধারণার জটা ধরে তাঁদের ঝাঁকিয়ে তুলেছিল। বিনয় ঘোষ অকপটে স্বীকার করেন : "After devoting more than 20 years to the collection and interpretation of historical material on the 19th century Bengal renaissance. I find many lacunae in the work done." এবং ঐ 'রেনেসাঁস'-এর ঔপনিবেশিক উৎস বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসেন : "আমরা যাকে বাঙলার রেনেসাঁ বলি, তা উনিশ শতকের শেষে নিছক একটা ঐতিহাসিক ধোঁকাবাজিতে পর্যবসিত হয়েছিল..." ('A Critique of Bengal Renaissance'—*Frontier*, September 25, 1971) এ প্রসঙ্গে, মনে রাখা উচিত যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি চিন্তানায়কদের সাহস ও

সততা নিয়ে প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছিল এর আগেও—১৯৪৯-৫১ সময়ে, তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্দলীয় তর্ক-বিতর্কের দলিলে (*মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*; সম্পাদনা : ধনঞ্জয় দাশ)। কিন্তু এ সমালোচনা তখন সীমাবদ্ধ ছিল কমিউনিস্ট পার্টির বুদ্ধিজীবীদের ভাবনা-চিন্তার চৌহদ্দির মধ্যে। ষাটের দশকে, এ সব প্রশ্ন আরও পরিব্যাপ্ত পরিবেশে মাথাচাড়া দেবার সুযোগ পায়।

২. ইতিহাসাশ্রয়ী সাহিত্যকর্মের নিদর্শন পাওয়া যায় একটা বিশেষ সাহিত্যিক ধারাতে—বিমল মিত্রের *কড়ি দিয়ে কিনলাম*, *সাহেব-বিবি-গোলাম* থেকে সুনীল গাঙ্গুলির *সেই সময়* পর্যন্ত।

৩. দ্রষ্টব্য : প্রফুল্লচন্দ্র পাল, দীনেশচন্দ্র সিংহ, হরিপদ চক্রবর্তী, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, রাজ্যেশ্বর মিত্র।

ভূমিকা

বাঙালি নাগরিক সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে

বাংলার অতীত নাগরিক সংস্কৃতির ইতিহাস একেবারে তমসাবৃত না হলেও, কিছুটা ছায়াচ্ছন্ন। যেসব পুরোনো ঐতিহাসিক শহরের নাম পাওয়া যায়—তাম্রলিপ্ত, কর্ণসুবর্ণ, সপ্তগ্রাম, পুণ্ড্রনগর, সুবর্ণগ্রাম—তাদের সাংস্কৃতিক সৃষ্টিকর্মের হদিশ বড়ো একটা মেলে না। কিছু পোড়ামাটির মূর্তি, মন্দির, বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ, পাথরের ভাস্কর্যের টুকরো, শিলালিপি এই জাতীয় নমুনা ছাড়া বিশেষ কিছুই টিকে নেই। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষেরা কী গান গাইত, বা কী ধরনের আমোদ-আহ্লাদ করত, তার সাহিত্যিক দলিল পাওয়া দুষ্কর। অবশ্য ঐ যুগের বাঙালি নাগরিক অভিজাতবর্গের জীবনযাত্রার ও অবসর বিনোদনের চমৎকার বিবরণী পাওয়া যায়। বাৎস্যায়নের *কামসূত্র*-এ, কহ্লনের *রাজতরঙ্গিণী*-তে এবং শ্রীধর দাস-সংকলিত *সদুক্তিকর্ণামৃত*-এর কয়েকটি বিচ্ছিন্ন শ্লোকে। লক্ষণীয়, এ বইগুলির সব-ই রচিত সংস্কৃত ভাষায়—যেটা সে যুগে রাজসভার ও অভিজাতবর্গের সরকারি ও সাহিত্যিক ভাষা ছিল। এবং *সদুক্তিকর্ণামৃত*-এর কিছু কবি ছাড়া, অধিকাংশ রচয়িতারাই ছিলেন অবাঙালি, বহিরাগত পর্যবেক্ষক। এঁদের রচনাতে দেখতে পাই, ধনৈশ্বর্য পরিবেশিত নাগরেরা দিন-রাত্রি অতিবাহিত করছে নৃত্য-গীতে, মদ্যপানে, বিলাস-বহুল ক্রীড়ামোদে—স্বভাবতই কলানিপুণা বারাঙ্গনা সমভিব্যাহারে।[১]

পরবর্তী যুগে—দ্বাদশ শতাব্দী নাগাদ—রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*-এ সমসাময়িক নবদ্বীপের নাগরিক জীবনযাত্রার স্বাদ-গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু আবার লক্ষণীয়—সংস্কৃতে রচিত এই কাব্যগ্রন্থটিতেও সেই একই রাজকীয় আড়ম্বরেরই প্রতিবিম্ব দেখি। প্রায় দুশো বছর ব্যাপী সেন রাজত্বে (এগারো শতক থেকে তেরো শতকের শুরুতে, যখন তুর্কী আক্রমণকারীরা নবদ্বীপ থেকে লক্ষ্মণ সেনকে বিতাড়িত করে), রাজধানীর সভাকবিদের রাজস্তুতি ও স্থানীয় উচ্চসম্প্রদায়ভুক্ত নাগরিকদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার গুণকীর্তন সম্বলিত কাব্যগ্রন্থ ছাড়া, এমন কোনো বিবরণী পাই না যার থেকে সাধারণ নগরবাসী—মধ্যবিত্ত করণিক, শহরের দোকানি পণ্যবিক্রেতা, কারিগর-মিস্ত্রি, কুলি-মজুর (যারা নিশ্চয়ই ঐ শহরগুলিতে বসবাস করতেন ও তৎকালীন নাগরিক সমাজব্যবস্থা ও পৌর-সংস্থার কড়ি-বর্গা-স্বরূপ ছিলেন)—এদের জীবনধারার ও সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার কোনো স্পষ্ট চেহারা বেরিয়ে আসে।

লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের অবসানের পর, প্রায় দুশো বছর অপেক্ষা করতে হয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নাগরিক ও সরকারি স্বীকৃতির জন্য। তুর্কী আক্রমণের পর নানা রাজনৈতিক-সামাজিক দ্বন্দ্বের অবসানে, পনেরো শতক থেকে গৌড়ে অধিষ্ঠিত মুসলমান সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা লৌকিক সংস্কৃতির ঐতিহ্যাশ্রয়ী কথ্য-কাব্যর ভাষা ও ছন্দে সাহিত্য রচনার সুযোগ দেখা দিল। এই সুলতানদের উৎসাহে *রামায়ণ-মহাভারত*-এর অনুবাদ, লৌকিক ধর্মকাব্য (*বেহুলা, মঙ্গলচণ্ডী* প্রভৃতি) ও রোম্যান্টিক প্রেমকাহিনি (*ইউসুফ-জুলেখা, পদ্মাবতী*) ইত্যাদির জনপ্রিয়তা লক্ষ করে নেশচন্দ্র সেন মশায় মন্তব্য করেছিলেন—"মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"[২]

ষোলো শতকের শুরুতে নবদ্বীপে চৈতন্যের নেতৃত্বে এক ধরনের নাগরিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল যাতে শহরের সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণের পরিচয় পাওয়া যায়। নবদ্বীপ সে-যুগে বিখ্যাত বিদ্যাস্থান ছাড়াও, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। চৈতন্যের জীবনীকারদের লেখায়, শহরের বিভিন্ন কারিগর, গোয়ালা, গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক ও অন্যান্য খেটে খাওয়া বাসিন্দাদের দেখা যায় নগর সংকীর্তনে যোগ দিয়ে সারা শহর ঘুরে বেড়াচ্ছে গান করতে করতে।[৩] অভিজাত শ্রেণি থেকে স্বতন্ত্র শহরের মেহনতি মানুষদের বিকল্প কণ্ঠস্বর শোনা যায় এই রাস্তার অনুষ্ঠানে। শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন শুধুমাত্র ধর্মীয় আচারে সীমাবদ্ধ ছিল না; একটা ব্যাপক আনন্দোৎসবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। ধর্মের সীমানা ডিঙিয়ে, জাতিভেদ-অস্পৃশ্যতা তুচ্ছ করে নবদ্বীপ শহরের নগর সংকীর্তন

সে-যুগের স্থানীয় establishment বা সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের সামনে একটা প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্কৃতি রূপে দেখা দিয়েছিল।[৪]

এর পরের শতকে—অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে—মোগল আমলে, ঢাকা শহর একটা কেন্দ্রীয় প্রশাসনের প্রাদেশিক রাজধানী রূপে প্রতিষ্ঠিত হল। এর আগে, ঢাকা নিশ্চয়ই একটি জনপদ ছিল। কিন্তু প্রাগ্ মোগল যুগে, বা তার পরবর্তী একশো বছরের রাজধানীর জীবনেও (১৬১০ থেকে ১৭১৩-'১৪ যখন মোগল প্রশাসন বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করে), ঢাকা থেকে কোনো উল্লেখযোগ্য নাগরিক সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যায় না। নিঃসন্দেহে, ঢাকার একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে—শহরের আদি অভিজাত-বর্গের চালচলনে ও রুচিজ্ঞানে, যার সূত্র হয়তো পাওয়া যাবে অতীতের মোগল আমলে। ঢাকার নাগরিক সংস্কৃতির আর একটা বিশিষ্ট অঙ্গ—তার লোক-সাহিত্য (যেমন, ঢাকার 'কুট্টির' ঠাট্টা-রসিকতা, ও চকবাজারের কেতাবপট্টি—যা কলকাতার 'বটতলার' সম-গোত্রীয়[৫])। কিন্তু এই দুই সংস্কৃতির সাহিত্যিক নির্মিতির নিদর্শন সতেরো শতকে পাওয়া যায় না। ঢাকার 'কুট্টির' রসিকতা শ্রুতি ও স্মৃতি নির্ভরশীল হয়ে লৌকিক কথ্য-সাহিত্যে হয়তো এখনও টিকে আছে।

বাংলা নাগরিক সংস্কৃতি ও সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল খুঁজতে গেলে, আমাদের আবার ফিরে যেতে হয় আঠারো শতকের নবদ্বীপে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে নবদ্বীপের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। দুশো বছর আগেকার চৈতন্যর জনপ্রিয় নগর-সংকীর্তন বড়ো একটা দেখা যায় না। তার বদলে, তাঁর রাজধানী কৃষ্ণনগরে এক নতুন ধরনের eclectic শহুরে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এঁর সভাসদ ও রাজকবিরা নানা ধরনের সামাজিক পরিবেশ থেকে আসছেন। একদিকে গোপাল ভাঁড়, যিনি গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির হাস্য-কৌতুকের ঐতিহ্যের ধারাবাহী। অন্যদিকে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, যিনি বর্ধমানের গ্রাম থেকে কৃষ্ণনগরে এসে রাজধানীর নাগরিক মূল্যবোধে পুরো দীক্ষিত হয়ে *বিদ্যাসুন্দর* রচনা করে শহরের অভিজাতবর্গ ও সাধারণ মানুষ উভয়েরই প্রীতিভাজন হয়ে উঠলেন।

এঁরই সমসাময়িক রামপ্রসাদের খ্যাতিও কৃষ্ণনগরে এসে পৌঁছেছে ইতিমধ্যে। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে নিজের সভাসদ হবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। রামপ্রসাদ তা প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিয়ে, একশত বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন।

ভারতচন্দ্রের মতো রামপ্রসাদ-ও গ্রামের ছেলে। চব্বিশ পরগনার কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। কিন্তু কৃষ্ণনগরে না গিয়ে, পিতার মৃত্যুর পর ভাগ্যান্বেষী রামপ্রসাদ গিয়ে হাজির হয়েছিলেন এক নতুন শহরে—কলকাতায়—যার নাম তখনও পর্যন্ত বিখ্যাত শহরের তালিকাতে ওঠেনি। এই উঠতি

ব্যবসায়িক নগরেই রামপ্রসাদ এক জমিদার ভবনে মুহুরির কাজ পেয়েছিলেন। ঐ দপ্তরেই কাজের ফাঁকে, শোনা যায়, কালী-ভক্ত রামপ্রসাদ লিখেছিলেন—

আমায় দেও মা তবিলদারী
আমি নিমক-হারাম নই শঙ্করী
পদরত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে,
ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা,
সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।

*** *** ***

তবু শিবের মাইনে ভারি
আমি বিনা মাইনের চাকর...

এ গানের কথায় ও ভাবে নতুন ধরনের রূপকালঙ্কার ও চালচলনের আভাস পাচ্ছি যা একান্তই কলকাতার সদ্য-উদ্ভূত ঔপনিবেশিক mercantile সংস্কৃতির আওতাতে তৈরি হচ্ছে। মুহুরির কাজে নিযুক্ত রামপ্রসাদের কর্মক্ষেত্রে, তহবিলদার—আজকাল আমরা যাদের বলি 'কেশিয়ার'—সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ ও উপরওয়ালাদের মাইনের তুলনায় অধস্তন কর্মচারীদের কম মাইনের অভিযোগ, এ সব-ই আজকের ডালহৌসি স্কোয়ার পাড়ার করণিক সম্প্রদায়ের নিত্যনৈমিত্তিক অনুযোগের পূর্বাভাস বলে মনে হয়।

রামপ্রসাদ যদিও কলকাতাতে বেশিদিন থাকেননি (উনি ফিরে এসেছিলেন নিজের গ্রামে, সেখানে বসেই উনি কালী সাধনা করতেন বলে শোনা যায়, এবং সেখানেই ওঁর জনপ্রিয় গানগুলি রচিত হয়েছিল), ওঁর কলকাতা যাত্রা নিছক একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই আশেপাশের গ্রাম ও শহর থেকে দলে দলে মানুষ আসতে শুরু করেছে এই নতুন ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলে। সুতানুটি, ডিহি কলিকাতা ও গোবিন্দপুর—এই তিনটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম, ব্যাপারীদের গঞ্জ থেকে দ্রুতগতিতে একটি সুসম্বদ্ধ শহরে পরিণত হচ্ছিল এই সময়ে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ও ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে প্রাপ্তিসাধ্য সুযোগের সন্ধানে মুৎসুদ্দি-বানিয়ান-দেওয়ান সম্প্রদায় কলকাতায় বসতি স্থাপন করে। ছোটোখাটো জমিদারের মতো, কলকাতার Black Town-এ (বাঙালিদের বাসস্থান প্রধান উত্তরাঞ্চলকে যে ভাষাতে দক্ষিণাঞ্চলের শ্বেতাঙ্গ আমলা ও বণিক বাসিন্দারা সেকালে বর্ণনা করত) এই নব্যধনী সম্প্রদায়, তাঁদের

সদ্যক্রীত জমি-জমাতে প্রজা বসাতে শুরু করলেন। স্বভাবতই বাজার-ই বসল। আধুনিক এক ঐতিহাসিকের মতে, এইসব ধনী পরিবারের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি ছিল বাজার ও বস্তি।[৭]

বাংলার অতীতের শহরগুলি থেকে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধাঁচের নগরী রূপে কলকাতা গড়ে উঠছিল। নবদ্বীপের মতো বিদ্যাস্থান, বা তাম্রলিপ্তির মতো নিছক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে কলকাতা তৈরি হয়নি। ইংরেজ ঔপনিবেশিক ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক স্বার্থ নগরায়ণের প্রতি ধাপ নির্ধারিত করেছিল। White Town ও Black Town-এ শহরের বিভাজন, আবার Black Town-এ দেশীয় ধনী ও দেশীয় নিম্নবর্গের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দূরত্ব এবং তারও উপর এই নিম্নবর্গের মেহনতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও নানা ধরনের নতুন পেশার আবির্ভাব ও পুরোনো বৃত্তিজীবীদের পরিবর্তিত জীবনধারা—এ সব-ই অতীতের নাগরিক ঐতিহ্য থেকে আলাদা, এবং ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনেই বিশিষ্ট আকার ধারণ করেছিল।

কলকাতার বস্তি ও বাজারে এসে হাজির হয়েছিলেন গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে শ্রমজীবী মানুষেরা—কারিগর, জেলে-ময়রা-ধোপা-মালি-দরজি, কৈবর্ত চাষি, ছোটো পণ্যদ্রব্য বিক্রেতা—জীবিকার্জনের তাগিদে। রামপ্রসাদের মতো এঁরাও এঁদের ঐতিহ্যাশ্রয়ী গ্রামীণ সংস্কৃতি নিয়ে এসেছিলেন এই শহরে। নতুন নাগরিক পরিবেশ ও চিন্তাধারার প্রভাবে এঁদের সেই পল্লীসংস্কৃতির নৃত্য-গীত প্রমোদানুষ্ঠানগুলিকে এঁরা প্রয়োজনমতো পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করে এক স্বতন্ত্র লোকসংস্কৃতির প্রবর্তন করলেন।

পল্লীসংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও জনসংস্কৃতি

উনিশ শতকের কলকাতার নাগরিক সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনার গোড়াতেই কয়েকটা তাত্ত্বিক সংজ্ঞা স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন। ইংরেজি পরিভাষার সঠিক প্রয়োগে, পল্লী সংস্কৃতিকে folk-culture বলে অভিহিত করা যায়, নাগরিক লোকসংস্কৃতিকে popular culture, ও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা নির্ভরশীল প্রচার মাধ্যমে পরিবেশিত জনসংস্কৃতিকে mass culture বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, এই তিনটি স্বতন্ত্র অভিধা বড়ো এলোমেলো ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পাশ্চাত্যের কিছু আধুনিক গবেষকদের লেখায় বিশেষ করে মার্কিন মুলুকে—popular culture, এই অভিধাটি এমন যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করা হয়, যাতে সমস্ত বিষয়টা ঘোলাটে করে দিয়ে লোকসংস্কৃতির বিশেষ নাগরিক আর্থ-সামাজিক ও শ্রেণি সচেতন চরিত্রটাকেই অস্পষ্ট করে দেওয়া হয়। একটা অরাজনৈতিক ও অনৈতিহাসিক

দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এইসব গবেষকেরা popular culture-এর সংজ্ঞাটিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে এমন এক ঢাউস বস্তা বানাতে চান যে তার মধ্যে কৃষকের পল্লীগীতি ও Bob Dylan, Joan Baez, Pete Seeger-এর রাজনৈতিক প্রতিবাদের গান থকে শুরু করে বাজারে সর্বাধিক বিক্রীত সস্তারুচির সাময়িক পত্রিকা (যা pulp magazine নামে পরিচিত) বা যৌনাত্মক ও উত্তেজনাপূর্ণ খুন-খারাপির চলচ্চিত্র, এমনকি fast food পর্যন্ত ঢুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এঁদের যুক্তি—যেহেতু এ সব-ই ও শহরের মেহনতি মানুষ-এর খরিদ্দার, দর্শক, শ্রোতা ও পাঠক, এগুলিকে এক-ই পঙ্‌ক্তিতে ফেলে 'লোকসংস্কৃতি' বলে অভিহিত করা উচিত।[৮]

এ দেশেও আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক সময়-ই শুনতে পাই—শহরের সিনেমা হলগুলিতে বোম্বাই মার্কা হিন্দি ফিল্ম ও টালিগঞ্জে নির্মিত তার বাংলা সংস্করণ দেখবার জন্য শহরের নিম্নবর্গের মানুষেরাই বেশি ভিড় করেন, এবং তাঁদের জন্যই এ-সব ছবির কাটতি বেশি। উত্তর কলকাতার কিছু রঙ্গমঞ্চে 'যাত্রা' নামাঙ্কিত এক ধরনের নাচগানপূর্ণ অভিনয়-ও লোকে ভিড় করে দেখে। এ সব লক্ষ করে অনেকেই বলেন—এগুলি যখন এত জনপ্রিয়, তাহলে একে 'লোকসংস্কৃতি' বলব না কেন?

ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। আমাদের গ্রামাঞ্চলে কৃষকের গাওয়া পল্লীগীতি থেকে উনিশ শতকের কলকাতায় রচিত লোকগীতির যেমন একটা চারিত্রিক পার্থক্য আছে তেমনি এক-ই শহরে নির্মিত হলেও, নাগরিক লোকসংস্কৃতি থেকে সিনেমা, বা টিভি-তে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রের-ও (তা যতই জনপ্রিয় হোক) একটা মৌলিক প্রভেদ আছে। শুরুতেই মনে রাখা দরকার আধুনিক জনসংস্কৃতির এই সৃষ্টিকর্মগুলি মূলত যন্ত্র নির্ভরশীল। এমনকি, কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত তথাকথিত 'যাত্রা'তেও আলোক-সম্পাত ও audio-cassette-এ পরিবেশিত আবহসঙ্গীত যে প্রযুক্তির শরণাপন্ন, তা পুরোনো কলকাতার লোকসংস্কৃতির কলাকৌশল থেকে বহুদূরাবস্থিত।

তাই ঐতিহাসিক ও সমাজসচেতনতার দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে বিচার করলে পল্লী-সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও জনসংস্কৃতি—এই তিনটি ভিন্ন ধারার স্বাতন্ত্র্য ও সঙ্গে সঙ্গে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম তারতম্য যে-কোনো সংবেদনশীল পর্যবেক্ষকেরই চোখে পড়বে। পল্লীসংস্কৃতি—এই নামেই সূচিত হচ্ছে এর উৎসস্থল। গ্রামীণ মানুষের সৃষ্ট সঙ্গীত, সাহিত্য, নৃত্য-গীতি, প্রমোদানুষ্ঠান, ধর্মীয় ও সামাজিক ব্রত, শিল্পকলা, ইত্যাদি সবই পল্লীসংস্কৃতির আওতায় পড়ে। মুখে মুখে লোকপরম্পরায় এ সংস্কৃতি সঞ্চারিত হয় বলেই একে oral culture বা কথ্য-সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করা যায়। কিন্তু মনে রাখা দরকার oral culture-এর অন্য ধারা, অর্থাৎ বেদের মতো শ্রুতি, বা মনু

প্রভৃতি রচিত ধর্মসংহিতার মতো স্মৃতিশাস্ত্রের থেকে, পল্লী সংস্কৃতির চরিত্র আলাদা। এ প্রসঙ্গে, great tradition (বা অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণির বহুদূরব্যাপী নিয়ন্ত্রিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য) ও little tradition (অর্থাৎ অখ্যাতজনের সীমিত সামাজিক পরিধির দৈনন্দিন জীবনে সৃষ্ট সংস্কৃতির লোকপরম্পরা)-এর যে পার্থক্য আধুনিক সমাজবিজ্ঞান ও সাহিত্য সমালোচনায় টানা হয়, তার উল্লেখ প্রয়োজনীয়।

সংস্কৃতির 'রাজপথ' ও 'জনপথ'

বেদ ও *মনুসংহিতা*, মৌখিক আবৃত্তির মাধ্যমে যুগপরম্পরায় প্রচারিত ও সংরক্ষিত হয়ে এসেছে। *খনার বচন*, বা প্রাচীন বাংলা প্রবাদ, বা কোনো পল্লীকবির গান, ঠিক একই ভাবে বিশ্রুত এবং জনস্মৃতিতে সঞ্চিত হয়ে থাকলেও, এই দুটো ধারাকে কি এক পঙ্‌ক্তিতে ফেলা যায়? বেদ ও ধর্মসংহিতাগুলি রচিত হয়েছিল ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাষাতে, এর রচয়িতারা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত সমাজের মানুষ, আচার্য গোষ্ঠীভুক্ত। অপরপক্ষে, আমাদের পুরোনো প্রবাদ বা গ্রামের রীতি, লৌকিক ভাষাতে ও গ্রামীণ রূপকালঙ্কারের সাহায্যে রচনা করেছিলেন যাঁরা, তাঁরা অধিকাংশ-ই ছিলেন নিরক্ষর নিম্নবর্গের মানুষ। স্বভাবতই, এই দুই সৃষ্টিকর্মর চরিত্র—উভয়ের প্রচার মাধ্যম oral হলেও—স্বতন্ত্র।

শুধু আমাদের দেশে নয়, সর্বত্র-ই এ দুই ধারার স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। গ্রামীণ শ্রমজীবী সমাজের সংস্কৃতির গবেষণাচর্চায়, আধুনিক পাশ্চাত্য লেখকদের মধ্যে Robert Redfield-এর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে—"The great tradition is cultivated in schools or temples ; the little tradition works itself out and keeps itself going in lives of the unlettered in their village communities."[৯] অর্থাৎ অভিজাত সংস্কৃতির চর্চা হয় বিদ্যালয় ও মন্দিরে; অখ্যাতজনের সংস্কৃতি নিজেকে তৈরি করে এবং চালু রাখে গ্রামীণ নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনকে অবলম্বন করে।

অবশ্য Redfield-এর এই বিশ্লেষণের প্রায় তিরিশ বছর পূর্বে প্রাচ্যের বিখ্যাত চারুকলাবিদ্, শ্রীলঙ্কার আনন্দ কুমারস্বামী, ঠিক অনুরূপ ভাবেই অভিজাত ও জনগণের শিল্পকলার মধ্যে একটা দাঁড়ি টেনেছিলেন। তাঁর মতে, শিক্ষিত সমাজ বা আচার্যদের শিল্পচর্চা চলে শিল্পের রাজপথ বা high way দিয়ে, আর জনগণের শিল্প এগোয় অলিগলি বা by-way দিয়ে। রাজপথগামী অ্যাকাডেমিক শিল্পকে কুমারস্বামী সুনজরে দেখেননি। ঐতিহ্য-বিরোধী, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ভাবাবেগপূর্ণ বলে এ শিল্পধারাকে খারিজ

করে দিয়ে তিনি পল্লীর জনগণের শিল্পের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন গ্রামীণ সমাজের সরল বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা, এবং তার ওপর একটা মহত্ত্ব আরোপ করেছিলেন।[১০]

কুমারস্বামীর মতামত হয়তো অনেকেই পুরোপুরি মানবেন না। কিন্তু, স্বীকার করতে হবে যে তিনি পল্লীসংস্কৃতির মূল চরিত্রটা ধরেছিলেন ঠিক-ই। মৌখিক সঞ্চারণ ও গ্রামীণ সমাজের প্রাত্যহিক সমস্যা, লোকাচার প্রভৃতির ছাপ—এইসব বৈশিষ্ট্য ছাড়াও, পল্লীসংস্কৃতির সবচেয়ে বড়ো চারিত্রিক স্বকীয়তা তার যৌথ নির্মাণ পদ্ধতি। ব্যক্তি-কবির একক রচনা নয়; যুগ পরম্পরা ধরে গীত কোনো গান রূপান্তরিত হয় এক প্রজন্ম থেকে আর-এক প্রজন্মে। Great Tradition-এ রচয়িতার একচেটিয়া অধিকার তার সৃষ্টিকর্মের উপর। আর Little Tradition-এ শিল্প-সাহিত্য গোটা সমাজের সম্পদ। এক-ই গান বা লৌকিক আখ্যান যুগে যুগে পালটায়, সময়োপযোগী নতুন উপকরণ ও রূপালঙ্কার আহরণ করে। Little Tradition-এর এই নমনীয়তা ও উদারতা পল্লীসংস্কৃতির উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে জীবন্ত করে তুলেছে।

ঠিক এই কারণেই, পল্লীসংস্কৃতির শিল্পীরা শহরে এসে এক নতুন সৃজনশীল লোকসংস্কৃতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। নাগরিক লোকসংস্কৃতির অনেক উপাদানই অতীতের পল্লীসংস্কৃতি থেকে আহৃত হলেও, তা এক স্বতন্ত্র আকার ও চরিত্র ধারণ করেছে। প্রথমত, গ্রামীণ জীবনের সমাজব্যবস্থা, ঋতুগত কৃষিকার্য, সুসংহত জনগোষ্ঠী—এসব থেকে বিচ্যুত হয়ে এইসব আগন্তুকেরা শহরে এসে যে-সব বিক্ষিপ্ত কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন ও নতুন উপজীবিকা গ্রহণে বাধ্য হলেন, তার আর্থ-সামাজিক পরিবেশে তাঁদের ঐতিহ্যবাহিত পল্লীসংস্কৃতির রূপ পালটে গেল। তাই উনিশ শতকের কলকাতায় দেখা গেল গ্রামের তরজার লড়াই কবিগানে পরিবর্তিত হচ্ছে। অতীতের কীর্তনের গায়কী ধারা ভেঙে ঢপ-কীর্তন তৈরি হচ্ছে, যাত্রায় খেমটার প্রবর্তন ও পাঁচালিতে সঙের আমদানি হচ্ছে। এ সবই শহরে জীবনযাত্রার প্রতিবিম্ব হয়ে দাঁড়াল।

দ্বিতীয়ত, শহরে এসে লোককবিরা ক্রমশই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হতে শুরু করলেন এবং নিজেদের নাম প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলেন। পল্লীসংস্কৃতির গানের রচয়িতা অজ্ঞাতনামা। লোকপরম্পরায়, জনকণ্ঠে তাঁদের গান বেঁচে থাকলেও, তাঁদের নাম হারিয়ে গেছে যৌথ সৃষ্টিকর্মের নিয়মানুযায়ী। লোকমুখে বহুল-গীত ''আমার বাড়ি আইস বন্ধু বসতে দিমু পিঁড়ি...''-র কথাগুলি কে প্রথম রচনা করেছিলেন তা কি কেউ জানে? বা পল্লীবধূর মুখে বসানো এই কৌতুকাবহ অথচ মর্মস্পর্শী প্রচলিত গানটি—''রাঙ্গা ভাসুর আমার কেন দেওর হইল না?''—এটি কি কোনো রসিকা রমণী রচিত, না কোনো ভাসুরের কল্পনাবিলাস? আমরা কোনোদিন-ই জানব না।

অবশ্য, অতীতের পল্লীসংস্কৃতির সবটাই অজ্ঞাতনামাদের দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল না। তা না হলে, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বা চণ্ডীদাসের নাম পেলাম কী করে? নিজ নিজ রচনার শেষে ভণিতা দেবার রেওয়াজ শুরু হয়েছিল বোধহয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে। ঐ সময় থেকেই শুনতে পাই ব্যক্তি-কবির নাম—শাহ মুহম্মদ সগীর (*ইউসুফ জোলেখা*-র রচয়িতা) মালাধর বসু (*শ্রীকৃষ্ণ বিজয়*-এর লেখক) প্রভৃতি। গৌড়ের সুলতানদের স্তুতি করে এঁরা এঁদের রচনা আরম্ভ বা শেষ করেছেন। বোঝা যায়, গ্রামীণ অজ্ঞাতকুলশীলতা থেকে এঁরা বার হয়ে আসতে চাইছেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য। ত্রয়োদশ শতকে তুর্কী আক্রমণের পর বাংলার গ্রামীণ সমাজ বিপর্যস্ত। যে সুসংহত সামাজিক পরিবেশে যৌথ পল্লীসংস্কৃতির ব্যক্তি-কবি বা শিল্পীর জীবনযাত্রা সুনিশ্চিত করেছিল, তা অবিন্যস্ত হয়ে গেছে। পল্লীকবিরা কোথায় যাবেন? কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর নদীয়ার গ্রাম ফুলিয়া ছেড়ে পদ্মা পার হয়ে গিয়েছিলেন বারেন্দ্রভূমিতে, এবং গৌড়ের সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় *রামায়ণ* অনুবাদ করেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর জন্মভূমি বর্ধমানের দামুন্যা গ্রাম ত্যাগ করে মেদিনীপুরের আঁড়বার রাজ্য বাঁকুড়া দেবের কাছে চলে আসেন, ও তাঁর আনুকূল্যে *চণ্ডীকাব্য* রচনা করেন ও এই রাজপরিবারের কাছ থেকেই 'কবিকঙ্কণ' উপাধি পান। স্বভাবতই সাহায্যপ্রার্থী কবিদের নিজেদের নাম ঘোষিত করতে হয়েছিল এইসব রাজসভায় পৃষ্ঠপোষকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এবং অন্যান্য আশ্রিত কবিদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়েও।

ঠিক এক-ই ভাবে বাংলার গ্রামসমাজ আবার ভাঙনের মুখে পড়ল আঠারো-উনিশ শতকে, যখন ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তি এদেশ দখল করল। গ্রামের পুরোনো পেশা ও জীবনযাত্রা থেকে বিচ্যুত হয়ে ভাগ্যান্বেষণে অনেকেই চলে এলেন নতুন শহর কলকাতায়। এখানে নতুন পৃষ্ঠপোষক; তাদের আনুকূল্যের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা। গ্রামের লোককবিরা এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে নিজেদের নাম ঘোষণা শুরু করলেন। আমরা শুনতে পেলাম হরু ঠাকুর, ভোলা ময়রার নাম, ভবানী বেনে ও নিতাই বৈরাগীর দলের কবির লড়াই-এর কথা। এরও পরে শুনেছি পাঁচালিকার দাশু রায় ও যাত্রা জগতের দিক্‌পাল গোপাল উড়ের নাম। নাগরিক লোকসংস্কৃতিতে ব্যক্তি-কবির প্রতিষ্ঠা শুরু হয়ে গেল।

লোকসংস্কৃতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের পৃষ্ঠপোষকদের চরিত্র যা এই ধারাকে পল্লীসংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র পর্যায় ফেলে। পল্লীসংস্কৃতির অধিকাংশ অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক গ্রামের সাধারণ মানুষ। কৃষিভিত্তিক নৃত্য-গীতি, বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে সঙ্গীতাদি, বা কথকতা অথবা পাঁচালি—এ-সবের শ্রোতা ও অংশগ্রহণকারী, শিল্পী ও সমঝদার একই অঞ্চলের

একই জনগোষ্ঠীর অঙ্গীভূত। গ্রামের মেহনতি মানুষের নিজস্ব প্রয়াসে, পরিচালনায় ও প্রত্যক্ষ যোগদানে এ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। গণতন্ত্রের যে সুপরিচিত সংজ্ঞা—For the people, by the people, of the people (জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা নির্মিত ও জনগণের ভিতর থেকে উদ্ভূত)—এই ত্রিকোণ সংজ্ঞাটি পল্লীসংস্কৃতি প্রসঙ্গে যথাযোগ্য বলে মনে হয়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এটাও খেয়াল রাখা দরকার যে পল্লীসংস্কৃতি সবসময়-ই ধনীবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না। পূজা-পার্বণে গ্রামের জমিদার এসে যাত্রা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে দর্শক হিসেবে যোগদান করতেন, শিল্পীদের পারিতোষিক দিতেন, নিজের আবাসে তাদের ডেকে প্রমোদানুষ্ঠানের আয়োজন-ও করতেন। কিন্তু গ্রামের দৈনন্দিন উৎসব-অনুষ্ঠান—যে 'বারোমাসে তেরো পাবন' নিয়ে বাংলার পল্লীসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে—এগুলিতে গ্রামের নিম্নবর্গের মানুষের নিজস্ব চাহিদা ও রুচি-ই নির্ধারক ছিল।

এ প্রসঙ্গে Great Tradition ও Little Tradition-এর পারস্পরিক সম্পর্কের আর একটা দিকের একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা সেরে নেওয়া যাক। পল্লীসঙ্গীতের ইতিহাসে দেখা যাবে অভিজাতপূর্ণ Little Tradition-এর কিছু কিছু অংশগ্রহণ করছে (যেমন দুর্গাপূজার সময় যাত্রা বা পাঁচালি)। কিন্তু Little Tradition-এর অনুগামীরা, অর্থাৎ নিম্নবর্গের জনগণ Great Tradition-এ প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত। জমিদারগৃহে বিবাহ বা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কাঙালিভোজনে আমন্ত্রিত হলেও, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বা নাটকের অভিনয়তে এঁরা কোনোদিন নিমন্ত্রিত হয়েছেন বলে শোনা যায়নি। শূদ্রের বেদ পাঠ ও মন্দির-প্রবেশে অনধিকারের নির্দেশের ধারা বেয়ে, অভিজাত বর্গ নিম্নবর্গকে Great Tradition-এর চত্বরে কোনোদিন ঢুকতে দেয়নি। ইউরোপীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই উভয় ঐতিহ্যের পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনা প্রসঙ্গে Peter Burke লক্ষ করেছেন যে অভিজাতবর্গরা জনসাধারণের কিছু কিছু অনুষ্ঠানে যোগদান করত। কিন্তু জনসাধারণ কখনো উচ্চ বর্গের Great Tradition-এ অংশগ্রহণ করেনি। সমাজের সংখ্যাগুরু অংশের সামনে Great Tradition-এর দ্বার উন্মুক্ত ছিল, অথচ যারা একই সঙ্গে Little Tradition-এর এলাকাতেও যাতায়াত করত, তাদের কাছে লোকসংস্কৃতি ছিল "second culture"।[১১]

শহরের পৃষ্ঠপোষক

নাগরিক লোকসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। শহরে এসে পল্লীসংস্কৃতির শৈল্পিক ধারাগুলি কেবল নতুন আকার নিল না (যেমন তরজা থেকে

কবিগানে, বা গ্রামীণ জড়ান পট থেকে কালীঘাটের কাগজের পটে পরিবর্তন), নাগরিক সভ্যতার cash economy বা মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির চাপে এগুলি পণ্যদ্রব্যে পরিণত হল। লোককবিরা ক্রমশই বেচাকেনা, লেনদেন, বাজারদর—এইসব নব্যলব্ধ ব্যবসায়িক সম্পর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন। যদিও লোককবিরা তাঁদের সমঝদার-রূপে মূলত স্থানীয় জনগণকেই পেয়েছিলেন, তাঁরা আর-এক ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেছিলেন—শহরের নতুন ধনীবর্গের কাছ থেকে। আঠারো শতকের কলকাতায় যারা সম্পদশালী ছিলেন—শোভাবাজারের বা পাথুরিয়াঘাটার রাজাদের মতো জমিদার শ্রেণি, অথবা রামদুলালদের মতো নব্যধনী যাঁরা ব্যবসা বা মুৎসুদ্দিগিরি করে ক্রোড়পতি হয়েছিলেন—উভয় শ্রেণির মানুষ-ই তাঁদের পুরোনো গ্রামীণ শিকড় থেকে পুরোপুরি বিচ্যুত হয়ে যাননি। তাই দেখি, শোভাবাজারের রাজবাড়িতে হরু ঠাকুর, ভবানী বেনে ও নিতাই বৈরাগীর কবির গানের লড়াই হচ্ছে। ভোলা ময়রার মতো বিখ্যাত কবিয়ালরা যথেষ্ট পয়সা উপার্জন করতে শুরু করেছিলেন। এইসব ধনী পৃষ্ঠপোষকদের বাড়িতে যখন তাঁরা গাইতেন, পুরস্কার ও পারিতোষিক পেতেন। তাঁদের খ্যাতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকেরা প্যালা দিয়ে তাঁদের নিমন্ত্রণ করতেন। এটা পরবর্তী যুগে রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াল। গোপাল উড়ে *বিদ্যাসুন্দর* যাত্রা অভিনয় করে এত খ্যাতি অর্জন করেন যে কলকাতার অভিজাত পরিবারও বহু টাকা বায়না দিয়ে তাঁর দলকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসতেন। দাশু রায়কে "প্রথমে লোক...তিনটি মাত্র টাকা দিয়া পাঁচালীর গান করাইত, শেষে শতমুদ্রা দিতে স্বীকৃত হইলেও সেই দাশরথি তাঁহাদের দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিলেন।"[১২]

এইসব নতুন পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে লোককবিরা নানা টানাপোড়েনের থেকে ভুগতেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯) যিনি একনিষ্ঠ ভাবে আঠারো-উনিশ শতকের কবিয়ালদের গান সংগ্রহ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে আছেন, এমনই একজন লোককবির দুঃখজনক পরিণতির বর্ণনা করেছেন। কলকাতার সিমূলা নিবাসী হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গি, যিনি হরু ঠাকুর নামে বিখ্যাত হন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং যদিও পড়াশোনার বিশেষ সুযোগ পাননি, কেবল নিজের সুকণ্ঠ ও বিদ্যা-অনুশীলনের অদম্য উৎসাহের জোরে সে-যুগের কলকাতার প্রসিদ্ধ কবিয়াল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায়—'ইনি পূর্বে 'সৌখিন' ছিলেন, কাহারো স্থানে কপর্দক মাত্র গ্রহণ করেন নাই। শেষে নানা গতিকে অভাববশত ধনের নেশায় পেশায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহামান্য মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর কর্তৃক ইহার 'সৌখীনত্ব' রূপ সতীত্ব সংহার হয়। অর্থাৎ মহারাজের অধিক অনুরোধ ও আশ্বাস বাক্য এবং

দানের বশ হইয়া ইনি ধনাগম তৃষা কৃশা করিতে পারিলেন না।" নবকৃষ্ণের আদেশে হরু ঠাকুর দল বানালেন, এবং যেহেতু শোভাবাজারের রাজবাড়িতে তাঁর আসরে শহরের অন্যান্য ধনী গণ্যমান্য লোকেরা নিমন্ত্রিত হতেন, তাঁর গানের "ধ্বনি যে ধনির কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল তিনি-ই তাঁহাকে যত্নযোগে আহ্বান করত আপন বাটীতে গাহনার নিমিত্ত অর্থ দিয়া বাধিত করিতে লাগিলেন।" কিন্তু যেহেতু হরু ঠাকুরের এই ব্যবসায়িক সাফল্যের সৃষ্টিকর্তা ছিলেন রাজা নবকৃষ্ণ, তিনি তাঁর আশ্রিত কবির উপর কিছু বাধা-নিষেধ আরোপ করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত জানাচ্ছেন—"...তিনি বিশেষ বিশেষ পর্ব্বাহে রাজবাটী ভিন্ন অন্যত্র বায়না লইতে পারিতেন না।"[১৩] অর্থাৎ, শহরে লোককবিদের স্বাধীনতা খর্ব হতে শুরু করেছে আঠারো শতকের শেষ থেকেই—ধনীদের আর্থিক আনুকূল্যের বদলে তাঁদের কাছে চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকার মাধ্যমে। আজকের শিল্পজগতে contract system-এর সূত্রপাত তখন থেকেই!

এ সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু কলকাতার লোককবিরা তাঁদের ধনী পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে সম্পর্কে নিজেদের আত্মমর্যাদা বজায় রাখতে চেষ্টা করতেন। কখনো-কখনো দুটো স্পষ্ট কথা জানিয়ে দিতে দ্বিধা করতেন না। এর বহু নজির মেলে তৎকালীন বিবরণী থেকে। কলকাতার ঠনঠনে নিবাসী লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, যিনি ঐ যুগে 'লোকে কানা' নামে পরিচিত, পেশাদারি পাঁচালিকার ছিলেন। একবার এক অভিজাত বাবুর বাগানবাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে লক্ষ্মীকান্ত চর্ব্য-চোষ্য সমস্ত কিছু এমনভাবে উদরস্থ করলেন যে পাতে এক কণা শাকান্ন-ও পড়ে রইল না। অন্যদিকে বাবুর খাওয়া শিষ্টাচারসম্মত মাপাজোখা; একটু একটু করে খাবার ফলে তাঁর পাতে বিপুল উচ্ছিষ্ট পড়ে রইল। আহারান্তে ভৃত্য যখন দুজনের পাত ফেলে দিল, তখন দেখা গেল এক কুকুর এসে লক্ষ্মীকান্তের শূন্য পাতের দিকে ভ্রুক্ষেপমাত্র না করে, নিমন্ত্রণকর্তা বাবুর পাতটি বেছে নিয়ে তাঁর উচ্ছিষ্ট পরমানন্দে খেতে শুরু করল। এই দেখে বাবু শ্লেষ করে বললেন—"ছি, ছি, বিশ্বাস! দেখো তোমার পাতে কুকুর-ও আহার করে না!" শুনে লক্ষ্মীকান্ত তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—"মহাশয়! এ কুকুর ভিন্ন গোত্রে আহার করে না।" অর্থাৎ বাবু ও কুকুরটি সমগোত্রীয়![১৪] সে-যুগের বিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রা এই রকম এক গানের আসরে নিমন্ত্রণকর্তাকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন—"মাপ কর গো রায়বাবু, দুটো সত্য কথা বলি।" এই হুঁশিয়ারির পর কর্তার কিপটে স্বভাবের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন—"পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুফতের মধু অলি।"[১৫]

ধনী পৃষ্ঠপোষকদের ফরমায়েশ পালনে স্বীকৃত হলেও, শহরের লোককবিরা তাঁদের মূল শিকড় থেকে কোনোদিনই বিচ্ছিন্ন হননি। বরাবরই এঁদের প্রধান আসর জমত

শহরের সাধারণ ক্রেতা ও দর্শকদের মধ্যে। কবিয়াল নিতাই বৈরাগী 'সখী সংবাদ' গেয়ে উচ্চ মহলে যতই প্রশংসা পান, শেষ পর্যন্ত তাঁর ব্যাপক গুণমুগ্ধ সাধারণ শ্রোতৃমণ্ডলের দাবি মেটাতে তাঁকে 'খেউড়' গাইতে হত।[১৬]

তাই কলকাতার লোকসংস্কৃতির ইতিহাস প্রধানত শহরের অখ্যাতজন, নিম্নবর্গের পথ দিয়ে, বা কুমারস্বামীর ভাষায় by-way ধরেই এগিয়েছিল। এদের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা, রূপকল্প ও শব্দালঙ্কার নিয়ে গড়ে উঠেছিল উনিশ শতকের কলকাতার লোকসংস্কৃতি। এর নির্মাণপদ্ধতিতে দেখা যায় এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনশীলতা ও যৌথ সমাজের ঐতিহ্যাশ্রয়ী প্রবণতা। যদিও অতীতের অজ্ঞাতনামা কবিদের বদলে ব্যক্তিকবির নাম ও যশ প্রচারিত হচ্ছিল, এঁদের শিল্পকর্মে সেই পুরোনো যৌথ অংশগ্রহণের প্রথা তখনও প্রচলিত ছিল। তাই দেখতে পাই, পূর্বোল্লিখিত কবিয়াল নিতাই বৈরাগী (১৭৫১-১৮১৮), 'বিরহ', 'সখীসংবাদ' ও 'খেউড়' গেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সুর-লয়-সমন্বিত সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে তিনি যে গানগুলি গাইতেন সেগুলি তাঁর জন্য 'বেঁধে' (অর্থাৎ রচনা করে) দিতেন কলকাতার সিমূলা অঞ্চলের গৌর কবিরাজ ও নবাই ঠাকুর।[১৭] ঠিক একইভাবে যাত্রার জগতে যদিও গোপাল উড়ে *বিদ্যাসুন্দর* যাত্রায় অভিনয় ও গান গেয়ে নাম করেছিলেন, কিন্তু তাঁর বিখ্যাত গানগুলির একটিও তাঁর নিজস্ব রচিত নয়। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের গবেষণা অনুযায়ী "নানা জায়গার কবি গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। ওস্তাদেরা সুরসংযোগ করিয়া দেন, আর যাত্রার অধিকারী গোপালের নামে সেগুলি বিকায়।"[১৮] সে যুগের কলকাতার লোকশিল্পেও এই যৌথ নির্মাণ পদ্ধতির সন্ধান পাচ্ছি ব্যক্তিশিল্পীর খ্যাতির পিছনে। কালীঘাটের পটের চিত্রকরদের নাম দেখতে পাচ্ছি তাঁদের ছবির নীচে—নীলমণি দাশ, নিবারণচন্দ্র ঘোষ, কালীচরণ ঘোষ। কিন্তু এই পটগুলি তৈরির নেপথ্যে ছিল তাঁদের পরিবারের যৌথ উদ্যোগ। নিবারণচন্দ্ররা অনেক সময়-ই নকশা এঁকে প্রধান রেখাগুলি দেখিয়ে দিতেন—যাতে তাঁদের রেখাঙ্কনের মুনশিয়ানা ধরা পড়ত। কিন্তু এই outline-এর ভিতরের অংশ রং দিয়ে ভরিয়ে তুলতেন তাঁদের ঘরের মেয়েরা। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই শিল্প-পদ্ধতির প্রত্যক্ষ দর্শক হিসেবে লিখে গেছেন কীভাবে মেয়েরা দু-এক ঘণ্টার মধ্যে এইভাবে ২০০ থেকে ৩০০ পট সম্পূর্ণ করে ফেলতেন।[১৯]

যৌথ ঐতিহ্যের আরও একটা পদচিহ্ন থেকে গিয়েছিল নাগরিক লোকসংস্কৃতির ক্রমবিকাশের পথে—স্ব-সমাজের সুখ-দুখের কথা, কৌতুক-রহস্য ও রসিকতার বিনিময়। কলকাতার লোকসংস্কৃতির এই স্বতঃস্ফূর্ততা ও সর্বজনীন অংশগ্রহণের চরিত্রটা বুঝতে সুবিধা হবে যদি আধুনিক কলকাতার সমাজজীবন থেকে কিছু উদাহরণ নেওয়া যায়।

কারণ, এই চরিত্রে একটা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা আছে, যা আজ-ও খুঁজে পাওয়া যায় কলকাতার রাস্তাঘাটে ও জনসাধারণের জীবনযাত্রায়। ট্রামে-বাসে, বা খেলার ময়দানে ছুঁড়ে দেওয়া রসালো মন্তব্যের আদান-প্রদান, বা নির্বাচনের সময় কলকাতার দেওয়ালে ব্যঙ্গচিত্রের জনপ্রিয়তা, ও রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে মুখে মুখে প্রচলিত বিদ্রূপাত্মক ছড়া, বা হাওড়া ও শিয়ালদহ্ রেলপথে কলকাতার চাকুরিজীবীদের দৈনন্দিন ট্রেন যাত্রায় ফেরিওলাদের গান ও ছড়া—এ সব-ই সেই অতীতের লৌকিক সৃজনশীলতার ধারাবাহী। আসলে, এই সদা বিড়ম্বিত শহরের সাধারণ বাসিন্দাদের মধ্যে একটা কৌতুকহাস্যের ঐতিহ্য বহুকালাবধি প্রবহমাণ।

বিশেষ করে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আন্তরিকতা, ও তাদের হুকুমজারি জনগণের বিদ্রূপবাণের বরাবর নিশানা ছিল। সে-যুগের বিখ্যাত বাগ্মী ও লেখক কৃষ্ণদাস পালের ইংরেজদের সঙ্গে মাখামাখি ও খানাপিনাকে ব্যঙ্গ করে একবার কাঁসারীপাড়ার একদল সঙ্ সরাসরি তাঁর বাড়িতে এসে হাজির হয়ে গান গেয়েছিল—"হরে মুরারে, মধুকৈটভারে, হরি ভজে কি হবে—চপ, কাটলেট, কোপ্তা খাও বাবা গবাগব, খাও বাবা গবাগব হরি ভজে কি হবে।"[২০] এবার আমাদের এ-যুগের কলকাতার এক কাহিনি বলি। যাটের দশকে ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী বিখ্যাত সাঁতারু মিহির সেন হঠাৎ রাজনীতিতে প্রবেশ করার অভিলাষেই বোধহয় প্রচার করতে শুরু করলেন এই স্লোগানটি—"বাঙালী গর্জে ওঠো।" রাস্তায় দেওয়াল লিখন দেখা গেল—"বাঙালী জেগে ওঠো!" ওঁর স্লোগানে সাড়া দিয়ে, একদিন ভোরবেলা পাড়ার কিছু ছেলে সেন মহাশয়ের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গাঁক গাঁক করে হুংকার দিতে শুরু করল। ওঁর বিজ্ঞাপিত দেওয়াল লিখনের নীচে দেখা গেল নতুন স্লোগান—"কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিও না।"

একশো বছরের-ও আগে ১৮৭০-এর দশকের শেষে কলকাতায় পৌরসভার কমিশনারদের নির্বাচন উপলক্ষে শহরের বাসিন্দারা গান বেঁধেছিলেন—

ও চাঁদ, ফাঁকি দিয়ে ভোট নেবে ভেবেছ আবার?
চিনেছে তোমায় সব রেট পেয়ার—
যেমন করেছি বোকামী, দেহ আক্কেল সেলামী
বেলতলাতে ন্যাড়া যায় হে কবার?[২১]

নেতাদের প্রতি নির্বাচক সাধারণের অনাস্থা ও সন্দেহে বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়েনি গত এক শতকের ব্যবধানে। তাই ইদানীংকালেও নির্বাচনের সময় শহরবাসীরা ভোটপ্রার্থীদের

ঠাট্টা করে ছড়া বাঁধেন—

মিথ্যে দাদা নাচন-কোঁদন মিথ্যে পাতা ফাঁদ
মিষ্টি কথায় আর কি ভুলি ওগো সোনার চাঁদ।[২২]

আজকাল ট্রেনের কামরায় বিক্রেতারা ছড়া বেঁধে প্রচার করেন তাঁদের পণ্যসম্ভার—দাঁতের মাজন, দাদের মলম, আমাশার ওষুধ থেকে শুরু করে 'টফি-লজেঞ্চুশ' ও ডালমুট। এর উৎস খুঁজতে গেলে আবার ফিরে যেতে হয় সেই উনিশ শতকের কলকাতায়। ১৮৭০-এর দশকে, পথচারী এক চানাচুর বিক্রেতার এই মজার গানটির সন্ধান দিয়েছেন সে-যুগের বিখ্যাত কবি ও লেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকার—

ধরমচাঁদ কি চেনাচুর
মজামে ভরপুর
তু দেখেগা কেত্না সাধু, কেত্না অবতার
নাচ রংমে তেরা সামনে করেগা বিহার।
*** *** *** ***
গৌর নাচে ধিয়া ধিয়া, নাচে, আঁসু ধার
চসমা চোকমে দেকে নাচে, সেন অবতার।[২৩]

গানের শেষাংশে 'চসমা চোকমে দেকে...সেন অবতার'—এই কথাগুলি শুনে সে যুগের শ্রোতারা সহজেই বুঝতে পারতেন শহরের কোনো বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তিকে কটাক্ষ করে বলা হচ্ছে। চশমা-পরিহিত ব্রাহ্ম নেতা কেশব সেনের চেহারা সকলেরই পরিচিত ছিল, এবং এঁর অনুগত ভক্তবৃন্দ এঁকে প্রায় অবতারের পর্যায়ে তুলে ফেলেছিলেন ঐ সময়—যেমন বৈষ্ণবেরা চৈতন্যকে 'গৌর' পদে অভিষিক্ত করে অবতার বানিয়েছিলেন।

কলকাতার লোকসংস্কৃতির এই সর্বজনীন ঐতিহ্যের পরিচয় যদিও আজ-ও পাওয়া যায় রাস্তায়-ঘাটে, তার অনেকটাই অবলুপ্ত হয়ে গেছে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। চড়ক ও সঙের মিছিল, বা নগর-সংকীর্তন বা রাস্তায় ঝুমুর নৃত্য, বা কীর্তনওয়ালীদের ঢপ-কীর্তন বা কবি-গান পাঁচালির আসর—এ-সব আর দেখা যায় না। একশো দেড়শো বছর আগে কলকাতার মেহনতি মানুষ যে আমোদ উপভো । করতেন তাঁদের নিজেদের পাড়ায় তাঁদেরই উদ্যোগে আয়োজিত কোনো যাত্রা কথকত। দেখে ও শুনে—সেই একই বিনোদনের স্পৃহা মেটাতে গেলে তাঁদের বর্তমান প্রজন্মে র ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রবেশ মূল্য দিয়ে কোনো রঙ্গশালায় ঢুকতে হয়। পল্লীসংস্কৃতির সঙ্গে তফাত এখানেই। বাংলার গ্রামাঞ্চলে আজ-ও পল্লীসঙ্গীত সামাজিক

ক্রিয়াকর্ম বা যৌথ অবসর বিনোদনের স্বাভাবিক অঙ্গ—তা শুনবার জন্য পয়সা খরচ করতে হয় না। বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার গ্রামে ভাদ্র মাসে গেলে ভাদু ও পৌষ মাসে টুসু গান শোনা যাবে। মালদহের গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তিতে গম্ভীরা উৎসব দেখতে গেলে টিকিট কাটতে হবে না। কেঁদুলির মেলার 'টুরিস্ট' ভিড় থেকে পালিয়ে বীরভূমের মাঠেঘাটে মুফতে অসাধারণ ভালো বাউল গান শোনা যেতে পারে।

তাই, চলচ্চিত্র, টি.ভি. বা ভিডিও, যা 'জনসংস্কৃতি' বা mass culture-এর মাধ্যম রূপে পরিগণিত, এর থেকে পল্লীসংস্কৃতি ও নাগরিক লোকসংস্কৃতিকে আলাদা করে দেখা দরকার। Folklore, বা লোকাচার বিদ্যায় আধুনিক তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় নাগরিক লোকসংস্কৃতি এক বিশেষ ধারা বলে বিবেচিত হয়। এবং সচরাচর একে popular culture নামেই অভিহিত করা হয়। শহরের আর্থ-সামাজিক আবহাওয়াতে তৈরি মূলত নিম্নবর্গের নাগরিকদের সৃষ্ট জনপ্রিয় প্রবাদ-প্রবচন, গীতি-গাথা, উৎসব-অনুষ্ঠান—এই সব মিলিয়ে গড়ে ওঠে এক বিশেষ শহুরে ধাঁচের সংস্কৃতি, যার নিদর্শন মেলে পৃথিবীর বিভিন্ন আধুনিক মহানগরীর ইতিহাসে।[২৪]

'জনসংস্কৃতি' না 'যূথচারী সংস্কৃতি'?

'জনসংস্কৃতি'র উৎসনির্মাণ পদ্ধতি, বিষয়বস্তু ও চরিত্র আলোচনা করলে দেখা যায়, পল্লীসংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির থেকে এর পার্থক্যটা শুধু কালের ব্যবধান-জনিত নয়। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা যার সাহায্যে এই সংস্কৃতি নির্মিত—তা শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু নির্বাচন ও চরিত্রকেও প্রভাবান্বিত, এমনকি নির্ধারিত-ও করে। সদর্থক দিক থেকে চলচ্চিত্র, বা মুদ্রিত পুস্তক ও সাময়িকপত্র বা আলোকচিত্রবিদ্যা, এই প্রযুক্তির কল্যাণে শিল্প-সাহিত্যকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে, এবং ব্যাপক জনসাধারণের কাছে প্রাপ্তিসাধ্য করে তুলছে। কিন্তু জনগণের প্রাপ্তিসাধ্য, আর জনগণের আয়ত্তাধীন এই দুই-এর মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। পল্লীসংস্কৃতিতে, এবং নাগরিক লোকসংস্কৃতির সৃষ্টিতে, সাধারণ শ্রোতা ও দর্শকদের একটা প্রত্যক্ষ অবদান রয়েছে। এই সংস্কৃতির শিল্পীদের সঙ্গে তাঁদের নিবিড় সম্পর্কের মাধ্যমে, তাঁদের নিজস্ব রুচি, চাহিদা ও ফরমায়েশের আওতাতেই তৈরি হয়েছে এই দুই সংস্কৃতি। এর বিষয় মনোনয়ন ও সৃষ্টিক্রিয়া তাই জনগণের আয়ত্তাধীন বলা যেতে পারে।

অপরপক্ষে, 'জনসংস্কৃতি', বা প্রযুক্তিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল হয়ে যে mass culture তৈরি হয়েছে, তা জনগণের কাছে প্রাপ্তিসাধ্য হলেও (অবশ্য এ দেশের সুদূর প্রসারিত অভ্যন্তরস্থ ব্যাপক গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে তা আজও পৌঁছায়নি), তার

চরিত্র ভিন্ন। প্রথমত, যে প্রযুক্তির সাহায্যে জনসংস্কৃতির সৃষ্টি, তার পরিচালনার উপর এ সংস্কৃতির উপভোক্তাদের কোনো অধিকার নেই। পল্লীসংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতিতে শিল্পীদের সঙ্গে দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, তার সুযোগ নেই জনসংস্কৃতির প্রমোদানুষ্ঠানের উপভোগে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেই দেখা যাক। চলচ্চিত্রের প্রযোজক, নির্দেশক, সঙ্গীত পরিচালক, পরিবেশক, সিনেমা হলের মালিক এইসব বহুদূরাবস্থিত কর্তৃত্ব ও প্রদর্শনী ব্যবস্থার ব্যাপক ও জটিল গোলকধাঁধার ভিতর দিয়ে চিত্তবিনোদনের দুর্লভ সামগ্রীটি (অর্থাৎ ফিল্‌ম) জনগণের সামনে হাজির করা হয়।

দ্বিতীয়ত, উপভোক্তাদের সাংস্কৃতিক রুচি ও চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত হবার পরিবর্তে, জনসংস্কৃতির প্রযোজকেরা উলটে জনগণের রুচি গঠন ও পরিবর্তনে এক প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী নির্ধারক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিলাসদ্রব্য-নির্ভরশীল ও বিলাসবহুল জীবনযাত্রা-কেন্দ্রিক মূল্যবোধের প্রচারে এই জনসংস্কৃতি শাসকগোষ্ঠীর ও ব্যবসায়িক শ্রেণির স্বার্থে এক সুসজ্জিত যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এই ধরনের পণ্যদ্রব্যাবিষ্টতা বা consumerism-এর স্রোতের মুখে লোকসংস্কৃতি অনেক সময়-ই ভেসে যায়। সত্তরের দশকে সমসাময়িক ইতালির অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা Pier Paolo Pasolini বলেছিলেন—consumerism লোকসংস্কৃতির total genocide বা সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করেছে। তাঁর মতে, consumerist জীবনপদ্ধতির পরামর্শে আকৃষ্ট হয়ে ইতালির শ্রমজীবী যুবসম্প্রদায় হয় এক ধরনের জঘন্য মানসিক দুর্দশায় ভুগছে নয়তো অপরাধপ্রবণ আক্রমণাত্মক মনোভাব জাহির করছে।[২৫]

আমাদের দেশে যদিও জনসংস্কৃতি ও তার consumerism-এর প্রচারের তোড়ে লোকসংস্কৃতি এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি, যুবসম্প্রদায়কে তা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম হয়েছে। সিনেমা হলে চলচ্চিত্রের কোনো দৃশ্যে নারীদেহকে পণ্যদ্রব্যরূপে প্রদর্শিত করে যৌনাত্মক সুড়সুড়ি দিলে দর্শকদের জান্তব উল্লাস দেখে মনে হয় mass culture-এর বদলে একে mob culture বা যূথচারী সংস্কৃতি বলাই ভালো।

গান্ধিসুলভ প্রযুক্তিবিরোধী ও সিনেমাবিদ্বেষী মনোভাব থেকে এ কথাগুলো বলছি না। নিঃসন্দেহে শতবর্ষাধিক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অসাধারণ শিল্পকর্ম সৃষ্টি হয়েছে বিদেশ ও এদেশেও, যা চিরায়ত বলে পরিগণিত। কিন্তু সে আলোচনা এ প্রবন্ধের বিষয় নয়। আপাতত আলোচ্য—পল্লীসংস্কৃতি (folk culture), লোকসংস্কৃতি (popular culture), ও জনসংস্কৃতি (mass culture)। এই তিনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক। পল্লীসংস্কৃতি ও নাগরিক লোকসংস্কৃতির উৎস ও চরিত্র বিশ্লেষণ করলে বলা

যেতে পারে এরা যেন একই দরিদ্র ও নগণ্য জননীর দুই সন্তান যারা মাঠে-ঘাটে, হাটে-বাজারে সামান্য সঙ্গতি অবলম্বন করে বড়ো হয়েছে। আর জনসংস্কৃতি এদের-ই বৈমাত্রেয় ভাই, যার জন্ম সম্পদশালিনী সতীনের ঘরে, ব্যয়বহুল আধুনিক টেক্‌নোলজির দ্বারা পুষ্ট হয়েছে। অত্যধিক প্রশ্রয়ে লালিত ধনীর দুলালের আচার-আচরণের মতো, জনসংস্কৃতির প্রদর্শনেও প্রায়শই বেলেল্লাপনা, ধনদৌলতের অশোভন ও চটকদার বিজ্ঞাপন, এবং সুরুচির সম্পূর্ণ বিতাড়ন লক্ষণীয়। প্রচুর বিক্রীত খবরের কাগজগুলির ঝকঝকে ক্রোড়পত্রে উচ্চ সমাজপতিদের নৈশভোজের খানাপিনা ও সাজসজ্জার বর্ণনা, ও বহুল-প্রদর্শিত চলচ্চিত্রে নায়কদের machismo বা জান্তব পুরুষত্বের আস্ফালন ও নায়িকাদের যৌনত্বের দেমাক—এ সব-ই মনে করিয়ে দেয় উনিশ শতকের কলকাতার সেই হঠাৎ ধনীদের রুচিবোধের কথা, যারা হাতে কাঁচা টাকা পেয়ে যথেচ্ছভাবে খরচ করত নিজেদের বিজ্ঞাপিত করার জন্য। বেশ্যাবাড়িতে মদ ও বমনের স্রোতে, প্রিয় বেড়াল বা কুকুরের বিয়ে দিয়ে, পাখির লড়াই বা ঐ জাতীয় ছাইভস্মে কিছু নিয়ে শৌখিনতায় এদের অর্থ ব্যয়িত হয়েছে। সে-যুগে অবশ্য এমন অনেক রুচিবান ধনী নাগরিকও ছিলেন যাঁরা সঙ্গীতের সুরের ও নৃত্যের তালের সমঝদার ছিলেন। যাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হয়েছিল বহু শিল্পীর প্রতিভা। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে স্মরণীয় পাথুরিয়াঘাটা রাজপরিবারের সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর যাঁর সঙ্গীতগুরু ও মহাযোগীরূপে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী উনিশ শতকের বাংলাদেশের সঙ্গীত সমাজে সুবিখ্যাত হল, এবং তারপর নাম করতে হয় সে-যুগের বিখ্যাত ধনী, উত্তর কলকাতার সিমুলে নিবাসী আশুতোষ দেবের, যিনি সাতুবাবু নামে পরিচিত ছিলেন, এবং যাঁর সঙ্গীতসভায় ধ্রুপদ গায়ক রামকেশব ভট্টাচার্য ও সেতারবাদক রেজা খাঁ (যাঁর কাছে সাতুবাবু নিজে সেতার শিক্ষা করেন) বিখ্যাত ছিলেন।

অতীত বাঙালি উচ্চবর্গের সংস্কৃতি-চর্চা, যা Great tradition-এর অঙ্গ, তার এই উন্নতরুচিশীল গৌরবময় ইতিহাস বিচার করলে, আজকের 'জনসংস্কৃতি' (যা আধুনিক উচ্চবর্গের অর্থানুকূল্যে সৃষ্ট)-কে সেই ঐতিহ্যের কোনোমতেই উত্তরধারক বলা যেতে পারে না। এবং বর্তমান metropolitan জনসংস্কৃতি বহুলাংশেই অতীত কলকাতার নগরায়ণের সেই প্রথম যুগের ভুঁইফোড় বাবুদের আচাড়ুয়া রুচিদৈন্যের-ই ধারাবাহক।

পরিশিষ্ট

উনিশ শতকের কলকাতায় লোকসংস্কৃতির আলোচনার ইতি টানবার আগে দু-একটা কথা বলে শেষ করি।

সে-যুগের কলকাতার লোকশিল্পীদের mass culture বা জনসংস্কৃতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বাঁচতে হয়নি। কারণ তখনও প্রযুক্তিবিজ্ঞান নির্ভরশীল জনমাধ্যম সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করেনি কর্তৃপক্ষ রূপে। একমাত্র নতুন technology যা সবে কলকাতার বটতলা অঞ্চলে প্রবর্তিত হয়েছে তা মুদ্রাযন্ত্র। কিন্তু ছাপাখানা, লৌকিক কথাসাহিত্যের প্রতিযোগী না হয়ে বরং লোকসংস্কৃতির সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছিল। দাশু রায়ের *পাঁচালী* বা গোপাল উড়ের *বিদ্যাসাগর* যাত্রার গান, এই বটতলার ছাপাখানা থেকেই সস্তা চটি বই রূপে বার হয়েছিল, এবং পাঠক সাধারণের মধ্যে এদের ব্যাপক প্রচলন ছিল। কিন্তু এসব লোকপ্রিয় সাহিত্য বটতলায় পুস্তিকায় মুদ্রণের ফলে, কলকাতার রাস্তা থেকে oral culture-এর কবি বা গায়কেরা তাঁদের পেশা থেকে উৎখাত হননি। রামপ্রসাদের গান বটতলা থেকে ছাপিয়ে বিক্রি হত। কিন্তু তাতে শ্যামাসঙ্গীত-গায়ক ভিখারিদের উপার্জনের পথ বন্ধ হয়নি। বটতলার *বিদ্যাসুন্দর*—তার বাজারে কাটতি সত্ত্বেও—সাধারণ্যে অভিনীত গোপাল উড়ের যাত্রাকে পরাস্ত করে কখনো-ই তার প্রতিকল্প রূপে প্রতিস্থাপিত হয়নি। বরং বটতলা, উনিশ শতকের কলকাতার লোকসংস্কৃতির এক নতুন সংযোজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। Orality ও literacy নিরক্ষর জনসাধারণের কথ্য সংস্কৃতি ও শিক্ষিতজনের লেখাপড়ার সংস্কৃতি—এই দুই জগতের মধ্যে যোগসূত্র ছিল বটতলা।

অবশ্য, এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে সে-যুগে চিত্রশিল্পীদের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির কালীঘাটের পটচিত্রশিল্পীদের কাছে মন্দভাগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নব্য-প্রবর্তিত 'ওলিওগ্রাফ' ও 'লিথোগ্রাফ'-এর মাধ্যমে এই লোকশিল্পীরা যে-সব বিষয় চিত্রিত করতেন—দেব-দেবী, নায়ক-নায়িকা, প্রভৃতি—সেগুলি অতি দ্রুত ও সস্তায় পুনঃরূপায়িত করা সম্ভব হত। উনিশ শতকের শেষে কালীঘাটের পটচিত্রশিল্পীরা হটে যেতে বাধ্য হচ্ছিলেন এই বিদেশি প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তনের ফলে। ১৮৮৮ সালে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর সমসাময়িক শিল্পকলার বিবরণী দিতে গিয়ে, কালীঘাটের পটচিত্রের ভাগ্য বিপর্যয় সম্বন্ধে বলেছিলেন—"এই শিল্প এখন পড়তির মুখে, কারণ কলকাতার শিল্প বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্ররা সস্তাদরে দেবদেবীদের বহু-বর্ণাঙ্কিত লিথোগ্রাফ ছবি বাজারে ছাড়ছেন।"[২৬]

Mass culture প্রতিযোগীরূপে আবির্ভূত না হলেও, অতীতের Great Tradition-এর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছিল লোকসংস্কৃতিকে। এই অভিজাত সমাজের বিদ্বজ্জনের সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসাহিত্যিকদের সম্পর্কটা অনেকাংশে love-hate বা আকর্ষণ-বিকর্ষণের টানাপোড়েনে দোদুল্যমান ছিল। ঐ সংস্কৃতির কাব্যকাহিনি, ভাবনাচিন্তার অনেক কিছুই লোককবিরা আহরণ করেছিলেন, এবং—আগে উল্লেখ করেছি—ঐ

শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকদের উপর অনেকক্ষেত্রেই নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু এই আহরণ ও নির্ভরশীলতা নিছক অনুকরণ-স্পৃহা থেকে আসেনি এবং বাদবিচার বোধশূন্য ছিল না। Folklore-এর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এ যুগের এক ভাষ্যকার Aron Gurevich বলছেন যে লোকসাহিত্যের সৃজন প্রক্রিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর সমবেত preliminary censorship বা প্রারম্ভিক অনুমোদন-সাপেক্ষ। এই শ্রোতৃমণ্ডলী বা সামাজিক গোষ্ঠী কিছু লোকশিল্পকে গ্রহণীয় বলে স্বীকৃতি দেয়, কিছুকে বর্জন করে। তাই একমাত্র সেই সব লোকসংস্কৃতির নিদর্শন-ই বেঁচে থাকে যা তাদের সমাজ বা সম্প্রদায় বা শ্রেণির অনুমোদন লাভ করেছিল এবং শ্রোতা-দর্শকদের রুচিসম্মত বলে বিবেচিত হয়েছিল।[২৭] তাই লোককবিদের মানসিকতা অনেকটা ঝাঁঝরি বা চালনির মতো ছিল। উচ্চ সমাজের সাংস্কৃতিক সম্পদ থেকে তাঁরা ছেঁকে বেছে নিতেন নিজেদের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।

উনিশ শতকের কলকাতার লোকশিল্পীরা শিক্ষিত সমাজের সংস্কৃতির ধর্মীয় উপাখ্যান (যেমন রাধা-কৃষ্ণের কাহিনি) বা প্রণয়-কাহিনি (*বিদ্যাসুন্দর*) নিজেদের প্রয়োজনমতো কেটে-ছেঁটে, নতুন রং লাগিয়ে ও নতুন উপাদান সংযোজন করে তাঁদের শ্রোতা ও দর্শকদের বিনোদনের জন্য উপস্থাপিত করেন। তাঁদের যাত্রায় কৃষ্ণ ও রাধার লৌকিক সংস্করণ দেখে তাই অভিজাত বাঙালি সমাজের মুখপত্র *বঙ্গদর্শন* ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছিল, তাদের আরাধ্য নারায়ণকে পাড়ার গয়লাতে পরিণত করা হয়েছে![২৮] ভারতচন্দ্রের কাব্যর আড়ম্বরপূর্ণ নৃত্যছন্দ থেকে বিদ্যা ও সুন্দর নেমে এল গোপাল উড়ের লোকপ্রিয় খেমটার তালের জগতে। ভদ্রসমাজ তাকে 'অশ্লীল' বলে খারিজ করে দিল।

তাই এই দুই সাংস্কৃতিক জগৎ Great Tradition ও Little Tradition, শিক্ষিত সমাজের সাহিত্য-শিল্প ও লোকসংস্কৃতি—এদের মধ্যে কখনো-সখনো পারস্পরিক আদান-প্রদান ঘটলেও কালক্রমে উভয়-ই পরস্পর থেকে দূরে সরে এসেছিল। নিম্নবর্গের লোককবিরা সে-যুগের বাঙালি শিক্ষিত সমাজের আচার-আচরণ, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি সন্দেহ ও বিদ্বেষের চোখে দেখেছেন। আর অভিজাত শিক্ষিত বাঙালিরা বাংলা লোকসংস্কৃতিকে একটা অস্বস্তিজনক ব্রণ বলে ভেবেছিলেন, যেটা তাঁরা তাঁদের নব্য পরিশীলিত, পাশ্চাত্য শিক্ষার অঙ্গরাগে রঞ্জিত সাংস্কৃতিক মুখাবয়বে ঘষেমেজে মসৃণ, বা ঐ মুখ থেকে একেবারে নির্মূল করে দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

দুই সংস্কৃতির মধ্যে এই টানাপোড়েন এক ধরনের যন্ত্রণাদায়ক আকর্ষণ-বিকর্ষণ আজও শেষ হয়নি বাঙালি ভাবজগতে। তাই দেখি, এক দিকে নিম্নবর্গের সমাজের একাংশ তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পল্লীসংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যাশ্রয়ী

ছত্রচ্ছায়া থেকে বার হয়ে আধুনিক জনসংস্কৃতির প্রচার মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী। বেতারকেন্দ্রের studio-র যন্ত্রবাদকদের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ঐক্যতানে, অর্থাৎ orchestra-র সঙ্গতে, এই লোকশিল্পীরা বাউল গান (যা তাঁদের গ্রামীণ পরিবেশে সচরাচর একটি গুপিযন্ত্র ও তাঁদের পায়ের ঘুঙুরের সাহায্যে গীত হয়) পরিবেশিত করেন। আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যম ও ব্যবসায়িক স্বার্থের নিপুণ নিয়ন্ত্রণে, বাউল সংস্কৃতি বা মধুবনীর মহিলা শিল্পীদের চিত্রকলা, বিশ্বের বিনোদন শিল্পের বাজারে পণ্যদ্রব্যে পরিণত হয়েছে। বাজারের চাহিদা, পৃষ্ঠপোষকদের ফরমায়েশ, অনেক ক্ষেত্রে এই শিল্পীদের গায়কী রীতিকে সংক্রামিত করে এক দোআঁশলা সঙ্গীতের জন্ম দিয়েছে। অবশ্য, তর্কের খাতিরে বলা যেতে পারে—অতীতে উনিশ শতকের কলকাতাতেও কি লোকশিল্পী ও লোককবিরা তাঁদের তদানীন্তন ধনী হিতৈষীদের চাহিদা মেটাতে নিজেদের অতীতের রচনাশৈলী পালটাননি, বা তাঁদের পুরোনো বিষয়বস্তু কাটছাঁট করে সময়োপযোগী করেননি? নিশ্চয়ই করেছিলেন। কিন্তু, সে যুগ থেকে আজকের তফাত আছে। বর্তমান জনসংস্কৃতির প্রচার মাধ্যমের পৃষ্ঠপোষকতা প্রায় ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গন-স্বরূপ। যে-কোনো শিল্প-সাহিত্যই—তা অতীতের পল্লীসংস্কৃতি-ই হোক, বা আধুনিক চলচ্চিত্র-ই হোক—এই প্রচারমাধ্যের আনুকূল্য লাভ করে, তার ভুজবন্ধনে নিষ্পেষিত হয়ে তার আধারে-ই নিজেদের রূপান্তরিত করতে বাধ্য হয়। এর মধ্য থেকে খুব অল্প লোককবি-ই সাহসী ব্যতিক্রম হয়ে বার হয়ে আসতে পেরেছেন। অতীতে, উনিশ শতকের কলকাতাতে কিন্তু এই লোককবিদের একটা নিজস্ব এক্তিয়ার ছিল তাঁদের ধনী পৃষ্ঠপোষকদের আধিপত্যের বাইরে—এক ব্যাপক শ্রোতৃমণ্ডলী, শহরের জনসাধারণ যাঁরা ভোলা ময়রা অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির কবির লড়াই, গোপাল উড়ের যাত্রা, ভবানী ঝুমুরওয়ালীর গান শুনতে ও দেখতে ভিড় করতেন। লোককবিদের এই শ্রোতৃ ও দর্শকমণ্ডলী আজ অনুপস্থিত শহরের রাস্তায় ও হাটে-বাজারে। এদের কেড়ে নিয়েছে সিনেমা হল, ভিডিও পার্লার।

একদিকে যখন গ্রামের উচ্চাভিলাষী শিল্পীরা তাঁদের ঐতিহাসিক সংস্কৃতির আশ্রয় থেকে বার হয়ে জনসংস্কৃতির প্রাসাদে ঢুকতে উন্মুখ, অন্যদিকে দেখি বাঙালি শিক্ষিত সমাজের কিছু অংশ ঐ পল্লীসংস্কৃতির দিকেই ফিরে তাকান বার বার। প্রগতিশীল শিল্পীরা পল্লীসঙ্গীতের সুরের পিঠে চড়ে নিজেদের রাজনৈতিক বাণী প্রচারে সচেষ্ট। সদিচ্ছা প্রণোদিত হলেও, এ প্রচেষ্টা অনেক সময়-ই ব্যর্থ হয়। ফসলের ক্ষেতের মধ্যে কাকতাড়ুয়ার মতো এইসব বাণীর কথা ঐ সুরের কাঠামো থেকে বেখাপ্পা হয়ে বার হয়ে আসে। আবার, আমরা যারা পল্লী ও লোকসংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করছি, তারা

অনেক সময়-ই এত জড়িয়ে পড়ি যে এক হারানো ও দ্রুত অন্তর্ধানশীল জগৎ পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠি। তার অবশিষ্টাংশ ছিটেফোঁটা যা এখনও টিকে আছে, তার 'বিশুদ্ধতা' বজায় রাখবার অভিপ্রায়ে তাকে প্রায় জাদুঘরের প্রদর্শনবস্তুর মতো এক স্তম্ভের উপর তুলে রাখতে চাই আমরা। এ সব-ই কি শিকড় আবিষ্কারের তাগিদে? না, অতীতের বাঙালি শিক্ষিত সমাজ, পল্লী ও লোকসংস্কৃতির কবি-শিল্পীদের প্রতি যে অনাদর ও প্রতিকূলতা প্রদর্শন করেছিল, তার খেসারত দিতে চাইছি এক গুপ্ত অপরাধবোধ থেকে?

বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রবণতার এই জটিল গ্রন্থির পাক খুলতে গিয়ে দুটো ব্যাপারে সতর্ক হওয়া দরকার। প্রথমত আমাদের মতো nostalgia ও অতীতের লোকসংস্কৃতির জন্য আকুলতা সত্ত্বেও, স্বীকার করে নেওয়া দরকার যে তার পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়—এবং তার পুনর্লিখনের কোনো কৃত্রিম পরিকল্পনা অবাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয়ত, পরস্পরের পোশাকের আদান-প্রদান করে, এ-ওর সাজে নিজেদের সজ্জিত করে, Great Tradition ও Little Tradition কখনোই কাছাকাছি সরে আসে না, বা একটি একবর্ণাত্মক সমরূপী সংস্কৃতিতে বিলীন হয়ে যায় না। দুই ঐতিহ্যের ভিন্ন আর্থ-সামজিক উৎস-ই এই দুই সংস্কৃতিকে স্বতন্ত্র স্বরূপত্ব দিয়েছে—যদিও, আগে উল্লেখ করেছি কীভাবে তাদের নিজ নিজ ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে তারা পরস্পরের কাছ থেকে উপাদান আহরণ করেছে। দুই-এর সম্পর্কের এই দ্বৈত চরিত্রটাই অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা যায় আজকের বিভিন্ন সমালোচনার ধারায়। গোঁড়া মার্কসবাদীরা—যাঁদের বলা যেতে পারে বামপন্থী মৌলবাদী—আপোশহীন শ্রেণিদ্বন্দ্বের তত্ত্বে অটল বিশ্বাসী হয়ে মনে করেন নিম্নবর্গের সংস্কৃতির সঙ্গে উচ্চবর্গের সংস্কৃতির মুখ দেখাদেখি অকল্পনীয়। আবার, 'হিন্দুত্বের' ধ্বজাধারী বুদ্ধিজীবীরা এই দুই সংস্কৃতির বিভাজনটাই মানতে চান না। তাঁদের মতে—শাস্ত্রীয় ও লৌকিক, ধর্মগ্রন্থ-ভিত্তিক অনুষ্ঠান ও লোকাচার, সনাতন হিন্দুত্ব ও লৌকিক পুরাণের কোনো তফাত নেই, সব এক-ই হিন্দু সমাজের অঙ্গ।[২৯] 'হিন্দুত্বের' এই তাত্ত্বিক দাবির আওতার বাইরে অবস্থিত হয়েও, কিছু কিছু আধুনিক সমালোচকের লেখাতেও অনেক সময় দেখা যায়, শ্রেণিভিত্তিক বিভক্তিকরণের প্রতি অনাস্থা হেতু, দুই সংস্কৃতির পার্থক্যটাও উড়িয়ে দেবার প্রবণতা—binary distinction আজ নাকি অবান্তর এই অজুহাতে।

আসলে, লোকসংস্কৃতির চরিত্র ও তার জটিল ক্রমবিকাশের পথ অনুধাবন করতে গেলে আমাদের প্রয়োজন প্রথাগত গবেষণার বাঁধা রাস্তা ছেড়ে, বিভিন্ন discipline বা অনুশীলনীয় বিষয়ের ব্যাপকতর এলাকায় প্রবেশ করা—সাহিত্য সমালোচনার প্রক্রিয়ার

ছাড়াও, সমকালীন অর্থনীতি ও রাজনীতির ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, এমনকি নৃতত্ত্ববিদ্যা পর্যন্ত। উনিশ শতকের বাংলা লোকসংস্কৃতি যে-সব উপাদান দিয়ে তৈরি হয়েছিল, তার উৎস সন্ধানে আমাদের হাতড়াতে হবে এই সব নানা এলাকার গলি-ঘুঁজিতে—কুমারস্বামীর ভাষায় by-lanes-এ। কারণ, এ সংস্কৃতি একমাত্রিক ধারাতে এগোয়নি। উচ্চবর্গের সংস্কৃতির সঙ্গে কখনো সংঘাত, কখনো সমঝোতা, কখনো তার কাছে আত্মসমর্পণ—লোকসংস্কৃতির এই ইতিহাসের নেপথ্যে যে অতীতের গোষ্ঠী আনুগত্যের ঐতিহ্য, সমসাময়িক শহুরে সমাজের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ, লোককবি ও শিল্পীদের ব্যক্তিগত আশা-আশঙ্কা, এ সব-ই নানাভাবে তার অবয়ব গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। এ বিষয়ে গবেষণার কাজকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে হলে, কলকাতার লোকসংস্কৃতির এই বহুমাত্রিক পরিধির স্বীকৃতি ও উপলব্ধি প্রয়োজন।

টীকা

১. নীহাররঞ্জন রায়, আদিপর্ব, পৃ. ৩১০-১৩।

২. দীনেশচন্দ্র সেন, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১২৯।

৩. দ্রষ্টব্য : জয়ানন্দ রচিত *চৈতন্যমঙ্গল*; কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্য চরিতামৃত*; বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্য ভাগবত*।

৪. একদিকে গোঁড়া ব্রাহ্মণ নেতৃত্ব, ও অন্যদিকে শাসকবর্গ (বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ, এবং নবদ্বীপে তাঁর আমলা কাজী) উভয়ই চৈতন্য-প্রবর্তিত নগর-সংকীর্তনের বিরোধী ছিল। প্রকাশ্য নগরসংকীর্তনে নিম্নজাতিভুক্ত মানুষের অংশগ্রহণে ভীত হয়ে রক্ষণশীল উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সবাইকে সতর্ক করে বলেছিল : "কৃষ্ণের কীর্তন করে চণ্ডাল বার বার/এই পাপে গ্রাম সব হইবে উজাড়।" (*চৈতন্য চরিতামৃত*, ১/১৭)। অপর পক্ষে, এই সব নগর সংকীর্তনে ব্যাপক জনসমাবেশ, এবং চৈতন্যর জনপ্রিয়তা—বিশেষ করে নিম্নস্তরের মানুষদের মধ্যে—শাসক গোষ্ঠীকেও সন্দিগ্ধ ও আশঙ্কান্বিত করে তুলেছিল। নবদ্বীপের কাজী, সংকীর্তনরত নাগরিকদের মৃদঙ্গ ভেঙে, এবং মারধর করে তাদের দমাবার চেষ্টা করেছিল (*চৈতন্য-ভাগবত* দ্রষ্টব্য)। সাংস্কৃতিক সৃজনকর্মে dissent বা, প্রভাবশালী মত-বহির্ভূত ভিন্ন মত প্রকাশের বিরুদ্ধে ধর্মীয় মৌলবাদী ও রাষ্ট্রশক্তির যৌথ আক্রমণ—যা আজ পৃথিবীর নানা জায়গায় দেখা যায়—তার-ই এক পূর্বাভাষ পাওয়া যায় চৈতন্যের নবদ্বীপে। (ঐ সময়ের নবদ্বীপে চৈতন্য-প্রবর্তিত নগর সংকীর্তনের সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বের মূল্যায়নের জন্য, দ্রষ্টব্য : হিতেশরঞ্জন সান্যাল।)

৫. দ্রষ্টব্য : মোহাম্মদ আবদুল কাইউম।

৬. দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ৩।

৭. Pradip Sinha, p.16.

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলকাতায় বাঙালি ও অন্যান্য দেশীয় জমিদার ও ইউরোপীয় ব্যবসাদারদের বাজার স্থাপনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তার পিছনে Real Estate-এ তাদের অর্থ বিনিয়োগের চিত্তাকর্ষক বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : সৌমিত্র শ্রীমাণী

৮. দ্রষ্টব্য : (ক) B. Browne Ray. (খ) The Berkley Pop Culture Project. (গ) Tom Hayes.

৯. দ্রষ্টব্য : Robert Redfield.

১০. Ananda K. Coomaraswamy, Vol. XI, No. 1, 1937.

১১. Peter Burke, p.28.

১২. দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ২০৭।

১৩. *ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৮৮-৮৯। অবশ্য, অন্য আর এক সূত্র থেকে জানতে পাচ্ছি—'একদিন মহারাজা নবকৃষ্ণ, কবিওয়ালা হরু ঠাকুরের গান শুনে নিজের গায়ের দামী শালের জোড়া তাঁহাকে দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা ঢুলিকে দিয়া ব্রাহ্মণ যে শূদ্রের ব্যবহৃত শাল লয় না ইহা প্রকাশ্যে সর্বসাধারণের মধ্যে তাঁহাকে শিক্ষা দিলেন। সেই হইতে তিনি তার উক্ত মহারাজার বাড়ীতে পাঁচালী বা কবির গান করিতেন না, উহার বিচার করিতেন।' (প্রমথনাথ মল্লিক, পৃ. ৮৩)

১৪. *ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী*, পৃ. ২০৭-৮।

১৫. প্রমথনাথ মল্লিক, পৃ. ৮৩।

১৬. *ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী*, পৃ. ১৬৭।

১৭. হরিহর শেঠ, 'চন্দনগরের কথক, কবিওয়ালা ও যাত্রা', *প্রবাসী*, মাঘ ১৩৩১।

১৮. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, 'যাত্রা' (শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, পৃ. ৭৪০-৪১)।

১৯. দীনেশচন্দ্র সেন, পৃ. ৪৪৭-৭৮।

২০. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ৩৭।

২১. বৈষ্ণবচরণ বসাক, পৃ. ৪৭২-৭৩।

২২. শঙ্কর সেনগুপ্ত, পৃ. ৫৪।

২৩. সুধীর চন্দ্র মিত্র, পৃ. ৫১৬।

২৪. Peter Burke, Chapter Two.

২৫. Pier Paolo Pasolini, p. 112

২৬. T. N. Mukherjee, p. 20.

২৭. দ্রষ্টব্য : Aron Gurevich.

২৮. *বঙ্গদর্শন*, কার্তিক, ১২৮০।

২৯. দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত উদ্ধৃতিটি লক্ষণীয় "...academic distinctions between 'shastrik' and 'laukik'. scriptural and popular, folk and classical Hinduism, simple do not exist." (Meenakshi Jain-এর প্রবন্ধ; *Times of India*, June 15, 2000)

কলকাতার লোকসংস্কৃতির আদিপর্ব

ভূমিকা

ঔপনিবেশিক বসতিরূপে কলকাতার ঐতিহাসিক আবির্ভাব যদিও সতেরো শতকের শেষে (যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও ডিহি কলকাতা—এই তিনটি গ্রামের ইজারা লাভ করে), শহররূপে কলকাতার ক্রমবিকাশ শুরু হয়—আঠারো শতক থেকে। লোকবসতি, বাজার প্রতিষ্ঠা, গৃহ নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বেশ দ্রুতগতিতে, এই তিনটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম, ব্যাপারীদের গঞ্জ থেকে একটি সুসংবদ্ধ শহরে পরিণত হচ্ছিল ঐ সময়ে। বন্দরের সুবন্দোবস্ত, পণ্যদ্রব্য মজুত রাখার জন্য উপযুক্ত গুদাম নির্মাণ, শহরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি মজবুত দুর্গ (ফোর্ট উইলিয়ম) তৈরি, একটা পাকা-পোক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা—এই সব মিলিয়ে কলকাতা সে-যুগের বাংলাদেশে একটি 'আধুনিক' নগররূপে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

আঠারো শতকের বাংলায় ঘোরতর অরাজকতা চলছে। মুঘল রাজত্বের মুমূর্ষু অবস্থা। অর্থনৈতিক বিপর্যয় চতুর্দিকে। এই সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে, সে-যুগে অনেক বাঙালির কাছেই কলকাতা নিরাপত্তা ও অর্থোপার্জনের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৭১০ থেকে ১৭৫২-এর মধ্যে শহরের জনসংখ্যা দশ-বারো হাজার থেকে বেড়ে চার লক্ষে গিয়ে পৌঁছোয়। পরবর্তী চল্লিশ বছরে (১৭৮৯-৯০ সালের শেষে) ছয় লক্ষে গিয়ে দাঁড়ায়।[১]

এই বহিরাগত মানুষদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন নিকটবর্তী গ্রামের শ্রমজীবী—কৈবর্ত চাষি, জেলে, ময়রা, ধোপা, মালি, দরজি, কারিগর, ছোটো পণ্যদ্রব্য বিক্রেতা—যাঁরা নতুন শহরে এসে বাসা বেঁধেছিলেন জীবিকার্জনের উদ্দেশ্যে। এঁরা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন এঁদের ঐতিহ্যাশ্রয়ী গ্রামীণ সংস্কৃতি, পুজো-পার্বণের অনুষ্ঠানসূচি। নতুন নাগরিক পরিবেশে ও চিন্তাধারার প্রভাবে তাঁদের সেই লোকসংস্কৃতির গান-বাজনা ও প্রমোদানুষ্ঠানগুলিও তাঁরা প্রয়োজনমতো পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করেছিলেন। এই রূপান্তর ঘটেছিল কখনো শহরের ধনী পৃষ্ঠপোষকদের ফরমায়েশ অনুযায়ী, কখনো সাধারণ শ্রোতা ও দর্শকদের চাহিদার দাবিতে। পারিপার্শ্বিক নাগরিক সমাজ থেকে ধ্যান-ধারণা ও রূপসজ্জা ধার করে কলকাতার লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল।

কলকাতার নগরায়ণের আদিপর্বে—অর্থাৎ আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে উনিশ শতকের শুরুতে শহরে যে লোকসংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যায়, তার মধ্যে সদ্য আগত গ্রামবাসীদের পল্লী-সংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্ট। এই ছাপ নানা স্তরে দেখতে পাওয়া যায়—রাস্তাঘাটে জনপ্রিয় প্রবচনে, সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত আচার-অনুষ্ঠানে (চড়ক-উৎসব, যাত্রা-পাঁচালি ইত্যাদি) এবং শহরের তৎকালীন অভিজাতবর্গ ও নিম্নবর্গ, উভয়েই যে নতুন নাগরিক গীতি-অনুষ্ঠানের ভক্ত ছিলেন, সেই কবিগানে।

নবাগত শ্রমজীবীদের চোখে ধাঁধা লেগেছিল, সেই সময়কার শহরের ধনী রথী-মহারথীদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি দেখে। তখন ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল, এবং তাঁর প্রিয়পাত্র গোবিন্দরাম মিত্র ছিলেন দেওয়ান। গোবিন্দরামের কুখ্যাতি গড়ে উঠেছিল তাঁর নির্মম অত্যাচারের জন্য; মারধর করে রাজস্ব আদায় করে কোম্পানির ট্যাকশাল ফাঁপিয়ে তুলে তিনি তাঁর ইংরেজ প্রভুদের কাছে 'Black Zamindar' বা 'কালা জমিদার' নামে খ্যাতিলাভ করেন। এঁরই সমসাময়িক, কোম্পানির আর এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী বনমালী সরকার টাকা করে কুমোরটুলি অঞ্চলে এমন এক প্রাসাদোপম অট্টালিকা তৈরি করেন, যা শহরের বাসিন্দাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। বড়বাজার অঞ্চলের জাঁদরেল ছিলেন আমীরচাঁদ বা উমিচাঁদ নামে যিনি ইতিহাসে কুখ্যাত। ১৭৫৭-এ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাহের পরাজয়ের পিছনে যে ষড়যন্ত্র ছিল, তাতে মীরজাফর, জগৎ শেঠ-দের সঙ্গে উমিচাঁদের নামও জড়িত। পাঞ্জাব থেকে আগত, আমীরচাঁদ কলকাতাতে তেজারতি করে বড়োলোক হন, এবং তাঁর সুদের কারবারের উত্তরাধিকারী হন তাঁর-ই নিকট আত্মীয় হুজুরিমল।

তদানীন্তন কলকাতার এইসব নামকরা নাগরিকদের দৃষ্টি-আকর্ষক কাজকর্ম ও আচার-আচরণ দেখে, শহরের রাস্তার মানুষ ছড়া বেঁধেছিলেন—

বনমালী সরকারের বাড়ি
গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি।
আমির চাঁদের দাড়ি।
হুজুরি মল্লের কড়ি।[২]

এই শহুরে ছড়াটি, বহু পুরোনো বাঙালি লৌকিক প্রবাদ উদ্ভাবনের ঐতিহ্যের ধারাবাহী। ব্যক্তি-বিশেষকে নিয়ে—সে পৌরাণিক-ই হোক, বা ইতিহাসের নায়ক-ই হোক—প্রবাদ. ও প্রবচন তৈরি করার গ্রামীণ রেওয়াজ বহুকালাবধি। যেমন, 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' (পৌরাণিক চরিত্র নিয়ে) ও এই দুটি লাইন—

নুনের ভাঁড়, তেলের ভাঁড়, তাকে কি বলি ভাঁড়।
ভাঁড়ের মধ্যে ছিল এক নদের গোপাল ভাঁড়।।[৩]

প্রথম প্রবাদটিতে একটা নৈতিক হুঁশিয়ারি আছে, বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। দ্বিতীয় প্রবচনটি, একই শব্দ 'ভাঁড়'-এর বিভিন্ন অর্থের ব্যঞ্জনা দিয়ে, নিরীহ কৌতুক এক ঐতিহাসিক চরিত্রকে নিয়ে। নবদ্বীপের রাজসভার বিদূষক গোপাল ভাঁড়-এর রসিকতার মেজাজের অনুসারী এই দু-লাইনের ছড়াটি।

বনমালী সরকার ও গোবিন্দরাম নিয়ে কলকাতার যে ছড়াটি আমরা পাচ্ছি, তাতে অতীতের প্রবাদের নৈতিক সাবধানবাণীর ছায়া-ও দেখতে পাই, আবার পুরোনো প্রবচনে প্রচলিত ব্যক্তিবিশেষের কৌতুককর হাবভাব ও স্বভাব-চরিত্র নিয়ে নিছক ঠাট্টা-তামাশার দস্তুরের সাক্ষ্যও পাচ্ছি। গোবিন্দরাম মিত্রের 'ছড়ির' উল্লেখে, ঐ লোকটির ভয়াবহ আচার-আচরণ সম্বন্ধে সমসাময়িক লৌকিক উপলব্ধির হদিশ পাই। গোবিন্দরামের তুলনায়, অন্যান্যরা মনে হয় কম বিপজ্জনক। বনমালী সরকারের 'বাড়ি' (যা দূর থেকে দেখে সাধারণ মানুষ অভিভূত হতেন) ও শিখ ধর্মাবলম্বী আমীরচাঁদের 'দাড়ি' (যার দৈর্ঘ্য হয়তো তখনকার কলকাতার বাঙালি বাসিন্দাদের চোখে নতুন মনে হয়েছিল) ও হুজুরিমল্লের 'কড়ি' (যা ধার করে সে-যুগের কলকাতার অনেকে ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে হয় লাখপতি হয়েছিলেন, বা একেবারে ফতুর হয়ে পথের ভিখারি হয়ে গিয়েছিলেন)—এসব নিয়ে শহরের রাস্তার মানুষেরা রসিকতা করার উৎসাহ পেতেন।

এইসব মেহনতি জনগণ যাঁরা গ্রাম থেকে কলকাতাতে এসেছিলেন, এঁদের সঙ্গে উচ্চবর্গের ব্যবসায়ী শ্রেণির মানুষও অর্থোপার্জনের তাগিদে নতুন নগরীতে এসে পৌছেছিলেন। আমরা জানতে পারছি, আঠারো শতকের শুরুতে ত্রিবেণী থেকে স্বর্ণবণিক সম্প্রদায়ভুক্ত দর্পনারায়ণ মল্লিক কলকাতাতে এসে বসবাস শুরু করেন। ডাকাতের ভয়ে উনি ওঁর বাড়ির চারদিকে উঁচু প্রাচীর তুলেছিলেন। তাই নিয়ে তখনকার কলকাতার

লোক-কবিরা ছড়া বেঁধেছিলেন—

কায়েত মরে খেয়ালে
বেনে মরে দেয়ালে।[৪]

ঐ যুগের কলকাতায় একটা বিষয় লক্ষণীয়। ঐ সময়কার কিছু কিছু অনুষ্ঠানে এক ধরনের সার্বজনিক অংশগ্রহণের নিদর্শন দেখতে পাই। শহরের ধনিকবর্গ ও মেহনতি জনসাধারণ একযোগে কবিগান, যাত্রা, পাঁচালি, চড়ক—এইসব উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। অতীতের গ্রামীণ যৌথ প্রমোদানুষ্ঠানের ও ধর্মীয় পরবের ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে, শ্রেণি-নির্বিশেষে কলকাতা শহরের নাগরিকদের এই প্রথম প্রজন্ম তাঁদের প্রচলিত সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে এক সারিতে না বসলেও, যৌথভাবে অংশগ্রহণ করতেন। পরবর্তী যুগে, অর্থাৎ উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এই সাংস্কৃতিক সংহতিতে ফাটল দেখা যায় ও শিক্ষিত বাঙালি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা ও সৃষ্টিকর্ম এই লৌকিক সাংস্কৃতিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র পথে এগিয়ে চলে। এ বিষয় বারান্তরে আলোচ্য।

যে-যুগের কথা বলছি—অর্থাৎ কলকাতার লোকসংস্কৃতির আদিপর্বে—তখন কবিগান ও কবিয়ালদের এ শহরে একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাই এঁদের নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছা আছে। কবিগান ও কবিয়ালদের বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ লেখা বার হয়েছে এবং অনেক তথ্য ইতিমধ্যে গবেষকেরা সংগ্রহ করেছেন।[৫] সুতরাং এ প্রসঙ্গে আমার নতুন কিছু তথ্য দেবার নেই। কিন্তু ঐ সময়ের কবিগানের উদ্ভব, তার ঐতিহাসিক পটভূমিকা, ও কবিয়াল ও তাঁদের গানের চরিত্র, একটু অন্যভাবে বিশ্লেষণের দরকার বলে মনে হয়।

কবিগান—গ্রামীণ উৎস থেকে নাগরিক রূপায়ণ

এ যুগের একজন বাঙালি সমালোচকের মতে, বৈষ্ণব কবিদের পর, যোলো শতকের শেষার্ধে মঙ্গলকাব্যের কবিরা বাংলার পল্লী-সংস্কৃতির আসর জমিয়ে বসেন। "ইঁহারাই পল্লীগ্রামের অন্তিম গ্রামীণ কবি, জনসাধারণের কবি। ইহার পরই কবিওয়ালাদের আবির্ভাব।"[৬] অর্থাৎ, 'অন্তিম গ্রামীণ' কবিদের পর, যে কবিওয়ালারা এলেন, তাঁরা আর পল্লীগ্রামের বাসিন্দা নন।

মন্তব্যটি এক অর্থে সঠিক। কবিয়াল বা কবিওয়ালা হিসেবে যাঁদের নাম আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পাচ্ছি, তাঁরা সবাই-ই কলকাতা, বা তার আশেপাশের শহরতলি থেকেই এসেছেন। 'কবিগান' নামাঙ্কিত কোনো বিশেষ ধরনের সঙ্গীতানুষ্ঠানের

উল্লেখ আমরা বাংলার পল্লীসংস্কৃতির নথিপত্রে পাচ্ছি না (যে অর্থে 'পাঁচালী', 'তরজা', 'বিজয়া', 'আগমনী' বা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ও মঙ্গলকাব্য তাদের নিজস্ব আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে গ্রামীণ লোকজীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল)। কবিগান ও কবিয়ালদের প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির প্রথম সংবাদ আমরা পাচ্ছি আঠারো শতকের শুরু ও মাঝামাঝি সময়ের কলকাতা থেকে।[৭]

তাই কবিগান নিঃসন্দেহে কলকাতার নাগরিক সংস্কৃতির সন্তানদের মধ্যে অগ্রগণ্য বলে দাবি করতে পারে। কিন্তু আঠারো শতকের কলকাতাতে কি কবিয়ালরা হঠাৎ উড়ে এসে বসেছিলেন, না, তাঁদের আবির্ভাবের নেপথ্যে পূর্ববর্তী শতকের, অর্থাৎ প্রাগ্-ঔপনিবেশিক বাঙালি গ্রামীণ ও নাগরিক সংস্কৃতির একটা প্রবহমাণ প্রভাব ছিল?

মনে রাখা দরকার, সতেরো শতকে একটা স্বতন্ত্র নাগরিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল কৃষ্ণনগরে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতাতে। ভারতচন্দ্র ছিলেন তার সভাকবি। রাধা-কৃষ্ণের পৌরাণিক প্রেমের কাহিনি ছেড়ে লৌকিক উপাখ্যান অবলম্বন করে *বিদ্যাসুন্দর* রচনা করে তিনি বাংলা রোম্যান্টিক কাব্যসাহিত্যে একটা নতুন নজির স্থাপন করেন—অনাবিল শৃঙ্গার-রসাত্মক কাব্যগুণমণ্ডিত রচনা-কৌশলের নিদর্শন। এই *বিদ্যাসুন্দর* কাব্যেই আমরা জানতে পারছি তৎকালীন জনপ্রিয় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা, যা পরবর্তী যুগের কলকাতার কবিগানে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। তার নিজের কাছে সুন্দরকে থেকে যাবার অনুরোধ করে, বিদ্যা তার স্বদেশে বারোমাসে বিভিন্ন ঋতুতে বিচিত্র আনন্দোৎসবের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছে, আশ্বিনে দুর্গাপূজার সময়—

নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব
নূতন নূতন ঠাঠে খেঁড়ু শুনাইব।[৮]

'খেঁড়ু' আসলে 'খেউড়'-এরই উচ্চারণ ভেদ। সে যুগে খেউড় ছিল ছড়া বা গানের মাধ্যমে আদিরসাত্মক ব্যঙ্গোক্তির আদান-প্রদান। হালকা মেজাজের ছন্দবদ্ধ দু-তিন লাইনের উত্তর-প্রত্যুত্তর। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। রাধা গাইছে—

ওরে আমার কালো ভ্রমর, মধু লুটবি যদি আয়।

'কালো ভ্রমর'-রূপী কৃষ্ণের প্রতি রাধার এই সরাসরি আমন্ত্রণে ক্ষুব্ধ রাধার স্বামী (আয়ান ঘোষ)-র জবাব—

আমি থাকতে চাকের মধু পাঁচ ভ্রমরে খেয়ে যায়।[৯]

স্পষ্টতই আদিরসাত্মক ব্যঞ্জনা ও বক্রোক্তির জন্যই খেউড় জনপ্রিয় ছিল। যদিও আজকে খেউড় বলতে আমরা ইতর গালিগালাজ বুঝি, লোকসংস্কৃতিতে খেউড়-গায়কদের

উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে হতো; প্রতিদ্বন্দ্বী কবির কোনো ছড়া বা গানের প্রত্যুত্তরে তৎক্ষণাৎ সমতুল্য একটা জবাব দিতে হতো। মুখখিস্তির প্রতিযোগিতা নয়, নিয়মবদ্ধ আঙ্গিকের ছকের মধ্যে থেকে বাগ্‌যুদ্ধ।

আঠারো শতকের কলকাতায়, কবিয়ালদের কবির লড়াইতে খেউড় একটা অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল তদানীন্তন জনসমাজে। এ প্রসঙ্গে পরে আসব।

কলকাতার কবিয়ালরা কেবলমাত্র নদীয়া-শান্তিপুরে প্রচলিত 'খেঁড়ু' বা খেউড়-এর ঐতিহ্য-ই নতুন শহরে নিয়ে আসেননি। অতীতের বৈষ্ণব গীতিকাব্য ও মঙ্গলকাব্য—এই দুই লোকসাংস্কৃতিক ধারার প্রবহমাণ প্রভাব কবিগানে স্পষ্ট। কিন্তু, নতুন ঔপনিবেশিক শহরের সামাজিক পরিমণ্ডলে, এইসব লোককাব্যের চরিত্ররা কবিগানে, সমসাময়িক নাগরিকদের বেশভূষাতে সজ্জিত ও আচার-আচরণের অনুকারী। সে সময়ের কবিগানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমালাপ বা শিব-পার্বতীর সাংসারিক কোন্দল (যা যথাক্রমে অতীতের বৈষ্ণব গীতিকাব্য ও মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য ছিল) তদানীন্তন শহরে কথাবার্তা ও চালচলনের আকারে পরিবেশিত হতো। কলকাতা শহরে তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হতে শুরু করেছে। বাজারে গোলাদার, আড়তদার, মহাজন ও পণ্য বিক্রেতা ও ক্রেতাদের ভিড়। এই বাজারের ভাষা ও পরিভাষা কবিয়ালরা তাঁদের গানে, পৌরাণিক উপাখ্যানের বর্ণনাতেও কাজে লাগাতেন। যেমন, প্রতারিত রাধার মুখে, রাম বসু এই গানটি বসিয়েছিলেন—

মদনো রাজারো, প্রেমেরো বাজারে,
এলে প্রেম লাভো হয়।
রসিকে রমণী, এলেম, আমি, সেই আশয়।।
আগে কে জানে সই এ বিবরণ।
কপট মহাজন হেথা এমন।।
নূতন ব্যবসায় রমণী পেলে,
ফেরে ফারে করে চাতুরী।[১০]

কবির লড়াইতে উত্তর-প্রত্যুত্তর পৌরাণিক আখ্যায়িকা ছেড়ে প্রায়ই সমসাময়িক জীবনের ঘটনা বা কবিয়ালদের ব্যক্তিগত জাতব্যবসা ইত্যাদি বিষয়ে চলে আসত। একবার আন্টুনি ফিরিঙ্গি 'দুর্গা' সেজে, ভোলা ময়রাকে 'মহাদেব' বানিয়ে তাঁকে বেকায়দায় ফেলার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেছিলেন—

যে শক্তি হ'তে উৎপত্তি,
সেই শক্তি তোমার পত্নী কি কারণ,
কহ দেখি ভোলানাথ, এর বিশেষ বিবরণ।

আদ্যাশক্তির প্রসঙ্গ তুলে আন্টুনি সাহেব নিঃসন্দেহে একটা জটিল ধাঁধা উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ভোলা ময়রা প্রত্যুৎপন্নমতি কবি ছিলেন। শাস্ত্রীয় উত্তর দেবার হাঙ্গামাতে না গিয়ে, অন্যভাবে আন্টুনির প্রশ্নের জবাব দিলেন—

ওরে আমি সে ভোলানাথ নই,
আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা, বাগবাজারে রই,
চিন্তামণির চরণ চিন্তি ভাজনা খোলায় ভাজি খই।
আমি যদি সেই ভোলানাথ হই,
সবাই পূজে ভোলায়...
আমায় পূজে কই?
নে যা আমার খই, নে যা ঘাঁটালের দই
পেরিং-এর মুখে গিয়ে গাছে লাগাও মই...[১১]

ভোলা ময়রার এই জবাবে তাঁর জাত-ব্যবসার একটা সুন্দর বিবরণী পাই।

আসলে, সে-যুগের কবিয়ালরা অধিকাংশই এসেছিলেন শহরের নিচুতলার, মেহনতি শ্রেণি থেকে। তাঁদের পদবি থেকে বোঝা যায় তাঁরা কী পেশাতে নিয়োজিত ছিলেন। ভোলানাথ ছিলেন ময়রা, এবং বাগবাজারে তাঁর দোকান ছিল।[১২] আঠারো শতকের শুরুতে যে-সব কবিয়ালদের নাম পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত—গোঁজলা গুই (কৈবর্ত বা গোয়ালা সম্প্রদায়ভুক্ত বলে অনুমিত), কেষ্টা মুচি, রঘুনাথ দাশ (যিনি কখনও তন্তুবায়, কখনও কর্মকার বলে সমসাময়িক বিবরণীতে অভিহিত হচ্ছেন)। কলকাতার আদিযুগের এই কবিয়ালদের কাছেই পরবর্তী যুগের বিখ্যাত কবিয়ালদের হাতেখড়ি হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, রঘুনাথ দাশ কবিগান শিখেছিলেন গোঁজলা গুই-এর কাছে, এবং পরে এই রঘুনাথেরই শিষ্য হয়েছিলেন হরু ঠাকুর (১৭৩৮-১৮০৮)। আবার হরু ঠাকুরের সাগরেদ হয়েছিলেন ভোলা ময়রা। এঁদের সমসাময়িকদের মধ্যে নানা জাতের ও শ্রেণির কবিয়ালদের সমাবেশ দেখতে পাই। ব্রাহ্মণ হরু ঠাকুর, কায়স্থ বংশোদ্ভূত রাম বসু (১৭৮৭-১৮২৯), বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী নিতাই বৈরাগী (১৭৫১-১৮১৮), মাঝি সম্প্রদায়ভুক্ত নীলমণি পাটনী, গন্ধবণিক জাতের ভবানী বেনে—এঁদের পাশাপাশি পাচ্ছি এক পর্তুগিজ কবিয়াল, হেনসম্যান অ্যান্টনি (আন্টুনি ফিরিঙ্গি নামে বিখ্যাত)—যিনি তখনকার দিনে কলকাতার কবিগানের আসরে জাঁকিয়ে বসেছিলেন। পুরুষতান্ত্রিক ও পুরুষ-অধ্যুষিত কবিগানের মধ্যে মহিলা কবিয়ালরাও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। ভোলা ময়রার সমসাময়িক যজ্ঞেশ্বরীর নেতৃত্বে এক স্বতন্ত্র কবির দলের ও তাঁর নিজের রচিত গানের খোঁজ পাচ্ছি আমরা।[১৩] ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশ

দশকে বৈষ্ণবী মহিলা কবিয়ালরা কলকাতাতে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮২৬ সালের ১১ মার্চের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকাতে খবর পাচ্ছি যে কৈকালা গ্রামে, কৃষ্ণকান্ত দত্তের গৃহাঙ্গনে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে কলকাতার থেকে গোলকমণি, দয়ামণি ও রত্নামণি— এই তিন 'নেড়ে কবি', (অর্থাৎ বৈষ্ণবী গায়িকা) কবিগানের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন।[১৪]

কবিগানের সামাজিক চরিত্র বিশ্লেষণে যাবার আগে, আঙ্গিকগত কয়েকটা দিকের আলোচনা সেরে নেওয়া যেতে পারে। কবিয়ালদের মধ্যে সবাই যে নিজেরা গান রচনা করতেন তা নয়। এক-একটি কবিয়ালের দলে বাঁধনদার থাকতেন, যাঁরা প্রয়োজনমতো গান তৎক্ষণাৎ রচনা করে দিতেন। নীলমণি পাটনীর দলের বাঁধনদার ছিলেন কুকুর-মুখো গোরা—যিনি কেবল মুখে মুখে বড়ো বড়ো ওস্তাদি দলের গীতের উত্তর দিতেন, এবং "ঐ সমস্ত উত্তর-গানের মধ্যে গূঢ় ও গুহ্য ভাব সকল সন্নিবেশিত থাকিত।"[১৫] আন্টুনি ফিরিঙ্গির দলের বাঁধনদার ছিলেন গোরক্ষনাথ। কিন্তু কিছুকাল পরে গোরক্ষনাথের মাইনে নিয়ে আন্টুনির সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার ফলে গোরক্ষনাথ দল ছেড়ে চলে যান, এবং তখন থেকে আন্টুনি নিজেই গান রচনা করেন।[১৬] ভোলা ময়রার দলে বেতনভোগী বাঁধনদার ছিলেন গদাধর মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য।[১৭] রাম বসু, নিতাই বৈরাগীরা নিজেরাই নিজেদের গান রচনা করতেন বলে শোনা যায়। এইসব তথ্য দেখে মনে হয় সে-যুগের বিখ্যাত কবিয়ালরা অর্থাৎ যাঁদের নামে বিভিন্ন কবিগানের দল শহরে পরিচিত ছিল—মূলত গায়ক ছিলেন। হয় স্বরচিত, নয় বেতনভোগী রচয়িতাদের গান গেয়েই এঁরা খ্যাতি অর্জন করেন।

সমসাময়িক তথ্য থেকে আর একটা ব্যাপারও চোখে পড়ে। দেখা যাচ্ছে আঠারো শতকের শুরুতেই কবিগান বেশ একটা সুসংগঠিত পেশা ও সুবিন্যস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানরূপে কলকাতা শহরে অধিষ্ঠিত হয়েছে। কবির দলের নেতা, অর্থাৎ কবিয়ালদের—শিল্পী ও সংগঠক—এই উভয় ভূমিকাই পালন করতে হতো, অনেকটা আজকের যুগের impresario বা অভিনয়কারী দলের কর্মসচিবের মতো বা যাত্রাদলের অধিকারীর মতো, নিজ নিজ দলের ব্যবসায়িক ব্যাপারেরও তত্ত্বাবধান করতে হতো। এই কবিয়ালরা যখন নানা ধরনের পার্শ্বচর, বাজনদার, কবিগীতি রচয়িতাদের নিয়মিত বেতন দিয়ে নিযুক্ত করতে পারতেন, তখন নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে কবিগান একটা অর্থকরী পেশা হিসেবে তখনকার দিনে কলকাতাতে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল।

এই পেশাদারি চরিত্র অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে, কবিগান আঙ্গিকগতভাবেও একটা সুসম্বদ্ধ শৈল্পিক কাঠামোর রূপ নিচ্ছিল। কবিগানের অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা

রকমের সাঙ্গীতিক ঢং ও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের নিয়মাবলী তৈরি হচ্ছিল। প্রধানত, কৃষ্ণলীলাকে কেন্দ্র করে নর-নারীর প্রেমের ব্যাখ্যানই কবিগানের আসল উপজীব্য। এই গানের বিষয়বস্তুতে সচরাচর তিনটে বিভাগ দেখা যায়—ভবানী বিষয়, সখী সংবাদ ও খেউড়। গানের শুরুতে গাওয়া হতো 'চিতেন', তারপর 'মহড়া' এবং শেষে 'অন্তরা'।[১৮] ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় (১৮১২-৫৯), যিনি নিজে একদা কবিয়ালদের জন্য গান বেঁধে দিতেন, এবং তাঁর পূর্ববর্তী কবিয়ালদের বহু গান সংগ্রহ করেছিলেন, জানিয়েছেন কীভাবে সঙ্গতের বাদ্যযন্ত্র, কবিয়ালদের এক প্রজন্ম থেকে আর-এক প্রজন্মে পালটেছিল। গোঁজলা গুঁই-এর আমলে 'টিকেরা', তাঁর শিষ্য রঘুনাথ দাশের সময়ে 'কাড়া' এবং হরু ঠাকুরের পর থেকে 'ঢোলের' সঙ্গতের আরম্ভ হয়।[১৯] অর্থাৎ কাঠি দিয়ে ঢাক-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ('টিকেরা' ও 'কাড়া') বাজানোর পরবর্তী স্তরে হাত দিয়ে ঢোল বাজানোর রেওয়াজ শুরু হয় উনিশ শতকের গোড়ায়। এই পরিবর্তনের ইতিহাস গবেষণাযোগ্য।

কবিগানের আবার নানা রূপভেদ ছিল। 'দাঁড়া কবি' বলে এক ধরনের নাম শোনা যায়। উনিশ শতকের এক সঙ্গীত-সংগ্রাহকের মতে "যে সকল কবিতে দাঁড়াইয়া গান করা হয়, তাহাকে দাঁড়া কবি বলে।"[২০] রঘুনাথ দাশই নাকি 'দাঁড়া কবি'র সৃষ্টিকর্তা।[২১]

তদানীন্তন কলকাতার আর একটি জনপ্রিয় গীতি-শৈলী—'হাফ-আখড়াই'-এর সঙ্গেও কবিগানের নিকট সম্পর্ক ছিল। উপরোক্ত উনিশ শতকের সঙ্গীত সংগ্রাহকের মতো 'হাফ-আখড়াই, বিকশিত কবি মাত্র।'[২২] 'হাফ-আখড়াই'-এর সৃষ্টিকর্তা বাগবাজারের একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক—মোহনচাঁদ বসু, দেওয়ান রামচরণ বসুর পৌত্র। সুগায়ক মোহনচাঁদ 'হাফ-আখড়াই' তৈরি করেন অতীতের প্রচলিত 'আখড়াই' গীতিশৈলী ভেঙে। গবেষকদের মতে 'আখড়াই'-এর শুরু হয় ষোলো-সতেরো শতকের নদীয়া-শান্তিপুর অঞ্চলে। পরে আঠারো শতকের কলকাতাতে শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেবের পৃষ্ঠপোষকতায় ও তাঁর সভাকবি কুলুইচন্দ্র সেনের উদ্যোগে 'আখড়াই' তদানীন্তন কলকাতার বাঙালি অভিজাত সমাজে 'বৈঠকী গান'-রূপে সমাদৃত হয়। এটা আঠারো শতকের শেষ দশকের কথা। তার পরে, উনিশ শতকের শুরুতে, কুলুইচন্দ্রের ভাগ্নে উত্তর-ভারত ফেরত, টপ্পায় পারদর্শী নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত), এই 'আখড়াই'-তে আরও উচ্চাঙ্গের সুর, তাল, লয় প্রবর্তন করেন, এবং ১৮০৪ সালে কলকাতার শোভাবাজার-বাগবাজার অঞ্চল ও পাথুরিয়াঘাটাতে দুটি অপেশাদার 'আখড়াই' দল গঠন করেন শহরের অভিজাত পরিবারের শৌখিন গায়ক ও বাদ্যশিল্পীদের নিয়ে।

'আখড়াই' গানে উত্তর-প্রত্যুত্তর ছিল না। এই দুই দলের প্রতিযোগিতায়, যার সুর ও গান ভালো হতো, তারই জিত হতো। উভয় পক্ষকেই তিনটি বিষয় নিয়ে গান গাইতে হতো—প্রথমে, 'ভবানী বিষয়', পরে 'খেউড়' এবং শেষে 'প্রভাতী'। সে-যুগের কলকাতার অভিজাত পরিবারে অনুষ্ঠিত 'আখড়াই' এক বিশাল সাজ-সরঞ্জামপূর্ণ ব্যাপার ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের নিখুঁত বর্ণনা থেকে জানা যায় কত ধরনের বাদ্যযন্ত্র ও রাগ-রাগিণী ব্যবহৃত হতো রাত-ভোর 'আখড়াই' অনুষ্ঠানে। নিধুবাবুর জীবদ্দশার শেষ পর্বে—অর্থাৎ উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে—এই বিশাল ব্যয়বহুল 'আখড়াই'-এর পৃষ্ঠপোষকদের (আঠারো শতকের ধনী পরিবারগুলি) আর্থিক অবস্থা অতীব শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। ফলে, 'আখড়াই' প্রায় বন্ধ-ই হয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে, নিধুবাবুর শিষ্য মোহনচাঁদ বসু সমসাময়িক অর্থনৈতিক চাপ ও সামাজিক চাহিদার মোকাবিলা করে 'হাফ-আখড়াই'-নামধেয় এক বর্ণসংকর গীতিশৈলীর উদ্ভাবন করলেন—যাতে অভিজাত বর্গের 'আখড়াই' ও নিম্নবর্গের কবিগানের কিছু বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ দেখা যায়। 'হাফ-আখড়াই'-এর দুটি বিশেষত্ব। প্রথমত, নিধুবাবু প্রবর্তিত রাগ-রাগিণীর নৈপুণ্যময় জটিলতা ও বাদ্যযন্ত্রের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহারের বদলে মোহনচাঁদ আনলেন আরও সহজ ও সরল সুরলহরি এবং বাদ্যযন্ত্রের মিতব্যয়িতা। দ্বিতীয়ত, 'আখড়াই'তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ ছিল দুই দলের গায়কী ঢং-এর প্রতিযোগিতায়। 'হাফ-আখড়াই'তে এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ হল দুই দলের মধ্যে উত্তর-প্রত্যুত্তরের লড়াই-এর মাধ্যমে। স্পষ্টতই, 'আখড়াই'তে অনুসৃত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুরাশ্রয়ী গায়কী ঢং-এর প্রতিযোগিতার পরিবর্তে, 'হাফ-আখড়াই'তে কথানির্ভরশীল গানের প্রত্যক্ষ আদান-প্রদানই বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল।[২৩]

লক্ষণীয়, মোহনচাঁদ বসু প্রবর্তিত 'হাফ-আখড়াই'-এর জনপ্রিয়তা কলকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজে উনিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশ দশকের সময় থেকেই। এর বহু পূর্ব হতেই কবিওয়ালাদের গানে উত্তর-প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে কবির লড়াই জনপ্রিয় হয়েছিল। মোহনচাঁদ কবিগানের এই বাগ্‌যুদ্ধের রীতি 'হাফ-আখড়াই'তে এনেছিলেন। তাছাড়াও, কবিগানের যে 'চিতেন-মহড়া-অন্তরা' পর্যায় ছিল, মোহনচাঁদ তাতে আরও বৈচিত্র্য এনেছিলেন—'পর-চিতেন', 'ফুকা', 'ডবল ফুকা', 'মেলতা' ইত্যাদির প্রবর্তন করেন।

লোকসংস্কৃতি থেকে উপাদান ধার করে সম্ভ্রান্ত সমাজের নতুন সঙ্গীতকলা তৈরি করার এই ধরনের নজির কেবলমাত্র 'হাফ-আখড়াই'তেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সে-যুগের থিয়েটারেও এর নিদর্শন পাওয়া যায়। আসলে সমাজের উচ্চমার্গের মানুষের সঙ্গে নিম্নবর্গের সংস্কৃতির একটা যোগাযোগ ছিল তখনও, যার ফলে কিছুটা eclectic ধরনের সাঙ্গীতিক অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা সমাজের সর্বস্তরে দেখতে পাওয়া যেত।

পৃষ্ঠপোষক ও লোকশিল্পী

লক্ষণীয়, কবিয়ালরা একদিকে যেমন শহরের জনগণের প্রিয়পাত্র, অন্যদিকে ধনী নাগরিকদের পৃষ্ঠপোষকতা উপভোগ করতেন। এই সম্ভ্রান্ত পৃষ্ঠপোষকেরা লোকসংস্কৃতির রসগ্রাহীও বটে, আবার অস্তমান মোগল যুগের অভিজাত নৃত্য-গীতেরও সমঝদাররূপে শহরে নাম করেছিলেন। জনসাধারণের প্রশংসালাভ ও ধনিকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন—কবিয়ালদের ভাগ্যে এই দুর্লভ সমন্বয় সম্ভব হয়েছিল কারণ তখনও বাংলা সংস্কৃতিতে শ্রেণি-বৈষম্যটা প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি। সংস্কৃত-ঘেঁষা সাহিত্যচর্চা ও মোগল রাজদরবার প্রভাবান্বিত গান-বাজনার অনুশীলনের পাশাপাশি লোকসংস্কৃতির ব্যাপক ধারাতেও জমিদারশ্রেণির সচরাচর যোগদানের যে গ্রামীণ ঐতিহ্য ছিল, তারই প্রসার দেখা যায় ঐ সময়ের কলকাতাতে। তাই শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের প্রাসাদাঙ্গনে হরু ঠাকুর ও নিতাই বৈরাগীর কবির লড়াই-ও হচ্ছে, আবার একই সময় অন্দরে বৈঠকখানাতে উত্তর-ভারতীয় বাঈজীদের নাচও (যাকে সে যুগের ইংরেজরা nautch বলে অভিহিত করত) চলছে।[২৪] ঠাকুর পরিবারের পূর্বপুরুষ রামলোচন ঠাকুর (১৭৫৪-১৮০৭) জোড়াসাঁকোতে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে সে-যুগের ধ্রুপদী সঙ্গীতের ওস্তাদদের গানের জলসাও বসাচ্ছেন, আবার রাম বসু, হরু ঠাকুর ও অন্যান্য সমসাময়িক নামজাদা কবিয়ালদের ডেকে কবিগানের আসরও পরিচালনা করছেন।[২৫]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ—ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে কলকাতায় এই কবিগানের জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে, পরবর্তী যুগের সাহিত্য সমালোচকেরা প্রায়শই কবিয়ালদের এমনভাবে এঁকেছেন যাতে মনে হতে পারে যে এঁরা নতুন রাজধানীর এই ধনিক পৃষ্ঠপোষকদের কেনা গোলাম ছিলেন, এবং তাঁদের 'বিকৃত রুচির' পরিতোষের জন্যই গান বাঁধতেন। প্রায় একশো বছর পরে, রবীন্দ্রনাথ কবিগান নিয়ে লিখতে বসে বললেন—"...ইংরাজের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থুলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান।...তখন নূতন রাজধানীর নূতনসমৃদ্ধশালী কর্মশ্রান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না। কবির দল তাহাদের সেই অভাব পূর্ণ করিতে আসরে অবতীর্ণ হইল।"[২৬]

রবীন্দ্রনাথের এই মত প্রকাশের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে, বিনয় ঘোষ মশায় লিখলেন : "...কলকাতার বাঙালী হঠাৎ-রাজারা এইসব স্বভাবকবির আখড়াই ও

কবিগানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের রুচি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রথম যুগের ইংরেজ হঠাৎ-নবাবদের বিকৃত রুচির বিশেষ তারতম্য ছিল না। হতভাগ্য স্বভাবকবিরা এইসব বাঙালী হঠাৎ-রাজাদের বিকৃত রুচি চরিতার্থ করতে বাধ্য হত পেটের দায়ে, কবিগান গেয়ে। ...আখড়াই কালচারই হাফ-আখড়াই ও কবিগানের ভিতর দিয়ে কলকাতা শহরের নব্যযুগের বাঙালী বাবু হঠাৎ-জমিদার ও দেওয়ানদের বিকৃত রুচির ইন্ধন যোগাত।"[২৭]

প্রয়াত শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ, উনিশ শতকের কলকাতার ইতিহাস রচনায় জনদরদি দৃষ্টিভঙ্গি ও তার বিশ্লেষণে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রবর্তকদের মধ্যে অন্যতম। ঐ যুগের কলকাতার লোকসংস্কৃতির বর্তমান ঐতিহাসিকেরা তাই বিনয় ঘোষের কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবেন। সত্যি কথা বলতে, উনিশ শতকের সংবাদপত্র, দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ করে যে বিরাট ভাণ্ডার বিনয় ঘোষ রেখে গেছেন, সেই মূলধন ভাঙিয়েই আমরা অর্থাৎ যারা ঐ সময়ে কলকাতা নিয়ে গবেষণা করছি—লিখতে ভরসা পাচ্ছি।

তা সত্ত্বেও, উপরোক্ত মন্তব্যগুলির যথার্থতা যাচাই করা দরকার—বিশেষ করে আজ যখন অতীতের নাগরিক লোকসংস্কৃতিকে নতুন কষ্টিপাথরে বিচার করতে বসেছি।

ভেবে দেখা যাক। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বণিক সম্প্রদায়ের আমোদের উত্তেজনা', ও পরবর্তী যুগে বিনয় ঘোষের মতে 'হঠাৎ-রাজাদের বিকৃত রুচির ইন্ধন'—এই অভিধায়ে চিহ্নিত কবিগানগুলি আসলে কী ছিল? তাদের বিষয়বস্তু, ভাষা, বাচনভঙ্গি ও গীতিশৈলী, এবং যে-সব ঘটনা উপলক্ষে সেগুলি গীত হতো, তার খুঁটিনাটি, শ্রোতাদের স্তর-পরম্পরা, পৃষ্ঠপোষক ও আশ্রিত কবির অস্বচ্ছন্দ সম্পর্ক—এইসব জটিল বিষয়ে সযত্ন অনুসন্ধান করলে হয়তো ঐভাবে কবিয়ালদের খারিজ করে দেওয়া সম্ভব হবে না। তদানীন্তন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে তাঁদের গান ও জীবনধারাকে উৎখাত করে যদি তাঁদের বিচার করি, তাহলে সেটা হবে তাঁদের প্রতি চরম অবিচার। যে ভাষা ও বাচনভঙ্গি আজকে আমাদের কানে হয়তো 'বিকৃত রুচি' বলে শোনাচ্ছে, সে-যুগে সর্বজনস্বীকৃত ঐ রচনাশৈলীর মাধ্যমে কবিয়ালরা অনেক সময়-ই তখনকার কলকাতার জনজীবনের আশা-হতাশা, আমোদ-আহ্লাদ, নালিশ-প্রতিবাদ, এইসব তাঁদের গানের নানা ভাঁজে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

'বিকৃত রুচি'—এই গতানুগতিক ও বহুব্যবহৃত সংজ্ঞাটাই ধরা যাক। যৌনাত্মক ও শারীরিক বিষয়াদি নিয়ে খোলাখুলি বা ইঙ্গিতপূর্ণ গান ও অন্যান্য রচনাগুলিই এই

সংজ্ঞার আওতায় পড়ে। সে-যুগে কবিগানের প্রধান বিষয়ই ছিল রাধাকৃষ্ণের প্রেমের উপাখ্যান। ঐতিহ্যাশ্রয়ী বাঙালি লোকসংস্কৃতিতে এই প্রেমকাহিনি নানা গীতিভঙ্গি ও নৃত্যশৈলীতে রূপান্তরিত হয়েছে—ধামালি, ঝুমুর, খেউড় ইত্যাদি।[২৮] এই সব লোকগীতি ও নৃত্যে যৌনাত্মক ব্যঞ্জনা শ্রোতা ও দর্শকদের কাছে খুব স্বাভাবিকভাবেই অনুমোদিত ছিল, এবং তার সারমর্ম গ্রহণে তাঁরা বেশ দক্ষ ছিলেন। এই লোকসংস্কৃতির শিল্পী ও শ্রোতা-দর্শকেরা অধিকাংশ সমাজের নিম্নশ্রেণিভুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের সামাজিক আমোদানুষ্ঠানে খোলামেলা আদিরসাত্মক নাচ-গান ও ঠাট্টা-রসিকতার রেওয়াজ ছিল। ঝুমুরের 'আদিরস-প্রধান' বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে একজন আধুনিক সমালোচক বলছেন—"ইঁহাদের রাধাকৃষ্ণ সাধারণ মানব-মানবী এবং ইঁহাদের প্রেম ইন্দ্রিয় তাড়না সঞ্জাত লালসাপূর্ণ। অবশ্য তথাপি তাহা কবিত্ববর্জিত নহে।..."[২৯]

সুতরাং, 'বিকৃত রুচি' বলতে যদি এইসব আদিরসাত্মক গান, বা শরীর-সম্বন্ধীয় বক্রোক্তির আদান-প্রদান (যেমন খেউড় ও তরজাতে শোনা যায়)-কে চিহ্নিত করতে হয় (যা এতদিন হয়ে এসেছে—শিবনাথ শাস্ত্রী মশায় থেকে শুরু করে, রবীন্দ্রনাথ এবং পরবর্তী বাঙালি সাহিত্য-সমালোচক পর্যন্ত), তাহলে কিন্তু মানতে হবে যে এই তথাকথিত 'বিকৃত রুচির' উদ্ভাবক ও পৃষ্ঠপোষক কেবল নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বা কলকাতার 'হঠাৎ-রাজা বণিক সম্প্রদায়' ছিলেন না, নিচুতলার মানুষেরা ও তাঁদের কবি-গায়কেরাও এই রুচির অংশীদার ছিলেন। হয়তো অনেক সময় তাঁদের নিজেদের স্বার্থে একে রাজসভাতে এঁরাই চোরাই চালান করে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজসভার ভাঁড়ের পদমর্যাদার সুযোগ নিয়ে গোপাল ভাঁড় কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর পরিবার সম্বন্ধে যে-সব রসিকতা করতেন, তা সমাজের এই নিচুস্তরের অপমানিত ও অবহেলিত মানুষের অভিজাতবর্গ সম্বন্ধে ঈর্ষা ও সুযোগ পেলে তাদের বেকায়দায় ফেলার ইচ্ছার-ই, প্রতিবেদন বলে মনে হয়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র গোপাল ভাঁড়ের পুত্রকে দেখে বলেছিলেন—"গোপাল, তোমার ছেলের যে বেশ রাজপুত্রের মতো চেহারা।" গোপালের জবাব : "হাঁ মহারাজ! আমি তো রাজপুত্রের বাপ!"[৩০] মহারাজার পিতৃত্বের বিরুদ্ধে এমন প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ—ঐ দুটি কথায়—'রাজপুত্রের বাপ' অনুমোদিত ছিল ঐ সময়ের নবদ্বীপের রাজসভার সাংস্কৃতিক মানানুযায়ী। একটা সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার সংরক্ষিত ছিল গ্রামীণ সাংস্কৃতির জন্য—যেখানে লোককবিরা, এবং জনসাধারণ সুযোগ পেতেন কখনো-সখনো, অভিজাতবর্গের সঙ্গে পাঞ্জা লড়াই-এর। এই রকম সুযোগ প্রাপ্তির নির্দশন পাওয়া যায় 'কাদা-খেউড়' নামে একটি উৎসবে—যা নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাতে অনুষ্ঠিত হতো দুর্গাপূজার

নবমী উপলক্ষে। ঐ দিন মহিষ বলিদানের পর, স্বয়ং মহারাজের পরিবার থেকে শুরু করে শহরের যে-কোনো সাধারণ নাগরিক রাজসভাতে এসে পরস্পর ছড়া-কাটাকাটি ও উত্তর-প্রত্যুত্তর-এর প্রতিযোগিতায় যোগদান করতেন। পরবর্তী এক ঐতিহাসিকের জবানি অনুযায়ী : "...মহারাজ (অর্থাৎ কৃষ্ণচন্দ্র), যুবরাজ ও আর আর রাজকুমারদিগকে নিজে নিজে এক একটি সকার বকারের খেউড় রচনা করিয়া গাইতে হইত..."[৩১]

এই যে 'সকার-বকার' (অর্থাৎ, ইংরেজি পরিভাষাতে four-letter words বলে যা আজকের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কাছে সমধিক পরিচিত) ভাষাতে খেউড় 'রচনা করিয়া গাইতে হইত'—এর পিছনে কি একটা সর্বজনীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক চাপ ছিল? অতীতের যৌথ ধর্মীয় ভজনপূজনাদি ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, যা প্রাগ্-আর্য যুগ থেকে বাংলাদেশে চলে আসছে, তার মধ্যে যে যৌনাত্মক অনুষঙ্গ (যেমন, তান্ত্রিক মন্ত্র ও আচার-পদ্ধতি) ও আদিরসাত্মক প্রসঙ্গ (যেমন, রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক আখ্যানে) নিহিত, পরবর্তী যুগে সেগুলিকে সাংস্কৃতিক উৎসব-অনুষ্ঠানে সমন্বিত করার প্রচেষ্টা দেখতে পাই। বছরে কয়েকটি দিন সংরক্ষিত হয়েছে Saturnalia বা লাগামছাড়া উদ্দাম, সর্বজনীন আনন্দোৎসবের জন্য (যেমন উত্তর-ভারতে দোলোৎসবের উচ্ছৃঙ্খলতায় প্রকট)। এইসব উৎসবে নিম্নশ্রেণির মানুষেরা, সর্বজনগ্রাহ্য ও জন-অনুমোদিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের (খেউড়, তরজা, কবিগান ইত্যাদি) সুযোগ নিয়ে সমাজের উচ্চবর্গের লোকেদের ও প্রতিষ্ঠিত ও পূজনীয় দেবদেবীদের ব্যঙ্গ করতেন। হাজার বছরের পুরোনো ঝুমুর গানে উত্তর-প্রত্যুত্তর বা 'চাপান' ও 'উতোর'-এর রীতির উল্লেখ করে একজন সমালোচক বলছেন—"গায়ক হিন্দু, শ্রোতাও হিন্দু, অথচ দুই দল কবিওয়ালাই হিন্দুর দেবদেবীকে যথেষ্ট গালাগালি দেয়।"[৩২]

তাই তথাকথিত 'বিকৃত রুচি'র গান, যা আজ আমাদের কানে 'অশ্লীল' বলে বিবেচিত, সে-যুগের লোকসংস্কৃতিতে তার একটা প্রতিবাদী ভূমিকার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। উল্লেখযোগ্য, উনিশ শতকের কলকাতাতেও এই 'কাদা খেউড়ের' ঐতিহ্য বজায় ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত মশায় তাঁর শৈশবের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখছেন—"তখনকার দিনে নবমীতে পাঁঠা ও মোষ বলি করিয়া গায়ে রক্ত, কাদা মাখিয়া মোষের মুণ্ডু মাথায় লইয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘোরা হইত।" নৃবিজ্ঞানীরা হয়তো এই প্রথার মধ্যে বাংলার আদিম উপজাতীয় লোক-ঐতিহ্যের চিহ্ন খুঁজে পাবেন। কিন্তু, আমাদের এখনকার আলোচনার প্রসঙ্গে, মহেন্দ্র দত্তের পরবর্তী মন্তব্যগুলি প্রণিধানযোগ্য—"আর বৃদ্ধ পিতামহ তাহার সমবয়স্কলোক, পুত্র পৌত্র লইয়া হাতে খাতা লইয়া কাদামাটির গান করিত। সে সব অতি অশ্লীল

ও অশ্রাব্য গান। বাড়ির মেয়েদের সম্মুখেও সেই সব গাওয়া হইত এবং পাছে ভুল হয় এজন্য হাতে লেখা খাতা রেখে দিয়েছে, ইহাকে অপর কথায় খেউড় গান বলিত। তখনকার দিনে এ সবের প্রচলন ছিল এবং লোকে বিশেষ আপত্তি করিত না বরং আনন্দ অনুভব করিত।" এর শেষে লেখকের টিপ্পনীটিও উল্লেখযোগ্য—"কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা ও কেশব সেন মহাশয়ের অভ্যুদয় হইতে ধীরে ধীরে এ সব উড়িয়া যায়।"[৩৩]

কলকাতার কবিয়ালদের গানে 'খেউড়' একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে ছিল। একে শহরের ধনী হঠাৎ-নবাবদের 'বিকৃত রুচির' উপজাত সংস্কৃতি বলে বর্জন করা যায় না, বরং শহরের নিম্নশ্রেণির মানুষেরাই 'খেউড়ের' ভক্ত ছিলেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ঐ সময় বিখ্যাত কবিয়াল নিতাই বৈরাগী (১৭৫১-১৮১৮) কোনো এক কবিগানের অনুষ্ঠানে 'সখী-সংবাদ' গাইছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে নিম্নশ্রেণিভুক্ত যাঁরা ছিলেন—অর্থাৎ 'ছোটলোকেরা'—আসরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলেন—"হ্যাদ্ দেখ লেতাই, ফ্যার ঝদি কালকুকিলির গান ধল্লি, তো, দো, দেলাম; খাড় গা।" নিতাই কবিয়াল, এই শুনে, তৎক্ষণাৎ একটি "মোটা ভজনের খেউড়", অর্থাৎ ওঁদের ভাষাতে 'খাড়'—গেয়ে শ্রোতাদের সন্তুষ্ট করলেন। এই ঘটনাটির বর্ণনা প্রসঙ্গে, প্রতিবেদক স্বনামধন্য ঈশ্বর গুপ্ত মন্তব্য করেছিলেন—"বিশিষ্টজনেরা ভদ্রগানে এবং ইতরজনেরা খেউড় গানে তুষ্ট হইত।"[৩৪]

তাই, কবিগানে 'অশ্লীলতা'র দায়-দায়িত্ব তদানীন্তন কলকাতার হঠাৎ-রাজাদের 'বিকৃত রুচির' ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার পরিবর্তে গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

কবিয়ালরা ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতা পেলেও, তাঁদের পুরোপুরি বশংবদ চামচা ছিলেন না। প্রয়োজন হলে দু'কথা শুনিয়ে দিতে কসুর করতেন না। কলকাতায় কোনো এক জমিদার বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে ভোলা ময়রা নিমন্ত্রণ-কর্তার কিপটে স্বভাবকে ব্যঙ্গ করে তাঁর মুখের উপরই ছড়া কেটে শুনিয়ে দিয়েছিলেন—

পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুকতের মধু অলি।
মাপ কর গো রায় বাবু, দুটো সত্য কথা বলি।[৩৫]

সে যুগের কবিগানের সংগ্রাহক ঈশ্বর গুপ্ত মশায় (১৮১২-৫৯) জানাচ্ছেন কলকাতার ঠনঠনে নিবাসী লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, যিনি সাধারণের কাছে 'লোকে কানা' কবিয়াল বলে বিখ্যাত ছিলেন, ধনিকবর্গের কাছে ভয়ের পাত্র ছিলেন। "ভয় করিয়া সর্ব্বদাই অর্থ দিতেন, ইহার কারণ, ভাঁড়ের মুখ, কি জানি, কখন কি বলিয়া বসে, এই ভাবিয়াই ধন দানে সন্তুষ্ট ও বাধ্য করিয়া রাখিলেন।"[৩৬] লক্ষ্মীকান্তের উপস্থিত বুদ্ধি, ব্যঙ্গোক্তি ও স্পষ্টবাদিতা—এইসব মিলে 'লোকে কানা'-র খ্যাতি বা কুখ্যাতি সত্যিই শহরের উদ্ধত

হঠাৎ-রাজাদের ভয় বা অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। ওঁর খ্যাতির কথা শুনে একবার জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ওঁকে নিজের বাগানবাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। লক্ষ্মীকান্ত মনের সুখে পেট ভরে আহার করে পাতে আর কিছুই ফেলে রাখলেন না। কিন্তু নিমন্ত্রণ-কর্তা বাবুর "বাবুআনা আহার, পাত্রে প্রায় সমুদয় দ্রব্যই পড়িয়া রহিল, বাবুর পাতে সমস্তই রহিয়াছে, এ কারণ কুক্কুর আসিয়া স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে আহার করিতে লাগিল।" তখন, সম্ভ্রান্ত বাবুটি লক্ষ্মীকান্তকে ঠাট্টা করে বললেন যে কুকুর-ও 'লোকে কানা'র পাতে আহার করে না। লক্ষ্মীকান্ত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—"মহাশয়! এ কুক্কুর ভিন্ন গোত্রে আহার করে না।"[৩৭]

লক্ষ্মীকান্তের এই জবাব সে-যুগের কলকাতার সামাজিক জীবন ও লোকসংস্কৃতির সম্পর্কের আর-একটা স্তরের সন্ধান দিচ্ছে। নিজেদের মধ্যে এই লোককবিরা জাত-পাতের সূক্ষ্ম ভেদাভেদ বড়ো একটা মানতেন বলে মনে হয় না। নিম্নজাতভুক্ত রঘুনাথ দাশের কাছে ব্রাহ্মণ সন্তান হরু ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণে কোনো বাধা ছিল না। যখনই গান গেয়েছেন, সর্বদাই গুরুর নাম ভক্তিভরে স্মরণ করেছেন। অথচ, এই হরু ঠাকুর-ই একবার শোভাবাজারের রাজবাড়িতে এক অনুষ্ঠানে, যখন রাজা নবকৃষ্ণ তাঁর গানের সুখ্যাতি করতে গিয়ে তাঁকে নিজের গায়ের একটি দামি শাল উপহার দেন, উনি শালটি তৎক্ষণাৎ ছুঁড়ে দেন ওঁর দলের ঢুলির গায়ে। এর দ্বারা হরু ঠাকুর ইঙ্গিত করেছিলেন যে ব্রাহ্মণ হয়ে তিনি শূদ্র রাজাবাহাদুরের ব্যবহার শাল ছুঁতে পারেন না।[৩৮]

শহরের পরিবর্তনশীল আবহাওয়াতে জাত-পাত-গোত্র-কুল ইত্যাদি নিয়ে লোকশিল্পীদের ভাবনা-চিন্তার কিছু সূত্র পাওয়া যায় এই ধরনের ঘটনা ও তৎকালীন লোকপ্রবাদ ও প্রচলিত ছড়া থেকে। সমাজে উচ্চবর্ণের প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল Status symbol-এর মতো। অনগ্রসর জাত থেকে যাঁরা বড়োলোক হয়েছিলেন, তাঁরা অনেকেই ঐ সময় কলকাতায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-পুরোহিত-ঠিকুজিকার-কুষ্ঠি বিচারক-ঘটকদের টাকার উপঢৌকন দিয়ে উঁচু জাতে উঠে পড়তেন। একবার উঠে পড়লে শহরের সমাজপতিদের মধ্যে তাঁরা অগ্রগণ্য হয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতেন। রজক পরিবারের থেকে উঠে এসে রতন, ইংরেজ বণিকদের দোভাষী হয়ে ধনী রতন সরকার নামে খ্যাত হন। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে বাঁশ-বিক্রেতা পিরীতরাম মাড়ের কপাল ফিরে যায় ১৭৮০ সালে, যখন বাঁশের দাম বৃদ্ধির ফলে দ্রুতগতিতে ধন-সম্পদ অর্জন করে উনি জানবাজারের রাজবংশ (যে-বংশে বধূ হয়ে এসেছিলেন রানী রাসমণি) প্রতিষ্ঠা করেন। পোস্তার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নকু ধরের উদ্ভবও এমনি হীনাবস্থা থেকে। শহরের

বড়োলোকদের এই জাতে ওঠার দৌড়ে, কারুর এগিয়ে যাওয়া, কারুর পিছিয়ে পড়া, উচ্চবর্ণের পদবি পাবার জন্য হাপিত্যেশ—এসব নিয়ে শহরের লোককবিরা ছড়া বেঁধেছিলেন—

দুলোল হলো সরকার, ওক্কুর হলো দত্ত,
আমি কিনা থাকব যে কৈবিত্ত সেই, কৈবিত্ত।[৩৯]

'দুলোল' বলতে রামদুলাল দে, ইংরেজ কোম্পানির বেনিয়ান হয়ে যিনি অর্থ উপার্জন করে কোটিপতি হয়ে 'সরকার' উপাধি অর্জন করেন। 'ওক্কুর' ছিলেন অজ্ঞাতকুলশীল অক্রূর যিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে হালকা জাহাজ ও ডিঙি নৌকা সরবরাহ করে বড়োলোক হন এবং 'দত্ত' পদবি অর্জন করেন। যে 'কৈবিত্ত'র কথা বলা হচ্ছে, যিনি 'কৈবিত্ত'-ই রয়ে গেলেন এই পদবি-অর্জনের প্রতিযোগিতাতে, তিনি নাকি জানবাজারের পিরীতরাম মাড়, যিনি কায়স্থ সমাজে উন্নীত হবার চেষ্টায় বিফল-মনোরথ হয়েছিলেন।[৪০]

নিচুতলা থেকে বড়োলোক হয়ে, যাঁরা বর্ণাশ্রম ধর্ম-অধ্যুষিত সমাজে, ক্রমোচ্চ জাত বিভাগ পদানুসারী সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করতেন, কায়স্থ বা 'কায়েত' জাতে প্রবেশ করাটা বোধহয় তাঁদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। তদানীন্তন একটা ছড়া এই প্রবণতার প্রতি কটাক্ষ করছে—

হাল বয়, তাল খায়, গিধনায় বাস,
তার বেটা কায়েত হল, বিশ্বাস খাস।[৪১]

মনে হয়, যদিও কলকাতার সমাজের উপরতলাতে ঐ সময়, অনগ্রসর জাতি-উদ্ভূত হঠাৎ-ধনীরা সামাজিক স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করেছিলেন (মূলত তাঁদের টাকার জোরে), শহরের লোককবিরা ব্যাপারটাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। এই হঠাৎ-ধনীদের মধ্যে অনেকেই, এই লোককবিদের মতো, উচ্চ সমাজের উপহাস্য ও অবজ্ঞা-জর্জরিত তথাকথিত শূদ্রশ্রেণিভুক্ত ছিলেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক অর্থনীতির আওতাতে তৈরি কলকাতা শহরের melting pot-এ, এক অজ্ঞাতকুলশীল রতন সরকার, নকু ধর, রামদুলাল, অক্রূর-ধরনের লোকেরা রাতারাতি ক্রোড়পতি হয়ে গেলেন। অতীতের গ্রামীণ সমাজের জাত-ভিত্তিক বৃত্তি ও পেশার যে বাঁধাধরা ব্যবস্থা ছিল, সবই ওলট-পালট হয়ে গেল কলকাতাতে। এই হঠাৎ-রাজাদের প্রতি লোককবিদের এক ধরনের ঈর্ষা-মিশ্রিত-অবজ্ঞার ভাব ছিল মনে হয়। রাস্তা-ঘাটে লোকমুখে প্রচলিত ছড়াতে যেমন এদের নাম করে ঠাট্টা করা হতো, পাঁচালি ও কবিগানের রাধা-কৃষ্ণের গম্ভীর আখ্যানের ভাঁজে ভাঁজেও এদের আচার-আচরণের প্রতি বক্রোক্তির নিদর্শন প্রায়ই পাওয়া যায়। 'মাথুর' অংশে, বিশেষ করে, রাখাল কৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ করে

মথুরাতে গিয়ে রাজা হয়ে গিয়ে অতীতের বিস্মরণ—এই বিষয়টি সে যুগের লোককবিরা যেভাবে বর্ণনা করতেন, তার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিতে অনেক সময়ই ধরা পড়ত সমকালীন কলকাতার এই হঠাৎ-রাজাদের বিচার-বিবেচনার ছায়া ও ছাপ। বিখ্যাত কবিয়াল রাম বসুর নিম্নলিখিত গানটিতে দূতী মথুরা থেকে ফিরে এসে রাধাকে কৃষ্ণের পরিবর্তনের কথা শোনাচ্ছেন—

গিয়ে দেখলাম শ্যামের এখন সে ভাব নাই,
রাইকে নাহি মনেতে।
মথুরাজ্যেশ্বর বংশীধর হয়েছেন এখন।
রাজছত্র শিরে তাঁর দরশন পাওয়া ভার,
গোপিকায় নাহিক স্মরণ।
তিনি ন'ন রাধাকান্ত হয়েছেন কুবজাকান্ত,
রাধার প্রাণান্তে ক্ষতি কি তাঁর বলনা।[৪২]

বা, গোবিন্দ অধিকারী (১৭৯৮-১৮৭০) সে-যুগের জনপ্রিয় কৃষ্ণযাত্রায় বৃন্দা দূতী সেজে কৃষ্ণকে সম্বোধন করে যে গানটি গাইতেন, তার কথাগুলি লক্ষণীয়—

এখন চিনবে কেন চিন্তামণি,
হয়েছ রাজা, পেয়েছ কুবজা।
আমি বৃন্দাবনের সেই বৃন্দা কাঙ্গালিনী।
যখন ছিল রাধার চিন্তে, তখন আমায় চিন্তে,
বসেছ নাম কিন্তে, পারবে না হে চিন্তে,
কুঞ্জ বিহার বনে, এ মধুর ভুবনে।[৪৩]

কৃষ্ণের এইসব বর্ণনাতে সে-যুগের শ্রোতারা সহজেই সমসাময়িক শহরের 'বাবু'দের লক্ষণাদি আবিষ্কার করতে পারতেন। গ্রামে নিজেদের বাসভূমি ছেড়ে কলকাতাতে এসে বড়োলোক হয়ে এই 'বাবু'রা তাঁদের অতীতের দরিদ্র দিনগুলি ও সামাজিক হীনাবস্থা ভুলে যাবার যারপরনাই চেষ্টা করতেন; গ্রামে ফেলে আসা পরিবার—বাবা-মা ও স্ত্রী থেকে যত দূরে থাকা যায়, ও প্রয়োজন হলে, তাদের ত্যাগ করতেও এঁরা পিছপা হতেন না। শহরের নতুন আদব-কায়দা আয়ত্ত করে, এখানেই নব্য-প্রাপ্ত ইয়ার-বন্ধু ও রক্ষিতা নিয়ে, তাঁরা রাজত্ব করতেন। এটা কি নিছক কাকতালীয় যে এই সময় থেকেই কলকাতার নব্য-ধনী হোমরা-চোমরাদের 'কেষ্ট-বিষ্টু' বলে বিদ্রূপ করার রেওয়াজ শুরু হয়?[৪৪] মথুরারাজ কৃষ্ণ বা 'কেষ্ট'র মতোই এঁদের আর 'সে ভাব নেই'; অতীতের কথা 'নাহি মনেতে'; পুরোনো সঙ্গীদের কাছে তাঁদের 'দরশন পাওয়া ভার'; তাঁদের আর 'চিন্তে' পারেন না, কারণ এইসব 'কেষ্ট-বিষ্টুরা' এখন 'নাম কিন্তে' ব্যস্ত।[৪৫]

কলকাতার কৃষ্ণ-বিষয়ক কবিগান, যাত্রা, পাঁচালি প্রভৃতি লোকসাহিত্যে 'মাথুর' অংশে কুব্জার ভূমিকা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা বিশেষ করে লক্ষণীয়। রচয়িতা নির্বিশেষে, প্রত্যেকেই কুব্জাকে একটি কুৎসিত, কিন্তু কৃষ্ণকে মোহপাশে বাঁধতে কুশলী, এক রক্ষিতাকে পরিণত করেছেন। অথচ, পুরাণাদিতে—*শ্রীমদ্ভাগবত*, *হরিবংশ* প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা যে বিবরণী পাই, তাতে দেখি যদিও মথুরা রাজবংশের পরিচারিকা কুব্জা কুরূপা ও বক্র-পৃষ্ঠ ছিলেন, কৃষ্ণকে 'অনুলেপন' (অর্থাৎ গন্ধদ্রব্যাদি দিয়ে শরীরে প্রলেপ) করেছিলেন বলে, তাঁর ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ কুব্জার বক্র-পৃষ্ঠে হাত ছুঁইয়ে তাঁকে ঋজু ও সুরূপা করে দেন।

কলকাতার লোককবিরা কিন্তু কুব্জার প্রাগ্-সংশোধিত কুৎসিত মূর্তিটাই বেছে নিয়েছিলেন। পাঁচালিকার দাশরথি রায়, বা দাশু রায় (১৮০৫-৫৭) নামে যিনি জনপ্রিয় ছিলেন, তাঁর এই নিম্নলিখিত গানটিতে দূতী মথুরা-রাজ কৃষ্ণকে সম্বোধন করে তাঁর নতুন প্রেমিকা কুব্জা সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করছেন—

> তুমি বাঁকা, কুবজা বাঁকা, দুই বাঁকাতে মিলেছে।
> তোমার যেমন বাঁকা আঁখি, কুবজী তেমনি কোটর চোখী
> খাঁদা নাকে ঝুমকো নোলক দুলিয়েছে।
>
> . . .
>
> মাথার ফাঁকে টাকের উপর পরচুলেতে ঘেরেছে।
> ভাল ভাল গহনা গাঁটা, তাতে আবার ডায়মনকাটা,
> প'রে যেন ভাঙন বুড়ি সেজেছে।[৪৬]

কথাগুলিতে সমসাময়িক নাগরিক জীবনের উচ্চমার্গে ব্যবহার্য সাজগোজ ও অলঙ্কারাদির উল্লেখ পাচ্ছি। 'ডায়মনকাটা' গয়না সে-সময় কলকাতায় খুব চালু ছিল; হীরের মতো দেখতে পল-তোলা নকশা-করা হার-নোলক-বাউটি ইত্যাদি মহিলাদের প্রিয় ছিল। নাগররা তাঁদের রক্ষিতাদের উপহার দিতেন।

ও-যুগের খ্যাতনামা ঢপ-কীর্তন রচয়িতা মধুসূদন কাণ (১৮১৮-৬৮) ঠিক অনুরূপ ঢং-এ কুব্জার সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্ক নিয়ে মথুরা-রাজাকে সম্বোধন করে বিদ্রূপ করছেন—

> রাই হতে কুলিনী কুবুজী, গরবে বেঁকেছ বুঝি,
> নূতন কুল করে হয়েছে, কুলীন রাজাজী;
> দাসীকে করেছ রানী, রাজনন্দিনী কাঙ্গালিনী...[৪৭]

এইসব গানে কুব্জা যেন ঐ সময়কার কলকাতার নিচুতলার বারবনিতাদের মতো হঠাৎ-রাজাদের মোহান্ধ করে নিজে রানী হয়ে জাঁকিয়ে বসেছেন মথুরাতে।

দেহোপজীবীদের মতো রং চড়িয়ে ও সস্তা চকমকে গহনা পরে কুরূপ ঢেকে কুব্জা যেন কৃষ্ণকে—কলকাতার বাবুদের মতো বশীভূত করেছেন।

লক্ষণীয়, যদিও এই লোককবিরা অধিকাংশই এসেছিলেন সমাজের নিম্নবর্গের থেকে (গোবিন্দ অধিকারী দরিদ্র বৈরাগী সম্প্রদায়ভুক্ত; দাশরথির গানে হাতেখড়ি হয়েছিল গ্রামের স্ত্রী-কবিয়াল অক্ষয়া পাটনীর কাছে; মধু কাণ কিন্নর বা পেশাজীবী গায়ক জাতি থেকে উদ্ভূত), এঁরা কেউই কিন্তু নিম্নশ্রেণির ভাগ্যান্বেষীদের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত ছিলেন না। নকু ধর বা পিরীতরাম মাড়ের জীবন নিয়ে কোনো প্রশংসাত্মক লোকগীতি পাওয়া যায় না। বরং তাঁদের অতীত হীনাবস্থা সম্বন্ধে কটাক্ষ ও বিদ্রূপই লোকগীতি পাওয়া ও প্রচলিত লোকপ্রবাদের প্রধান উপাদান—যেমন কৃষ্ণ-বিষয়ক কবি-গান, পাঁচালী ইত্যাদিতেও নিম্নশ্রেণি-জাত পরিচারিকা কুব্জাকে ঠাট্টা করা হয়েছে, কৃষ্ণসহচারিণী হয়ে মথুরার রাজ-সিংহাসনে উল্লম্ফনের অভিযোগে।

মনে হয় এই যুগের কলকাতার লোকশিল্পীরা দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত হলেও, শ্রেণি-ভিত্তিক সংহতি বা সহানুভূতির থেকেও, অতীতাশ্রয়ী সামন্ততান্ত্রিক সমাজের যে ক্রমোচ্চ পদমর্যাদার জাত-ভিত্তিক বিন্যাস সবাই মেনে নিত, তাকেই এঁরা তখনও পর্যন্ত অনুসরণ করছিলেন। অর্থাৎ, স্ব-স্ব জাতের সমাজ-নির্ধারিত বৃত্তি বা পেশা ও আচার-আচরণের বেঁধে দেওয়া গণ্ডি যেন কেউ না লঙঘন করে। তাই দেখতে পাই, (অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনবিংশ শতকের শুরু—এই সন্ধিক্ষণে) শহরের লোককবিরা সামাজিক বিতর্কের ক্ষেত্রে পক্ষ নির্বাচন করছেন অতীতের গ্রামীণ মূল্যবোধের ভাবধারাতে। একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ঐ সময়, 'কালীপ্রসাদী হেঙ্গামা' সারা কলকাতাকে মাতিয়ে তুলেছিল। ঘটনাটা, আজকের কলকাতার নাগরিকদের চোখে তুচ্ছ মনে হতে পারে, কিন্তু তখন এটা শহরের অভিজাত বাঙালি সমাজে প্রায় গৃহ-যুদ্ধের আকার নিয়েছিল। হাটখোলার ধনী গোরাচাঁদ দত্তের নাতি কালীপ্রসাদ, আনার বিবি নামে একটি সুন্দরী মুসলমান মহিলাকে "উপপত্নী রাখিয়া তাহার গৃহে কিছুদিন বাস" করেন। ব্যাপারটা নিয়ে কলকাতার বাঙালি হিন্দু সমাজ দুই দলে ভাগ হয়ে যায়। একদিকে, শহরের ধনিকবর্গের প্রথম প্রজন্মের নেতা, শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব ও তাঁর চেলা-চামুণ্ডা; অন্যদিকে, উত্তর কলকাতার সিমলা অঞ্চলের বাসিন্দা, নব্য-ধনী, বিখ্যাত ব্যবসাদার রামদুলাল দে-সরকার।[৪৮]

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে ঐ সময় কলকাতার ধনিক বাঙালি সমাজের মধ্যেও এক ধরনের শ্রেণি-বৈষম্য ছিল—অতীত গ্রামীণ সমাজে অনুসৃত ক্রমোচ্চ পদমর্যাদার সোপানের আদর্শ অনুযায়ী। ঐ সময়ের এক নথিবদ্ধ তালিকা থেকে জানা

যাচ্ছে যে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার নামজাদা নাগরিকদের মধ্যে, প্রথম শ্রেণির যোগ্য ছিলেন শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব, এবং রামদুলাল দে সরকারকে একেবারে তৃতীয় শ্রেণিতে গণ্য করা হয়েছিল। কারণ—নবকৃষ্ণের বাবা, দেওয়ান রামচরণকে মুঘল সম্রাট শাহ্ আলম 'মহারাজ' খেতাব দিয়েছিলেন, এবং বাংলাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অভিযানের প্রারম্ভিক যুগে, ঐ পিতৃ-পরিচয়ের জোরে নবকৃষ্ণ খোদ ক্লাইভের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা আদায় করে দিয়েছিলেন। ফলে, নতুন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ছত্রছায়াতে, নবকৃষ্ণ কলকাতার বাঙালি সমাজে ক্ষমতাশালী দলপতি হয়ে জাঁকিয়ে বসেছিলেন পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই।[৪৯]

অপরপক্ষে রামদুলাল দে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে কলকাতার এক বাঙালি দেওয়ানের দপ্তরে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। নিজের অধ্যবসায় গুণে পরে এক ইংরেজ কোম্পানির বেনিয়ান হয়ে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেন, এবং বাণিজ্যে তা বিনিয়োগ করে কোটিপতি হন।[৫০]

স্বভাবতই, শহরের এই দুই দলপতির চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতিতে ফারাক থাকবে। বনেদি ধনী নবকৃষ্ণ ও উঠতি ধনী রামদুলালের নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে, অতীতাশ্রয়ী সামন্ততান্ত্রিক জাত-পাত বিচার অধ্যুষিত মূল্যবোধ একদিকে, আর কলকাতা শহরে নব্য-উন্মোচিত বাণিজ্যিক ধনতান্ত্রিক আবহাওয়াতে পুষ্ট অতীত-বিচ্ছিন্ন সুবিধাবাদী মূল্যবোধ অন্যদিকে—এই দুই অবস্থানের সংঘাত আবিষ্কার করা যায়।

কালীপ্রসাদ দত্তের মুসলমান 'উপপত্নী' রাখার অভিযোগে, শোভাবাজার রাজবাড়ি ও তাদের অনুগামীরা কালীপ্রসাদকে জাতচ্যুত করেন। কালীপ্রসাদ তখন শোভাবাজারের প্রতিদ্বন্দ্বী দলপতি রামদুলালের কাছে যান। রামদুলাল উপদেশ দেন শহরের ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের অর্থ ও উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করতে। এই উৎকোচ-গ্রহণে সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ পুরোহিত দলপতিরা কালীপ্রসাদকে জাতে তুলে নেন। এই ঘটনাকে নিজের ব্যবসায়িক বুদ্ধির জয়লাভের নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করে রামদুলাল বলতেন—"জাতি আমার বা'র ভিতর।" (অর্থাৎ, টাকা খরচ করে জাতচ্যুতরা ওপর-জাতে উঠতে পারে, এবং অতীতের জাত-ভিত্তিক নিয়মতান্ত্রিক সামাজিক বিধিনিষেধকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কলকাতাতে রাজত্ব করতে পারে)।[৫১]

কলকাতার লোককবিরা 'কালীপ্রসাদী হেঙ্গেমা' উপলক্ষে শোভাবাজারের রাজবাড়ির নেতৃত্বের কাছাকাছি ছিলেন বলে মনে হয়। শুরু থেকেই, তাঁরা অজ্ঞাতকুলশীল-জাত রামদুলালের আর্থিক সাফল্য ও তার সুযোগ নিয়ে জাতে ওঠার প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করে বলতেন—"...দুলোল হলো সরকার"। 'কালীপ্রসাদী হেঙ্গেমা'তে 'অনাচারী' কালীপ্রসাদ

দত্তের সমর্থনে রামদুলালের ভূমিকাকে তাঁরা সুনজরে দেখেননি। এই 'হেঙ্গেমা'র সূত্রেই কালীপ্রসাদের মায়ের শ্রাদ্ধে আবার গোলমাল শুরু হয়। কালীপ্রসাদের জ্ঞাতিরা ওঁর মুসলমান রক্ষিতার প্রশ্ন তুলে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বর্জন করেন। এই উপলক্ষে যে লোকগীতিটি তখন প্রচারিত হয়েছিল, তার যে অংশ-বিশেষ পাওয়া যায়, তার কথাগুলি শুনলে রচয়িতাদের মেজাজ মালুম হয়—

দত্ত বাড়ীর তত্ত্ব শুন ভাইঃ—

. . .

কেউ সেজেছেন মোল্লারে ভাই,

কেউ সেজেছেন কাজী,

চাকা টুপী মাথায় দিয়ে কেউ সেজেছেন ঘাট মাঝি...[৫২]

মুসলমান রীতি-নীতি ও তার অনুসরণকারী হিন্দুদের প্রতি কটাক্ষটা খুব স্পষ্ট।

এ প্রসঙ্গে, রাজনারায়ণ বসু মশায় আমাদের আরও জানাচ্ছেন—"এই হেঙ্গাম (অর্থাৎ কালীপ্রসাদকে নিয়ে) সময়ে একটি গীত রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রারম্ভে আছে—'গেল গেল হিন্দুয়ানী'।"[৫৩]

উপসংহার

এইসব তথ্য একজোট করে বিচার করলে দেখা যায়, কলকাতার নগরায়ণের প্রারম্ভিক যুগে—অর্থাৎ আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের শুরুতে শহরে যে লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তার প্রধান সৃষ্টিকর্মগুলি, যেমন কবিগান, যাত্রা বা পাঁচালী, নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ আকার নিচ্ছিল। কবিগানের বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ করেছি কীভাবে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে গান গাওয়া হতো ও কী ধরনের বিশেষ বিশেষ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের প্রথা চালু হয়েছিল। ঠিক একইভাবে, পাঁচালীতে দাশু রায় (১৮০৫-৫৭)-এর উদ্যোগে উনিশ শতকের শুরুতে কিছু নূতন গায়কীরীতির প্রবর্তন হয়। ছড়ার মাঝে গান গাওয়ার যে রীতি পুরোনো পাঁচালীর বৈশিষ্ট্য ছিল, দাশু রায় সেই ঐতিহ্যাশ্রয়ী বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে গানে টপ্পাধর্মী রাগসঙ্গীতের আমেজ আনেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সমঝদারদের কাছে এটা আদরণীয় হয়েছিল। আবার সঙ্গে সঙ্গে লোকরঞ্জনের জন্য পাঁচালীতে দাশু রায় সঙ-এর অবতারণা করেছিলেন। এই সঙ-এর উদ্দেশ্য ছিল সমসাময়িক সমাজের অঙ্গ-বিশেষের তীব্র সমালোচনা করা।[৫৪] কবিগানে খেউড়ের অংশে বা বাগ্‌যুদ্ধের সময় যেভাবে সমসাময়িক ঘটনা ও সামাজিক রীতি-নীতির সমালোচনা করা হতো, দাশু রায়ের পাঁচালীতেও এই একই প্রবণতা দেখা যায়।

বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও, পাঁচালীতে নতুনভাবে নানা ধরনের বাজনার অবতারণা হয়—তানপুরা, বেহালা, ঢোল, মন্দিরা ইত্যাদি।[৫৫]

কলকাতার কবিয়ালদের শেষ প্রজন্মের সমসাময়িক ছিলেন পাঁচালীকার দাশু রায় ও যাত্রাজগতের তারকা গোপাল উড়ে (১৮১৭-৫৭), যাঁরা উনিশ শতকের বিশ ও ত্রিশ দশকে শহরের লোকসংস্কৃতির মঞ্চ অধিকার করে বসেছিলেন। পূর্ববর্তী কবিয়াল- ও দাশু রায়ের মতো, গোপাল উড়ে-ও পুরোনো যাত্রার পালাতে পরিবর্তন এনেছিলেন। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যানের খোল-নোলচে প্রায় পুরো পালটে গোপাল তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রাকে সমসাময়িক কলকাতার সমাজজীবনের ছবি হিসেবে উপস্থাপিত করেছিলেন। দাশু রায়ের পাঁচালীতে যেমন, গোপাল উড়ের যাত্রাতেও তেমন সঙের ও ভাঁড়ের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। কলকাতা শহরের দিন-মজুর—ভিস্তিওয়ালা, ধোপা-ধোপানী, মেথর-মেথরানী—এদের ভূমিকায় নেমে গোপালের যাত্রার অভিনয়কারীরা নেচে-গেয়ে সে-যুগের দর্শকদের মাতিয়ে তুলতেন। যাত্রা নৃত্যের ক্ষেত্রে গোপাল উড়ে প্রায় একটা বৈপ্লবিক প্রবর্তন আনেন 'খেমটা' নাচের অবতারণা করে। গ্রামীণ লৌকিক নৃত্যের দ্রুত তাল, সজীবতা ও তাৎক্ষণিক সৃজনশীলতার ধারা বেয়ে 'খেমটা' কলকাতাতে পৌঁছেছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগে। "...চন্দননগর, চুঁচুড়া অঞ্চল হইতে যাত্রায় খেমটা নাচের প্রচলন হয়। ...কেশে ধোপা ঐ খেমটা নাচ শিখিয়া গোপালের মালিনীর নাচে (*বিদ্যাসুন্দর* পালাতে) যাত্রায় খেমটার প্রচলন করেন। ...খেমটার সঙ্গে গানের সুরও হালকা হইয়া গেল।"[৫৬]

গোপাল উড়ের প্রসঙ্গে একটা তথ্য উল্লেখযোগ্য। একজন গবেষকের মতে: "গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর পালার গান একটিও গোপালের রচিত নয়। নানা জায়গার কবিগান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। ওস্তাদেরা সুর সংযোগ করিয়া দেন, আর যাত্রার অধিকারী গোপালের নামে সেগুলি বিকোয়।"[৫৭] এ তথ্য যদি সঠিক হয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে, গোপাল উড়ের যাত্রার ব্যবস্থাপনা সেই কবিগানের প্রথারই অনুসারী। অর্থাৎ, কবিয়ালদের যেমন বাঁধনদার ছিল, গোপালেরও তেমনি গানের রচয়িতা ও সুরকার ছিল। গোপাল শুধু গাইতেন, এবং তাঁর কণ্ঠস্বরের গুণে তিনি আসর মাত করতেন।[৫৮] কবিয়ালদের মতো, তিনিও গীতি-রচনাকার ও নৃত্য-বিশারদদের (যেমন খেমটা-নাচিয়ে কেশে ধোপা) ভাড়া করতেন বলে মনে হয়। পেশাদারি কবিয়ালদের মতো, গোপাল উড়েও তাঁর যাত্রা থেকে যথেষ্ট উপার্জন করতেন।[৫৯]

কবিগান, পাঁচালী, যাত্রাতে কয়েকটি একজাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যা সে-যুগের কলকাতার নাগরিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। লোকশিল্পীরা

এইসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যে নব্যরীতি প্রবর্তন করেছিলেন তার দ্বিবিধ উদ্দেশ্য ছিল। একদিকে যেমন শহরের ধনী অভিজাতবর্গের আনন্দদানের জন্য ঐতিহ্যাশ্রয়ী রাগসঙ্গীতের অনুসরণ, অন্যদিকে জনসাধারণের বিনোদনের জন্য খেউড়, খেমটা প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির জনপ্রিয় উপাদানগুলির সৃজনশীল ও সময়োপযোগী ব্যবহার। দাশু রায় তাঁর পাঁচালীর ভূমিকাতে বলেছিলেন—

সাধুর সন্তাপ-দূর জন্য
যত সুমধুর সারতত্ত্ব হইল যোজন

. . .

অপরে করিবে রাগ, ঘুচাইতে সেই বিরাগ
পরে কিছু অপর প্রসঙ্গ...[৬০]

স্মরণীয়, ঠিক একই কারণে কবিগানের আসরে নিতাই বৈরাগীকে 'ক্যালকুক্যিলির' (অর্থাৎ কালো কোকিল) রোম্যান্টিক গান 'সখি সংবাদ' ছেড়ে খেউড় ধরতে হয়েছিল শ্রোতা-সাধারণের দাবিতে।

প্রায় সমসাময়িক কালেই, আঠারো শতকের শেষে, বাংলার কীর্তন গায়কী ধারাতেও পরিবর্তন এনেছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার রূপচাঁদ চট্টোপাধ্যায় (১৭২২-৯২) মনোহরশাহী কীর্তনের সুর ভেঙে হালকা সুরের 'ঢপ' কীর্তন তৈরি করেন। পরে মধুসূদন কাণের রচনায় (১৮১৮-৬৮) 'ঢপ' কীর্তন আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে অনুপ্রাস ও যমকের ব্যবহারের জন্য। উনিশ শতকের কলকাতাতে জগন্মোহিনী ও অন্যান্য মহিলা কীর্তনীয়ারা ঢপ কীর্তন গেয়ে লোকসমাজে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[৬১]

দেখা যাচ্ছে, এইসব নানা ধরনের গীতিশৈলীতে একটা সাধারণ প্রবণতা ছিল—গানের কথায় ও সুরে সহজ ও হালকা ভাব আনা, যাতে ব্যাপক জনসাধারণের কাছে বোধগম্য ও আদরণীয় হয়। এমনকি শহরের অভিজাত শৌখিন ভদ্রলোক কবি-গীতিকাররাও এই জনচাহিদা বেশিকাল অগ্রাহ্য করতে পারেননি। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকেই তাই দেখি বাগবাজারের মোহনচাঁদ বসু অতীতের সুরের আড়ম্বরপূর্ণ 'আখড়াই' ভেঙে হালকা মেজাজের 'হাফ-আখড়াই' তৈরি করছেন, লোকসংস্কৃতির কবির লড়াই-এর রীতি ধার করে।[৬২]

লক্ষণীয়, লোকসংস্কৃতির এই লঘু মেজাজের, সহজবোধ্য ও সাবলীল অংশ (খেউড়, সঙ, খেমটা, ইত্যাদি)-র মাধ্যমে এই কবি-গায়ক-অভিনেতারা সমসাময়িক কলকাতা শহরের নব্য ধনিকবর্গের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি নিয়ে ব্যঙ্গ করতেন। শহরের নিম্নবর্গের শ্রোতাদের কাছে নব্য-ধনীদের জীবনধারা বিদ্বেষ ও বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থল

ছিল। স্বভাবতই, কবিগান, পাঁচালী, যাত্রা ও অন্যান্য গীতি-অনুষ্ঠানে বড়োলোকদের নিয়ে উপহাস জনপ্রিয় ছিল।

অবশ্য এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সর্বক্ষেত্রেই প্রগতিশীল বা কোনো বৈপ্লবিক চিন্তাপ্রসূত ছিল না। আগেই আমরা লক্ষ করেছি, গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ সে-যুগের কলকাতার নিম্নবর্গের মানুষ মেনে চলতেন অনেকাংশে। তাই নব্য-ধনীদের জাতে ওঠার প্রতিযোগিতাকেও যেমন তাঁরা বিদ্রূপ করতেন, একই সঙ্গে সমাজ-সংস্কারকদের কাজকর্মও (যেমন বিধবা-বিবাহ বা স্ত্রী-শিক্ষার প্রচেষ্টা) তাঁরা উপহাস করতেন তাঁদের গানে ও কবিতায়। সামাজিক সংস্কারের আন্দোলনকে তাঁরা, ইংরেজি শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক অর্থনীতির আরও পাঁচটা কুফলের মতোই (জাত বিসর্জন দিয়ে 'বাবু' হবার প্রতিযোগিতা, অর্থের লোভে স্বজন-পরিজন ত্যাগ করা, মদ্যপান ও বারাঙ্গনা-গমন ইত্যাদি) সন্দেহের চোখে দেখতেন। মনে হয়, কলকাতার লোকসংস্কৃতিতে আক্রোশের ও বিদ্রূপের উপলক্ষ ছিল প্রধানত নতুন শহরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক আওতাতে যে নব্য-ধনী সম্প্রদায় ও ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালিদের প্রথম প্রজন্ম আবির্ভূত হয়েছিল। এই উভয় শ্রেণি-ই রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সযত্ন-পালিত মূল্যবোধকে 'চ্যালেঞ্জ' করেছিল তাদের নিজস্ব প্রবৃত্তি ও প্রবণতা অনুসারে।

একদিকে, হঠাৎ-রাজা বেনিয়ান-মুৎসুদ্দি শ্রেণি—যাঁরা এই শহরে এই প্রথম, সামাজিক আচার-ব্যবহারের স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছেন, মনে রাখা প্রয়োজন, কলকাতার এই নব্য-ধনীদের মধ্যে অধিকাংশই এসেছিলেন তথাকথিত 'শূদ্র' সম্প্রদায় থেকে, যাঁরা বংশ-পরম্পরায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম নির্দেশিত জাত-কুল-গোত্র-শ্রেণি বিভেদের কঠোর নিয়মের মধ্যে বন্দি ছিলেন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক, উভয় গ্রামীণ স্তরেই, এঁদের বাপ-পিতামহ অবদমিত ও অন্ত্যজ ছিলেন। আঠারো শতকের কলকাতার ঔপনিবেশিক অর্থনীতি এঁদের বংশধরদের কাছে অভাবিত সুযোগের পথ খুলে দিয়েছিল। রতন ধোপা, পিরীতরাম মাঢ়, নকু ধরের মতো মানুষ কোম্পানির আমলের ধনকুবের। তাই স্বভাবতই এঁদের আচার-আচরণ বা মূল্যবোধ ভিন্ন ছিল এঁদেরই সমসাময়িক কলকাতার বনেদি জমিদার ধনিকগোষ্ঠী থেকে (অর্থাৎ মুঘল রাজসভার খেতাবপ্রাপ্ত রাজা রাজবল্লভের বংশধর, শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব, ভূকৈলাশের গোকুল ঘোষাল-এর মতো অভিজাতবর্গ যাঁরা ইংরেজ কোম্পানির আবির্ভাবের আগে থেকেই ধনোপার্জন করে সুপ্রতিষ্ঠিত)—বা সমসাময়িক ধনী বণিক সম্প্রদায় থেকে (শেঠ ও বসাকরা, যাঁরা সুতানুটিতে ব্যবসাকেন্দ্র খুলে বসেছিলেন জব চার্নকের আগমনের বহু পূর্বে)।

কলকাতার নগরায়ণের শুরুতে, অবাধ ও অবৈধভাবে মুনাফা লোটার সুযোগ সর্বস্তরে ব্যাপ্ত ছিল। কোম্পানির প্রশাসকদের মধ্যে যেমন ওয়ারেন হেস্টিংস ও এলাইজা ইম্‌পে দুর্নীতিপরায়ণতার জন্য কুখ্যাত হয়েছিলেন, ইংরেজ আমলা ও বণিক, ও যথাক্রমে তাদের বাঙালি দেওয়ান ও মুৎসুদ্দি, একইভাবে তাঁদের নিজস্ব এক্তিয়ারে যথেচ্ছভাবে চুরি-জোচ্চুরি করে ধনবান হয়েছিলেন। হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতায় গঙ্গাগোবিন্দ সিং দেওয়ানির সুযোগ নিয়ে যেভাবে যথেচ্ছাচার করেছিলেন, তার ইতিহাস সর্বজনবিদিত।[৬৩]

এই ধরনের permissive নাগরিক আবহাওয়াতে, নব্য-ধনী হঠাৎ-রাজাদের লাই-দেওয়া সন্তান-সন্ততিরা, লাগামছাড়া ঘোড়ার মতো শহরে ঘুরে বেড়াতেন। ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে মদ্যপান ও আমোদ-আহ্লাদ, বেশ্যালয়ে গিয়ে হৈ-হল্লোড়, বাগানবাড়িতে বাঈজী বা খেমটাওয়ালী নিয়ে 'মাইফেল'[৬৪] —এইসব আচার-আচরণের বর্ণনা সে-যুগের বাংলা সংবাদপত্র ও সাহিত্যের একটা চিত্তাকর্ষক অঙ্গ ছিল।[৬৫]

এদের ব্যবহার ও রীতি-নীতি, কলকাতা শহরের তৎকালীন হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের চোখে স্বভাবতই অবাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়েছিল। এতদিনের বর্ণাশ্রমধর্মী সমাজব্যবস্থার নিয়মাবলী এই 'বাবুরা' নিছক টাকার জোরে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছিলেন। এমন-কি, তাঁদের সমাজের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের টাকা দিয়ে হাত করে উচ্চবর্ণে প্রবেশাধিকার অর্জন করছিলেন। 'কালীপ্রসাদী হেঙ্গামা' উপলক্ষে সে-সময়ের কলকাতার হিন্দু সমাজের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তা এই সামাজিক-ধার্মিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন।

কলকাতার রক্ষণশীল ও বনেদি বাঙালি হিন্দু অভিজাতবর্গের এই মনোভাবের সঙ্গে শহরের লোককবিরা অনেক সময়-ই একমত হতেন। আঠারো শতকে, গ্রাম থেকে সদ্য-আগত কারিগর ও শ্রমজীবীরা শুধু যে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে তাঁদের মনিবদের (যাঁরা ছিলেন বনেদি হিন্দু রক্ষণশীল রাজা-রাজড়া ও শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বাজার স্থাপন করেছিলেন ও এই গ্রামীণ শ্রমজীবীদের সেইসব বাজারে নিয়োগ করেছিলেন) মোসাহেবি করেছিলেন, তা বলা যায় না। অতীতের গ্রামীণ বর্ণাশ্রমধর্মী রীতি-নীতির শাসনাধীনে অভ্যস্ত, কলকাতা শহরে সদ্য-আগত এইসব গরিব মানুষ মানসিক ভাবেও তাঁদের মনিবদের কিছু চিন্তাধারার অংশীদার ছিলেন বলে মনে হয়। কলকাতা শহরের অনেক লোককবির চোখে তাই নাগরিক নব্য-ধনী সম্প্রদায়ের হাব-ভাব ও ব্যবহার জঘন্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। তাঁদের অতীতাশ্রয়ী, গ্রামীণ ধর্মীয় ও সামাজিক ঐতিহ্যের মাপকাঠিতে, এই আধুনিক শহরে 'বাবু'দের জীবনধারা, তাঁদের নিজেদের চিন্তাধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল।

অন্যদিকে, ইংরেজি শিক্ষিত ও ঐ যুগের পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ও দার্শনিক ভাবধারায় উদ্দীপিত বাঙালি সমাজ-সংস্কারকরাও হিন্দু সমাজের অচলায়তন ভাঙতে গিয়ে রক্ষণশীল সমাজপতিদের চক্ষুশূল হয়েছিলেন। শহরের লোককবিরাও সব সময় এই সংস্কারের প্রচেষ্টাকে সুনজরে দেখেননি। তাঁদের চোখে এই ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারা বিদেশাগত, আসন্ন অমঙ্গলের চিহ্নরূপে দেখা গিয়েছিল। রামমোহন রায়কে ব্যঙ্গ করে তাই তাঁরা ছড়া বেঁধেছিলেন—

> সুরাই মেলের কুল,
> বেটার বাড়ী খানাকুল,
> বেটা সর্ব্বনাশের মূল,
> ওঁ তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে ইস্কুল,
> ও সে জাতের দফা, করলে রফা
> মজালে তিন কুল।[৬৬]

আসলে, কলকাতার লোকসংস্কৃতির আদিপর্বে, এই বিভিন্ন ধরনের প্রবণতাগুলি আজকে আমাদের কাছে একটা তালগোল পাকানো ব্যাপার বলে মনে হতে পারে। কখনো শুনতে পাই কবিয়ালদের গানে সমাজের ধনী ও প্রভাবশালী নাগরিকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রূপ, আবার কখনও শুনি এই উচ্চমার্গের রক্ষণশীল সম্প্রদায়েরই অনুসৃত অত্যন্ত গোঁড়া মনোভাবের প্রতিধ্বনি। কখনো লোককবিদের ছড়া ও গানে আবিষ্কার করি এমন সব চাঁচা-ছোলা মন্তব্য যা আজকের আমাদের Anti-Establishment কানে মধুবর্ষণ করে; কিন্তু পরমুহূর্তেই মহিলা ও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের নিয়ে এমন ধরনের রসিকতা শুনি যা আমাদের আধুনিক মুক্তমনকে আঘাত করে।

তাই, এককথায় তদানীন্তন লোকসংস্কৃতিকে 'প্রগতিশীল' বা 'প্রতিক্রিয়াশীল'— এই সংজ্ঞার মধ্যে বন্দি করা যায় না। 'অশ্লীল' বলে ঘৃণিত ও বর্জন করা-ও অন্যায় হবে। এই সংজ্ঞাগুলি আমাদের আজকের রাজনৈতিক ও সামাজিক-অনুসৃত মূল্যবোধের আলোকে তৈরি। এগুলি অতীতের কলকাতার লোকসংস্কৃতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক হবে? ঐ সময়কার লোককবিদের কাছে 'প্রগতি' ও 'প্রতিক্রিয়া'র অর্থ হয়তো অন্য ছিল; 'শ্লীলতা-অশ্লীলতা'র সীমানা হয়তো তাঁরা ভিন্নভাবে মাপজোক করতেন। ঐ সময়ের স্মৃতিরোমন্থন করতে গিয়ে পুরোনো যুগের বিখ্যাত অভিনেতা রাধামাধব কর পরবর্তী যুগের পাঠকদের সম্বোধন করে বলেছিলেন : "...আজকাল দেখিতেছি আপনারা—কায়মনোবাক্যে কিনা বলতে পারি না—অন্তত বাক্যে, অত্যন্ত puritan ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন; কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ সরমে সঙ্কোচে আপনাদের

নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া উঠে। যে সঙ্গীতের আসরে ভদ্রসমাজে পিতা-পুত্র একত্র বসিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিত না; পর্দ্দার আড়ালে মাতা স্ত্রী কন্যার অধিষ্ঠান কাহারও কিছুমাত্র উদ্বেগের কারণ হইত না, সে সঙ্গীত আপনারা বোধহয় আজকাল আপনাদের মোটা purist মাপকাঠিতে পরিমাপ করিয়া প্যুরিটান দরজির দোকান হইতে কাটিয়া ছাঁটিয়া ভদ্রসমাজের উপযোগী করিয়া বাহির না করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন না।...”[৬৭]

আঠারো-উনিশ শতকের কলকাতার পরিবর্তনশীল সমাজের নানা স্তরে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি দেখা যায়। ইংরেজ ঔপনিবেশিক ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিমণ্ডলে এই সদ্যোজাত মহানগরীতে নতুন ধরনের শ্রেণির উদ্ভব হয়—মুনশি, দেওয়ান, বেনিয়ান-মুৎসুদ্দি, ও ঐ জাতীয় নব্য-ধনী সম্প্রদায় একদিকে, আর অন্যদিকে গ্রাম থেকে আগত, তাদের পুরোনো পেশা থেকে বিচ্যুত হাজার হাজার বেকার কৃষিজীবী ও কারিগর যাঁরা এই শহরে এসে নানা ধরনের জীবিকা খুঁজে পান, বা তৈরি করেন।

এইসব নতুন শ্রেণি-বিন্যাসের ভিত্তিতে একটা ক্রমোচ্চ সোপানের আর্থ-সামাজিক সিঁড়িঘর তৈরি হচ্ছিল কলকাতার নগরায়ণের আদিপর্বে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অর্থে এটা ছিল একটা উল্লম্ব বা vertical কাঠামো।

কিন্তু ঐ যুগের কলকাতার লোকসংস্কৃতির অবস্থান-বিচার করতে গেলে, এই আর্থ-সামাজিক vertical কাঠামো থেকে বার হয়ে আমাদের পৌঁছোতে হয় এক অনুভূমিক বা horizontal সাংস্কৃতিক স্তরে—যেখানে শহরের ঐ vertical কাঠামোর বিভিন্ন শ্রেণি অনেক ক্ষেত্রেই সহ-সমঝদার। উচ্চবর্গের জীবনধারা ও চিন্তাভাবনা নিম্নবর্গের থেকে স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও, অনেক সময়ই উভয়েই এক সর্বজনীন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভাণ্ডার থেকে উপাদান ও রস গ্রহণ করতেন (যেমন রাধাকৃষ্ণের প্রেমের উপাখ্যান, বা চড়ক ও দুর্গাপূজার উৎসব)। এর ফলে, উভয়ের সাংস্কৃতিক ভাবধারার ও সৃষ্টিকর্মের মধ্যে আদান-প্রদান ঘটেছে (যেমন কবিগানে রাগসঙ্গীতের ব্যবহার ও অপরদিকে 'হাফ-আখড়াই'তে কবির লড়াই-এর প্রভাব)—যেভাবে শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে 'মহান ঐতিহ্য' বা great tradition ও 'অখ্যাতজনের ঐতিহ্য' বা little tradition প্রায়ই পরস্পরকে ছুঁয়ে এসেছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার, এই horizontal সাংস্কৃতিক স্তরের সার্বজনীনতাতেও, কিন্তু লোককবিরা vertical স্তরের সামাজিক ভেদাভেদ ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে কখনোই এড়িয়ে যাননি। যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন, উচ্চবর্গের সমাজের নৈতিক অধঃপতন ও ভ্রষ্টাচারকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণে আঘাত করেছেন। এমনকি নিজেদের

ধনী পৃষ্ঠপোষকদের পর্যন্ত এক হাত নিতে ছাড়েননি। পৃষ্ঠপোষকেরা এক শ্রেণিভুক্ত ছিলেন না। এবং পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে সম্পর্কও একরেখাবলম্বিত বা unilinear ছিল না। নানা স্তরে তা বিভিন্ন আকার নিয়েছিল।

শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ মশায় যাকে বলেছিলেন "কলকাতার প্রাক-নাগরিক বাল্যজীবন"[৬৮], সেই বড়ো হয়ে ওঠার দিনগুলিতে শহুরে সমাজের দেহ পুরো কোনো স্পষ্ট আকার নেয়নি। না গ্রাম, না শহর—এমন এক বয়ঃসন্ধিকালে, কলকাতার মেহনতি মানুষ ও তাঁদের কবি ও গায়কদের উপলব্ধিতে শ্রেণি-সম্পর্ক কোনো-এক আঁটোসাঁটো সংজ্ঞারূপে দানা বাঁধেনি। Industrial বা আধুনিক শিল্পপণ্যোৎপাদী সমাজের নাগরিক মানসিকতা থেকে এঁদের আবেগ অনুভূতি, ভাবনা-চিন্তার চরিত্র আলাদা। তাই আজকের ঐতিহাসিকদের খুব সাবধানতার সঙ্গে এগুলো দরকার, এঁদের শিল্পকর্মের যুক্তিসঙ্গত মূল্যায়নের প্রচেষ্টার।

এ বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে, অনুসন্ধানের ও মূল্যায়নের প্রণালী অন্যরকমভাবে সূত্রবদ্ধ করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। কারণ, ঐ সময়ের কলকাতাতে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা ও শ্রেণি-সম্পর্কের জটিলতা সবসময় প্রত্যক্ষভাবে সবরকমের লোকসাহিত্যে ধরা পড়ে না (যদিও রাস্তার প্রবাদ-প্রবচন ও কবিগানের 'খেউড়' বা ঐ জাতীয় গানে ও কবিতায় তদানীন্তন সামাজিক রীতি-নীতির সমালোচনা বেশ সুস্পষ্ট)। কবিগান, পাঁচালি, ঢপ কীর্তন, এইসব গানে পৌরাণিক ঘটনার বিবরণীর আড়ালে লোককবিরা অনেক কথা বলেছিলেন যা তাঁদের সমসাময়িক শ্রোতাদের কাছে তদানীন্তন কলকাতার সমাজ-জীবনের অনুষঙ্গ বহন করত, কিন্তু যা পড়ে আজকে আমরা খারিজ করে দিতে পারি রাধাকৃষ্ণের উপাখ্যানের বিরক্তিকর একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি বলে।

এটাও মনে রাখা দরকার, ঐ সময়ের কলকাতার বাসিন্দারা—ধনিকশ্রেণি ও নিম্নবর্গ, উভয়ই—প্রথম প্রজন্মের নাগরিক। ফেলে-আসা গ্রামের প্রতি টান তখনও অটুট। গ্রামীণ সমাজের প্রতিষ্ঠানগত ও সার্বজনীন উৎসব-অনুষ্ঠানের ঐতিহ্যে ফিরে যাবার আকুলতা দেখা যায় কলকাতার নাগরিকদের যৌথ আমোদ-আহ্লাদের অনুষ্ঠানে। অতীতের গ্রামীণ কৃষিনির্ভরশীল উৎসব—যেমন নবান্ন—কলকাতাতে সম্ভব ছিল না। কিন্তু একই ধরনের ঋতু-ভিত্তিক মিলনোৎসব (যেমন চড়ক, গাজনের সঙ, দুর্গাপূজা, চৈত্রমাসের রাস) আঠারো শতকের কলকাতাতে পুনরাবির্ভূত হলো। এবং এর পৃষ্ঠপোষক যদিও শহরের ধনিকবর্গ ছিলেন, এর দর্শক-শ্রোতারা ছিলেন কলকাতার ব্যাপক জনসাধারণ।

অতীতের গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত এক ধরনের সাংস্কৃতিক সংহতি (সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেণি-বৈষম্য এবং তা নিয়ে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে লড়াই সত্ত্বেও), আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের শুরুর কলকাতাতেও প্রবহমাণ ছিল।

কিন্তু এই সাংস্কৃতিক সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতার আনুষ্ঠানিক অভিব্যক্তির স্তরের উপরে কলকাতার লোককবিরা তাঁদের নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন। শহরের প্রতাপশালী ধনী নাগরিকদের নিয়ে রাস্তায় ঠাট্টা-রসিকতা থেকে শুরু করে কবিগানের আসরে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ—এই দুঃসাহসিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নজির আজকের ভারতবর্ষের কোনো শহরের বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে দেখতে পাই?

নিঃসন্দেহে, সে-যুগের কলকাতার লোককবিদের 'বিদ্রোহী', (যে অর্থে সমসাময়িক কৃষক বিদ্রোহের প্রভাবে গণ-সংগীত বা গাথা সাহিত্য তৈরি হয়েছিল) বলে চিহ্নিত করা ভুল হবে। কলকাতায় বাস করতে গিয়ে পারিপার্শ্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছিল তাঁদের নানাভাবে—সুযোগ বুঝে কখনো উচ্চবর্ণের ফরমায়েশ মেনে, কখনো পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে। লড়াইটা ছিল মূলত আত্মরক্ষামূলক—তাঁদের পুরোনো গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় অনুসৃত মূল্যবোধের সমর্থনে, ও সদ্য উদ্ভূত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বাজারি রীতি-নীতির বিরুদ্ধে। ফলে, তাঁদের সৃষ্টিকর্মে দেখা যায় নানা প্রবণতার জটিল, কিন্তু চিত্তগ্রাহী সমাবেশ—ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধর্মানুরাগ, যৌথ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানপ্রীতি, লৌকিক হাস্যরস, নূতন নাগরিক পরিবেশ থেকে রূপকল্প চয়ন, অতীতের ধ্রুপদী সংগীত ও সদ্য-প্রবর্তিত বিলেতি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, শৌখিন নেশা থেকে লোকসংস্কৃতি অর্থকরী পেশাতে ক্রমিক রূপান্তর। এককথায়, কলকাতার বহুধাবিস্তৃত ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে, ও শহরের বহুবিধ ও বিভিন্নধর্মী বৃত্তিজীবীদের বিনোদনের চাহিদায় সাড়া দিয়ে সে-যুগের লোকসংস্কৃতিও বহুবর্ণরঞ্জিত ও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছিল।

টীকা

১. A. K. Roy, pp. 128-29.

২. হরিহর শেঠ, পৃ. ৩২৩।

৩. সুশীলকুমার দে, পৃ. ৪৪।

৪. হরিহর শেঠ, পৃ. ৩৩১।

রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে ঐ সময়কার গান ও ছড়া অধিকাংশ কলকাতার বাইরে রচিত। ১৭৭৫ সালে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি সারা বাংলায় আলোড়ন তোলে। কৃষ্ণনগরে

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী ঐ সময়, নন্দকুমারের ফাঁসি ও কলকাতার মানুষের শোকোচ্ছ্বাসের বর্ণনা করে কবিতা রচনা করেন। আর একটি ছড়া পাওয়া যায়—

আজগুবী এক আইন হয়েছে,
কৌলচলিদের সাথে হেস্টিন ঝগড়া বাঁধিয়েছে।
হায়রে হায় একি হোল বামুনের ফাঁসি হোল,
নন্দকুমার মারা গেল, গুরুদাস ধুলায় পড়েছে।

(উদ্ধৃত— রণজিৎকুমার সমাদ্দার, পৃ. ১৯০-৯১) ছড়ায় ভাষা ও ভাব থেকে অনুমান করা যায় ওটি কলকাতারই কোনো লোককবি-রচিত।

৫. দ্রষ্টব্য : প্রফুল্লচন্দ্র পাল, দীনেশচন্দ্র সিংহ।

৬. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৯৭১), পৃ. ১৩২।

৭. দ্রষ্টব্য : "The existence of Kabi-songs may be traced to the beginning of the 18th century, or even beyond it to the 17th, but the most flourishing period of the Kabiwalas was between 1760 and 1830" (Sushil Kumar De, p 301).

৮. *রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের রচনাবলী,* পৃ. ৭২।

৯. প্রফুল্লচন্দ্র পাল, পৃ. ৩৬।

১০. *ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৫৩-৫৪।

১১. পূর্ণচন্দ্র দে *উদ্ভটসাগর,* 'কলিকাতা বাগবাজারের প্রাচীন ইতিহাস', *দেশ,* ৬ মাঘ ১৩৪৬। ভোলা ময়রার জবাবে উদ্ধৃত দুটি নামের ব্যাখ্যা প্রয়োজন আজকের পাঠকদের জন্য। প্রথম, 'হরুর চেলা' বলতে ভোলা ময়রা তাঁর গুরু সে-যুগের বিখ্যাত কবিয়াল হরু ঠাকুরের কথা স্মরণ করছেন। শেষ লাইনে যে 'পেরিং'-এর নাম পাই, তিনি ক্যাপ্টেন চার্লস পেরিন। কলকাতায় জব চার্ণকের আসার কয়েক বছর পরেই—১৭০৫ সালে—এখন যাকে আমরা বাগবাজার বলি, পেরিন সেখানে একটি বাগান তৈরি করেছিলেন ও বাজার বসিয়েছিলেন। 'বাগ' (বাগান) ও 'বাজার'-এর সহাবস্থানের জন্যই নাকি ঐ অঞ্চলের নাম বাগবাজার হয়েছিল। (দ্রষ্টব্য—পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর : প্রাগুক্ত)।

১২. শোনা যায়, বাগাবাজারে এক খড়ের চালের ঘর ছিল ভোলার দোকান। পূর্ণচন্দ্র দে *উদ্ভটসাগর*-এ ১৯২৬ সালে পুরোনো কলকাতা নিয়ে লিখতে গিয়ে আবিষ্কার করেছিলেন যে অতীতে এই দোকানটি অবস্থিত ছিল যে জায়গাটিতে, সে স্থানটির দুই দিক জুড়ে তাঁর সময়ে, বাড়ি দাঁড়িয়েছে। একদিকে বাগবাজারের তদানীন্তন ধনী বাসিন্দা ভগবতীচরণ গাঙ্গুলির বাড়ি, আর একদিকে সংস্কৃত সাহিত্যবিদ্ ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী আনন্দরাম বড়ুয়ার ছাপাখানা। (দ্রষ্টব্য—Purnachandra De Udbhatsagar, 'Calcutta of Old : Its Streets and Lanes-II', *Calcutta Municipal Gazette* : 25th December, 1926)।

১৩. দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ১৮৬।
১৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১২৭।
১৫. *বিবিধার্থ সংগ্রহ*; ৫৮ খণ্ড; মাঘ, ১৭৮০ শকাব্দ; (১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ)।
১৬. দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ১৯৬।
১৭. ঐ, পৃ. ১৮৫।
১৮. *ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী*, পৃ. ১৩১।
১৯. ঐ, পৃ. ১০৯।
২০. বৈষ্ণবচরণ বসাক, পৃ. ৩৭০।
২১. দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ১৭৭।
২২. বৈষ্ণবচরণ বসাক, পৃ. ৩৭০।
২৩. *ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী*, পৃ. ৯৩-৯৫। *মনোমোহন গীতাবলী*, পৃ. ৯০-৯০।
২৪. N. N. Ghosh, 'Memoirs of Maharaja Nabakissen' in Benoy Krishna Deb, p. 192।
২৫. নগেন্দ্রনাথ বসু, পৃ. ৩২১। এ প্রসঙ্গে, এক ইংরেজ ধর্মযাজকের চোখে এই দুই সাংস্কৃতিক ধারার সহাবস্থান কীরকম লেগেছিল তার এক প্রাণবন্ত বর্ণনা পাই রেভারেন্ড ওয়ার্ডের বিবরণীতে। ১৮০৬ সালে শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি দেখেছিলেন নৃত্য (ইংরেজরা যাকে nautch বলত)—"বাঈজীরা সুবেশে সজ্জিত, গাইছে, নাচছে, যেন নিদ্রাতুর পদক্ষেপে..." কিন্তু ভোর রাত্রে নাচ শেষ হলে এবং অন্যান্য ইংরেজ অতিথিরা বিদায় নিয়ে চলে গেলে, এতক্ষণের বন্ধ সদর দরজা খুলে দেওয়া হলো, এবং পিলপিল করে সাধারণ লোকজন রাজবাড়ির আঙিনাতে ঢুকে পড়ল—হরু ঠাকুর, ভবানী বেনে ও নিতাই বৈরাগীর কবিগান শুনতে। এই কবিয়ালদের গান শুনে ও ভাব-ভঙ্গি দেখে বেচারা ইংরেজ ধর্মযাজক আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ করলেন কীভাবে এই গায়কেরা "কুচ্ছিত গান আর অশ্লীল নাচের ভঙ্গিতে অতিথিদের বিনোদন করছে।" (দ্রষ্টব্য—Shib Chunder Bose, pp. 118-19।
২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কবি-সংগীত', ১৩০২ (*লোকসাহিত্য*, পৃ. ৭৮)
২৭. বিনয় ঘোষ (১৩৬৩), পৃ. ৩৮-৩৯।
২৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় খণ্ড; *বাংলার লোকনৃত্য*, দ্বিতীয় খণ্ড; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দ্র.।
২৯. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৯৭২), পৃ. ১১৯-২২।
৩০. প্রমথনাথ মল্লিক, পৃ. ১৩।
৩১. *বিশ্বকোষ*, তৃতীয় খণ্ড—'ক', কলিকাতা, ১২৯৯।
৩২. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১১৭-১৮।
৩৩. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ৩০।

৩৪. *ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী*, পৃ. ১১৭-১৬৭।
৩৫. প্রমথনাথ মল্লিক, পৃ. ৮৩।
৩৬. ঐ, পৃ. ২০৭।
৩৭. ঐ, পৃ. ২০৭-০৮।
৩৮. ঐ, পৃ. ৮৩।
৩৯. হরিহর শেঠ, পৃ. ৩৩২।
৪০. ঐ।
৪১. ঐ, পৃ. ৩৩০।
৪২. ঐ, পৃ. ১৫০।
৪৩. ঐ, পৃ. ৩২৮।
৪৪. সুশীলকুমার দে, পৃ. ৫৫।
৪৫. আরও প্রত্যক্ষভাবে মথুরারাজ কৃষ্ণের সঙ্গে শহরের ফুলবাবুদের তুলনা করে গীতরচনার একটি নিদর্শন পাওয়া যায় উনিশ শতকের বর্ধমানের কবি কৃষ্ণধন বিদ্যাপতির নিম্নলিখিত গানে—

ব্রজের গোপাল আজ কি তুমি দ্বাদশ গোপাল হ'য়েছ?
ব্রজরাখাল ছেড়ে কি শেষ ফচ্‌কে ছোঁড়ায় পেয়েছ।
... ...
বুঝি ব্রজের রাখাল মরে, আজ নববাবুর মূর্ত্তি ধরে
আসছে যাচ্ছে ঘুরে ফিরে, তাই কি বসে দেখতেছ।
ওল্‌টম শ্যাম্‌পেন সেরী, হয়েছে গোবর্দ্ধন গিরি,
ব্রজাঙ্গনার পদ কি হরি, বারাঙ্গনায় দিয়েছ।

(*সংকলিত ভারতীয় সহস্র সঙ্গীত* : বৈষ্ণবচরণ বসাক, পৃ. ৪৫৮।)

৪৬. বৈষ্ণবচরণ বসাক, পৃ. ২৫৭।
৪৭. দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ৩৫০।
৪৮. রাজনারায়ণ বসু (১৯৯২), পৃ. ১৩৭; প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, পৃ. ৪৩-৪৪; প্রমথনাথ মল্লিক, পৃ. ১৩৪-৩৫।
৪৯. Aloke Ray (ed.), pp. 302-03.
৫০. S. N. Mukherjee, p. 20.
৫১. প্রমথনাথ মল্লিক, পৃ. ১৩৪-৩৫।
৫২. প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, পৃ. ৪৪।
৫৩. রাজনারায়ণ বসু, পৃ. ১৩৭।
৫৪. গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, পৃ. ২১১-১২।
৫৫. *মনোমোহন গীতাবলী*, পৃ. ১৬২।

৫৬. গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, পৃ. ২৩৬-৩৭।

৫৭. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, 'যাত্রা' (ড. সুশীলকুমার গুপ্ত, পৃ. ৭৪০-৪১)।

৫৮. গোপাল উড়ের খ্যাতির সূত্র ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। পুরোনো কলকাতার গল্প অনুযায়ী আমরা যা জানতে পারি, গোপাল ওড়িশা থেকে কলকাতাতে এসেছিলেন ১৮৩৫ নাগাদ, যখন তাঁর বয়স ছিল ১৮/১৯ বছর। রাস্তাতে চাঁপাকলা বিক্রি করে জীবিকা অর্জন করতেন। একদিন বউবাজারের রাস্তাতে গোপাল চাঁপাকলা ফেরি করছিলেন। তাঁর চিৎকার শুনে পার্শ্ববর্তী এক গণ্যমান্য শৌখিন যাত্রাদলের উদ্যোক্তা—রাধামোহন সরকার—তাঁর কণ্ঠস্বরে স্বরগ্রামের গান্ধার স্বর শুনে ডেকে আনেন, এবং তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রায় মালিনীর ভূমিকাতে তাঁকে নিযুক্ত করেন। মালিনীর সাজে গোপালের অভিনয় ও গান তাঁকে বিখ্যাত করে তোলে। রাধামোহন সরকারের মৃত্যুর পর গোপাল নিজের দল তৈরি করেন, এবং সহজ বাংলা ভাষাতে ও নতুন গান ও নৃত্যশৈলী দিয়ে 'বিদ্যাসুন্দর' পালা একেবারে পরিবর্তন করে ফেললেন। (দ্রষ্টব্য—দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ৩৬০-৩৬১)।

৫৯. "যাত্রা হইতে গোপালের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত" (দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ৩৬১)।

৬০. হরিপদ চক্রবর্তী, পৃ. ১৮-২২। এই অপর প্রসঙ্গ একাধারে অতীতের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের 'বিরহ' ও অন্যধারে লোকসংস্কৃতির 'খেউড়'-এর সমন্বয়।

৬১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৯২-৯৩। *বিশ্বকোষ* (৪র্থ খণ্ড), ১৩০০, পৃ. ৪৩৪-৩৫। দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ৩৩২।

৬২. এই 'হাফ-আখড়াই' অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও শৌখিন কবিরা সম্ভ্রান্ত বাঙালি পরিবার থেকে এলেও, তাঁদের নির্ভর করতে হতো শহরের গরিব মেহনতি মানুষের উপর গান গাইবার জন্য। 'হুতোম', বারোইয়ারি পুজোর সময় কলকাতার 'ধোপাপুকুর, লেনের দুইয়ের নম্বর বাড়ীটি'র মুখুজ্যেদের ছোটবাবুর অধ্যক্ষতা'য় হাফ-আখড়াই-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, দোহারদের মধ্যে অধিকাংশই "ঢাকাই কামার, চাষা ধোপা, পুঁটে তেলি ও ফলারে বামুন" (কালীপ্রসন্ন সিংহ : *হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৮৪, পৃ: ২২)। আঠারো শতক থেকে উনিশ শতকের শুরু পর্যন্ত কবিগানে যেভাবে শহরের নিম্নবর্গের 'চাষা ধোপারা' (যেমন কেষ্টা মুচি, গোঁজলা গুই, রঘুনাথ দাশ, নীলমণি পাটনী, ভোলা ময়রা) মূল কবি, গায়ক বা impresario-এর ভূমিকা নিতেন, উনিশ শতকের পরবর্তী দশকে, শৌখিন ভদ্রলোক impresario-দের তৈরি 'হাফ-আখড়াই'তে (অভিজাত সমাজের 'আখড়াই' ও লোকসংস্কৃতির 'কবিগানের' দো-আঁশলা) নিম্নবর্গের শিল্পীদের সে ভূমিকা অবলুপ্ত হয়েছিল। তাঁরা কেবল দোহারের স্তরে নিযুক্ত হতেন।

৬৩. Pradip Sinha, pp. 83-84। কোম্পানির আনুকূল্যে, কলকাতাতে অধিষ্ঠিত গঙ্গাগোবিন্দের সারা বাংলা ব্যাপী ক্ষমতার কাছে পরাভব স্বীকার করে, প্রাক্-ঔপনিবেশিক বাংলার শেষ বাঙালি 'মহারাজা', নবদ্বীপের কৃষ্ণচন্দ্র নাকি ছড়া বেঁধেছিলেন—"নিজের নাই কোন

সাধ্য, ছেলেরা সব অবাধ্য/এবে যা কিছু ভরসা তুমি যে গঙ্গা-গোবিন্দ" (প্রমথনাথ মল্লিক, পৃ. ১৮)।

৬৪. বাংলাতে 'মাইফেল', আর্বি 'মহফিল্'-এর উচ্চারণভেদ। কিন্তু, আঠারো-উনিশ শতকের কলকতার 'বাবু'-সংস্কৃতিতে, 'মাইফেল' যে অর্থে ব্যবহৃত হতো এবং তার যা অনুষঙ্গ, তা আদি 'মেহফিল্' থেকে অনেক তফাত। 'মহফিল', উত্তর-ভারতে উর্দু গানের মজলিস্— যা এখনও প্রচলিত। অতীতের কলকাতার 'মাইফেল'-এ, তখনকার ধনী বাঙালি উদ্যোক্তাদের মধ্যে একটা আত্মপ্রচারের প্রতিযোগিতা দেখা যায়—যা অনেক সময়ই আত্মবিনাশের শামিল হতো। জাঁকজমক ও টাকা খরচের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেক 'বাবু'-ই শেষে দেউলিয়া হয়ে যেতেন। এই কারণেই কি 'মহফিল' থেকে উচ্চারণ-পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় বাংলায় এ অনুষ্ঠানটা 'মাইফেল'-এ রূপান্তরিত হয়েছিল? ইংরেজি fail থেকেই কি 'মাইফেল্'-এর উৎস?

৬৫. দ্রষ্টব্য : ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কলিকাতা কমলালয়, নববাবুবিলাস, দূতিবিলাস, নববিবিবিলাস* (যেগুলি রচিত হয়েছিল উনিশ শতকের বিশ দশকে—এখন সংকলিত বাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইয়ে।

৬৬. হরিহর শেঠ, পৃ. ৩২৭।

৬৭. বিপিনবিহারী গুপ্ত, পৃ. ২৫৪-৬০।

৬৮. বিনয় ঘোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৬৬।

সরস্বতীর ইতর সন্তান

কলকাতার 'বাল্মীকি যন্ত্র'-তে ছাপা, ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়' বইটিতে একটি মজার গল্প পাওয়া যায়। দেবলোকে অবস্থানকালে প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর একদিন সরস্বতী দেবীর আশ্রমে হাজির হয়ে দেখলেন—"অসংখ্য নীচ বিকলাঙ্গ বঙ্গভাষার শব্দবৃন্দ, কৃতাঞ্জলী হইয়া শ্রীবন্ধনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান আছে এবং সকলে কহিতেছে—মাতঃ! সাধু কিম্বা নীচ ভাষার শব্দ সকলই আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা সকলই আপনার সন্তান, সকলই সমান স্নেহাস্পদ, সকলের সমান অধিকার হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদিগের তপস্যার কি বিড়ম্বনা! যেহেতু অনাদিকাল হইতেই আমরা নীচ জাতির আশ্রয়ে দিনপাত করিতেছি, ভদ্রসমাজে আমাদিগের কোন স্বাধিকার নাই, সেই দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অদ্য মাতৃসদনে আসিয়াছি, এবার সাধু সমাজে অধিকার না দেওয়াইলে আমরা আপনার শ্রীচরণ প্রান্তে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব।"[১]

শতাধিক বছর পূর্বে, গণতান্ত্রিক বা সমানাধিকারের দাবি-আদায়ের এই কল্পিত উপাখ্যানে, এ যুগের গবেষকেরা হয়তো 'ধর্না,', 'ঘেরাও', 'অনশন ধর্মঘট' ইত্যাদি রাজনৈতিক রণকৌশলের পূর্বাভাস খুঁজে পাবেন। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। সুতরাং গল্পটির বাকি অংশ শোনা যাক।

বঙ্গভাষার এই নীচ বিকলাঙ্গ শব্দবৃন্দের প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে সরস্বতী দেবী তাদের আদেশ করলেন বঙ্গদেশে গিয়ে ভদ্রসমাজে তাদের অধিকার দাবি করতে। প্রথমে, তারা বিদ্যাসাগর মশাই-এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাদের ভাগিয়ে দিলেন; বললেন—"তোমরা সরস্বতীর বংশোদ্ভব বটে, কিন্তু তাঁহার সংস্কৃত নামক পুত্রের সন্তান নহ, সংস্কৃত হইতে যে সকল সাধু শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা সংস্কৃতের ঔরসপুত্র; —তাহারাই আমার পুস্তকে স্থান পায়।"

এর পর ইতর শব্দরা একে একে তত্ত্ববোধিনী সভার অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, এবং সে-যুগের কলকাতার বাঘা বাঘা ভট্টাচার্য, বিদ্যারত্ন, তর্কালঙ্কারদের দোরে দোরে গিয়ে ধর্না দিল, কিন্তু প্রত্যেকেই চোখ রাঙিয়ে, দারোয়ান ডেকে তাদের তাড়িয়ে দিলেন।

মর্ত্যলোকে ইতর শব্দদের এইরকম অপমানের কথা শুনে এবার সরস্বতী দেবী নতুন ফতোয়া জারি করলেন। নাটক-রচয়িতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পুস্তক লেখক, গবর্নমেন্ট অনুবাদক, জেলা আদালতের উকিল ও আমলাদের হুকুম দিলেন—"আমি বিকলাঙ্গ ইতর শব্দগণকে তোমাদিগের সন্নিধানে, প্রেরণ করিব, ইহাদিগকে হতাদর না করিয়া তোমাদিগের বর্ণনাতে সাদরে স্থান দান করিবে।..."

সরস্বতী দেবীর এই প্রত্যাদেশে সবচেয়ে প্রথম সাড়া দিলেন "সিংহ মহাশয় (কালীপ্রসন্ন সিংহ) যিনি হুতুম (হুতোম প্যাঁচার নক্শা) লিখিয়া ইতর শব্দের যথেষ্ট সমাদর করিলে, বাগ্দেবী তাঁহার প্রতি কিছুদিনের জন্য আক্রোধ হইলেন।..."[২]

'ইতর' ও 'সাধু'

গল্পটি দীর্ঘ হলেও, বিবরণ দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না, কারণ এর অন্তর্নিহিত সারমর্মই আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। উনিশ শতকের বাংলার ব্যাপক নিচুতলার মানুষদের যে ভাষা, বা যার শব্দগুলিকে 'নীচ, বিকলাঙ্গ' বলে বাগ্দেবী অভিহিত করেছেন, তার কিন্তু একটা প্রবহমাণ ঐতিহ্যের ধারা ছিল। প্রাক্-আর্য যুগ থেকে প্রচলিত, বাংলাদেশের আদিম দেশজ শব্দগুলি অবিকৃতরূপে এখনও কথোপকথনে ব্যবহৃত হয়। তার পরে, সংস্কৃত ভেঙে যে তদ্ভব শব্দ—সেগুলিও এই নিচুতলার মানুষের ভাষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর, এই দেশজ ও তদ্ভবের সঙ্গে এসে জুটেছিল আরবি-ফারসি শব্দও—মুসলমান বিজয়ের পর থেকে। এই বিভিন্নধর্মী শব্দভাণ্ডার নিয়েই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল মধ্যযুগের বাংলা লোকসাহিত্য। এই লৌকিক বাংলা ভাষার বনিয়াদী সজীবতা ও স্বাবলীলতার সঙ্গে যদি উনিশ শতকের বাঙালি শিক্ষিত

সাহিত্যিকদের সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলার তুলনা করতে হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে বিদ্যাসাগরী বাংলা-ই 'বিকলাঙ্গ' ছিল। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অলঙ্কার ও তৎসম শব্দের গুরুভারে এ ভাষা কখনোই স্বচ্ছন্দ গতিতে সর্বত্রগামী হতে পারেনি।

'ইতর' বাংলা ও 'সাধু' বাংলা—এই দুই-এর মধ্যে বরাবরই একটা টানাপোড়েনের সম্পর্ক ছিল। সাধু সমাজ আর্যসভ্যতার সঙ্গে একাত্ম হবার তাগিদে ক্ষমতাশীল রাজকীয় সংস্কৃতির প্রতি ঝুঁকেছিল। বারো শতকে লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার কবি জয়দেবের সংস্কৃত 'গীতগোবিন্দ' এই প্রবণতারই স্বাক্ষর। কিন্তু নিচুতলায়, ব্যাপক জনসমাজে যে লোকসাহিত্য প্রচলিত ছিল তার শব্দভাণ্ডার দেশজ তদ্ভব শব্দ দিয়েই তৈরি। সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের হিসেব অনুযায়ী অতীতের জনপ্রিয় বাংলা কথ্য কাহিনিগুলির কেবলমাত্র এক-তৃতীয়াংশ তৎসম শব্দ, বাকি তদ্ভব।[৩]

পরবর্তী যুগে, যখন বাঙালি লোককবিরা প্রচলিত কথ্য বাংলা বা 'ইতর' বাংলায় মহাভারত-রামায়ণ ও পুরাণের অনুবাদ (বা অভিযোজন, যেহেতু কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত অনেক ঘটনাই মূল দুই মহাকাব্যে নেই, এবং স্থানীয় বাংলা লোকসাহিত্য থেকে আহৃত) শুরু করেন, তখন সবচেয়ে আপত্তি আসে ভট্টাচার্যের দল থেকে। তাঁরা অভিশাপ দেন—ধর্মগ্রন্থ যে বাংলাভাষায় শুনবে, সে ঘোর নরকে যাবে—

> অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি
> ভাষায়ং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।[৪]

সংস্কৃতে অভিশাপ দিয়েই ব্রাহ্মণ্য-নিয়ন্ত্রিত সাধু সমাজ ক্ষান্ত হননি। ইতরদের ধৃষ্টতাকে ঠাট্টা করতে গিয়ে তাঁরা ইতরদেরই সাধরাণ বাংলা ব্যবহার করতেও পিছপা হননি। তাই সে-যুগের প্রচলিত প্রবাদ—

> কৃত্তিবেসে কাশীদেসে আর বামুন ঘেঁষে
> এই তিন সর্বনেশে।[৫]

সংস্কৃতজ্ঞ বামুনদের একচেটিয়া এক্তিয়ারে, গ্রাম্য কবি কৃত্তিবাস আর কাশীরাম দাসের অনধিকার প্রবেশ যেমন সাধু সমাজ সহজে মেনে নিতে পারেনি, ঠিক তেমন-ই 'ইতর' ভাষার লোককবিরা উচ্চ সমাজের আর্য পৌরাণিক কাহিনিগুলিকে একেবারে বর্জন করতে পারেননি। ঐতিহ্যাশ্রয়ী স্থানীয় লোককাহিনিগুলিকে রামায়ণ-মহাভারতের আর্য অবয়বে ঢুকিয়ে দেবার প্রবণতাটা বেশ স্পষ্ট কৃত্তিবাসী রামায়ণে আর কাশীদাসী মহাভারতে। অনুরূপ ভঙ্গিতে, বাংলার লোককবিরা প্রাচীন স্থানীয় লৌকিক দেব-দেবীর ঘরোয়া কাহিনিগুলিকে আর্যাবর্তের শিব, বা কৃষ্ণের উপাখ্যানে বেমালুম চোরাচালান

করে দিয়েছিলেন। শিব-পার্বতী বা রাধা-কৃষ্ণকে এমনভাবে পরিবেশিত করা হলো যে আর্যাবর্তের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাদের চিনতেই পারতেন না।

ইংরেজ এদেশে এসে সাম্রাজ্য গড়ে তোলার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে, বাঙালি রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় অভিজাত কবিদের বাংলা সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"ভাষা ভাবের অধিকার ছাড়িয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করিল এবং কবিগণ প্রকৃত মানুষ না দেখিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ছবিগুলি দেখিয়া পাগল হইলেন। ...উপমাগুলি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম হইয়া নরনারীর রূপ বর্ণনা ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলিল।..."[৬]

নিগূঢ়, সূক্ষ্ম ভাব ও বিষয়ের প্রতি অবসরভোগী শিক্ষিত কবি-সাহিত্যিকদের এই আকর্ষণ নিছক ব্যক্তিগত রুচি থেকে জন্মায়নি। তদানীন্তন সামাজিক শ্রেণি সোপানে উচ্চশ্রেণির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ঘোষণার এটা একটা অভিব্যক্তি ছিল। প্রতি সমাজেই তার ক্ষমতাশালী শ্রেণির ব্যবহৃত ভাষাই বা বাচনভঙ্গিই সেই সমাজের 'আদর্শ' বা standard language হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ইতর' শ্রেণির ভাষা ও সাহিত্য থেকে নিজেদের সযত্ন দূরত্ব বজায় রাখার জন্য সংস্কৃতের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল বাঙালি অভিজাতশ্রেণিকে। তাই ভারতচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক, নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র হুকুম জারি করেছিলেন শিক্ষিত শ্রেণি যেন কৃত্তিবাসী রামায়ণ না পাঠ করে।[৭]

রাজতন্ত্র উত্তর-ভারতীয় মুসলমানদের হাতে ছিল বলে আরবি-ফারসি শব্দের প্রচলনও অভিজাত বাঙালিদের কথায় ও লেখায় দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সাধু বাংলা, মূলত সংস্কৃতঘেঁষাই ছিল, হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ্য অধিকার পুরোমাত্রায় বজায় ছিল বলে।

আঠারো-উনিশ শতকে এদেশে ইংরেজ আসার পর এই সংস্কৃতঘেঁষা সাধু বাংলাই গদ্যরীতির আদর্শ রূপে গৃহীত হল। এর পিছনে ইংরেজ শাসনকর্তা ও মিশনারিদের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। "১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হালহেড এবং পরবর্তীকালে হেনরি পিটস্ ফরস্টার ও উইলিয়াম কেরি বাংলাভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরিয়া আরবি-ফারসির অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্পদিনের মধ্যে বাংলা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে।"[৮]

বেনিয়ান পণ্ডিত

অবশ্য শুধু ইংরেজ আমলা ও ধর্মযাজকদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। ইংরেজ ব্যবসাদারদের সহযোগী রূপে যেমন বাঙালি মুৎসুদ্দি-বেনিয়ানরা এদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পালটে

সমাজে গোষ্ঠীপতিরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, ঠিক একই ভাবে ইংরেজ শিক্ষাবিদ্ ও রাজনীতিজ্ঞদের সহযোগী হয়ে বাঙালি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা শিক্ষিত বাঙালি সমাজের সাহিত্যচর্চার মাধ্যম হিসেবে সাধু বাংলার প্রচার করে নিজেদের সংস্কৃতি জগতে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইংরেজ আসার পর এই পণ্ডিতের দল তাঁদের পুরোনো জমিদার পৃষ্ঠপোষকদের হারিয়েছিলেন। সমাজে বেঁচে থাকতে ও নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখতে এঁদের নতুন পৃষ্ঠপোষকের দরকার হয়ে পড়েছিল। সে-সুযোগ মিলল ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর। এখানে ইংরেজ আমলাদের বাংলা শেখানোর জন্য উইলিয়াম কেরি যাঁদের নিযুক্ত করলেন, তাঁরা এই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদেরই বংশধর—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, পদ্মলোচন চূড়ামণি প্রভৃতি। এদেশে খ্রিস্টধর্ম-প্রচার ও শাসনকার্যে সফলতার জন্য গ্রামের সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা ইংরেজদের জানা দরকার হয়ে উঠেছিল। তাই কেরি চাষা-ভুষোর কথা সংকলিত করেছিলেন, ১৮০১ সালে 'কথোপকথন'-এ এবং পরবর্তী যুগে William Morton তাঁর প্রবাদ-সংকলন—'দৃষ্টান্ত-কাব্য-সংগ্রহ'-এ (১৮৩২)। কিন্তু ১৮০১ থেকে ১৮১৫ সালের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে যেসব বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয় এবং যেগুলির লেখক ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের মতো পেশাদারি পণ্ডিত বা রামরাম বসুর মতো সাহেবদের মুনশি, তাতে কথ্য ভাষা থেকে সংস্কৃত শব্দের ছড়াছড়ি-ই বেশি। মনে হয়, ইংরেজদের প্রচলিত বাংলা ভাষায় শিক্ষিত করার পরিবর্তে এই সুযোগে এক ধরনের সাধু বাংলা উদ্ভাবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাই যেন এই পণ্ডিত সমাজের মূল অভিপ্রায় ছিল। মনে রাখা প্রয়োজন, এদেশের শিক্ষা ও শাসনতন্ত্রে এই সময়টা ছিল ইংরেজ 'ওরিয়েন্টালিস্ট'দের প্রতিপত্তির যুগ। উইলিয়াম জোন্স, হোরেস হেম্যান উইলসন-এর মতো প্রাচ্যবিদরা প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রাদি ও সাহিত্যচর্চার সপক্ষে সরকারি নীতি নির্ধারিত করেছিলেন। এ দেশে প্রচলিত লোকসংস্কৃতিকে এঁরা মনে করতেন অধঃপতিত শ্রেণিদের অশ্লীল আমোদপ্রমোদ। বাঙালি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতসমাজের ধ্যানধারণার সঙ্গে এই সব ইংরেজ 'ওরিয়েন্টালিস্ট'দের মতবাদের সাযুজ্যর ফলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ 'সাধু' বাংলার চর্চার একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। কথ্য ভাষা বা 'ইতর' বাংলা সম্বন্ধে পণ্ডিতসমাজের মনোভাব বেরিয়ে আসে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের একটি মন্তব্য থেকে—"তেমনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধু ভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎ পুরুষেরা নগ্ন উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণ মানেই পরাঙ্মুখ হন।"[৯]

পরবর্তী দশকে এই সাধু বাংলা আরও দানা বেঁধে ওঠে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের হাতে। তাঁর 'পারসিক অভিধান'-এ তিনি অতি সতর্কভাবে তদানীন্তন কথ্য বাংলায় প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দগুলি বেছে বেছে তাদের জায়গায় 'স্বদেশীয় সাধুভাষা পুনঃসংস্থাপন'-এর চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর আর একটি বই—'বঙ্গাভিধান'-এ তিনি অনুরূপ কায়দায়, ''সাধু ভাষাতে অনেক ইতর ভাষার প্রবেশ হইয়াছে'' বলে, ঐসব ইতর শব্দগুলি বর্জন করতে অভিপ্রায়ী হন এবং 'বিজ্ঞ' লোকেদের উপদেশ দেন ''বিবেচনাপূর্বক কেবল সংস্কৃতানুযায়ী ভাষা লিখিতে তদ্দ্বারা কথোপকথন করিতে...''[১০] জয়গোপাল এতেই থামেননি। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের যে জনপ্রিয় সংস্করণ ছিল, তার উপর কলম চালিয়ে তিনি তাদের 'বিশুদ্ধ' করে নতুন সংস্করণ করেছিলেন।[১১] উল্লেখযোগ্য যে, এই জয়গোপাল তর্কালঙ্কারেরই ছাত্র ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মতো পরবর্তী যুগের বাঙালি সাহিত্যরথীরা।

নিজেদের সুবিধার্থে এবং সংস্কৃতি জগতে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে এঁরা যে বাংলা ভাষার পত্তন করলেন—তা সেই অতীতাশ্রয়ী, সংস্কৃতঘেঁষা, তৎসম-অধ্যুষিত এলাকা—যেখানে 'ইতর'জনের প্রবেশাধিকার নেই। বলা যেতে পারে, বাঙালি মুৎসুদ্দি বেনিয়ানরা অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে-ভূমিকা পালন করেছিলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই পণ্ডিত ও মুনশিদের ভূমিকা ছিল অনেকটা একই ধরনের। গ্রামীণ উৎপাদককে শোষণ করে তার উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য ইংরেজকে সরবরাহ, এবং তাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে ইংরেজের রাজকোষ পূর্ণ করে কোটিপতি হয়েছিলেন শোভারাম বসাক বা লক্ষ্মীকান্ত ধরের মতো বেনিয়ান এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিং বা দুর্গাচরণ মিত্রের মতো দেওয়ানরা। আর, ইংরেজদের দোভাষী মুনশির চাকুরিতে নিযুক্ত হয়ে, বাংলা ভাষাকে তার আদিম সজীব দেশজ উৎস থেকে নিঙড়িয়ে, সাধারণের অনধিগম্য এক ধরনের দুর্জ্ঞেয় সঙ্কেতলিপি তৈরি করে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং জয়গোপাল তর্কালঙ্কাররা বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে শিক্ষিত হিন্দু বাঙালিদের সাম্রাজ্য স্থাপন করলেন।

পরবর্তী যুগের standard সাহিত্যিক বাংলা গড়ে উঠেছিল এই সংস্কৃত শব্দ-বহুল সাধু ভাষার আওতাতেই। যাঁরা সাহিত্যচর্চা করতে এলেন, তাঁরা ভাষার গতি আরও সচ্ছল ও প্রকাশভঙ্গি আরও প্রাঞ্জল করেছিলেন। এমনকি পরে চলিত ক্রিয়াপদেরও ব্যবহার হল। কিন্তু ব্যাকরণরীতি ও শব্দমালায়, সমাসবদ্ধ পদ ও যমকানুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কারে সংস্কৃতির শাসন অবিচলিত ছিল।[১২]

এই কৃত্রিম সাধু ভাষার বিবর্তন স্বভাবতই স্বতঃস্ফূর্তভাবে হতে পারেনি। পণ্ডিত সমাজের সদাসতর্ক পরিচালনা ছাড়াও, বিপুল অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এ ভাষাকে টিকিয়ে রাখা ও চালু করার জন্য। হিন্দু কলেজে ও অন্যান্য বিদ্যালয়ে শিক্ষিত ইংরেজি-নবিশ বাঙালিদের এই ভাষাচর্চা করানোর উদ্দেশ্যে ১৮৪৭-এ David Hare-এর স্মরণার্থ সভা থেকে স্থির হয় যে প্রতিবছর বাংলা ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য একশো টাকা মূল্যের একটি করে পুরস্কার দেওয়া হবে। এই ধরনের আর্থিক উৎসাহ নিয়ে বাংলায় নাটক রচনার প্রয়াস দেখা যায় এর কিছুকাল পরে ১৮৫৪-এ যখন পুরস্কার ঘোষণা করে অভিনয়ের উপযোগী নাটক আহ্বান করা হয়, এবং রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' নাটক এরই ফলে রচিত হয়। এর প্রায় তিন দশক পরেও দেখছি পুরস্কারের বিনিময়ে বাংলা ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ১৮৭১ সালের 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে—"যিনি বাঙালা ভাষায় একখানি উৎকৃষ্টতম উপাখ্যান বা গল্পের পুস্তক রচনা করিতে পারিবেন, গবর্নর জেনরেল বাহাদুর তাঁহাকে ৫০০ টাকা পুরস্কার দানের অঙ্গীকার করিয়াছেন। ঐ পুস্তকে হিন্দু জাতির আচার, ব্যবহার ও স্বভাবের অতি উৎকৃষ্টরূপ পরিচয় থাকা আবশ্যক।"[১৩] এতকাল পরে যখন বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন এই বিজ্ঞাপন দেওয়ার কী দরকার হয়েছিল? আসলে, সৃজনশীল সাহিত্যে সাধুভাষার চর্চা তখনও খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। সমসাময়িক *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-য় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লেখক স্বীকার করেছিলেন—"এক্ষণে কতিপয় মাত্র কৃতবিদ্য ব্যক্তি বঙ্গভাষার অনুশীলন করিয়া থাকেন, বাঙ্গালাতে অতি অল্পসংখ্যক উত্তম গ্রন্থ ও প্রবন্ধ যাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা তাঁহাদিগের দ্বারা রচিত হইয়া থাকে, কিন্তু সাধারণ কৃতবিদ্যের সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প।"[১৪]

মনে রাখা দরকার যে, উনিশ শতকের ষাট-সত্তর দশকে যখন মধুসূদনের কাব্য বা বঙ্কিমের উপন্যাস নিয়ে সুধীমহলে হৈ-চৈ হচ্ছে, তখন উচ্চমার্গের সাহিত্য-কর্ম থেকেও ব্যাপক প্রচার ছিল বটতলার প্রকাশিত সস্তা পাঁচালি, ধর্মগ্রন্থ, প্রহসন—যেগুলি সহজ চলতি ভাষায় রচিত হত এবং অল্পশিক্ষিত পাঠক-সাধারণের কাছে আদরণীয় ছিল। এদের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ১৮৭৩ সালে বঙ্কিম অভিযোগ করেছিলেন—"সামান্য শিক্ষার বৃদ্ধি হওয়ায়, অল্পশিক্ষিত পাঠকের শ্রেণী বাড়িয়াছে। তাহারা কি পড়িবে?...তাহাদিগের মনোরঞ্জনার্থ এক শ্রেণীর লেখক উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারাও সেই অল্পশিক্ষিত শ্রেণীর লোক—তাহাদের রুচি মার্জিত ও পরিশুদ্ধ হয় নাই—সুতরাং অশ্লীলতা ও কদর্য্যতাপ্রিয় লেখক-পাঠক উভয়ই এক শ্রেণীর লোক..."[১৫]

তাই স্বভাবতই 'মার্জিত ও পরিশুদ্ধ' সাহিত্য রচনার জন্য টাকা খরচ করার দরকার ছিল। নিজস্ব ভাবাবেগের তাগিদে ভাষাসৃষ্টি ও সাহিত্য রচনার বদলে, আর্থিক পারিশ্রমিকের আকর্ষণে সংস্কৃতিচর্চার এইসব নজির থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সমাজের প্রতিপত্তিশালী পৃষ্ঠপোষকেরা ভাষা ও সাহিত্যকে পণ্য হিসেবে দেখতে শুরু করেছেন। কলে-কারখানায় আরো পাঁচটা পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের মতো, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু কলেজের চার দেওয়ালের মধ্যে 'সাধু' বাংলা জন্মলাভ করল ও পরিশীলিত হল। এবং আধুনিক যুগের বিজ্ঞাপন-শিল্পের প্রচারমাধ্যমের কায়দার পূর্বাভাষ দেখা গেল ঐ 'সাধু' বাংলাকে বাজারে বিক্রির প্রচেষ্টায়, পুরস্কার বিতরণ করে সাহিত্যিক ও পাঠক তৈরি করায়।

অন্ত্যজ ভাষা

এই সাহিত্য থেকে শুধু নিম্নস্তরের 'ইতর' ভাষাই নির্বাসিত হল না, এ দেশের জনসাধারণের এক ব্যাপক অংশের ব্যবহৃত ভাষার প্রবেশাধিকার বন্ধ হয়ে গেল। যে আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দগুলি লোকসাহিত্যে প্রচলিত ছিল, সেগুলি যেমন অচ্ছুৎ বলে বিবেচিত হল, পূর্ববঙ্গের মানুষদের কথ্য ভাষাও 'বাঙ্গাল' বলে এখন থেকে কলকাতার শিক্ষিত সমাজে নিন্দিত হতে শুরু হল। পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা এক জাতীয় sub-standard বা নিম্নস্তরের জীব হিসেবে হাসির খোরাক হয়ে হাজির হলেন ভদ্রলোক সমাজে। মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন শৈশবের কথা—"বাঙ্গাল দেখিলে আমরা ঠাট্টা করিতাম ও উৎপাত করিতাম। ...আমরা অনেক গাল দিয়া ছড়া করে পিছনে পিছনে যেতাম।" তারপর শ্রেণিগত অবস্থান থেকে শৈশবের এই উৎপাত সমর্থন করে বলছেন—"তারা ভদ্রলোক ছিল না। যাহাকে বলি বঙ্গজ কায়স্থ, তারা এ শ্রেণীর ছিল না। সেইজন্য তাহাদের প্রতি এমন বিতেষ্টা হয়েছিল...।"[১৬] দীনবন্ধু মিত্রের মতো নাট্যকারেরা 'বাঙাল' নামে এক ধরনের stereotype বা বাঁধাধরা ছাঁচের গোড়াপত্তন করলেও, 'সধবার একাদশী'তে রামমাণিক্যর কথার মধ্য দিয়ে সে-যুগে কলকাতার সমাজে পূর্ববঙ্গের বাসিন্দাদের ভাষাগত বিড়ম্বনার একটা প্রামাণিক ছবি বেরিয়ে আসে—"বাঙ্গাল কউশ ক্যান?—এতো অকাদ্য কাইচি, তবু ক্বলকত্বার মত হবার পারচি না? ক্বলকাত্বার মত না করচি কি? মাগীবারি গেচি, মাগুরি চিকোন দুতি পরাইচি, বাগুিল খাইচি—এতো কর‍্যাও ক্বলকত্বার মত হবার পারলাম না, তবে এ পাপ দেহেতে আর কাজ কি, আমি জলে জাপ দিই...।"[১৭] নাটকে-নভেলে 'বাঙাল' ও তার ভাষা নিয়ে ঠাট্টা দেখে পূর্ববঙ্গবাসী এক পত্রলেখক সমসাময়িক এক পত্রিকায়

অনুযোগ করেন—"আমরা একদিবস সমুদায় ভারতবাসীকে এক পরিবার বলিয়া ভাবি, আবার এদিকে বাঙ্গালীতে বাঙ্গালীতে প্রণয় রাখিতে পারি না।...পূর্ববঙ্গ একদিন গৌরবের স্থান ছিল...স্বীকার করি আজ কলিকাতার ভাষা সুকোমল বলিয়া পরিচিত...কিন্তু তাই বলিয়া কলিকাতার এত গর্বিত হইলে চলিবে না। কলিকাতার ভাবা উচিৎ, কাহারও দিন সমান যায় না।" পত্রলেখক আরও জানাচ্ছেন—"...কলিকাতায় কলেজে চলুন, দেখিবেন, পূর্ববঙ্গের ছাত্রগণ একত্র ভিন্ন বেঞ্চে উপবিষ্ট..."[১৮]

সংস্কৃতাভিমানী হিন্দু বাঙালি সাহিত্যিকদের উপহাসের ও বিদ্রূপবাণের আর-এক লক্ষ্য ছিল বাঙালি মুসলমানদের সাহিত্যকর্ম। পুরোপুরি সংস্কৃত-ঘেঁষা না হলে সে-সাহিত্য অপাঙ্‌ক্তেয় বলে খারিজ হয়ে যেত। রাজশাহীর মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী 'দুগ্ধ-সরোবর' (১৮৯১) নামে একটি গ্রন্থে কুসংস্কারবর্জিত, যুক্তিমূলক উদার ধর্মমত (যা তৎকালীন বাঙালি হিন্দু উদারনৈতিক সমাজ-সংস্কারকদের সহানুভূতি পাওয়া উচিত ছিল) প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন কিছুটা সুফি চিন্তার অনুপ্রেরণায়। কোনো এক সমসাময়িক হিন্দু বাঙালি সংবাদপত্র-লেখক এই বইটি নিয়ে ঠাট্টা করে লেখেন—"মুসলমানের বাবুর্চিখানার পক্ক দুগ্ধ হিন্দুর অস্পৃশ্য, এই জন্য আমরা এ দুগ্ধের আস্বাদ লইতে পারিলাম না।" এই হিন্দু ভদ্রলোকটির বিদ্রূপের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি মুসলমান-সম্পাদিত পত্রিকা লেখে—"বহু শতাব্দী হইতে যে সকল আরবী, পারসী, হিন্দি ইত্যাদি নানা ভাষার শব্দ, নানা কারণে বাঙ্গালার গ্রাম্য অধিবাসীর প্রচলিত ভাষার সহিত রক্তমাংসের ন্যায় মিশিয়া গিয়াছে, সেই সকল শব্দের কিছু কিঞ্চিৎ 'দুগ্ধসরোবরে' ব্যবহার করা হইয়াছিল।"[১৯]

মীর মশাররফ হোসেন পার পেয়ে গিয়েছিলেন, সংস্কৃত-মিশ্রিত সাধু বাংলা ভাষায় লেখার জন্য। তাঁর 'গোরাই ব্রিজ বা গৌরী সেতু' (১৮৭৩) কাব্যগ্রন্থটি সমালোচনা করতে গিয়ে 'বঙ্গদর্শন' তাঁর পিঠ চাপড়ে লেখে : "তাঁহার রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না। ...ভরসা করি, অন্যান্য সুশিক্ষিত মুসলমান তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইবেন।"[২০] তাঁর প্রথম বই 'রত্নাবলী' (১৮৬৯) পড়ে তো 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার সমালোচক সন্দেহই প্রকাশ করেছিলেন যে এটি কোনো হিন্দু লেখক মুসলমানের ছদ্মনামে রচনা করেছেন![২১]

তাই দেখা যাচ্ছে উনিশ শতকের মধ্যবর্তী দশকের ভিতরই শিক্ষিত বাঙালি সমাজের যে সাহিত্যিক বাংলা তৈরি হয়ে গেছে, তার মূল অবয়ব সংস্কৃতকে অবলম্বন করে, এবং দেশজ, তদ্ভব ও প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দগুলি—যেগুলি ব্যাপক বাঙালি সমাজ ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল—সেগুলিকে সযত্নে পরিহার করে।[২২] অতীত হিন্দু সমাজে

শূদ্রের বেদ অধ্যয়নে অনধিকারের সূত্র ধরে, এই সাহিত্যিক সাধু বাংলাকেও অনতিক্রম্য করা হল এমনভাবে যাতে ব্যয়বহুল শিক্ষা ও অনুশীলন ছাড়া এ ভাষা কোনোমতেই আয়াসসাধ্য হবে না। এ ভাষায় কাদের অধিকার সম্ভব, তা রামমোহন রায়ও এ শতকের শুরুতেই নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন—"যাঁহাদের সংস্কৃতে বুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাহারা বুৎপন্ন লোকদের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক।"[২৩] সুতরাং, এ ভাষার শ্রেণিচরিত্র বেশ স্পষ্ট। অতীতের সামন্ততান্ত্রিক হিন্দু সমাজের সংস্কৃতজ্ঞ উঁচু জাতের লোকেরা যাঁরা ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় উনিশ শতকের কলকাতার শিক্ষাজগতে করে খাচ্ছেন, এবং অন্যান্য সৌভাগ্যান্বেষণী, করিৎকর্মা লোকেরা যাঁরা তাঁদের নব্যপ্রাপ্ত অর্থবলে 'ব্যুৎপন্ন লোকদের সহিত সহবাসে' সক্ষম—অর্থাৎ হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, ইত্যাদি শিক্ষায়তনে তাঁদের ছেলেদের পড়াতে পারেন—এঁদের জন্যই সাধু বাংলা ভাষা।

কলকাতা-কেন্দ্রিক শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রদায় তাদের নিজেদের স্বার্থে যে সাধু ভাষার পত্তন করল, তার নাগাল ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। ব্যাপক বাঙালি সমাজে ব্যবহৃত বাংলা ভাষা—বা বিভিন্ন অঞ্চলে অনুসৃত dialect বা আঞ্চলিক বাচনভঙ্গি—এ সাধু ভাষার দ্বারা বড়ো একটা প্রভাবান্বিত হয়নি। যে 'অসংখ্য নীচ বিকলাঙ্গ বঙ্গভাষার শব্দবৃন্দ' সরস্বতী দেবীর দরবারে গিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গিয়েছিল, তাদের অনেকেই কিন্তু এখনও কথ্য বাংলা ভাষায় হয় আদিম বা কিছুটা পরিবর্তিত রূপে বহাল তবিয়তে বর্তমান। ১৮২৩-এ প্রকাশিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' বইটিতে, বিদেশি আগন্তুক 'যাবনিক (অর্থাৎ আরবি-ফারসি) ভাষার' প্রায় শ'দু-য়েক শব্দের যে তালিকা তৈরি করেছিলেন, তার প্রায় ৯৯ শতাংশ এখনও এদেশের কথ্য ভাষায় (এবং এমনকি লিখিত সাহিত্যেও কখনো-কখনো) প্রচলিত—তাদের 'সাধু ভাষায়' প্রতিশব্দ থাকা সত্ত্বেও।[২৪] 'কল', 'কলম', 'কড়া', 'খরচ', 'খাড়া', 'খুন', 'গরজ', 'ঘুম', 'তাগাদা', 'মজলিস', 'আজব'—ঐ তালিকা থেকে যথেচ্ছভাবে যে-কোনো শব্দ বাছলেই দেখতে পাই যে ওগুলি কথ্য এবং লিখিত বাংলাতেও বেশি ব্যবহৃত, ওদের সংস্কৃতাশ্রয়ী সাধু প্রতিশব্দ ('যন্ত্র', 'লেখনী', 'কঠিন', 'ব্যয়', 'দণ্ডায়মান', 'হত্যা', 'আবশ্যক', 'নিদ্রা', 'শীঘ্র', 'সভা', 'আশ্চর্য')-এর বদলে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ভবানীচরণ আক্ষেপ করেছিলেন—"ভদ্রলোকের মধ্যে অনেক লোক স্বজাতীয় ভাষায় অন্য জাতীয় ভাষা মিশ্রিত করিয়া কহিয়া থাকেন...ইহাতে বোধ হয় সংস্কৃত শাস্ত্র ইঁহারা পড়েন নাই এবং পণ্ডিতের সহিত আলাপও করেন নাই। তাহা হইলে এতাদৃশ বাক্য

ব্যবহার করিতেন না স্বজাতীয় এক অভিপ্রায়ের অধিক ভাষা থাকিতে যাবনিক ভাষা ব্যবহার করেন না।''[২৫]

'সাধু' সমাজের দোটানা

ভবানীচরণ যে 'অন্য জাতীয় ভাষা' নিয়ে আক্ষেপ করেছিলেন, বা জয়গোপাল যে 'ইতর ভাষার' অনুপ্রবেশ নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন, তার প্রতি কিন্তু বাঙালি ভদ্রলোক সাহিত্যিকদের একটা গোপন আকর্ষণ ছিল ঐ যুগে। নিজেদের সাহিত্য-রচনায় যে আড়ষ্ট, কৃত্রিম ভাষা ও কষ্টকল্পিত অলঙ্কার ব্যবহার প্রায় অবশ্যকরণীয় ছিল, তার তুলনায় 'ইতর' সমাজের সংস্কৃতিচর্চার স্বচ্ছন্দতা আর হৃষ্ট-পুষ্ট, মনখোলা রসিকতায় তাঁরা মাঝেমধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু-সেবনের সুযোগ খুঁজতেন। কলকাতার রাস্তা-ঘাটে পথচলতি সাধারণ মানুষের কথাবার্তা, বাজারে মেছুনীর ঠাট্টামস্করা, কলকাতায় বা গঙ্গায় স্নান করার পথে মেয়েদের ঝগড়াঝাঁটি, গোপাল উড়ের যাত্রার গান বা দাশু রায়ের পাঁচালী— এই সবের ভাষায় যে প্রত্যক্ষ ভাবপ্রকাশের বা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের ব্যাপক অবকাশ ছিল, 'সাধু' ভাষায় রচিত মার্জিত সাহিত্যে তার পথ বন্ধ ছিল। মনে মনে ভদ্রলোক সাহিত্যিকেরা এটা স্বীকার করতেন। তাই দেখা যায়, উনিশ শতকের অধিকাংশ নামজাদা বাঙালি সাহিত্যিকেরাই 'ইতর' ভাষার প্রতি যেন একটা অবৈধ প্রণয়ের আকর্ষণে জড়িয়ে পড়েছিলেন। 'সাধু' ভাষায় তাঁদের সাহিত্য-রচনা যেন সমাজের বিধিসম্মত পরিণীতা গৃহিণী; আর 'ইতর' ভাষা ব্যবহার করার তাঁদের সাময়িক ঝোঁকটা ছিল যেন বিধিসম্মত জীবনযাত্রার আবহাওয়া থেকে কিছুক্ষণের জন্য বার হয়ে এসে একটু দম নেওয়া। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের অনুবাদ করলেন পুরোপুরি সংস্কৃতাশ্রয়ী 'সাধু' বাংলায়। তার পাশাপাশিই লিখলেন 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'—একেবারে কলকাতার তদানীন্তন slang-এ, যে slang তাঁদের লেখায় স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে আজকের সাহিত্যিকেরা কুণ্ঠাবোধ করেন। চমক লাগাবার জন্য হয়তো 'আনন্দবাজার' পত্রিকার পোষ্য কবি-গল্পলেখকেরা চলতি যৌনাত্মক শব্দ ব্যবহার করেন কারণে-অকারণে। কিন্তু ক'জন এমন সহজভাবে লিখতে পারবেন—

> ''আজকাল সহরের ইংরাজি কেতার বাবুরা দুটি দল হয়েছেন। প্রথম দল 'উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বষ্ট্'।...টেবিলে খান, কমোডে হাগেন, এবং কাগজে পোঁদ পোঁচেন।''[২৬]

মাইকেল তাঁর বিরাট বিরাট মহাকাব্য লিখলেন সংস্কৃতঘেঁষা বাংলায় ও ইংরেজি blank verse-এর অনুকরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দে। সঙ্গে সঙ্গে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে

রোঁ' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় চালু কথ্য বুলির মিছিল বার করে দিলেন। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী', 'জামাই বারিক' বা 'লীলাবতী' নাটকে মেয়ে চরিত্রদের কথোপকথনে সে-যুগের কথ্য ভাষায় তাদের আশা-আকাঙক্ষা, রঙ্গ-রসিকতা, রাগ-বিদ্বেষের যে অবারিত অভিব্যক্তি, তা শুনলে আজকের মহিলা দর্শক কেন, পুরুষরা পর্যন্ত কানে আঙুল দেবেন—তথাকথিত মার্জিত রুচিতে আমরা এতদূর শিক্ষিত হয়ে উঠেছি! দু-একটা নমুনা দিচ্ছি—

ভবী (ময়রাণী) : কামিনি, নাতিনি, সতিনী আমার তুই, তোর ঠাকুরদাদায় রেখে মাঝে তিন জনাতে এক বিছানায় শুই।

কামিনী : মরণ আর কি কত সাধই যায়।

ভবী : একবার দেখি, বুড়ো তোকে নেয় কি আমায় নেয়।

কামিনী : 'মুড়কিমুখী ময়রা দিদি নবীন বয়েস তোর,
ছোট্টো মাজা, নিরেট বাঁজা, বড় কপাল জোর।'
তোকে ছেড়ে কি আমায় নেবে?

ভবী : নিলেও নিতে পারে।

কামিনী : কেন লো?

ভবী : ভাতার যে তোর মনে ধরে নি।[২৭]

এমনকি বঙ্কিমও, যিনি কথায় কথায় 'অশ্লীলতাদোষে' অভিযুক্ত করতেন সমসাময়িক ও অতীত সাহিত্যিকদের, এই 'ইতর' ভাষার জাদুমন্ত্র থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। *বিষবৃক্ষ*-এ মাতাল দেবেন্দ্রর মুখে এই গানটির ভাষা থেকে বোঝা যায় বঙ্কিম সেযুগের নিচুতলার রসের গান-বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন—

আমার আঁটা ঘরে সিঁধ মেরেছে
কোন ডাকাতের এ ডাকাতি
যৌবনের জেলখানাতে রাখবো তারে দিবারাতি
মন বাক্‌শ তার লজ্জা তালা,
কল কোরে তার ভাঙ্গলে ডালা,
লুটে নিলে প্রেমনিধি তার,
ভাঙ্গা বাক্‌শে মেরে নাতি।[২৮]

যদিও, সমসাময়িক বাউলদের দেহতাত্ত্বিক রূপকে কথাগুলিকে সাজিয়েছিলেন বঙ্কিম, এ গানের ভাষা ছিল কলকাতার 'ইতর' সমাজের। এতটা সাহস দেখিয়েও কিন্তু বঙ্কিম পরে পিছিয়ে গিয়েছিলেন। *বিষবৃক্ষ*-এর পরবর্তী সংস্করণ থেকে এই গানটি তিনি বাদ দিয়েছিলেন।

কিন্তু 'ইতর' ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সমসাময়িক বাঙালি ভদ্রলোক সাহিত্যিকদের যে দ্বিধাজড়িত মনোভাব, একাধারে অস্বস্তি ও আকর্ষণের সহাবস্থান, তার সবচেয়ে আন্তরিক স্বীকৃতি পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যেই, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংকলনের ভূমিকাতে। একদিকে 'সাধু' ভাষার সাহিত্যসেবী ভদ্রলোক সমাজ ও অন্যদিকে 'ইতর' ভাষার বাংলা লোকসাহিত্যের শিল্পী—এই দুই-এর মধ্যে শেষ যোগসূত্র ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। শিক্ষিত, ভদ্রলোক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও, ঈশ্বর গুপ্ত অল্পবয়সে 'ইতর' সমাজের আদৃত কবিয়াল, পাঁচালীকার, এদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কাব্যসাহিত্যে তাঁর হাতেখড়ি পান। পরবর্তী জীবনে *সংবাদ প্রভাকর* সম্পাদনার সঙ্গে সঙ্গে, এই সব অতীত লোককবিদের গান সংগ্রহ করে তিনি চিরকালের মতো আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়ে রয়েছেন। তাঁর রচিত কবিতাতেও এই লোকসংস্কৃতির ধারার ঐতিহ্য পাওয়া যায়। তাঁর কবিতা সংগ্রহ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সেই যুগের শিক্ষিত বাঙালি সাহিত্যিক (যাঁরা তখনও লৌকিক ভাষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে ছিলেন)-দের দ্বৈধভাবের এক চমৎকার ছবি তুলে ধরেছিলেন—"খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি।" তারপরই কিন্তু বঙ্কিম সাবধান করে দিচ্ছেন—"এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই।...আমরা 'বৃত্রসংহার' (হেমচন্দ্রের) পরিত্যাগ করিয়া 'পৌষপার্ব্বণ' (ঈশ্বর গুপ্তের) চাই না।" পরক্ষণেই স্বীকার করছেন—"কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌষপার্বণে যে একটা সুখ আছে—বৃত্রসংহারে তাহা নাই। পিঠাপুলিতে যে একটা সুখ আছে, শচীর বিম্বাধর-প্রতিবিম্বিত সুধায় তাহা নাই।...এই খাঁটি বাঙ্গালাটি, এই খাঁটি দেশী কথাগুলি মার প্রসাদ...।" এসব স্বীকার করেও কিন্তু বঙ্কিম যখন এই 'মার প্রসাদ' ছাপাবার উদ্যোগ করলেন, তখন দেখলেন যে "ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মাত্মা, কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালী। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অশ্লীল।" অতএব, পরিশীলিত, মার্জিত, শিক্ষিত বাঙালি পাঠকের জন্য ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংশোধন করা দরকার। তাই, "আমরা তাহা (অশ্লীল অংশ) সব কাটিয়া দিয়া, কবিতাগুলিকে নেড়ামুড়া করিয়া বাহির করিয়াছি।"[২৯]

এ প্রসঙ্গে বোধ হয় এটা বলা ভুল হবে না যে বঙ্কিম ও দীনবন্ধুর মতো ইংরেজি ও সংস্কৃত শিক্ষিত 'সাধুজন'দের সাহিত্যকর্মে 'ইতর' বাংলার প্রতি পক্ষপাতিত্বের আকস্মিক যেসব নমুনা পাই, তার সূত্র ঈশ্বর গুপ্তের কাছে উভয়ের সাহিত্যিক হাতেখড়ি। দীনবন্ধু যখন হিন্দু কলেজে ও বঙ্কিম যখন হুগলি কলেজের ছাত্র, তখন থেকেই

সংবাদ প্রভাকর-এ গুপ্ত কবির কায়দায় স্বচ্ছ, সরল, কথ্য বাংলা ভাষায় কবিতা লিখতে এঁরা অভ্যস্ত হন।

উপসংহার

'ইতর' বাংলা ও 'সাধু' বাংলার মধ্যে টানাপোড়েনের সম্পর্কটা, নিম্নবর্গের বাঙালিদেরও অস্থির করে তুলেছে। নিরক্ষর সম্প্রদায় বা অল্পশিক্ষিত মানুষ তাঁদের নিজেদের মতো করে 'সাধু' বাংলাকে ভেঙেচুরে প্রয়োগ করেছেন কথায়-বার্তায় বা চিঠিপত্রে। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতি লিখতে গিয়ে বলছেন—"হাড়ী, বাগ্‌দি, দুলেরা পর্যন্ত সাধু ভাষা ব্যবহার করিত। তাহারা বলিত, 'না বাবু, অত আর ফনিভাষ্যি করতে হবে না', অর্থাৎ বৃথা বাগাড়ম্বর করিয়া তর্কজাল বিস্তার করিতে হইবে না।"[৩০] 'ফনিভাষ্যি'—সে-যুগের বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ফণীভূষণ তর্কবাগীশের প্রতি বক্রোক্তি। ১৮৭০ সালে দামোদরের বন্যার ফলে হুগলি জেলার গ্রামের দুরবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে একটি কৃষক যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা লক্ষণীয়—"...মাঠ ও গ্রাম ইত্যাদি প্রতি বৎসর উক্ত নদীর জলে ইস্তক জষ্ঠী আশাড় লাগায়েত আস্বিন ও কার্ত্তিক মাহা (মাস) এককালিন ডুবিয়া থাকে...হাটের ঘাটের ও বাজার ইত্যাদি আবিস্বকে (আবশ্যকে) ডুঙ্গা বেতিতে জায়া (যাওয়া) হয় নাই। তাহাও যদি জলে তুফান হয় তবে অক্লেশে তাহাদের উপবাস হয়; এ বাড়ী হইতে সে বাড়ী জাইবার ক্ষ্যামতা থাকে না।..."[৩১]

হয়তো এই জাতীয় বাংলা লেখা বা বলার প্রবণতা এসেছিল নিম্নবর্গের কিছু মানুষের জাতে ওঠার, 'ভদ্রলোক' সমাজে প্রবেশলাভের প্রচেষ্টা থেকে। ঠিক যেমন বাঙালি 'বাবু'রা ইংরেজি মিশ্রিত বাংলা বলে চমকে দিতে চাইতেন নিজেদের সম্প্রদায়ের অন্যান্যদের এবং ভুল ইংরেজি বলে ইংরেজ প্রভুদের খুশি করার চেষ্টা করতেন। সমাজের ওপরকাঠামোতে জায়গা করে নেবার সেই একই প্রবণতা, ভাষাকে ব্যবহার করে।

বলাবাহুল্য, 'ইতর' জনদের এই 'সাধু' ভাষার চর্চার চেষ্টাটা ভদ্রলোকদের ঠাট্টার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল (ঠিক যেমন সে-যুগের ইংরেজরা Babu English নিয়ে ঠাট্টা করত)। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেবেলাকার গৃহভৃত্য ঈশ্বর সম্বন্ধে লিখছেন—"তাহার সাধুভাষার প্রতি লক্ষ করিয়া গুরুজনেরা আড়ালে প্রায়ই হাসিতেন।...'অমুক লোক বসে আছেন' না বলিয়া সে বলিয়াছিল 'অপেক্ষা করছেন'। তাহার মুখের এই সাধুপ্রয়োগ আমাদের পারিবারিক কৌতুকালাপের ভাণ্ডারে অনেকদিন পর্যন্ত সঞ্চিত ছিল।"[৩২]

এ প্রসঙ্গে একটা পুরোনো গল্প মনে পড়ল। দেরিতে হাজির হবার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে কোনো এক গৃহভৃত্য তাঁর বাবুকে বলেছিলেন—"আজ্ঞে, ভোজন করছিলাম।" আর যায় কোথা! বাবু চোখ পাকিয়ে বললেন—"তোর আস্পর্ধা তো কম নয়! তুই ব্যাটা ভোজন করবি কি রে? ভোজন করি আমরা, ভদ্রলোকেরা, আর তোরা তো গিলিস্ কেবল গোগ্রাসে!"

ভাষার ব্যবহারে শ্রেণিবিভাগটা ভদ্রলোক সমাজ তাই খুব সতর্কতার সঙ্গে মেনে চলতেন। নিজেদের লেখায় এই স্থিরীকৃত ভাষাগত বিভাজনের হেরফের হলেই, সমালোচকেরা চিৎকার করে উঠতেন—'গুরুচণ্ডালী' দোষ হয়েছে বলে। জানি না অন্য আর কোন্ ভাষায় শ্রেণিভেদ এত কঠিনভাবে নিয়মবদ্ধ এবং সর্বব্যাপী হয়ে আছে। বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়াপদ—সর্বত্রই 'ইতর' ও 'সাধু'—এই দুই শ্রেণির জন্য ভিন্ন শব্দ। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর ভৃত্যের বেলায়—'সে বলিয়াছিল'; কিন্তু গুরুজনেরা সে কথা শুনে 'আড়ালে প্রায়ই হাসিতেন'। প্রভু-ভৃত্য, সাধু-ইতর—এই দুই-এর জন্য ভিন্ন প্রত্যয় ব্যবহারের এই নিয়মটা আমাদের এত গা-সওয়া হয়ে গেছে যে আজকের এই সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক যুগেও আমরা আমাদের কথাবার্তায় এই শ্রেণিভিত্তিক অসঙ্গতিটা খেয়াল করি না। তাই, সরস্বতীর 'ইতর সন্তান'দের সপক্ষে লিখতে গিয়েও, এ প্রবন্ধে সে-সন্তানদের সবসময় স্থান দেবার পরিবর্তে 'সাধু' সন্তানদেরই বেশি জায়গা দিয়ে ফেলেছি দেখছি। ঔপনিবেশিক আমলে ভাষা-শিক্ষার ভূতটা ঘাড় থেকে নামতে এখনও অনেক দেরি।

টীকা

১. অলোক রায় সম্পা. (১৯৭৬), পৃ. ২৫।

২. ঐ, পৃ. ২৭।

৩. দ্রষ্টব্য : Suniti Kr. Chatterji.

৪. দীনেশচন্দ্র সেন, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৩০।

৫. সুশীলকুমার দে, পৃ. ৫৪।

৬. দীনেশচন্দ্র সেন (১৩৫৬), পৃ. ২৭৩।

৭. 'বঙ্গভাষা কিরূপে এরূপ হইল', *গ্রামবার্তা প্রকাশিকা,* শ্রাবণ ১২৮৮।

৮. সজনীকান্ত দাস, পৃ. ৩২।

৯. *বেদান্ত চন্দ্রিকা* (রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে বেনামে প্রকাশিত) ১৮১৭, উদ্ধৃত—মনোমোহন ঘোষ, (১৯৫৫), পৃ. ২২৮।

১০. ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জয়গোপাল তর্কালঙ্কার' (*সাহিত্যসাধক চরিতমালা*, খণ্ড ২, ১৩ ও ১৭, পৃ. ৬১)।
১১. সজনীকান্ত দাস, 'উইলিয়াম কেরি' (*সাহিত্যসাধক চরিতমালা*, খণ্ড ১৫, পৃ. ৪১)।
১২. দ্রষ্টব্য : —'...তাঁহার (রামমোহনের) সময়ের পর বঙ্গভাষায় যে কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা সংস্কৃত নিয়মের সংরক্ষণার্থেই হইয়াছে বলিতে হইবেক...' (*বিবিধার্থ* সংগ্রহ, বৈশাখ, ৪৯ খণ্ড, ১৭৮০ শকাব্দ; আনুমানিক ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ)।
১৩. *এডুকেশন গেজেট*, ৮/১/১২৭৮; বিনয় ঘোষ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯৫।
১৪. *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, কার্ত্তিক ১৮০১ শক; দ্রষ্টব্য—ঐ; পঞ্চম খণ্ড; পৃ. ৬৭।
১৫. *বঙ্গদর্শন*, পৌষ ১২৮০।
১৬. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ৮৯-৯০।
১৭. দীনবন্ধু মিত্র, *সধবার একাদশী*।
১৮. *সাধারণী*, ১৬ই ফাল্গুন ১২৮২।
১৯. *নুর-অল-ইমান*, শ্রাবণ ১৩০৭।
২০. *বঙ্গদর্শন*, ভাদ্র ১২৮৩।
২১. আনিসুজ্জামান, পৃ. ১৯৮।
২২. পরমেশ আচার্য, 'বাংলা পড়ার বই আর বাঙালি ভদ্রলোক', *বারোমাস*; মার্চ ১৯৮৫।
২৩. রামমোহন রায়, *বেদান্ত গ্রন্থ* (১৮১৫)। উদ্ধৃত—সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, পৃ. ২৮।
২৪. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১১৩-২০।
২৫. ঐ, পৃ. ১১৩।
২৬. কালীপ্রসন্ন সিংহ, পৃ. ৯।
২৭. দীনবন্ধু মিত্র, *জামাই বারিক*।
২৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বিষবৃক্ষ*, (*বঙ্গদর্শন*-এ প্রথম প্রকাশিত)।
২৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' (দ্রষ্টব্য : *ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী*; পৃ. ৪০৩-৪২৫)
৩০. দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, *স্মৃতিরেখা*, পৃ. ৩৬।
৩১. *সুলভ সমাচার*, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৭।
৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, পৃ. ২৩।

বাঈনাচ বনাম খেমটা
উনিশ শতকের বাংলা সংস্কৃতিতে শ্রেণি-বৈষম্য

১

শিরোনামাতে যে-দুটি নৃত্যশৈলীর উল্লেখ আছে, বর্তমান আলোচনাটা তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছি না। কিন্তু উনিশ শতকের বাংলা দেশে উপরোক্ত দুটি জনপ্রিয় নাচের ঢং তদানীন্তন বাংলা সংস্কৃতির দুটি ভিন্ন ধারার সংঘাতকে এক অর্থে চুম্বকাকারে তুলে ধরে। এই কারণেই শুরুতে এই ভিন্নধর্মী দুটি নাচের উৎস ও অনুশীলনকারিণীদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলে নেওয়া দরকার।

যদিও এ যুগের কিছু বিশেষজ্ঞ বাঈ নাচ ও খেমটা নাচকে অনেক সময়ই একই পঙ্‌ক্তিভুক্ত করেছেন[১], ঊনবিংশ শতাব্দীর পৃষ্ঠপোষকেরা কিন্তু দুটির স্বতন্ত্র চরিত্র সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন* খেমটার নিন্দে করতে গিয়ে লিখেছিল—"খেমটা বাঙ্গালার নৃত্য; বাইদিগের নৃত্য মহারাষ্ট্রীয়। খেমটা তান্ত্রিক, মহারাষ্ট্র নৃত্য পৌরাণিক। পুরাণের ন্যায় এই নৃত্যের গাম্ভীর্য্য আছে।"[২] খেমটার বিরুদ্ধে বিষোদগার ও বাঈ নাচের সমর্থনে কৈফিয়ত পাচ্ছি সমসাময়িক আর একটি সংবাদপত্রের মন্তব্যে—"বঙ্গভাষায় নাটক অভিনয়ের আর যে কোন উদ্দেশ্য থাকুক নীচ ভাবোদ্দীপক জঘন্য

খ্যামটা নাচ সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করা একটা প্রধান লক্ষ লওয়া উচিত। বাঈ নাচ থাকিলে ক্ষতি নাই।"[৩] মনোমোহন বসু সম্পাদিত *মধ্যস্থ*, "উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় বাঈ সম্প্রদায়ের...সুশিক্ষিতা নর্তকীদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছিল যে এঁদের 'নৃত্যকৌশল, গীতির ভাবানুযায়ী হাবভাব, অঙ্গভঙ্গি, ভ্রূকুটী প্রভৃতি যথার্থ ভাবুক লোকে দেখিলে বিস্ময়োৎফুল্ল না হইয়া থাকিতে পারেন না।"[৪]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণির বাঈ নাচ ও খেমটা নাচ সম্বন্ধে এই যে বৈষম্যমূলক মনোভাব, এ প্রায় পরম্পরাগত হয়ে আজও আমাদের মধ্যবিত্ত মানসে সক্রিয়। বাঈজীরা সমাজে কুলত্যাগিনী বলে বিবেচিত হলেও, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি মনে, তাদের সঙ্গে জড়িত রয়েছে এক ধরনের রাজকীয় আভিজাত্যের অনুষঙ্গ। শরৎচন্দ্র তাঁর রাজলক্ষ্মীকে খেমটাওয়ালি বানাতে পারলেন না; এক জাঁকজমকপূর্ণ মোগলাই জগতের বাঈজীতে পরিণত করলেন। খেমটার প্রতি আমাদের মনে সঞ্চিত রয়েছে অবজ্ঞা—"ছোটলোকের আমোদ, কোমর দুলিয়ে হালকা নাচের ভাবমূর্তি," পূর্বোদ্ধৃত *বঙ্গদর্শন*-এর ভাষ্য অনুযায়ী "কেবল দেহের মধ্যভাগের সঞ্চালনজনিত দেহের যে ঘৃণিত আন্দোলন।"

অথচ, নিরাবেগে, যুক্তি দিয়ে বিচার করতে গেলে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে—হালকা, চটুল ভঙ্গি কি বিভিন্ন লোকনৃত্যে প্রায়ই দেখা যায় না? যৌথ জনজীবনের আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ হয়ে কি এরা চিরকালই সব দেশে ছিল না? আফ্রিকার উপজাতি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যাশ্রয়ী নাচের ঢং ভেঙে আধুনিক পাশ্চাত্যের জনপ্রিয় যে-সব নৃত্যশৈলী গড়ে উঠেছে, তাতে কি খেমটা বা ঝুমুর নৃত্যের দ্রুত তালের লঘু মেজাজের প্রতিধ্বনি পাই না? এটা নৃত্যশিল্প বিশারদদের গবেষণার এক্তিয়ার। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর এই শেষ পর্বে পৌঁছে আজ ভেবে দেখা দরকার—বিজাতীয় শিক্ষাপ্রণালীর আলোকে আমরা আমাদের অতীত লোকসংস্কৃতির যে-সব উপাদানগুলিকে এতদিন ধরে কুরুচিপূর্ণ বলে অবজ্ঞা করে এসেছি, সেগুলিকে খোলামনে বিচার করব না কেন? বিশেষ করে যখন দেখতে পাই, উনিশ শতকের ভদ্রলোকদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু শুধু খেমটা ছিল না, সে-যুগের প্রায় সমস্ত লোক-সংস্কৃতির উপাদানগুলিই—কবিগান, যাত্রা, পাঁচালি, তরজা কথকতা—তখন স্বভাবতই প্রশ্ন আসে: কী কারণে এগুলিকে 'অশ্লীল' বলে চিহ্নিত করা হলো এবং কেন একে একে এগুলি নিশ্চিহ্ন হলো?

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই আমরা দেখতে পাই, সে-যুগের কলকাতার নব্যধনী পরিবারে বাঈ নাচের প্রচলন। উত্তর-ভারতের পতনোন্মুখ মোগল রাজদরবার থেকে এই নর্তকীদের অনেকেই চলে আসেন নতুন মহানগরী কলকাতায় পৃষ্ঠপোষকদের

সন্ধানে। Mrs. Belnos-এর মতো ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীদের বহু ছবিতে এই-সব নৃত্যপটীয়সীদের 'অঙ্গভঙ্গি, ভ্রূকুটী' ইত্যাদির আভাস পাওয়া যায়। ঘাঘরার চওড়া ঘেরের দুই কোণ দুই হাতে ধরে, সারেঙ্গীর সুরের তালে মৃদু পদসঞ্চালন ছাড়া আর কোনো বৈচিত্র্য ছিল বলে মনে হয় না এঁদের নাচে। খ্রিস্টীয় ধর্মযাজক হেবারের স্ত্রীর বর্ণনানুযায়ী এই নৃত্যশৈলীতে থাকে বাহু, মস্তক এবং দেহের কষ্টসাধ্য সঞ্চালন; আর সর্বদা শ্লথ গতিতে অস্থির পদযুগল কদাচিত স্থান পরিবর্তন করে...[৫] তাঁদের পোশাক সম্বন্ধে শ্রীমতী হেবারের মন্তব্য—"তাদের পোশাক তো যেন শালীনতার প্রতিমূর্তি" উদ্ধৃত করে পরবর্তী যুগের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের পত্রিকা *হিন্দু পেট্রিয়ট*, বাঈ নাচের উপর ব্রাহ্ম সমাজ-সংস্কারকদের আক্রমণ রুখতে গিয়ে বলেন "আমরা মানি ভারতীয় নাচ প্রাণহীন, কিন্তু তাতে কামুকতা বা দুর্নীতির চিহ্ন মাত্র নেই।"[৬]

অবশ্য বাঈজীদের মধ্যে যাঁরা তদানীন্তন ইউরোপীয় পর্যটকদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশংসা পেয়েছিলেন তাঁরা অধিকাংশই গায়িকা-রূপে পরিচিতা। রামমোহন রায় প্রভৃতি বাঙালি ধনী পৃষ্ঠপোষকদের বাড়িতে নিমন্ত্রিত ইউরোপীয় শ্রোতারা 'নিকি'-র কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তখনকার ইতালীয় অপেরা-গায়িকা Angelica Catalani (১৭৮০-১৮৪৯) ও জর্মান গায়িকা Elizabeth Billington (১৭৬৮-১৮১৮)-এর তুলনা করতেন। এই দুই ইউরোপীয় soprano-র মতো 'নিকি'র গলা খেলত উচ্চ সপ্তকে।

শোভাবাজারের রাজকৃষ্ণ দেব, জোড়াসাঁকোর সিংহী পরিবার, সিমলের দে-রা দুর্গাপূজার সময় এই-সব বাঈ নর্তকীদের দৈনিক ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা প্রণামী দিয়ে নিযুক্ত করতেন।[৭] যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে, এই-সব রাজা-রাজড়ারা আর ছিলেন না, ঐ-সব বাঈ নর্তকী ও তাঁদের বংশধরেরা তখনো কলকাতায় আসর জমিয়ে বসে ছিলেন। দুর্গাচরণ রায়ের 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন'-এ (১৮৮৯) খবর পাচ্ছি তখনকার দিনের "বাঈওয়ালির মধ্যে ইলাহিজান...বিখ্যাত।" সঙ্গে সঙ্গে যোগ করা হচ্ছে—"খেমটাওয়ালিদের মধ্যে হরিদাসী ও কামিনী বিখ্যাত।" পৃথকীকরণের চেষ্টাটা লক্ষণীয়। পুজোয় এবং বিবাহ উপলক্ষে, গ্রামাঞ্চলে জমিদার ও ধনীগৃহে এ শতাব্দীর শুরুতেও এঁদের বায়না দিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো।

যদিও ব্রাহ্ম সমাজের নেতারা খেমটার সঙ্গে সঙ্গে বাঈ নাচেরও বিরোধিতা করতেন, ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির অধিকাংশের কাছেই বাঈ নাচ তার বনেদি, রাজদরবার-সম্পর্কিত উৎসের জন্য পার পেয়ে গিয়েছিল। 'বঙ্গদর্শন' ও 'মধ্যস্থ'-র মতো নব্যশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মুখপত্রের চোখে বাঈ নাচ শুধু রুচিসম্মত বলেই বিবেচিত হয়নি, 'পৌরাণিক গাম্ভীর্য্য'-র পরিচায়ক বলে সম্মানিত হয়েছে।

অভিজাতবর্গের আশীর্বাদপুষ্ট বাঈ নাচ থেকে খেমটার উৎস ছিল স্বতন্ত্র। সেই সময়কার ইউরোপীয় চিত্রকর পর্যটক, যাঁরা উত্তর-কলকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহাঙ্গনে নৃত্যরতা বাঈজীদের এঁকেছিলেন, তাঁদের ছবিতে খেমটাওয়ালিদের সাক্ষাৎ মিলবে না। তার সন্ধানে যেতে হবে বটতলার বাঙালি কাঠখোদাই চিত্রে—যেখানে শাড়ি-পরিহিতা দুই নর্তকীর ক্ষিপ্রগতি অঙ্গ সঞ্চালনে খেমটার পরিচয় মেলে। ১৮৬৩-তে প্রকাশিত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'তে পাই এক বাবুর বাগানবাড়িতে "খেমটাওয়ালিরা একের পা, দু-এর পা, ছে পকা, কাওয়ালী, আড়খেমটা প্রভৃতি নেচে, বেদেনি, উড়েনি ও মগের নাচ পর্যন্ত নাচ্চে, চারিদিক থেকে রুমাল পোড়চে।"[৮] বাঈ নাচের মাত্র কয়েকটি মুদ্রার সীমাবদ্ধ চৌহদ্দি থেকে খেমটার নাচের ব্যাপ্তিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ মুক্তাচরণের সুযোগ বেশি ছিল বলে মনে হয়।

যদিও শহুরে হঠাৎ বড়োলোক বাবুদের (ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর জমিদার-বেনিয়ান ও তৎপরবর্তী ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণি থেকে এই মুৎসুদ্দি জাতীয় মানুষগুলির রুচি ছিল স্বতন্ত্র; ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' দ্রষ্টব্য) পৃষ্ঠপোষকতাকেই কলকাতার সমাজে খেমটার প্রতিপত্তি, এই নাচের দ্রুত তাল, সজীবতা ও improvisation বা উপস্থিত-মতো উপাদান নিয়ে নতুন করে সেজে ঢেলে উপস্থাপনার সুযোগ দেখে মনে হয় এর উৎস ছিল গ্রামীণ লৌকিক নৃত্য। পশ্চিমবাংলা-বিহার সীমান্তে যে ঝুমুর গান ও নাচ প্রচলিত আছে, তার সঙ্গে খেমটার সম্পর্ক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় লক্ষ করেছেন।[৯] গুরুসদয় দত্তের *The Folk Dances of Bengal*-এ ঝুমুরের যে ছবি আছে তাতে দেখা যায়, শাড়ির কোনা ধরে বা কোমরে এক হাত দিয়ে, আর এক হাত তুলে তুড়ি দেওয়ার ভঙ্গি—অনেকটা বটতলার চিত্রের নর্তকীদের মতো।

এই লোকনৃত্যের ধারা অনুযায়ীই খেমটা, নারী ও পুরুষ, উভয়েরই নৃত্যভঙ্গিমা রূপে কলকাতার যাত্রা আসরে অবতীর্ণ হয়। "উনিশ শতকের মধ্যভাগে, চন্দননগর, চুঁচুড়া অঞ্চল হইতে যাত্রায় খেমটা নাচের প্রচলন হয়। ...কেশে ধোপা ঐ খেমটা নাচ শিখিয়া গোপালের (সে যুগের বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা গোপাল উড়ে) মালিনীর (বিদ্যাসুন্দর পালায়) নাচে যাত্রায় খেমটার প্রচলন করেন...খেমটার সঙ্গে গানের সুরও হালকা হইয়া গেল।"[১০]

কেশে ধোপা, গোপাল উড়ে প্রভৃতি যাঁরা সে-যুগে জনপ্রিয় যাত্রাওয়ালা ছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই এসেছিলেন সমাজের নিচুতলা থেকে। গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের নাড়ির টানটা বজায় ছিল। তাই স্বভাবতই তাঁদের উদ্ভাবিত নতুন শিল্পশৈলীতে

এই লোকসংস্কৃতির হালকা দ্রুত লয় ও তাল এবং এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ততা দেখা গিয়েছিল। এই নাচ-গানের পৃষ্ঠপোষক বাবু সম্প্রদায় হলেও, এর ব্যাপক দর্শকমণ্ডলী ছিল কলকাতার সাধারণ জনগণ—যাঁরা আশেপাশের গ্রাম থেকেই শহরে এসেছিলেন কর্মোপলক্ষে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অতীতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন—"গৃহপ্রাঙ্গণে যে যাত্রা প্রভৃতির আয়োজন হইত তাহাতে যোগদান করিবার অধিকার আপামর সাধারণ সকলের ছিল। দরজা বন্ধ করিয়া কড়া পাহারা রাখিয়া কাহাকেও প্রবেশ করিতে না দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত।"[১১]

অবশ্য অভিজাত সমাজের মানুষদের বাড়িতে 'দরজা বন্ধ' করে 'কড়া পাহারা'র আড়ালে অনুষ্ঠিত হত বাঈ নাচ, সাহেবদের আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে। আর দরজা খোলা হতো ইতরজনদের জন্য যখন যাত্রা, কবিগান, খেমটা প্রভৃতির আয়োজন থাকত। আমোদ-প্রমোদের এই শ্রেণি-বৈষম্যটা ধরা পড়েছিল এক ইংরেজ ধর্মযাজকের চোখে। ১৮০৬ সালে পুজোর সময় রেভারেন্ড ওয়ার্ড শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণের বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন বাঈ নৃত্য দেখতে। ভোররাতে নাচ শেষ হলে এবং অন্যান্য ইংরেজ অতিথিরা বিদায় নিয়ে চলে গেলে, এতক্ষণের বন্ধ সদর দরজা খুলে দেওয়া হলো এবং পিলপিল করে a vast crowd of natives rushed in almost treading upon one another। রাজবাড়ির উঠোনে ঠেসাঠেসি করে বসে তারা হরু ঠাকুর, ভবানী বেনে ও নিতাই বৈরাগীর কবিগান শুনতে জড়ো হলো। কিছুক্ষণ আগে নিশ্চিত মনে রেভারেন্ড ওয়ার্ড দেখছিলেন বাঈজীদের "সুবেশে সজ্জিত, গাইছে, নাচছে যেন নিদ্রাতুর পদক্ষেপে, তাদের ঘিরে আছে সোফায় কাউচে বসা ইউরোপীয় অতিথিবৃন্দ..." কিন্তু এবার একেবারে বিপরীত মেজাজের অনুষ্ঠান। গায়কেরা "কুচ্ছিত গান আর অশ্লীল নাচের ভঙ্গিতে অতিথিদের বিনোদন করছে, তুলে ধরছে তাদের হাত, ঘুরপাক খাচ্ছে, বাড়িয়ে দিচ্ছে নিজেদের মাথা,...যখন-তখন বাঁকিয়ে দিচ্ছে তাদের শরীর আর চিৎকারে তাদের গলা চিরে যাওয়ার জোগাড়।"[১২] স্পষ্টতই নাচে ও গানে যে উদ্দামতার বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে, তা সেই গ্রামীণ গোষ্ঠীনৃত্যের স্বতঃস্ফূর্ততার কাছাকাছি; বাঈ নৃত্যের শান্ত ঢিমে তেতালা পদসঞ্চালন (যাতে 'there is no life' বলে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল—পূর্বের উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য) থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

মোগল আভিজাত্যের কৌলীন্যর ছিটেফোঁটা তখনও বাঈ নৃত্যের গায়ে লেগেছিল এবং জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে তাঁদের শরীরের প্রায় সমস্তই আচ্ছাদিত থাকত (শ্রীমতী হেবারের প্রশংসাবাক্য 'nothing but their faces, feet and their hands being

exposed to view') বলে ইংরেজ বণিকশ্রেণি তাকে সহ্য করতে পেরেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে, এলাহি খানাপিনার লোভে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলা, ব্যবসাদার, সেনাধ্যক্ষরা বাঈ নাচের নিত্যনৈমিত্তিক দর্শক ছিলেন। (ঐ শতকের মধ্যভাগ থেকে এ রেওয়াজ কমতে থাকে দুটো কারণে—এক, পুরোনো বাঙালি জমিদার পরিবারগুলির আর্থিক বৈকল্য, ও দুই, রক্ষণশীল ভিক্টোরীয় মূল্যবোধের দাপটে এ দেশে ইংরেজ কর্মচারী ও আমলাদের মনোভাবের পরিবর্তন)।[১৩] কিন্তু খেমটা বা কবিগান বা যাত্রা-জাতীয় বাংলা লোকসংস্কৃতির অসংকুচিত মনোভাবের স্বতঃস্ফূর্ততা এই-সব ইংরেজ বরাবরই অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। রেভারেন্ড ওয়ার্ডের মতো পরবর্তী আরো অনেক ইংরেজই এই ধরনের নৃত্য-গীত দেখে ও শুনে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন এবং বাঙালিদের 'শিক্ষিত' ও 'সভ্য' করে তুলবার প্রয়াসে এই-সব 'কুরুচিপূর্ণ' অনুষ্ঠানগুলি বন্ধ করবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন।

২

ওয়ার্ডের বিবরণীতে একটা জিনিস লক্ষণীয়। শোভাবাজারের রাজকৃষ্ণ দেব একদিকে অভিজাতবর্গের বিনোদন—বাঈ নাচের পৃষ্ঠপোষক। আবার একই সঙ্গে নিম্নবর্গের জনপ্রিয় কবিগান অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা।

মনে রাখা দরকার, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে কলকাতা মহানগরীতে ইংরেজদের সহযোগিতায় শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেবের মতো জমিদার (রাজকৃষ্ণের পিতা) বা রূপলাল মল্লিকের মতো বেনিয়ানরা, যাঁরা প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হয়ে বাঙালি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁদের তখনও পর্যন্ত কোনো স্পষ্ট সাংস্কৃতিক রুচি গড়ে ওঠেনি। মোগল রাজদরবারের ধ্বংসাবশেষের প্রতিনিধিরূপে বাঈ নৃত্যের পাশাপাশি গ্রাম বাংলা থেকে শহরে আগত লোকসংস্কৃতির নতুন অভিব্যক্তি—কবিগান, আখড়াই-এর নব্যরূপ ইত্যাদির সহাবস্থান সে-যুগের কলকাতার সাংস্কৃতিক জগতের এক কৌতূহলোদ্দীপক বৈশিষ্ট্য। এক যুগপরিবর্তনকালীন অবস্থায় এক শ্রেণির সাংস্কৃতিক চিন্তায় ও চর্চায় যে অসমঞ্জস ভাবধারার অরাজকতা ঘটেছিল, তার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট নিদর্শন—শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেবের রাজবাড়ির অনুষ্ঠানগুলি। মোগল বাদশাহ শাহ আলম দ্বারা মহারাজ উপাধিতে বিভূষিত নবকৃষ্ণ একই সঙ্গে নতুন ইংরেজ শাসকদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, যখন ১৭৫৭ সালে সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের পর পলাতক ইংরেজদের তিনি খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর

জীবনীকার লিখছেন, "খ্যাতনামা গীতিকার হরু ঠাকুর এবং নিতাই দাস (সে যুগের বিখ্যাত কবিওয়ালা হরু ঠাকুর ও নিতাই বৈরাগী) তাঁরই আশ্রিত ছিলেন। কলকাতার সমাজে 'নচ্' (nautch) ঢোকালেন তিনি এবং তাকে জনপ্রিয় করে তুললেন। ইংরেজদের ধারণা সাধারণ্যের প্রমোদ ব্যবস্থায় এটা আমোদের প্রধান উপকরণ। এ হলো বাঈ নাচ্।"[১৪]

নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় ভারতচন্দ্র ও গোপাল ভাঁড়ের সহাবস্থানের ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে, কলকাতার নতুন রাজা-মহারাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় অভিজাত শিল্পচর্চা ও লোকসংস্কৃতির যে সহাবস্থান গড়ে উঠেছিল তাতে কিন্তু ফাটল ধরে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর থেকেই—ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের পর, নতুন ভাবধারার আলোকে বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণির স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক রুচির বিবর্ধনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে। 'খেমটা'-র বিরুদ্ধে *বঙ্গদর্শন* প্রভৃতি পত্রিকার প্রচার অভিযান এই চেষ্টারই আত্মপ্রকাশ। এ অভিযান শুধু 'খেমটা'-র বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তৎকালীন লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা-উপধারার বিরুদ্ধেই নব্যশিক্ষিত ভদ্রলোক সম্প্রদায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। এগুলির বিকল্প হিসেবে তাঁরা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁদের নিজস্ব এক সংস্কৃতি যার ভিত্তি হিসেবে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন এক দিকে অতীতের উত্তর-ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত শিল্প ও অন্যদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্য শিল্পকলা। তাই বাঈ নৃত্যের প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে কালোয়াতি গানের চর্চায় এঁদের বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। রামমোহন রায়ের আমল থেকেই উত্তর-ভারতীয় ওস্তাদদের নিযুক্ত করে রাগপ্রধান গানের যে অনুশীলন শুরু হয়, তাকে অভিজাত রাজবাড়ির আঙিনা থেকে বার করে এনে এই নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির আয়াসসাধ্য করা হয় ১৮৭১ সালে Bengal Music School খুলে।[১৫] বলা বাহুল্য, লোকসংস্কৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অতীতের দরবারি রাগসঙ্গীতের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ, ও পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে শ্বাস গ্রহণ করে কাব্য-উপন্যাস নাটক রচনা—শিক্ষিত বাঙালি সমাজের এই যুগ্ম অভিপ্রায়ের পিছনে তৎকালীন ইংরেজ শাসনকর্তাদের প্রেরণা ছিল। ইংরেজদের মধ্যে যাঁরা সে-যুগে প্রাচ্য সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ছিলেন, যেমন William Jones বা Augustus Willard তাঁরা লোকসঙ্গীতকে মনে করতেন—"...melody of confusion and noise which consists of drums of different sorts, and perhaps a life" এবং দরবারি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকেই ধরে নিয়েছিলেন একমাত্র "Indian music...possesing intrinsic claim to beauty in melody।"[১৬] ১৮৭৪-এ কলকাতার নর্মাল বিদ্যালয়ে এক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে, যখন বিচারপতি Sir John Buddy Phear (যাঁর নামে

ফিয়ার্স লেন) বীণাবাদনের প্রশংসা করেন, তখন সে-যুগের বিখ্যাত বীণকার মৌলা বখস্ ইংরেজদের এই উৎসাহ প্রদানে সাড়া দিয়ে বিদেশি 'রাজপুরুষগণ'-এর কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন—"আপনারা যে আমার সঙ্গীত শ্রবণে প্রীত হইলেন, ইহাও আমার পরম সৌভাগ্য—আমাদের সঙ্গীতের এক্ষণকার অবস্থা অতি শোচনীয়, কিন্তু শাস্ত্রপূর্বমত আছে।...আপনারা মনোযোগ করিলেই আমাদের সঙ্গীতের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়।"[১৭]

অন্যদিকে বাঙালিদের সাহিত্যিক রুচি পালটাবার উদ্দেশ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে ইংরেজদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ শুরু হয়। ১৮১৩ সাল থেকে খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের ধর্মান্তরীকরণের অভিযান ব্যাপক আকারে আরম্ভ হয়। ১৮১৭ সালে তৈরি হয় Calcutta School Book Society ও হিন্দু কলেজ। ধর্মীয় প্রচার ও শিক্ষা প্রচার—এই দুই ক্ষেত্রেই বাংলা লোকসংস্কৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হলো।

খ্রিস্টান প্রচারক যাঁরা এদেশে ঐ সময় এসেছিলেন তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন Evangelist। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অফ্ ডাইরেক্টরদের সভাপতি চার্লস্ গ্র্যান্ট, যিনি ভারতবর্ষে সরকারি নীতি-নির্ধারণের ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতেন, নিজে ছিলেন Evangelist। অত্যন্ত কঠোর নীতিবাগীশ এই সম্প্রদায় সব রকম আমোদ-প্রমোদ সন্দেহের চোখে দেখতে অভ্যস্ত ছিল এবং 'পরোপকার করছি'—এই হামবড়া ভাব ও বদ্ধমুল ধারণা আঁকড়ে ধরে ধর্মপ্রচার করত।[১৮]

যেহেতু বাংলা লোকসংস্কৃতির গানগুলি সচরাচর ধর্মীয় চরিত্রভিত্তিক, পাদ্রিরা যখন হিন্দুদের মূর্তি-পূজার বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান শুরু করেন, তখন এই গানগুলিই প্রথমে চিহ্নিত করেন পৌত্তলিকতার নিদর্শন হিসেবে। তাঁদের প্রচারের মূল কথা ছিল—এ দেশের লোকেদের পূজ্য দেব-দেবীরা অত্যন্ত কুরুচিগ্রস্ত। সে-যুগের জনপ্রিয় 'ভবানী বিষয়' রচিত লোকসঙ্গীতে শিবের যে ঘরোয়া মানবিক চিত্র পাওয়া যায়, তার সমালোচনা করতে গিয়ে এক পাদ্রি লিখলেন—"শিবের সব কাজ ভগবৎ প্রকৃতির বিপরীত, আর লজ্জাকরও বটে। এমন-কি তাঁর কাজকর্ম মানবচরিত্রের পক্ষেও হেয়। তাঁর জীবন ভরে আছে ভিক্ষাবৃত্তি, দারওয়ানি, মৃত্যুভয়, কামলালসা, খুন এবং এমনই সব নীচ আর লজ্জাকর ঘটনার ছড়াছড়ি...এরকম সম্বন্ধ তরুণ মনে সুনীতির বোধ বিনষ্ট করার অনুকূল।"[১৯]

বাংলা লোকসাহিত্যে দেব-দেবীর বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি ইংরেজি পত্রিকার মন্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য, "উচ্চশ্রেণীদের প্রিয় দেবতা শিব। আর দুর্গা অথবা কালীকে

জোরের সঙ্গে বাংলার জাতীয় দেবী বলা যায়। প্রায় কৃষ্ণরাধার মতোই তাদের কামলালসায় আসক্তি। এখনকার মতো যে পর্যন্ত এমন সব দানবের আরাধনা সব শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত থাকবে, ততদিন দেশের নৈতিক পরিস্থিতিতে কোনো উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।"[২০]

১৮৫৫ সালে রেভারেন্ড জেম্‌স্ লঙ (যিনি 'নীলদর্পণ'-এর ইংরেজি অনুবাদ করে ১৮৬১ সালে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হন), বাংলায় প্রকাশিত বই-এর একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। *A Descriptive Catalogue of Fourteen Hundred Bengali Books and Pamphlets* নামে পরিচিত এই তালিকার ভূমিকাতে তখনকার জনপ্রিয় 'পাঁচালী' গান সম্বন্ধে লঙ সাহেবের মন্তব্য—"অশ্লীল আর মন নোংরা করে দেওয়ার মতো এই পাঁচালী সঙ্গীতবাদ্য সহযোগে হিন্দুশাস্ত্র থেকে গৃহীত কাহিনীর ছন্দবাঁধা আবৃত্তি। বিষ্ণু এবং শিবের সঙ্গে জড়িত সেসব কাহিনী..."

এরও আগে, ১৮২০ সালে, আর একটি অনুরূপ তালিকা প্রস্তুত করা হয় বটতলায় ছাপা বাংলা পৌরাণিক গীতি-আলেখ্য ইত্যাদির। এগুলির জনপ্রিয়তা দেখে শঙ্কিত হয়ে Calcutta School Book Society মন্তব্য করে "এই সব অশ্লীল পুস্তিকার চাহিদায় যে আগ্রহ এবং সাধারণের মধ্যে তার যা কাট্‌তি, বিশেষ করে হিন্দুদের বড় বড় উৎসবের ছুটিতে, তা অতীব শোচনীয়, কারণ এমন বইতে আমোদ পাওয়ার মানসিক হীনতাই প্রকট হচ্ছে।"[২১]

১৮০৬ সালে কবির গান শুনে রেভারেন্ড ওয়ার্ডের প্রতিক্রিয়া থেকে শুরু করে, উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত যত ইংরেজ, সমসাময়িক বাংলা লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে যা মন্তব্য করে গেছেন, তাতে কয়েকটি বিশেষণের পুনরাবৃত্তি লক্ষণীয়—'filthy', 'indecent', 'polluting', 'licentious'। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, স্বদেশে প্রচলিত কিছু নৈতিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে তদানীন্তন ইংরেজরা এদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বিচার করেছিলেন। বিদেশে ভ্রমণরত বা চাকুরিজীবী এইসব উন্নাসিক নীতিবাগীশ ইংরেজদের সম্বন্ধে তখনকার বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক থ্যাক্‌রের উক্তিটি স্মরণীয় "স্থূল, অজ্ঞ, বিকৃতবুদ্ধি উৎপীড়কের ন্যায় ইংরেজ প্রতিটি শহরে দেখা দিচ্ছে...সে রক্তচক্ষুর সামনে সহস্র উপভোগ্য দৃশ্য বয়ে গেলেও তার কিছু আসে-যায় না...শিল্প, প্রকৃতির ধারা সমানে চলছে, আর তার নির্বোধ দৃষ্টিতে মুগ্ধতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই..."[২২]

৩

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় প্রাঙ্গণে সত্যিই 'সহস্র উপভোগ্য দৃশ্যের' মিছিল চলছিল। ভাবগ্রাহী চোখ থাকলে তা দেখা যেতে পারত। সে-যুগে প্রচলিত

নানা ধরনের সঙ্গীত ও অনুষ্ঠানের তালিকা দিতে গিয়ে একজন সমসাময়িক কবি লিখেছিলেন—

...কবি পশতো তালফেরা শুনিতে মধুর
পাঁচালী অনেক ভাতি রামায়ণ সুর
কত কথা তরজাতে, সারিতে প্রচুর
ভবানী ভবের গান মালসী মায়ুর
গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী বিজয়াতে ভোর
বাইশ আখড়া ছাপ প্রেমে চুর চুর
গোবিন্দ মঙ্গল জারি গাইছে সুধীর
চৈতন্য চরিতামৃত প্রেমের অঙ্কুর
শ্রবণে যাহার গানে ভকত আতুর
কালিয়দমন রাস চণ্ডীযাত্রা ধীর
রচিল চৈতন্যযাত্রা রসে পরিপুর
সাপুড়িয়া বাদিয়ার ছাপের লহর
বাঙ্গালার নবগানে নতুন ঝুমুর।[২৩]

উপরিল্লিখিত গানগুলির মধ্যে কতকগুলিকে বলা হয় গীতিপ্রধান (যেমন মালসী, সারি, জারি) আর কতকগুলি আখ্যায়িকা-প্রধান (যেমন কবিগান, আখড়াই, পাঁচালি)। এই আখ্যায়িকা-প্রধান গানগুলিই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা লোকসংস্কৃতিতে একটা বিশেষ স্থান জুড়ে ছিল। কাহিনির প্রয়োজনে যে-কোনো জনপ্রিয় নতুন উপাদান সংযোজনের স্বাধীনতাটা অবাধ ছিল এই-সব গানের রচনায় ও পরিবেশনে। কোনো ধরা-বাঁধা সুরের বাধ্যবাধকতা বড়ো একটা ছিল না। সুবিধামতো যে-কোনো সুরের থেকে যতটুকু খুশি সাহায্য গ্রহণ করার পথটাও পরিষ্কার ছিল। তাই, এই যুগে দেখা যায় নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে নতুন গায়কী ভঙ্গি। প্রচলিত কীর্তনের সুর ভেঙে রূপচাঁদ চট্টোপাধ্যায় (১১২৯-৯৯) ও মধুসূদন কাণ (১২২৫-৭৫) 'ঢপ' কীর্তনের সূত্রপাত করেন যা মূলত মেয়ে কীর্তনীয়ারা কলকাতায় গাইতেন।[২৪] আদি 'আখড়াই' গানের রাগরাগিণীর নৈপুণ্যময় খেলা সরলীকরণ করে, উত্তর-প্রত্যুত্তরের উত্তেজনা এনে, বাগবাজারের মোহনচাঁদ বসু 'হাফ-আখড়াই'-এর সৃষ্টি করেন। এই-সব নানা ভাঙাগড়ার মধ্যে যে প্রবণতাটা স্পষ্ট তা হচ্ছে জনসাধারণ্যে সর্বজনগ্রাহ্য করে উপস্থাপনার প্রচেষ্টা।

এই বিচিত্র গানের মিছিল কবিগানের স্থান ছিল সবার আগে। বৈষ্ণব কবিদের পর বাংলা সাংস্কৃতিক আসরে মঙ্গলকাব্যের কবিরা এসে উপস্থিত হন। 'ইঁহারাই পল্লীগ্রামের

অন্তিম গ্রামীণ কবি, জনসাধারণের কবি। ইহার পরই কবিওয়ালাদের আবির্ভাব।"[২৫] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যে-সব কবিওয়ালাদের নাম পাচ্ছি, তাঁদের অনেকেই এসেছিলেন সমাজের নিচুতলা থেকে, যেমন—কেষ্টা মুচি ("এই কৃষ্ণ মুচি জাতি ব্যবসাও করিত; কবির গাহনাও গাইত")[২৬]; ভোলা ময়রা ("Bhola Moira, the famous kavi-wallah, had on Baghbazar Street a sweet meat shop...")[২৭]; কুকুরমুখো গোরা কেবল মুখে মুখে বড়ো বড়ো ওস্তাদিদলের গীতের উত্তর দিত এবং ঐ সমস্ত উত্তর গানের মধ্যে পুরাণঘটিত গূঢ় ও গুহ্য ভাব সকল সন্নিবেশ থাকিত...।[২৮] এঁদের প্রশংসা করতে গিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন "যে দেশের তাঁতি, শুঁড়ি, মুচি, হাড়ি, এতদ্রূপ সৎ কবি, সে দেশের ভদ্রলোকেরা আরও কত উত্তম হইবেন।"[২৯]

বৈষ্ণব গীতিকাব্য ও মঙ্গলকাব্য—উভয়েরই প্রবহমাণ প্রভাব রয়েছে কবিগানে, যদিও নতুন শতাব্দী ও নাগরিক সভ্যতার শ্রোতাদের চাহিদার তাগিদে বৈচিত্র্য এসেছে প্রকাশভঙ্গিতে এবং নতুন উপাদান সংযোজিত হয়েছে। অনেক আগেই গ্রাম বাংলার মঙ্গলকাব্যে, পুরাণের দেব-দেবীরা তাঁদের অলৌকিক মহিমার পরিমণ্ডল ছেড়ে সাধারণ ঘরোয়া চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। আগমনী ও বিজয়া গানে পার্বতী বাঙালি ঘরের বউ রূপেই প্রতি বছর শ্রোতাদের কাছে হাজির হতেন। কবিগান আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে দৈনন্দিন সামাজিক জীবনের প্রত্যক্ষ প্রতিবিম্বরূপে এই-সব পৌরাণিক উপাখ্যানগুলিকে উপস্থিত করল। ঐতিহ্যাশ্রয়ী রাধাকৃষ্ণলীলা ও হর-গৌরীর গল্পকে অবলম্বন করে যথাক্রমে 'সখী সংবাদ' ও 'ভবানী বিষয়'—এই দুই পর্ব ছাড়াও, কবিগানে তৃতীয় এক পর্ব জুড়ে দেওয়া হল—'খেউড়'। 'সখী সংবাদ'-এ রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনি বর্ণনা উপলক্ষ করে পারিপার্শ্বিক জীবনের নায়ক-নায়িকার বিবাহবহির্ভূত গোপন প্রেম, মান-অভিমান, বিরহ ইত্যাদি পরিবেশিত হল। যেমন, রাম বসুর (১১৯৪-১২৩৬) গানের এই কথাগুলি—

তোরে ভালোবেসেছিলাম বোলে কিরে প্রেম আমার
দুকুল মজালি
দুমাস না যেতে, দারুণ বিচ্ছেদের হাতে, সঁপে দিয়ে
আমায় ফেলে পালালি।[৩০]

রাধার অনুযোগের আড়াল থেকে যে-ছবিটা স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসছে, তা সেই অতিপরিচিত ঘটনা—ঘর থেকে ফুসলিয়ে বার করে এনে কোনো কুলবধূকে পরিত্যাগ।

'ভবানী বিষয়ক' কবিগানেও, ঠিক একই কায়দায় শিব-পার্বতীর সম্পর্ক বর্ণনায়, সমসাময়িক সমাজের বৃদ্ধ স্বামী ও তার তরুণী ভার্যার ঝগড়াঝাঁটির নিখুঁত বিবরণী দেওয়া হত। শিব যেমন বৃদ্ধ পেটুক, অলস, গাঁজাখোর, হতদরিদ্র স্বামী, পার্বতীও তেমনি কলহপরায়ণা, বদমেজাজের লক্ষ্মীছাড়া স্ত্রী। এই-সব গান শুনেই ইংরেজ পাদ্রি ও পত্রপত্রিকার সম্পাদকেরা হিন্দু দেব-দেবীদের licentious ও indecent বলে সাব্যস্ত করেছিলেন। বাইবেলের চরিত্র ও যিশুখ্রিস্টকে নিয়ে নিজেদের দেশে লঘু মেজাজের সঙ্গীত বা সাহিত্য-রচনার কোনো ঐতিহ্য ছিল না বলেই কি এই অসহনশীলতা? অথচ বাইবেলের নানা উপাখ্যানে আদিরসাত্মক ব্যঞ্জনা রয়েছে, ঠাট্টা-মস্করার সুযোগ আছে। শেষ পর্যন্ত বাঙালি কবি ঈশ্বর গুপ্তকেই এর সদ্ব্যবহার করতে হয়েছিল। কৃষ্ণ ও যিশুর তুলনা করে গুপ্ত কবি সে যুগে ছড়া বেঁধেছিলেন—

গোকুলে গোপাল খান ননি ছানা খির
খানকি মেরির পুত্র মাখম পনির[৩১]

যিশুখ্রিস্টের জন্মকাহিনির মতো হিন্দু পুরাণেও বহু চরিত্রের জন্ম রহস্যাচ্ছন্ন। এই-সব ঘটনা নিয়ে তখনকার দিনের যাত্রাগানে ঠাট্টা-তামাশা করা হত। একটা উদাহরণ দিই। সত্যবতী যখন অম্বালিকাকে বংশরক্ষার জন্য ব্যাসদেবের কাছে যেতে পীড়াপীড়ি করছেন, তখন অম্বালিকা জবাবে এই মজার গানটি গান,

আমার ঘটল আজ এ কি জ্বালা ঠাকরুণ গো,
ভেবে মরি করব কি উপায়।
ছিল ঠেকরো সিংহি ধীবর রাজা,
জানি তার ফরাসডাঙ্গায় ধাম,
তার জ্যোষ্ঠা কন্যা মান্যা তুমি
সত্যবতী মৎস্যগন্ধা-নাম।
কাশীরাজার কন্যা মোরা সামান্য কেউ নই
তোমার পুত্রবধূ হই।
চিত্রসেন পতি ছিল,
সে আমারে ছেড়ে গেল গো,
সেই পতির শোকে মনোদুখে
মর্মে মরে রই।
. . .
তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র যিনি,
ঐ দ্যাখ ব্যাস মুনি বড় ঠাকুর যিনি

দেখে তায় মরি লাজেতে।
তিনি কোন সাহসে ঢুকলেন এসে
আমার ঘরেতে।
সে যে মস্ত দেড়ে, দাড়ি নেড়ে অন্দরে ঢুকে
গিয়ে বসল তাল ঠুকে।

. . .

ছিঃ ছিঃ লজ্জায় মরে যাই।

সত্যবতী যখন আবার পীড়াপীড়ি করেন, তখন অম্বালিকা সোজা উত্তর দিলেন,

যদি করতে হয় তো আপনি কর, ঠাকরুণ
ও কথা আমায় বল না।

তারপর মোক্ষম বাণীটি ছাড়লেন,

বাল্যকালে নদীর তীরে বাইতিস তরণী
কথা লোকমুখে শুনি—
দেখে তোর রূপের ডালি, অফুট কমল কলি
তাতে হুল বসায়ে স্থূল বাধালেন পরাশর মুনি।
তুমি একবার করে পার পেয়েছ নাইক কিছু ভয়,
এখন যত ইচ্ছে তত কর কেউ তো কিছু বলবে না।
যদি করতে হয় তো আপনি কর, ঠাকরুণ,
ও কথা আমায় বল না।[৩২]

ঠাকুর-দেবতাদের কাহিনি নিয়ে লোকসাহিত্যে এই জাতীয় রঙ্গ-রসিকতা পুরাণের এক ধরনের বিকল্প ভাষ্য; রাশভারী ধর্মীয় ব্যাখ্যার পাশাপাশি parody বা লালিকার প্রবহমাণ স্রোত। অভিজাতবর্গের মার্জিত, গুরুগম্ভীর সংস্কৃতির সমান্তরাল একটা বিকল্প খোলামেলা লোকসংস্কৃতির ধারা প্রতি যুগে প্রতি সমাজেই বল্‌গাহীন ভাবে ছোটে। বাঁধাধরা, সামাজিক নিয়ম-কানুন অনুশাসিত জগৎ থেকে এ জগৎটা স্বতন্ত্র। এ জগতের বাসিন্দারা তথাকথিত 'ইতরজন'; অভিজাতদের উপাস্য চরিত্রগুলিকে এরা স্বর্গ থেকে মাটিতে নামিয়ে এনে পারিপার্শ্বিক জগতের মানব-মানবীতে পরিণত করে আমোদ পায়। সত্যবতীর বাবা তাই ফরাসডাঙ্গার ধীবর 'ঠেকরো সিংহি' হয়ে যায়। অম্বালিকার তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে 'বড়ঘরের কেচ্ছা' উদ্‌ঘাটিত হয়। উচ্চবর্গের সযত্নে সংরক্ষিত মূল্যবোধগুলি, সংস্কৃত-ঘেঁষা দুর্বোধ্য শব্দের খাঁচায় লালিত সাহিত্য-শিল্প, ছোটোলোকদের ছোঁয়া থেকে বাঁচানো শুদ্ধ দেব-দেবী—এই সব কিছুর বিরুদ্ধে একটা বেপরোয়া, অবজ্ঞা প্রকাশের স্বাধীনতা লোকসংস্কৃতির এই গানগুলিতে পাওয়া যায়। দাশরথি রায় বা দাশু রায়ের পাঁচালিতে যেমন 'কুল-কলঙ্কিনী'র দল গান গায়,

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগ চতুষ্টয়
দেখ চেয়ে, সকল নারী সতী কিছু নয়।

তার পর কুন্তীর পুত্র লাভের উপায় থেকে শুরু করে মন্দোদরীর বিভীষণ প্রণয় পর্যন্ত বর্ণনা করে, এরা অনুযোগ করে,

দেবতাদিগের বেলা, লীলা চলে ঢাকে
আমাদের পক্ষে কেবল পাপ লেখা থাকে
যারা সব সতী বলে হলেন পরিচিত
নাম নিলে তাঁহাদের পাপ তিরোহিত।
কুল-কলঙ্কিনী ভাই! আমরা ধরায়
মলেও অসীম দুঃখ হইবে তথায়।[৩৩]

পৌরাণিক কাহিনি বর্ণনায় বাধ্যবাধকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে সরাসরি ভাবে সাধারণ মানুষের অসংস্কৃত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি রাগ, ভালোবাসা, হাসি-আহ্লাদ-প্রকাশের সুযোগ ছিল 'খেউড়ে'। যদিও শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণির অশ্লীলতা-বিরোধী প্রচার অভিযানের ফলে 'খেউড়' বলতে আজ আমরা 'ছোটলোক'দের নিছক গালিগালাজ-ই বুঝি, 'খেউড়'-এর উৎস লোকসংস্কৃতির একটা সজীব সৃজনশীল ধারায়, ছড়া বেঁধে বা গান গেয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তরের রীতি থেকে। আদিরসাত্মক ব্যঙ্গোক্তি যা খেউড়ের বৈশিষ্ট্য ছিল—তার রস গ্রহণে সে-যুগের ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ সবাই-ই স্বাভাবিক ভাবে উৎসাহী ছিল। একজন সমালোচকের মতে "খেঁড়ু বা খেউড় গানই খুব সম্ভবত বাঙ্গালাতে প্রেমিক-প্রেমিকার সরাসরি হৃদয়াবেগ প্রকাশের প্রথম নিদর্শন।"[৩৪]

খেউড় যে সে-যুগে সাধারণের প্রিয় ছিল তার ইঙ্গিত দিচ্ছেন ঈশ্বর গুপ্ত— "বিশিষ্ট জনেরা ভদ্র গানে এবং ইতর জনেরা খেউড় গানে তুষ্ট হইত।" সখী সংবাদ ও বিরহ গানের ভণিতায়, দীর্ঘ বর্ণনায় ও অনুপ্রাসের বাহুল্যে অস্থির হয়ে শ্রোতারা অনেক সময় 'খেউড়' ধরতে দাবি করতেন। ঈশ্বর গুপ্ত জানাচ্ছেন, "সে-যুগের বিখ্যাত কবিওয়ালা নিতাই বৈরাগী (১১৫৮-১২২৫) একবার কোনো এক আসরে সখী সংবাদ ও বিরহ গাইছিলেন; তাবৎ ভদ্রেই মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন ও পুনঃপুনঃ বিরহ গাইতেই অনুরোধ করিতেছেন, তাহার ভাবার্থ গ্রহণে অক্ষম হইয়া ছোটলোকেরা আসরে দাঁড়াইয়া চিৎকারপূর্বক কহিল—'হ্যাদ্ দেখ্ লেতাই (নিতাই), ফ্যার ঋদি কালক্যকিলির (কালো কোকিল) গান ধল্লি, তো দো (দুও) দেলাম, খাড় (খেউড়) গা। নিতাই তৎ-ক্ষনাৎ মোটা ভজনের খেউড় ধরিয়া তাহারদিগের অস্থিরচিত্তকে সুস্থির করিলেন।"[৩৫]

খেউড়কে নিম্নবর্গের বিকৃত রুচির গান বলে খারিজ করে দিলেও, পুরোনো খেউড়ের কিছু অবশিষ্ট নিদর্শন থেকে বোঝা যায় যে এগুলি কাব্যরস-বিবর্জিত

গালিগালাজ ছিল না; হাসি রঙ্গ-রসিকতার লঘু মেজাজের গান ছিল। যেমন—

ও পাড়ায় গে দেখে এলাম একটি ডাগর কাল মেয়ে
জানলা খুলে বসে আছে নাগর আসার পথ চেয়ে[৩৬]

বা পদ্মের প্রতি ভ্রমরের উক্তির ছলে এই গানটি,

প্রাণ রে আজ মনের কথা আমায় খুলে কও—
দিবসে সরসে থাক, মধুদানে সুখে রাখ,
কেন নিশিতে মুদ্রিতা হও?
কেন লো প্রাণ কমলিনি, স্বভাবের বশ নও?
হয়ে রসবতী যুবতী, পীরিতি কি রীতি জান না...[৩৭]

কবিওয়ালাদের বাগ্‌যুদ্ধে, উত্তর-প্রত্যুত্তর পৌরাণিক আখ্যায়িকা ছেড়ে সমসাময়িক জীবনের ঘটনার বা ব্যক্তিগত জাতব্যবসা ইত্যাদি বিষয়ে চলে আসত। যেমন রাম বসু ও অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির এই বচসা,

রাম বসু : সাহেব! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি
ও তোর পাদরি সাহেব শুনতে পেলে
গালে দিবে চুন কালি

অ্যাণ্টনি : খ্রীষ্টে আর কৃষ্টে কিছু প্রভেদ নাই রে ভাই
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে
এও কোথা শুনি নাই।
আমার খোদা যে, হিন্দুর হরি সে
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে,
আমার মানব জনম সফল হবে
যদি রাঙা চরণ পাই।[৩৮]

ভোলা ময়রার একটি গানে তাঁর দৈনন্দিন জীবনের একটি চমৎকার বিবরণী পাই—

আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা
(ওগো) সর্দিগর্মি নাহি মানি
ফুরাইলে বারমাস ষড়ঋতুর হয় নাশ
(ওগো) কেবল এই কথাটা জানি।
শীত এলে লেপ পাই গর্মি এলে ঘোল খই
যাহা কিছু হাতে আসে 'কবির নেশায়' দিই ঢালি।
. . .
নহি কবি কালিদাস বাগবাজারে করি বাস
পুজো এলো পুরি মিঠাই ভাজি[৩৯]

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই লোকসংস্কৃতিতে ঠাকুর-দেবতার দোহাই দিয়ে গান রচনার পরিবর্তে ধর্ম-নিরপেক্ষ প্রণয়-সঙ্গীত রচনার দিকে ব্যাপক ঝোঁক দেখা যায়। যাত্রা ও পাঁচালীতে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নবদ্বীপের রাজদরবারের কবি ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' যদিও পুরোপুরি দেবমহিমা সংস্রবশূন্য হতে পারেনি, ঐ কাহিনির তদ্‌পরবর্তী একাধিক লৌকিক সংস্করণে—বিশেষত যাত্রায়—প্রেমিক-প্রেমিকার স্বাভাবিক মানবিক দাবিগুলি সরাসরিভাবে উচ্চারিত হয়েছে। রাধামোহন সরকারের যাত্রায় গোপাল উড়ে (১২২৪-৬৪) 'বিদ্যাসুন্দর' পালায় প্রথম মালিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অভাবনীয় সাফল্যের পর গোপাল নিজে যাত্রার দল গঠন করেন এবং সহজ কথ্য বাংলায় গান রচনা করিয়ে 'বিদ্যাসুন্দর'-এর নতুন পালা তৈরি করেন। মালিনীর গানগুলিতে সাধারণ মানুষের সাংসারিক সুখ-দুঃখের, আমোদ-আহ্লাদের প্রত্যক্ষ ছবি পাওয়া যায়,

ভাঙ্গা বাগান যোগান দেওয়া ভার
ফুলে নাই সে বাহার
কেউ গেছে কুঁড়িতে মজে
কেউ হয়েছে বোঁটা সার
ডাকে না কেউ আদর করে
যদি বেচি ধারে-ধোরে,
পয়সা দিতে ঝগড়া করে
যাচলে দেয় না পুনর্বার[৪০]

বা রঙ্গ-রসপূর্ণ এই গানটি—

এস যাদু আমার বাড়ি
তোমায় দিব ভালবাসা
যে আশায় এসেছ যাদু
পূর্ণ হবে মন আশা
আমার নাম হীরে মালিনী
কড়ে রাঁড়ী নাইকো স্বামী
ভালোবাসেন রাজনন্দিনী
করি রাজমহলে যাওয়া আসা।[৪১]

ওড়িশা থেকে ১৮/১৯ বছর বয়সে কলকাতায় এসেছিলেন গোপাল উড়ে ১৮৩৫ নাগাদ। চাঁপাকলা বিক্রি করে জীবিকা অর্জন করতেন। তাঁর ফেরির ডাক শুনে, কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হয়ে রাধামোহন সরকার তাঁকে গানের তালিম দেওয়ান। পরবর্তী যুগে গোপালের 'আড়-খেমটা' তালে রচিত রসালো গানগুলি "হাটে, মাঠে, বাটে পথিকগণ গাহিয়া পুরাতন করিয়া ফেলিয়াছেন।"[৪১খ]

রবীন্দ্রনাথও এক সময় এই তালে গান রচনা করেছিলেন (যেমন—'হেলা ফেলা সারা বেলা একি খেলা আপন মনে' বা 'দুজনে দেখা হল মধু যামিনীরে') যদিও কথা ও মেজাজ তাঁর নিজের সমাজের মানসিক বিলাসকেই প্রধানত ফুটিয়ে তুলেছে। গোপাল উড়ের কথার মতো, মানবিক আবেদন সর্বসাধারণের স্তরে নেমে আসেনি।

এই কথাটা মনে রেখেই বোধহয় রাজ্যেশ্বর মিত্র একবার লিখেছিলেন, ''এই অভদ্র ইতর গানগুলি তো সুরের দিক থেকে দরিদ্র ছিল না। সুতরাং কৃতবিদ্য সমাজ একটি চমৎকার কাজ করলেন। ...অর্থাৎ সেই-সব গানের সুর এবং সৌষ্ঠব নিজেদের গানে এনে বসিয়ে দিলেন এবং ঘুণাক্ষরেও এ কথা প্রকাশ করলেন না। ফলে তাঁদের রচনার জয়জয়কার হলো...।''[৪১খ]

গোপাল উড়ের সমসাময়িক দাশরথি রায় বা দাশু রায়ও (১২১২-৬৪) অতীতের পাঁচালি গানে নতুন ভাবধারা এনেছিলেন। কবিওয়ালা কেষ্টা মুচি, বা যাত্রাওয়ালা গোপাল উড়ের মতো দরিদ্রশ্রেণি থেকে না এলেও দাশু রায় তাঁর যৌবনের প্রথমে ঘর ছেড়ে গ্রামের স্ত্রী কবিওয়ালি অক্ষয়া পাটনির কবির দলে যোগ দেন। এই মহিলার কাছেই গান-বাজনার তাঁর হাতেখড়ি।

পাঁচালীর অধিকাংশই গীত হত, আর কোনো-কোনো অংশ দ্রুত আবৃত্তি করে অথবা বিশেষ ঢং-এ ছড়া কেটে পরিবেশিত হতো। এর কিছু কিছু অঙ্গ—যেমন 'নলিনী-ভ্রমর'—এতে লৌকিক রসালোচনার সুযোগ নিয়ে সম-সাময়িক সমাজের ঘটনার অবতারণা করেছিলেন দাশু রায় তাঁর পাঁচালিতে। 'নলিনী-ভ্রমর'-এর এক অংশে—''দৈবে এক রাত্রে নৌকা যাচ্ছে গঙ্গা বেয়ে/যাচ্ছে কাশী, দক্ষিণদেশী যত ছেনাল মেয়ে''—সে যুগের কলকাতার সমস্ত বেশ্যাপল্লী ও বারবনিতাদের এক বিচিত্র হাস্যোদ্দীপক তালিকা পাওয়া যায়। বা 'সীতা-অন্বেষণে' এই পঙ্‌ক্তি—

সতীদের অন্ন জোটে না বেশ্যাদের জড়োয়া গহনা
. . .
সৃষ্টি সব সৃষ্টি ছাড়া বাজিয়ে জড়োয়া গহনা
পণ্ডিতে চণ্ডী পড়ে দক্ষিণা পান চারটি আনা।[৪২]

পণ্য বেচাকেনার সমাজে, নতুন মূল্যবোধের আবহাওয়ায় অনুগত স্ত্রীর থেকে বেশ্যার মূল্য বেশি, চণ্ডীপাঠ থেকে বাজনদারের চাহিদা বেশি। গান-বাজনা আর লোক-শিল্পীদের বিনোদন পরিবেশনের শৌখিন নেশা থাকছে না, আকর্ষণীয় অর্থাগমের পেশাতে পরিণত হচ্ছিল উনিশ শতকের মধ্য থেকেই। ও শতকের শুরুতে কেষ্টা মুচি, ভোলা ময়রারা নিজেদের জাত-ব্যবসা অনুসরণ করতেন এবং অবসর সময়ে গান গাইতেন।

কিন্তু পরবর্তী যুগে গোপাল উড়ের যাত্রা আর শখের যাত্রা ছিল না; 'যাত্রা হইতে গোপালের জীবিকা নির্বাহ হইত।'[৪৩] গোপালের সমসাময়িক পাঁচালীকার দাশু রায়কে "প্রথমে লোকে...তিনটি মাত্র টাকা দিয়ে পাঁচালীর গান করাইত, শেষে শত মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হইলেও সেই দাশরথী তাঁহাদের দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিলেন।"[৪৪]

নাগরিক সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন লোকশিল্পীদের সামাজিক অবস্থান পালটে যাচ্ছিল, ঠিক তেমন-ই তাঁদের শিল্পকর্মে নতুন চাহিদা অনুযায়ী প্রচলিত বিধিবহির্ভূত উপাদান ঢুকছিল। দাশু রায় তাঁর পাঁচালীতে সঙ-এর অবতারণা করতে শুরু করলেন। সমাজের অঙ্গ-বিশেষের তীব্র সমালোচনা করাই অধিকাংশ সঙের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় থেকে যাত্রাতেও সঙ নামানো শুরু হয়, comic relief বা হাসির বৈচিত্র্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।[৪৫]

আসলে সঙ কলকাতার লোক-সংস্কৃতিতে বরাবরই সমালোচনার জনপ্রিয় হাতিয়ার ছিল। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ব্যঙ্গ বা কুপ্রথাগুলিকে নিন্দা করে প্রকাশ্য রাজপথে লোকশিল্পীরা সঙ সেজে জনসাধারণকে আমোদ বিতরণ করতেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এর বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এবং একে উচ্ছেদ করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই। ১৮২৫-এর ৫ ফেব্রুয়ারির *সমাচার দর্পণ* থেকে জানা যাচ্ছে যে সরস্বতী পূজার প্রতিমা বিসর্জনের দিন শোভাযাত্রার সঙ্গে একটি সঙ বার হয়েছিল "তাহার ভাব এই একটা সাধারণ কথা আছে পথে হাগে আর চক্ষু রাঙায়।" অন্যায় করেও ঔদ্ধত্য দেখানোর যে অধিকার ক্ষমতাবানরা চিরকাল উপভোগ করে এসেছেন, তার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষদের এই প্রতিবাদ বিদ্রূপের আড়ালে প্রকাশিত হলেও, ইংরেজ বিচারকর্তা তাকে ক্ষমা করতে পারেনি। সংবাদটির পরবর্তী অংশে দেখছি সঙের আয়োজনকর্তা পুলিশের দ্বারা ধৃত হয়ে আদালতে আনীত হলেন এবং "বিচারকর্ত্তা সাহেব তাঁহাকে বলিলেন যে তুমি তোমারদিগের দেবতার সম্মুখে এ প্রকার কদর্যাকার সঙ করিয়াছ এ অতি মন্দ কর্ম্ম।"[৪৬]

সে-সময় পূজা উৎসবে যে-সব সঙ প্রদর্শিত হত তার নাম থেকেই বোঝা যায় তাদের ব্যঙ্গের লক্ষ্যবস্তু ছিল কারা—'বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন'; 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে'; 'খ্যাঁদা পুতের নাম পদ্মলোচন'; 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়', সমাজের প্রতাপ-প্রতিপত্তিশালীদের যথেচ্ছাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্বল দরিদ্র জনসাধারণের একমাত্র অস্ত্র ছিল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। হাসির হররায় নিজেদের দুঃখ কষ্টের স্ফুটনোম্মুখ আর্তনাদকে চাপা দেবার প্রচেষ্টা নানা আকারে দেখা দিয়েছিল। কখনও অভিজাতদের আরাধ্য দেব-দেবী ও ধ্যান-ধারণাকে উপহাস করে

পরোক্ষ প্রতিহিংসার আমোদ লাভ, কখনও-বা সঙ বা পাঁচালি জাতীয় অনুষ্ঠানে সরাসরি তাদের কাজকর্মকে বিদ্রূপ করে লোক হাসানো।

লক্ষণীয় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত—এই একশো বছর বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃশ্যপটে নানা নাটকীয়, যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেছে—দুর্ভিক্ষ, মহামারী, কৃষক বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, সমাজ-সংস্কারের কোলাহলমুখর তর্কবিতর্ক। অথচ, তদানীন্তন লোকসংস্কৃতির জনপ্রিয় গানে—কবিগান, যাত্রাগান, পাঁচালি ইত্যাদিতে—এর প্রত্যক্ষ ছাপ খুব অল্পই দেখা যায়। গ্রামীণ ঐতিহ্যাশ্রয়ী সালতামামিসূচক গান বা বিবরণী—যাতে সারা বছরের ঘটনা বিবৃত হতো—সেগুলিও এই সময় থেকে রহস্যজনক ভাবে অবলুপ্ত হতে থাকে (অন্তত এখনও পর্যন্ত গবেষকরা ঐ বিষয়ে কিছু আবিষ্কার করতে পেরেছেন বলে শুনিনি)। পলাশীর মাঠে সিরাজউদ্দৌলার ভাগ্যবিপর্যয় নিয়ে একটি সুপরিচিত গান ('কি হলো রে জান...'), তিতুমীরের বিদ্রোহ উপলক্ষ করে দু-তিনটি গান ও গাথা (সাজন গাজীর গান ইত্যাদি)[৪৭], বিধবা বিবাহ ও স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে কিছু ছড়া ও গান (যার অধিকাংশই আবার ব্যঙ্গাত্মক) ছাড়া, বাংলা লোকসঙ্গীতে এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছু আবিষ্কৃত হতে দেখিনি। ভবিষ্যতের গবেষকদের অনুসন্ধানের ফলশ্রুতির অপেক্ষার অবসরে আমাদের একমাত্র অবলম্বন—অনুমান। সে-যুগের বাংলা লোকসংস্কৃতির জনপ্রিয় নানা ধরনের গান প্রভৃতিতে সমসাময়িক ইতিহাসের এই রাজনৈতিক উত্থান-পতন, আলোড়ন-আন্দোলনের বিস্ময়কর অনুপস্থিতির কারণ কি এক ধরনের পলায়ন-প্রবণতা? সংকটজনক, পীড়াদায়ক ঘটনার প্রতি পিঠ ফিরিয়ে, হাস্যকৌতুক দিয়ে তার ভারাক্রান্ত দুঃসহ মুহূর্তগুলো চাপ দেওয়ার প্রবণতা?

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের কবিওয়ালাদের বিষয়ে একজন সংবেদনশীল সমালোচক যা বলেছিলেন, তা বোধ হয় ঐ শতকের পরবর্তী লোকশিল্পীদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, "যে সময় কবিগানের উদ্ভব হয় পশ্চিমবঙ্গের সে এক দুর্যোগের দিন। ...সেদিনের যাহারা কবি, তাহারা দুঃখের দিনের—দুর্দিনেরই কবি। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে সে দুঃখের ছায়াও কাহারও কবিতাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই...দুর জনপদে জমিনদারের বরকন্দাজের হস্তে প্রহৃত রক্তাক্তদেহ গৃহস্বামী গৃহে ফিরিলে বেদনার গুরুভারে যখন সমস্ত গৃহখানি মূক এবং মৌন হইয়া যখন, তখন গৃহস্থিত শিশু যেমন সকলকে নির্বাক দেখিয়া পরিচিত অভ্যস্ত ভঙ্গীতে প্রত্যেকেরই মনোযোগ আকর্ষণ করে, প্রত্যেকেরই কথা শুনিতে হাসিমুখ দেখিতে চেষ্টা করে, কবিওয়ালাগণও ঠিক তেমনই ভাবেই শিশুসুলভ সারল্যে ও চাপল্যে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। সকলকে কথা কহাইতে ও হাসাইতে চাহিয়াছিল।"[৪৮]

৪

কিন্তু বাংলা লোকসংস্কৃতির এই 'শিশুসুলভ সারল্য ও চাপল্য' ইংরেজ শাসনকর্তা ও তাদের প্রবর্তিত শিক্ষায় দীক্ষিত নব্য ভদ্রলোক শ্রেণি বেশিদিন বরদাস্ত করতে পারেনি। আগেই দেখেছি ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ইংরেজ পাদ্রি, আমলা ও শিক্ষাবিদ্‌রা কবিগান, পাঁচালি প্রভৃতির বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগে প্রচার অভিযান আরম্ভ করেছিলেন। এ প্রচারের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল তাঁদের বাঙালি শিষ্য, কর্মচারী ও ছাত্রদের উপর। তৎকালীন ইংরেজ সমাজের মূল্যবোধ—যা তখন এদেশে আমদানি করা হচ্ছিল—তার আলোকে নিজেদের মেজে-ঘষে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার উপযুক্ত কর্মচারীরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আদর্শই এঁদের মূল্য লক্ষ্য ছিল। পূর্ববর্তী বাঙালি জমিদার-বেনিয়ান মুৎসুদ্দির আমলে এক পরিবর্তনকালীন সাংস্কৃতিক পরিবেশে, বর্ণসংকর রুচির পৃষ্ঠপোষকতায়, কবিগান, পাঁচালী, কথকতা যেমন নিম্নবর্গের মানুষের জনপ্রিয় ছিল, আবার উচ্চবর্গের সমর্থন ও প্রশংসাও পেয়েছিল। জোড়াসাঁকোর রামলোচন ঠাকুর (যিনি দ্বারকানাথকে দত্তক পুত্র রেখেছিলেন)-এর বাড়িতে কালোয়াতী গানের অনুষ্ঠানও হয়েছে, রাম বসু হরু ঠাকুরের কবিগানও হয়েছে।[৪৯] সিমুলিয়ার ছাতু বাবু (আশুতোষ দেব)-দের বাড়িতে উত্তর-ভারত থেকে ওস্তাদরা এসে সঙ্গীত পরিবেশন করে গেছেন, আবার গোপাল উড়ের যাত্রাও অনুষ্ঠিত হয়েছে।[৫০]

পরবর্তী যুগে, এঁদের উত্তরাধিকারীরা যাঁরা বাংলা সংস্কৃতি জগতে সর্বময় কর্তারূপে দেখা দিলেন, তাঁরা ইতিমধ্যে নতুন ভাবধারায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। সে ভাবধারায় লোকসংস্কৃতির স্থান ছিল না। হিন্দু কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করে এঁরা সরকারি আমলা, উকিল-মোক্তার, ডাক্তার-অধ্যাপক ইত্যাদি পেশাতে সুপ্রতিষ্ঠিত। চাকুরিতে এঁদের ইংরেজ মনিব ও দেশের ইংরেজ পরিচালক যে লোকসংস্কৃতিকে 'অশ্লীল' বলে বর্জনীয় মনে করতেন, এঁরাও সেই 'অশ্লীল' গান-কথকতা ইত্যাদির ছোঁয়া থেকে নিজেদের গা বাঁচিয়ে একটা স্বতন্ত্র সংস্কৃতি—যেটা শোভন, ভদ্র ও ইংরেজের কাছে সম্মানার্হ হবে—গড়ে তোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

এঁরা যখন আসরে অবতীর্ণ হলেন—অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে—ততদিন কবিগান বিদায় নিয়েছে। ১৮৫৮-র রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত *বিবিধার্থ-সংগ্রহ* থেকে জানতে পারছি যে "কলিকাতার রাজা নবকৃষ্ণ ও তৎপর কয়েকজন ধনাঢ্য ব্যক্তির অপসৃতির পর গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে কবির হ্রাস হইয়াছে।"

কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে—"...কবি ও খেউড়ের সদৃশ অশ্লীল বিনোদ কদাপি বহুকাল ভদ্রসমাজে সমাদৃত থাকিতে পারে না" যেহেতু "জ্ঞানালোকের কিঞ্চিন্‌মাত্র ব্যাপ্তি হইলে অবশ্যই সে ব্যবহার দুষ্যবোধে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।"[৫১]

কিন্তু 'জ্ঞানালোকের ব্যাপ্তি' সত্ত্বেও যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা তখনও জনপ্রিয় লোকসংস্কৃতিরূপে বাংলাদেশে অধিষ্ঠিত। তাই এদের বিরুদ্ধে নব্যশিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকেরা সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। যাত্রার জনপ্রিয়তার নিন্দা করতে গিয়ে এঁদেরই এক প্রতিনিধি লেখেন—"বাজনা, গীত, নাচ আর পালাগুলো সমান জঘন্য। অথচ এরকম প্রমোদে বাঙালিদের এতই আসক্তি যে শত শত লোক সারারাত জেগে যাত্রাগান দেখবে শুনবে। বার বার বেশি যে-সব পালা অভিনীত হয় তার বিষয় কামুক কৃষ্ণ আর সুন্দরী গোয়ালিনী রাধার প্রণয়লীলা, অথবা বিদ্যাসুন্দরের আসঙ্গ। বলা বাহুল্য দর্শক শ্রোতাদের নৈতিক চরিত্রের ওপর এর সর্বনাশা প্রভাব থাকে।"[৫২]

যাত্রার বিরুদ্ধে ভদ্রলোকদের আপত্তির মূল কারণ ছিল যে এটি নিম্নবর্গের লোকশিল্পীদের একচেটিয়া শিল্পকলা হয়ে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত প্রভাব থেকে মুক্ত করে সাদাসিধেভাবে পরিবেশিত করছে (যেটা গোপাল উড়ের গানে লক্ষণীয়) ও হিন্দু দেব-দেবীদের পৌরাণিক উচ্চাসন থেকে নামিয়ে সাধারণ মানব-মানবীতে পরিণত করছে। *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত যাত্রা সম্বন্ধে দুটি প্রবন্ধে এই মনোভাবটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। *বিদ্যাসুন্দর* যাত্রার জনপ্রিয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথম প্রবন্ধটিতে লেখা হয়—"ইহাতে হাস্যরস ব্যতীত আর কোন রসের প্রবলতা নাই।...এক্ষণে...এদেশে হাস্যরসের প্রাধান্য জন্মিয়াছে। নতুবা বিদ্যাসুন্দর যাত্রা কোনক্রমেই সাধারণ প্রিয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না।...যে ভাষায় ইহার গীতগুলি রচিত হইয়াছে, তাহা সরল, অনায়াসেই অপর সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করে..."[৫৩]

দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে বলা হচ্ছে—"অনধিকারীরাই এক্ষণে আমাদের যাত্রার গীত বাঁধে। জেলে মালো কুমার কামার প্রভৃতি অশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে যে কেহ কথায় মিল করিতে পারিল সেই মনে করিল আমি গীত গাঁথিলাম, যাত্রাকর তাহা গান করিয়া ভাবিলেন আমি গীত গাইলাম। শ্রোতারা মনে করিলেন আমরা গীত শুনিলাম।...আধুনিক যাত্রার দোষে কৃষ্ণ রাধাকে গোয়ালা বলিয়া বোধ হয়, পূর্বে কবির গুণে তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া বোধ হইত।"[৫৪]

যে গোপাল উড়ে এ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সম্ভ্রান্ত ঘরে আপ্যায়িত হতেন, তাঁর সম্বন্ধে পরবর্তী যুগের শিক্ষিত ভদ্রলোকের অভিমত—"ভদ্রলোকের বাটীর ভিতর গোপাল উড়ের যাত্রা দেওয়া কোন্ যুক্তির অনুসারী কার্য্য? এই যাত্রার সকল অঙ্গই

প্রায় আদিরস ঘটিত। বিশেষতঃ যখন মালিনী আইসে তখন কোন ভদ্রলোক অনাবৃত কর্ণে বসিয়া স্থির থাকিতে পারেন?"[৫৫]

যাত্রা সম্বন্ধে সে-যুগের ভদ্রলোক সমাজে প্রায় একটা কুসংস্কার গড়ে উঠেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর স্কুল থেকে ভোলানাথ বসু নামে একটি ছাত্রকে বার করে দেন, *বিদ্যাসুন্দর*-এ অভিনয়ের অপরাধে।[৫৬] কৃষ্ণকুমার মিত্র ময়মনসিংহে ছেলেবেলায় যাত্রা দেখতে ভালোবাসতেন। কিন্তু কিশোরগঞ্জ স্কুলের শিক্ষক বিহারীলাল সেন তাঁদের যাত্রা শুনতে বারণ করে দেবার ফলে "আমরা ব্রাহ্ম ছাত্রগণ আর যাত্রাগান শুনিতে যাইতাম না।"[৫৭]

ভদ্রলোকদের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েও যাত্রা কিন্তু নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে তার অতীতের সম্মান নিয়ে বেঁচে ছিল। ১৮৭২ সালে মহেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভাই) ছেলেবেলায় দেখেছিলেন বৃদ্ধ গোবিন্দ অধিকারীর (যিনি উনিশ শতকের মধ্যবর্তী যুগে কৃষ্ণলীলার গান গেয়ে বাংলাদেশকে মাতিয়ে তুলেছিলেন) যাত্রা, যার উদ্যোক্তারা ছিল পাড়ার বস্তির গোয়ালারা।[৫৮]

পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করে ভদ্রলোকেরা নাগরিক লোকসংস্কৃতিকে বেশ কোণঠাসা করতে পেরেছিলেন। ঐ সময়ের একটি সাময়িকপত্র থেকে জানতে পারছি—"এক্ষণে দিন দিন হিন্দু সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্ত সহকারে যেমন লোকের মনের ভাব পরিবর্ত্ত হইতেছে, তেমনি কথকতার প্রাদুর্ভাব হ্রাস পাইতেছে। সুশিক্ষিত দলে ইহা আর অধিকার পায় না, এক্ষণে কেবল অশিক্ষিত দল হইতেই কথঞ্চিৎ ইহার জীবন রক্ষা হইতেছে। অশিক্ষিত দলের মধ্যে কেবল স্ত্রী ও নীচ লোকেরাই ইহার অধিকতর ভক্ত।..."[৫৯]

কিন্তু এই 'নীচ লোকেদের' মধ্যে আমোদ বিতরণ করে যাত্রাওয়ালা বা কথকরা কতদিন আর পেট চালাতে পেরেছিলেন? ভোলা ময়রা বা কেষ্টা মুচির মতো তাঁদের নিজস্ব জাতব্যবসা আর ছিল না। নাগরিক সভ্যতার পরিবেশে তাঁরা পুরোপুরি পেশাদারি হয়ে গিয়েছিলেন। অর্থবান পৃষ্ঠপোষকের সমর্থন ছাড়া তাঁরা বেশিদিন টিকে থাকতে পারেননি।

কলকাতার শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রদায় উনিশ শতকের শেষ থেকে থিয়েটারের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে। "ফলে কলিকাতায় যাত্রার চাহিদা কিছুটা কমিতে থাকে...বর্তমানে যেমন চিৎপুর অঞ্চলে যাত্রার কেন্দ্র তৎকালে ফরাসডাঙ্গাও তেমনি যাত্রার কেন্দ্রে পরিণত হয়।"[৬০]

যাত্রার পালটা হিসেবে ভদ্রলোকেরা ইংরেজি কায়দায় 'থিয়েটার'-এর সূত্রপাত করেন উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই। ঐ শতকের ৭০ দশকে যখন পেশাদারি

মঞ্চ স্থাপিত হয়, তখন শিক্ষিত বাঙালির সামনে নিজস্ব কায়দায়, নিজেদের রুচি অনুযায়ী, মার্জিত ভাষায় নাটক অভিনয়ের সুযোগ খুলে গেল। লোকসংস্কৃতির 'ইতর' শ্রোতা ও দর্শকদের থেকে নিজেদের আলাদা করে নিয়ে শিক্ষিত সমাজের এক সমসাময়িক মুখপত্র লিখল—"আস্তে আস্তে আমাদের সমাজের রুচিতে পরিবর্তন ঘটছে। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীদের কাছে কবিয়াল, পাঁচালীওলাদের অমার্জিত গান আর আগের মতো কদর পায় না। তার জায়গায় দেখা যায় উন্নত প্রকৃতির নাট্যবস্তু এবং আমাদের জগতে উচ্চমানের সাহিত্য গড়ে উঠেছে।"[৬১]

যদিও যাত্রার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে তাঁদের অনেক দিন লেগেছিল (দর্শক টানবার জন্য যাত্রা থেকে দ্বৈত নৃত্যগীত—মেথর-মেথরানি, সাপুড়ে-সাপুড়েনির নাচ, ইত্যাদি—আমদানি করতে হতো) এবং কিছুদিনের জন্য ইংরেজদের কোপানলে পড়তে হয়েছিল (১৮৭৬ সালে ইংরেজ যুবরাজের অভ্যর্থনাকে ব্যঙ্গ করে নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার জের স্বরূপ Dramatic Performances Control Act জারি হয়েছিল)। মোটের উপর বলা চলে শিক্ষিত বাঙালি তাঁদের রচিত নাটকে সংলাপে, অভিনয় ভঙ্গিতে গান-বাজনার একটা বিশিষ্ট ধারার সূত্রপাত করেন, যা চারিপাশের 'ইতর শ্রেণীর' যাত্রা থেকে ছিল আলাদা।

ইংরেজ শাসনকর্তাদের আশীর্বাদ পেতেও বেশি দেরি হয়নি। ১৮৭৮-এর জানুয়ারিতে বড়োলাট লর্ড লিটন ও তার পত্নী 'বেঙ্গল থিয়েটার-এর' মঞ্চে *শকুন্তলা* নাটক দেখতে এসে বাঙালি ভদ্রলোক সমাজকে কৃতার্থ করলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, মনে হলো, সত্যিই এতদিন পরে গা থেকে যাত্রা পাঁচালীর 'ইতর' গন্ধটা ঝেড়ে ফেলতে পেরেছে। তার রুচির উন্নতির প্রশংসা করে একজন বাঙালি ভদ্রলোক লিখলেন—"সাবেকি যাত্রা ও কবি ছেড়ে বাঙালি বাবুর রুচি ক্রমেই থিয়েটারের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, আর দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের উচ্ছেদ করে আসছে ইউরোপীয় ফ্লুট, কনস্যারটিনা, হারমোনিয়াম, অর্গান এবং পিয়ানো। পুরনো, সেকেলে ব্যবস্থার তুলনায় তা অবশ্যই উন্নতি যাতে ক্রমশ মার্জিত রুচি গঠনের পরিচয় রয়েছে।"[৬২]

যদিও থিয়েটারে ভদ্রলোকেরা বিনোদনের এক নিজস্ব পথ খুঁজে পেলেন, এবং যাত্রা পাঁচালী থেকে নিজেদের সরিয়ে এনে এই বিকল্প অভিনয়শৈলীর চর্চায় মনোনিবেশ করলেন, তবু 'ইতর' শ্রেণির লোকসংস্কৃতিকে তাঁদের চোখের সমুখ থেকে যতদিন না উৎখাত করতে পেরেছিলেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁরা নিস্তার বোধ করেননি। যাত্রা-পাঁচালী-কথকতা-সঙ—এই ধরনের লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠানগুলি যেহেতু সে-যুগে প্রকাশ্যে,

হাটে-বাজারে, মেলা-পরবে হতো, ভদ্রসমাজের নব্য-অর্জিত গোঁড়া রুচিবোধ এই উন্মুক্ত প্রদর্শন কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। সে-যুগের শিক্ষিত শ্রেণি-সম্পাদিত কাগজপত্রে তাই বারংবার এগুলি বন্ধ করার দাবি উঠেছে। "পাঁচালী ও যাত্রার দলের লোকেরা...হাজার দুই হাজার লোকের সম্মুখে অম্লান বদনে অকুণ্ঠিত মনে মুখে যাহা আইসে তাহাই বলে, সুর তাল মানের সঙ্গে অতিশয় কুৎসিত গান গাইতে এতটুকু লজ্জাবোধ করে না..."[৬৩]

ভদ্রলোক সমাজের শিক্ষিত পুরুষরা এ-সবের রস আহরণে নিবৃত হলেও, তাঁদের স্ত্রী-কন্যারা কিন্তু তখনও এগুলি শুনবার জন্য আগ্রহী ছিলেন। আসন্ন বিপদের লক্ষণ হিসেবে 'কথকতা'-কে চিহ্নিত করে একটি সাময়িকপত্র হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, "কৃষ্ণলীলা বর্ণনাসরে রাম ও বস্ত্র হরণাদি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অশিক্ষিত যুবতীর চিত্ত অবিচলিত থাকা সম্ভাবিত নয়।...এক্ষণে আমাদিগের প্রস্তাব এই, বিষয়টি যখন এত দোষের আকর হইয়া উঠিয়াছে, তখন ভদ্রলোকদিগের এ বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া আর বিধেয় হয় না।"[৬৪]

কলকাতার রাস্তাঘাট থেকে 'ইতরশ্রেণী'র এই-সব উৎপাত তুলে দেবার সংকল্পে অবশেষে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা ১৮৭৩-এর ২০ সেপ্টেম্বর টাউন হলে সমবেত হয়ে Society for the Suppression of Public Obscenity প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল "জনসাধারণের শুদ্ধতা রক্ষা-কল্পে বিধিবদ্ধ পিনাল কোড এবং প্রিন্টিং অ্যাক্ট-এর ধারাগুলি প্রয়োগে সরকারকে সাহায্য" এবং "সেই সংকল্পের ঘোষণা যে দেশের নবজায়মান সাহিত্যকে কখনোই আর দূষিত বা দূষণকারী হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে ফেলা চলবে না।"[৬৫]

এঁদেরই উৎসাহে পরের বছর কাঁসারীপাড়ার সঙের মিছিল বন্ধ করার চেষ্টা করেন তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার হগ্ সাহেব (যার নামে হগ্ মার্কেট বা আজকের নিউ মার্কেট)। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টা সফল হয়নি। কাঁসারীপাড়ার সঙেরা সেদিন বাবুদের ঠাট্টা করে গেয়েছিলেন—

শহরে এক নূতন হুজুগ
উঠেছে রে ভাই,
অশ্লীলতা শব্দ মোরা আগে শুনি নাই;
এর বিদ্যাসাগর জন্মদাতা
বঙ্গদর্শন এর নেতা

বৎসরান্তে একটি দিন
কাঁসারীরা যত,
নেচে কুঁদে বেড়ায় সুখে
দেখে লোকে কত
এত গরিব লোকের আমোদ বড়
সভ্যতার মাথাব্যথা।
. . .
যদি ইহা এত মন্দ
মনে ভেবে থাকো,
নিজের মাগ্‌কে চাবি দিয়ে
বন্ধ করে রাখ।[৬৬]

১৮৭৪-এ কাঁসারীপাড়ার সঙদের বিরুদ্ধে যে অভিযান, সেটাকে বলা যেতে পারে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংস্কৃতি জগতে দুই ভিন্নধর্মী ধারার সংঘাতের এক চরম অভিব্যক্তি। এক দিকে অভিজাতদের শিল্প-সাহিত্য, অন্য দিকে নিম্নবর্গের গান-বাজনা— এ দুটি ধারা সমস্ত শতক ধরে নানা বিচিত্র পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। শুরুতে ছিল এক ধরনের অস্বস্তিকর সহাবস্থান যখন এক যুগসন্ধিক্ষণে উভয়েই নিজেদের উপযুক্ত ভাষা খুঁজছিল। বিলীয়মান মোগল সাম্রাজ্য থেকে প্রাপ্ত দরবারি নৃত্য ও সঙ্গীত, অতীতের সংস্কৃত সাহিত্য, পারিপার্শ্বিক লোকসংস্কৃতি ও নব্য আগত পাশ্চাত্য সংস্কৃতি—এই সবকিছুর মধ্যে হাতড়ে বেড়িয়েছে। অপর পক্ষে, নিম্নবর্গের কবিওয়ালারা ঐতিহ্যাশ্রয়ী পৌরাণিক ধর্মভাব ও পরিবর্তনশীল নাগরিক সভ্যতার সামাজিক অরাজকতার ধর্মনিরপেক্ষতার টানাপোড়েনে দ্বিধাগ্রস্ত।

মধ্যবর্তী পর্যায়ে, পুরোনো পৃষ্ঠপোষকেরা বিদায় নিয়েছেন ও নতুন শিক্ষিত ভদ্রলোক সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক রুচি নিয়ে গড়ে উঠছেন। কথ্য ভাষায় প্রচলিত তদ্ভব ও দেশিবিদেশি শব্দের পরিবর্তে সংস্কৃত তৎসম শব্দ ব্যবহার করে ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের 'রোমান্টিক' ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে গুরুগম্ভীর কাব্য-উপন্যাস নাটক-প্রবন্ধ রচনা করে তাঁরা 'ইতর' সাধারণ থেকে নিজেদের আলাদা করতে ব্যস্ত। অন্য দিকে যাত্রা-পাঁচালী প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির সৃষ্টিকর্মে পৌরাণিক পালার পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়বস্তু (যেমন *বিদ্যাসুন্দর*-এর লৌকিক সংস্করণ) ও সমসাময়িক সমাজের রীতিনীতিগুলিকে একেবারে রাস্তার মানুষের অমার্জিত ভাষায়, বিদ্রূপাত্মক টিপ্পনীর সঙ্গে প্রকাশের প্রবণতা (যেমন সঙের গানে)। স্পষ্টতই,

দুটি ধারা ক্রমশই দুই বিপরীত মেরুর দিকে ধাবমান। পৃষ্ঠপোষকদের অর্থানুকূল্য থেকে বঞ্চিত এই লোকশিল্পীরা মধ্যবর্তী যুগে এক অসমকক্ষ অবস্থান থেকে ভদ্রলোক সংস্কৃতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন। থিয়েটারের সামনে যাত্রাকে পিছু হটতে হলো। এ সত্ত্বেও নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে লোকসংস্কৃতির সরব উপস্থিতি দেখা গেছে রাস্তায়-ঘাটে, হাটে-বাজারে, মেলা-পার্বণে। এই সোচ্চার সংস্কৃতির সবচেয়ে জঙ্গি অভিব্যক্তি ছিল সঙ—যেখানে উচ্চশ্রেণির মানুষদের আচার-আচরণকে সরাসরি, রাখ-ঢাক না রেখে বিদ্রূপ করা হতো।

এই দুই ভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারার সংঘাতের শেষ পর্যায়, অসহিষ্ণু অভিজাতবর্গ ইংরেজ শাসকদের ছত্রছায়ায় আইনের অস্ত্র নিয়ে নিম্নশ্রেণির বিনোদনের রাস্তাগুলি বন্ধ করে দিতে উদ্যোগী হলেন। এর ফলে বাংলা লোকসংস্কৃতির যে শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল, তার বর্ণনা করতে গিয়ে তৎকালীন একটি সাময়িক পত্র প্রশ্ন তুলেছিল—"এক্ষণে সামান্য লোকের আমোদ আহ্লাদ ও উৎসব তো সকলি একে একে শেষ হইতেছে। এক্ষণে যাত্রা নাই, পাঁচালী নাই, কবির তো কথাই নাই। সামান্য লোকেরা কি লইয়া থাকিবেক? কেবল ধান্যেশ্বরী। আর ছোবড়া টেনে কি দিনপাত হয়?..."

সামান্য লোকের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরা কিন্তু তাঁদের ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন নির্ভুল অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। কাঁসারীপাড়ার সঙেরা ভদ্রলোকেদের আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গান গেয়েছিলেন,

সস্তা দরে মস্ত নাম
কিনতে যত লোক,
এই সুযোগে তাদের
সবার ফুটে গেল চোক;
গরিবের মাথায় কাঁঠাল
ভেঙে এরা ভাই
ইংরেজদের কাছে কেমন
দেখাচ্ছে বড়াই।[৬৮]

টীকা

১. 'অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল নৃত্য উত্তর ভারত অঞ্চল হইতে বাংলাদেশে প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহার মধ্যে খেমটা বা বাঈজী নাচ অন্যতম।' (আশুতোষ ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.৮৯) '...the nautch and the khemta (the khemta dance is

merely a corrupt form of Nautch)...were imported into Bengal in comparatively recent times from northern Indian cities', (Gurusaday Dutta, p. 14)

২. 'যাত্রা', *বঙ্গদর্শন*, কার্ত্তিক, ১২৮০। যতদূর জানা যায়, বাঈ নর্তকীরা কলকাতায় এসেছিলেন উত্তর-ভারত থেকে। যেহেতু মহারাষ্ট্রে মহিলাদের উপাধি বাঈ, তার থেকেই কি *বঙ্গদর্শন*-এর-লেখক অনুমান করেছিলেন যে এই নর্তকীরা মহারাষ্ট্র থেকে আসছেন?

৩. *সাধারণী*, ২১ অগ্রহায়ণ ১২৮১।

৪. *মধ্যস্থ*, অগ্রহায়ণ ১২৮০।

৫. *Hindoo Patriot*, November 6, 1871। উদ্ধৃতি অনূদিত।

৬. ঐ, উদ্ধৃতি অনূদিত।

৭. Shib Chunder Bose, p. 121.

৮. ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৯৩।

৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৯।

১০. গৌরীশংকর ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২৩৬-৩৭।

১১. বিপিনবিহারী গুপ্ত, পৃ. ২৮১।

১২. Shib Chunder Bose, pp. 118-19 উদ্ধৃতি অনূদিত।

১৩. 'The English in India Our Social Morality', দ্র *Calcutta Review*, No, II ; Vol. I, 1844.
জ্ঞানান্বেষণ, ২৬ অক্টোবর; ১৮৩৯—ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৮৭।

১৪. N. N. Ghosh, 'Memoirs of Maharaja Nabkissen' in Raja Binaya Krishna Deb p. 192 উদ্ধৃতি অনূদিত।

১৫. পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ির সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টির ছাত্ররা অধিকাংশই ছিলেন বাঙালি ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'Public Opinion and Official Communications about the Bengal Music School and its President', Calcutta. 1876.

১৬. William Jones and N. A. Willard, pp. 3-13.

১৭. *সাধারণী*, ২১শে অগ্রহায়ণ ১২৮১।

১৮. "...The Evangelism of the early Victorian period was a dismal gloomy religion and a ripe breeding ground for bigotry". Michel Brander, p. 110.

১৯. *Calcutta Christian Observer*, March 1834. No. 22. p. 115. উদ্ধৃতি অনূদিত। এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটিও উল্লেখযোগ্য—"We must candidly own that, to judge from present appearances ; the hope of any material improvement in Bengali literature is not likely to be realized very soon, unless the Bible should become a popular book"—*Calcutta Review*, Vol. XIII, No. XXVI, 1850, p. 257-83.

২০. *Calcutta Review*, উদ্ধৃতি অনূদিত।

২১. *Calcutta School Book Society*, '3rd Report, 1819-20', Appendix No. II, p. 47. উদ্ধৃতি অনূদিত।

২২. W.M. Thackeray, p. 89. উদ্ধৃতি অনূদিত।

২৩. জয়নারায়ণ ঘোষাল, পৃ. ২৪৭।

২৪. "জগন্মোহিনী নামে কাণ জাতীয়...একটি স্ত্রীলোক ঢপের কীর্ত্তণে অসাধারণ যশস্বিনী হইয়াছিল। জগন্মোহিনীর পর ঢপ তৎকালীন লোকে অতিশয় আদর করিতেন। তাহার যেমন বাক্-পরিষ্কার তেমনি স্বরসঞ্চার ছিল..."—*বিশ্বকোষ*, চতুর্থ ভাগ, ১৩০০, পৃ. ৪৩৪-৩৫।

"উনিশ শতকের প্রথম দিকে কীর্তনের সুর-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া এবং তাহার সঙ্গে কথকতার ঢং যুক্ত করিয়া ঢপ কীর্তনের সৃষ্টি হয়।...পরে ইহা শহরাঞ্চলের মেয়ে কীর্তনিয়াদের একচেটিয়া হইয়া পড়ে।"—হরিপদ চক্রবর্তী, পৃ. ৭৩।

২৫. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১৩২।

২৬. দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ১৮৪।

২৭. Purnachandra De Udbhatsagar, 'Calcutta of Old : Its Streets and Lanes II'—*Calcutta Municipal Gazette*, December 25, 1926.

২৮. *বিশ্বকোষ*, তৃতীয় খণ্ড, ১২৯৯।

২৯. *ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১১০। ঐ সময়ে, যাত্রা অভিনয়ে ও রচনায় যাঁরা নাম করেন তাঁদের অধিকাংশই এসেছিলেন নিম্নবর্গ থেকে। গোপাল উড়ের পূর্বসূরিদের মধ্যে ছিলেন ঠাকরো যুগী, শিবে যুগী, নন্দ যুগী, প্যারীমোহন নামে এক ভিক্ষুক বেহালাবাদক, প্রভৃতি। দ্রষ্টব্য—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ খণ্ড পৃ. ৫৫৯-৬০।

৩০. ঐ পৃ. ১১৮।

৩১. বসন্তক, পঞ্চম সংখ্যা, ১২৮১।

৩২. 'রাধামাধব করের স্মৃতিকথন'—(বিপিনবিহারী গুপ্ত), পৃ. ২৫৪-৬০।

৩৩. হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৬৩৯।

৩৪. হরিপদ চক্রবর্তী, পৃ. ১৩-১৪।

৩৫. *ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী* প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৬৭।

৩৬. প্রফুল্লচন্দ্র পাল, পৃ. ২।।০।

৩৭. অজ্ঞাত; বৈষ্ণবচরণ বসাক, পৃ. ৩৭২-৭৩।

৩৮. প্রফুল্লচন্দ্র পাল, পৃ. ৫।০। এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করে পর্তুগিজ সাহেব আন্টুনি নাকি হিন্দু হয়ে যান বলে শোনা যায়।

৩৯. ঐ।

৪০. দীনেশ সেন (১৯১৪), পৃ. ১৬২৬-২৭।

৪১. ঐ।

৪১ক. দীনেশ সেন (১৮৯৬), পৃ. ৩৭৬।

৪১খ. *দেশ*, ১০ চৈত্র ১৩৬২, পৃ. ৫৭৪।
৪২. হরিপদ চক্রবর্তী, পৃ. ৩৭৫।
৪৩. দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ৩৬১।
৪৪. ঐ, পৃ. ২০৭।
৪৫. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ২১১-১২।
৪৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৪৩।
৪৭. এ প্রসঙ্গে ডা. রণজিৎকুমার সমাদ্দারের বহু তথ্য-সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা 'বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব (সন্ন্যাসী থেকে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত)', কলিকাতা, ১৯৮২, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।।
৪৮. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ১৯৭২, পৃ. ১১৯-২২।
৪৯. নগেন্দ্রনাথ বসু, পৃ. ৩২১।
৫০. দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ৩৬১, ৪৩০।
৫১. *বিবিধার্থ সংগ্রহ*, ৫৮ খণ্ড, মাঘ শকাব্দ ১৭৮০।
৫২. Hur Chunder Dutta থেকে উদ্ধৃতি অনূদিত।
৫৩. 'যাত্রা', *বঙ্গদর্শন*, প্রথম খণ্ড, পৌষ ১২৭৯।
৫৪. 'যাত্রা' ঐ, কার্তিক, ১২৮০।
৫৫. 'দর্শকের চিঠি', *সোমপ্রকাশ*, ২২ বৈশাখ, ১২৭১।
৫৬. যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের স্মৃতিকথন (বিপিনবিহারী গুপ্ত), পৃ. ২৭৫।
৫৭. কৃষ্ণকুমার মিত্র, পৃ. ৪১।
৫৮. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ২৪-২৫।
৫৯. *সোমপ্রকাশ*, ২৩ চৈত্র ১২৭০।
৬০. গৌরীশংকর ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২৪২
৬১. *Bengalee*, September 27, 1873. উদ্ধৃতি অনূদিত।
৬২. Shib Chunder Bose, p. 221 উদ্ধৃতি অনূদিত।
৬৩. *সুলভ সমাচার*, ৭ ভাদ্র ১২৭৮।
৬৪. *সোমপ্রকাশ* ২৩ চৈত্র ১২৭০।
৬৫. *Friend of India*, September 25, 1873, উদ্ধৃতি অনূদিত।
৬৬. বসন্তক, দ্বিতীয় পর্ব, দশম সংখ্যা, ১৮৭৪।
৬৭. ঐ।
৬৮. ঐ।

—

কালীঘাটের পট
তৎকালীন সমাজ ও আধুনিক মূল্যায়ন

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির জগতে যে নতুন চিন্তার আলোড়ন এসেছিল, তার স্নায়ুকেন্দ্র ছিল কলকাতা। আর এর আওতাতেই বাংলা সাহিত্যে নব-কলেবর পরিগ্রহ করে ব্যাপক বিস্তৃতির পথে যাত্রা শুরু করে। এ কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই যে সে-যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার-আন্দোলন এবং সাহিত্য-রচনা—উভয় ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তদানীন্তন মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, ইংরেজি শিক্ষার গুণে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভাবধারা যাঁদের চিন্তার শিরা-উপশিরায় গিয়ে প্রবেশ করেছিল, ঐতিহ্যকে যাঁরা যুক্তির মানদণ্ডে বসিয়ে তার নতুন ব্যাখ্যায় ব্রতী হয়েছিলেন। নিত্য-নতুন-চিন্তাপুষ্ট এইসব আন্দোলনের ঝড়ে কলকাতার হাওয়া-বাতাস যখন কম্পিত, তখন এই কলকাতারই বুকের উপর একেবারে স্বতন্ত্র আর-এক জাতীয় মানুষ এক ভিন্ন সংস্কৃতির চর্চায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন। যেসব কবিগান ও পাঁচালী শুনতে সে যুগের কলকাতার লোক ভেঙে পড়ত, তাতে সমসাময়িক সামাজিক আন্দোলনের বা কোম্পানির শাসনে দুরবস্থার উল্লেখ থাকলেও কবিওয়ালারা মূলত বিচ্ছিন্ন ছিলেন তদানীন্তন চিন্তানায়কদের জগত থেকে। এঁদের শিল্পকর্মের পরিণতি বাংলাদেশের গ্রামের প্রাচীন কবির লড়াই, যাত্রাগান ইত্যাদির ধারা

বেয়ে। অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার শহুরে হাওয়ায় কবিগানের গ্রাম্য-বোল কিছুটা পালটে গেছল। যাই হোক, গত শতাব্দীর বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সাহিত্যিক অবদানের সামাজিক মূল্য বিচারের বাগ্‌বিতণ্ডায় আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি সে-যুগের এই লোকশিল্পের কথা—যার আদিপর্ব গ্রামের সঙ্গে জড়িত হলেও, শহুরে জীবনযাত্রার পরিবর্তনগুলিতে সাড়া দিয়ে একটা নতুন ধরনের শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছিল। এই শহরকেন্দ্রিক নতুন লোকশিল্পেরই সমগোত্রীয় তদানীন্তন কালীঘাটের পট। কবিগান বা পাঁচালির মতো, এরও উৎস ছিল প্রাচীন গ্রাম্য আঁকার ঐতিহ্যে। বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাজগতের থেকে দূরে বসেও, কালীঘাটের পটুয়ারা তৎকালীন কলকাতার সামাজিক জীবনকে তাঁদের পটে অক্ষয় করে রেখে গেছেন। ফলে ঐতিহ্যাশ্রয়ী প্রাচীন-পট ও নব্য কলকাতার লোকশিল্পীর আঁকা পট, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক—সবদিক থেকেই হল আলাদা। কবিগান ও পাঁচালির নিরক্ষর অশিক্ষিত শ্রোতারাই কালীঘাটের পটের একমাত্র খরিদ্দার ছিল। কবিওয়ালারা এদিক থেকে সৌভাগ্যবান ছিলেন, তাঁদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সে-যুগের অর্থশালী বাবু সম্প্রদায়, যার ফলে অবশ্য শিল্পীদের ভরণ-পোষণের সমস্যা মিটলেও তাদের শিল্পকর্ম 'বাবু' মুখাপেক্ষী হতে গিয়ে এক ধরনের 'ডেকাডেন্ট' সংস্কৃতির কবলে গিয়ে পড়েছিল। অপরপক্ষে কালীঘাটের পট অনেক বেশি স্বাধীনচেতা হয়েও, দরিদ্র জনসাধারণকেই একমাত্র পৃষ্ঠপোষক পেয়ে 'জর্মান' ওলিওগ্রাফ-এর সঙ্গে লড়াই করতে করতে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হল। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার লোকশিল্পের শৈল্পিক সম্ভাবনা তাই অচিরেই বিলুপ্ত হয়েছিল।

কালীঘাটের বর্তমান মন্দিরটি স্থাপিত হয় ১৮০৯ সালে, প্রাচীন কলকাতার জমিদারবংশ সাবর্ণ চৌধুরীদের উত্তরাধিকারী সন্তোষ রায়ের অর্থানুকূল্যে। এর কিছুকাল পরে আশেপাশে হাটবাজারের প্রচলন হয়। তীর্থযাত্রীদের ক্রমবর্ধমান ভিড়ের উৎসাহেই দোকানপাটের সূত্রপাত। অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পটুয়ারা এসেও তাদের বসতি গড়ে। কী করে তীর্থযাত্রীদের জন্য স্বল্প-মূল্যে দেব-দেবীদের ও পরে সমসাময়িক ঘটনার ছবি এঁকে বিক্রি করা হতো, কীভাবে বৌবাজার আর্ট-স্টুডিওতে প্রস্তুত ছবি ও জর্মান ওলিওগ্রাফের প্রকোপে পড়ে এ শতাব্দীর শুরুতেই তাদের পট আঁকার পরিসমাপ্তি ঘটল—এ ইতিহাস ইতিপূর্বে বহু প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। কালীঘাটের শিল্পীদের সমাজসচেতনতা তাঁদের ছবির তুলির টানে মূর্ত। এ সমাজসচেতনতা তাঁদের পূর্বপুরুষ পটুয়াদের কাছ থেকে অর্জিত জনসংযোগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। গ্রাম্য পটে শ্রীকৃষ্ণকে আঁকা হতো সাধারণ গ্রামবাসীর কল্পনার সঙ্গে তার চেনা পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে। শহুরে এসে, কাগজের বুকে, স্বল্প রং-

কালির ছোঁয়ায়, পট আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে এল জনসাধারণের কাছে। শহুরে জীবনযাত্রার দৈনিক ঘটনা, পরিচিত মানুষ নতুন নায়কের স্থান দখল করল। বিনা চেষ্টায়, একেবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তদানীন্তন সমাজ যে-ভাবে কালীঘাটের পটে উঠে এসেছিল, তার নেপথ্যে শিল্পীদের তীক্ষ্ণ সমাজবোধের পরিচয় মেলে। মনে রাখা দরকার যে কালীঘাটের পটে নিছক বিবরণীর বৈচিত্র্যহীনতা নেই; অঙ্কনশৈলীতে একটা বিশেষ মেজাজ, একটা দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সুরটা বেশ স্পষ্ট। শুধু 'বাবু' সম্প্রদায় নয়, স্বসমাজভক্ত ভণ্ডরাও উপহাসের হাত থেকে রেহাই পায়নি। এইসব কারণেই কালীঘাটের পটুয়াদের সমাজচেতনার একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তদানীন্তন সমাজসংস্কারক বুদ্ধিজীবীদের পৃষ্ঠপোষকতা যদি তাঁরা লাভ করতেন তাহলে হয়তো বাংলাদেশে একটা নতুন শিল্পকলার সূত্রপাত হতে পারত। কিন্তু এ কষ্টকল্পনা মাত্র। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর শহরকেন্দ্রিক বাঙালি সাহিত্যিক বা সংস্কৃতিবিদ্‌দের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির যোগাযোগ ছিল না বললেই হয়, দুটি স্বতন্ত্র ধারার মধ্যে সেতুকল্প ছিলেন একমাত্র গুপ্ত-কবি। এবং পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথের আনুকূল্যেই লোকসংস্কৃতি ও বুদ্ধিপ্রধান সাহিত্যিক সমাজের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং সে-যুগে পাশ্চাত্যের বাস্তবানুকরণধর্মী তৈলচিত্র দর্শনে অভ্যস্ত শিক্ষিত শিল্প-রসজ্ঞদের কাছ থেকে কালীঘাটের বাস্তব-বিকৃত ছন্দ-প্রধান পটের যথোচিত গুণাবধারণ আশা করাটা অন্যায়। তাঁরা পাশ্চাত্য তৈলচিত্রের গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাস্কর্যের বা দরবারি শিল্পের মূল্যায়নে উৎসাহিত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু গ্রাম্য লোকসংস্কৃতির প্রতি একটা সাংস্কৃতিক কুসংস্কারের ভাব থেকে গিয়েছিল। এটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও, এই ধরনের মনোভাবটা অবশ্যম্ভাবী ছিল; সে-যুগের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের হোতাদের শ্রেণিচরিত্রের সঙ্গে এটা জড়িত। তদানীন্তন একজন শিল্প-সমালোচকের বক্তব্যের মধ্যেই লোকশিল্পের প্রতি এই উন্নাসিকতাটা ধরা পড়ে।

"...কালিদাস প্রভৃতির নাটকের তুলনায় এখনকার যাত্রা নাটক যেরূপ, ঐ সময়ের চিত্র-রচনার তুলনায় বর্তমান প্রচলিত পটচিত্রও সেইরূপ দিব্যশ্রী প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব এদেশে শকুন্তলা, মালতীমাধব প্রভৃতি নাটক সকল সমূলে উন্মুলিত হইয়া তাহার স্থানে যাত্রা প্রভৃতি সামান্য গীতনাটক অবলীলাক্রমে রাজত্ব করিয়া আসিতেছে, সেদেশের পুরাকালের কবিত্বসূচক চিত্রলেখার স্থানে যে এক্ষণকার নির্জীব ও কিম্ভূত চিত্ররচনা সকল পদার্পণ করিতে সাহসী হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?"—('সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্যজাতির শিল্প চাতুরি'—শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানী।)

আজকে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে দেখলে, কালীঘাটের পটের সমসাময়িক জনপ্রিয়তার কারণ ও আধুনিক শিল্পের ক্ষেত্রে তার আলোচনার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে দীনবন্ধু মিত্রের বিদ্রূপাত্মক নাটক, কালীপ্রসন্ন সিংহের সামাজিক নকশা এবং ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গাত্মক কবিতার পরিপূরক কালীঘাটের পট। *হুতোম প্যাঁচার নক্শা*-য় যে হঠাৎ অবতার, বারবনিতা, চড়ক-পার্বণের সন্ন্যাসীরা ভিড় করে রয়েছে, তাদেরই দেখতে পাই কালীঘাটের পটে। একটি বহু-ব্যবহৃত motif হচ্ছে, কলকাতার ''বাবু''—ঊনবিংশ শতাব্দীর শহুরে জীবনের একটি বিশিষ্ট অবদান। মাথায় তরঙ্গায়িত বাবরি চুল, পরিধানে ফিনফিনে কালাপেড়ে ধুতি, চুনট করা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগলস সমন্বিত কালো জুতো। কখনও বাবু বীণা বাজাচ্ছেন, কখনও বাবু বাড়ির বাইরে যাবেন স্ফূর্তি করতে, নিরাভরণা ক্রন্দনরতা স্ত্রী পায়ের কাছে লুটিয়ে, আবার কখনও বাবু তার প্রেয়সীর সঙ্গে মদ্যপান-রত। দীনবন্ধুর *সধবার একাদশী*কে যেন চিত্রিত করা হয়েছে। পটে অঙ্কিত নায়িকারাও সে-যুগের পরিচিত মানুষ। বীণা-বাদিকার ফুল হাতে প্রসাধনরতা মহিলাদের ছবিরই বোধহয় সবচেয়ে দাবি ছিল। আসলে সমকালীন সম্পন্ন মধ্যবিত্ত সমাজের দুর্নীতি ও ব্যভিচারের বিরুদ্ধে পটুয়াদের বিদ্রূপ তুলির টানে প্রকাশ পেয়েছিল। কেবল অল্প-ইংরেজি-শিক্ষিত শৌখিন বাবুও তাদের মোসাহেবেরাই পটুয়াদের উপহাস্যাস্পদ ছিল না, নিজেদের সমাজভুক্ত বৈষ্ণব সাধুরাও এ উপহাসের শিকার হয়েছিল। স্ফীতোদর হাতে জপের-মালা মুণ্ডিত-মস্তক, আবার তার উপর একটা কালো-পাখির অবস্থিতি—সব মিলিয়ে ভণ্ডামির আবহাওয়াটা সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। অবশ্য বিদ্রূপটা আরও সূক্ষ্মভাবে চাবুক মারে আর একটি ছবিতে—একটি বিড়াল মুখে মাছ নিয়ে চেয়ে রয়েছে; তার কপালে চন্দনের তিলক, গলায় তুলসীর মালা। মাইকেলের *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ*-র মেজাজের সঙ্গে মিল পাওয়াটা দুরূহ নয়। বা আরও কাছকাছি হয়তো সমসাময়িক কবিওয়ালা এন্টনি ফিরিঙ্গির গানের কলিটি!

তোমরা পয়সা পেলে, হেসে খেলে,
সাদায় কর কালো।
তোমাদের গোঁসাই চেয়ে আমি বলি
কসাই তবু ভালো।

এ ছাড়াও সমসাময়িক ঘটনা যা মানুষের মনে রেখাপাত করত, পথে-ঘাটে যা নিয়ে আলোচনা হতো, তারও ছবি পাই কালীঘাটের পটে। শ্যামাকান্তর সঙ্গে বাঘের লড়াই নিয়ে একাধিক ছবি আঁকা হয়েছে। এই ধরনের তীক্ষ্ণ সমাজসচেতনতা ও বিদ্রূপের বলিষ্ঠ কায়দা, কালীঘাটের পটকে তদানীন্তন জনসাধারণের কাছে এত আদরণীয় করে তুলেছিল। সস্তায় দেব-দেবীর ছবি পাওয়ার সুবিধা ছাড়াও পরিচিতি দৃশ্য জগতের

সরস চিত্রণ উপভোগ করার একটা স্বাভাবিক আনন্দ ছিল। একদিকে এই ব্যাপক জন-সংযোগ আর অন্যদিকে মধ্যবিত্ত সমাজের লাম্পট্য-ব্যভিচারের বিরুদ্ধে ধিক্কার—এই দৃষ্টি বৈশিষ্ট্যের জোরে কালীঘাটের পট-শিল্প তৎকালীন মননশীল সাহিত্যিক-সমাজের উপেক্ষিত কিন্তু সত্যপরায়ণ সম্পূরক বলে দাবি করতে পারে। পদস্খলন মাঝে মাঝে ঘটেছে, সেটা শিক্ষার অভাব-প্রসূত, যুক্তি-তর্ক দিয়ে নতুনকে যাচাই করে নেবার অক্ষমতাজনিত। তাই দেখতে পাওয়া যায়, ঝোঁকটা কখনো-কখনো পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরুদ্ধে গিয়ে পড়েছে। ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজের সব কিছুই উপহাসের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে অনেক সময়। শিক্ষিত সমাজের বিচক্ষণ পরিচালনা যদি তাঁরা পেতেন, তাহলে হয়তো দৃষ্টিভঙ্গিটা অনেক স্বচ্ছ হয়ে উঠত।

কোনো-এক আধুনিক সমালোচক আক্ষেপ করেছেন, কালীঘাটের পট হোগার্থ বা দ্যমিয়ের ছবির মতো সূক্ষ্ম আঘাতে রূপায়িত হয়নি। মৃন্ময়, প্রাণহীন পুতুলের সংসারের আখ্যান হয়ে গেল। আসলে বিদ্রূপ বা শ্লেষের প্রকাশভঙ্গি যে সব দেশে সব যুগেই একই ধরনের হবে, এমন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কালীঘাটের পটের চরিত্ররা যে স্থূলভাবে অঙ্কিত হয়েছে, গোলগাল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিন্যাসে, তার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে প্রাচীন গ্রাম্য পটে আর পটুয়া চিত্রকরদের ছবি আঁকার উপকরণের পুঁজির মধ্যে। প্রথমত মনে রাখতে হবে, কালীঘাটের পটের আঁকবার ধাঁচে বহুলাংশে পুরোনো পটাশ্রয়ী। শ্রীকৃষ্ণের জীবনীর বিবরণ-সংবলিত জড়ানপটে ফিগারগুলি সবসময়ই গোলাকৃতি; স্থূল হাত-পা। রেখা টেনে, একটা রং-এ 'আউট লাইন'টিকে ভরিয়ে দেওয়া হতো। ফলে ছবিগুলি হতো 'ফ্ল্যাট', কোনো ঘনত্ব থাকত না। কলকাতার পটুয়ারা যখন কাগজে আঁকতে শুরু করলেন এই প্রচলিত রীতিটি কিছুটা রূপান্তরিত হলো। ফিগারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সীমারেখায় ছায়া বা 'শেডিং' দেওয়া হতে লাগল, ফলে আগে যে ফিগারগুলোকে চ্যাপটা মনে হত, এবার তাদের দেহের ঘনত্ব ও মণ্ডলাকৃতির আভাস পাওয়া গেল, ইংরেজিতে যাকে বলা হয়ে থাকে volume। সুতরাং জড়ানপটের পুরোনো স্থূল চরিত্রগুলি এবার আরও স্ফীত হয়ে কাগজ থেকে বেরিয়ে রইল! 'শেডিং' দিয়ে ঘনত্ব দেখানোর এই রীতিতে কতখানি সমসাময়িক ইংরেজ শিল্পীদের প্রভাব পড়েছে, কতখানি পটুয়াদের প্রতিমা গড়ার প্রভাব রয়েছে, সে চুলচেরা আলোচনার মধ্যে না গিয়ে একটা কথা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে কালীঘাটের ফিগারে স্ফীত ভাবটা, পটুয়াদের বিদ্রূপের উদ্দেশ্যটাকে আরও সফল করেছে। সামাজিক অবক্ষয়ের একমাত্র প্রতিনিধি হতাশা বা কৃশতা নয়। ধন-গৌরবের স্ফীতাবস্থা, অতি-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্রয়, আমাদের নির্লজ্জ আস্ফালন—এসবই 'ডেকাডেনস'-

এর অব্যর্থ চিহ্ন। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় একদিকে যেমন নতুন চিন্তার জোয়ারে একটা প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সমাজ সৃষ্টি হচ্ছিল, অন্যদিকে পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক জমিদারি চিন্তার অবশিষ্টাংশ ইংরাজি শিক্ষার সুযোগে প্রাপ্ত নকলনবিশি স্বভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, ধনবৃদ্ধি ও উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। এরই বিরুদ্ধে বিদ্রূপের বাণ পরিচালনা করেছিলেন দীনবন্ধু-মাইকেল-কালীপ্রসন্ন ও কালীঘাটের পটুয়ারা। স্বভাবতই এই হঠাৎ অবতার, ভুঁইফোড় স্থূল-শ্রেণির চিত্রায়ণে, স্ফীত গোলগাল ফিগারের প্রচলনই যথার্থ। অন্তঃসারশূন্যতার প্রতীকধর্মী রূপায়ণ। আর তাছাড়া মনে হয়, ভারতীয় শিল্পে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সব-সময়ই স্থূল দেহের সঙ্গে জড়িত। মোটা স্ফীতোদর বামনের মূর্তি প্রাচীন ভাস্কর্যে প্রায়শই দেখা যায়।

কালীঘাটের পটুয়াদের অঙ্কনশৈলী প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার। আগেই বলেছি স্বল্পমূল্যে তীর্থযাত্রীদের ছবি বিক্রি করার উদ্দেশ্যে কালীঘাটের পটের জন্ম। চিত্রকরদের উপকরণও ছিল যৎসামান্য—কাগজ, একটা তুলি আর দু-একটি রং। অল্প সময়ে, অল্প মাল-মশলা দিয়ে ছবি আঁকার প্রয়োজনীয়তা ছিল। এই মিতব্যয়িতার ছাপ তাদের ছবিতে খুব স্পষ্ট। দু-একটা রেখার টানে একটা ফিগার রচিত হতে দেখা যায়। মনে হয় তুলির ডগায় কালি থাকতে থাকতে 'আউট লাইন'টা এঁকে ফেলতে হতো। সাবলীল রেখার সাহায্যে মূর্তি রচনা করাটা খুব কষ্টসাধ্য ছিল না, কারণ বহুপুরুষাগত পট আঁকার স্বভাব তাঁদের মজ্জার মধ্যে নিহিত ছিল। কিন্তু নতুনত্ব এল পটভূমি সৃষ্টির কায়দায়, কাপড়ের ভাঁজ-আঁকবার পদ্ধতিতে। জড়ানপটে এই সব ক্ষেত্রে নিখুঁত আলঙ্কারিক কায়দায় শাড়ির পাড়, মাথার পাগড়ি, গাছের ডাল-পালা আঁকা হত। কালীঘাটের পটে সময়ের ও উপকরণের স্বল্পতাহেতু, শুধুমাত্র রেখা ও রং-এর আভাসে কাজ সেরে দিতে হলো। নায়িকা হেলান দিয়ে বসে, শিল্পী পাশ থেকে শুধু বালিশের একটি কোণ দেখিয়েই ক্ষান্ত; দু-তিনটি রেখা পর পর বসিয়ে বালিশের ওয়াড়ের ভাঁজ দেখানো হয়েছে। রেখার এইরকম পরিমিতিতে এত আশ্চর্য সুন্দর এফেক্ট সৃষ্টি করার উদাহরণ শিল্পের ইতিহাসে বিরল। নায়িকার পরিধেয় শাড়ি আঁকার পদ্ধতিটিও লক্ষণীয়। কাগজের সাদা জমিটা আস্ত রেখে, মেয়েটির দেহের অনাবৃত অংশকে প্রথমে মেটে লাল রং বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর ছবির সাদা জায়গাটাকে শাড়ির আভাসে রূপান্তরিত করার চেষ্টা; প্রয়োজনীয় স্থানে চওড়া কালো রং-এর টান দিয়ে পাড় তৈরি হলো; এবার সাদা অংশে তুলির আবছা দু-একটি দাগ ফেলে, ভাঁজের আভাস দিলেই, কালোপেড়ে শাড়ি পরিহিতা সুন্দরীর দেহাবয়ব তৈরি হয়ে গেল। কালীঘাটের পটের এইসব নায়িকাদের দেহের স্থূলত্ব লক্ষণীয়। প্রাচীন

ভারতীয় ভাস্কর্যের বৃহদায়তন গুরুভার নারীমূর্তির আদর্শেই যেন এরা চিত্রিত হয়েছে। যে গোলাকৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্নিবেশ 'বাবু'দের চিত্রায়ণে ব্যঙ্গের হাতিয়ার হয়েছিল, নারীদেহের অঙ্কনে সেই 'ফর্ম' এক অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্যের প্রকাশপথ হয়ে দাঁড়াল। বহু-প্রচারিত 'নিদ্রিতা' ছবিটি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য; নারীদেহের সীমারেখার আনত ভঙ্গির সুষমা প্রকাশে, সোজা অনমনীয় কোণ (angle)-কে একেবারে বর্জন করে, শুধুমাত্র বক্ররেখা (curve)-র সাহায্য নেওয়া হয়েছে। রেখার পরিচালনাতেও এমন একটা সতেজ গতি রয়েছে যে চিত্রকর ছবির কোন অংশ থেকে তুলির টান শুরু করেছিলেন, এবং কোথায় শেষ করেছেন, তার সীমারেখা গতির আবর্তনে হারিয়ে গেছে।

বস্তুত কালীঘাটের পটে স্থূলাকৃতির প্রতি ঝোঁকের দরুন, আনত বক্ররেখা বা কার্ভ-এর প্রাধান্য; কোণ বা angle প্রায় অনুপস্থিত। কালীঘাটের আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য এইখানেই। এই ধরনের আঙ্গিকের ক্রমবিকাশের পিছনে উপস্থিত কারণের উল্লেখ আগেই করেছি। লোকশিল্পে বিশেষ ধরনের অঙ্কনশৈলীর বিবর্তনের শুরুতে থাকে এক-ই ছাঁচে বারবার আঁকার রেওয়াজ। পুনরাবৃত্তির ফলে প্রথম যুগের পূর্ণাঙ্গ সবিশেষ বর্ণনার প্রয়োজনটা আস্তে আস্তে ফুরিয়ে যায়; তার বদলে সোজাপথে বাহুল্য-বর্জিতরূপে পুরোনো ছবিটাই অল্প সময়ে আঁকা হতে থাকে। ক্রমে এই ছবিটাই ছাঁচ বা আদর্শে পরিণত হয়; পরবর্তী ছবি এরই কায়দায় আঁকা হয়। কায়দাটা 'ফর্মিউলা' হয়ে দাঁড়ায়। যেমন কালীঘাটের পটের মানুষের হাতে আঁকার পদ্ধতির একটা সূত্র ছিল। প্রথমে বৃত্তের আকারে একটা মুঠো আঁকা হতো; তারপর তারই মধ্যে প্রয়োজনানুসারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাঁচটা দাগ বসিয়ে দেওয়া হত, আঙুল দেখাবার জন্য। মেয়েদের ছবিতে, স্তনাগ্রভাগের উপর দিয়ে বাঁকাভাবে তুলির একটা মোটা টান দিলেই, শাড়ির আঁচলের 'এফেক্ট' তৈরি হতো। পুরুষের চুল আঁকার জন্যও বাঁধাধরা সূত্র ছিল; কপালের দু'পাশ ঘিরে কালো রং-এর প্রলেপ; তারপর কানের পিছনদিকে শিং-এর আকৃতিতে আরও দুটো পোঁচ, বাবরি চুলের ঢেউ দেখানোর উদ্দেশ্যে। এইভাবে বাহুল্য-বর্জিত সরল প্যাটার্নের উদ্ভব হয়েছিল, যার ভিত্তিতে আঁকা মানবদেহের চিত্র অসম্ভব গতিশীল ও প্রকাশক্ষম হয়ে উঠল।

এ শতাব্দীর শুরুতেই কালীঘাটের শিল্প-নৈপুণ্যের ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু তার মূল্যায়ন বোধহয় আজও শৈশবাবস্থা অতিক্রম করেনি। আধুনিক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করে অনেকে কালীঘাটের পটকে 'কিউবিজ্‌মের' পূর্বসূরি, বা Leger-এর ছবির সমান্তরাল বলে দাবি করেছেন। 'ফর্মিউলা'র ছাঁচ আঁকার পদ্ধতিতে হয়তো কিছু সাযুজ্য থেকে থাকবে। কিন্তু angle-প্রধান কিউবিস্ট্ চিত্রে মানুষের মুখ বা দেহ থেকে

'স্টিল্‌লাইফ' যেমন অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, কালীঘাটের পটের পেলব বাঁকা রেখা ঠিক তেমনি ভাবেই নিসর্গ চিত্রের পরিবর্তে মানবদেহে ও মুখাবয়বকেই সানন্দে আমন্ত্রণ জানায়। আর Leger তাঁর অঙ্কনশৈলী পালটেছেন বহুবার। এ শতকের দ্বিতীয় দশকে তিনি যে স্টাইলের ছবি এঁকেছেন তার সঙ্গে কালীঘাটের পটের গোলাকৃতি 'ফর্মের' মিল চোখে পড়ে। কিন্তু Leger-এর চিত্রে 'ফিগারগুলি' স্থাণু পুতুলের মতো; অপরপক্ষে কালীঘাটের ছবিতে রেখার গতিতে রয়েছে বিচিত্র ছন্দ। এ ছাড়াও মনে রাখা দরকার যে Leger ও কিউবিস্ট্‌দের ফর্ম নির্বাচনের পিছনে ছিল বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি-নির্ভরশীল দৃষ্টিভঙ্গি, সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে তাল রেখে, শ্রমশিল্প জগতের বিষয়বস্তুর আকারকে চিত্রকলায় স্থান দেবার প্রচেষ্টা। কালীঘাটের পটুয়াদের আঙ্গিকের উদ্ভাবনীশক্তি, পূর্বপুরুষদের সংস্কারের অবদান ও ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার সামাজিক আবহাওয়ার জল-হাওয়ায় তৈরি।

সে যাই হোক, মনে হয় কালীঘাটের পটের অঙ্কনশৈলীর সম্ভাবনা আজও ফুরোয়নি। রূপে একে পরিবর্ধিত করার পথ রয়েছে; ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগও বহু-বিস্তৃত বর্তমান বাংলাদেশের সামাজিক পরিবেশে। রুচিহীনতার প্রকোপ, আর অশিক্ষিত ধনিক শ্রেণির আত্মপরিতুষ্টির নির্লজ্জ দম্ভপ্রকাশকে নির্মমভাবে আঘাত করতে হলে প্রয়োজন কালীঘাটের পটের মতো বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গি। পটের প্রকাশশৈলীকে রূপান্তরিত ও পরিবর্ধিত করে ব্যঙ্গ-চিত্রের নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি করার সম্ভাবনা কতখানি বাস্তব, আধুনিক চিত্রকরেরা তা অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন।

কলিকাতা কৌতুকালয়

১

কথায় বলে—'হাসির মার বড় মার!' হাসি-মস্করা, রঙ্গ-রসিকতা, ব্যঙ্গ-কৌতুক, ইত্যাদি সব সময় লোক হাসানোর একটা নিরীহ পন্থা নয়। বিশেষ বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে এই আপাতদৃষ্ট নিরীহ হাস্যকৌতুক কিছু কিছু মানুষের কাছে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। উনিশ শতকের কলকাতার বাঙালি নাগরিকদের কাছে 'হাসি' ছিল এমন-ই একটা 'মার'-এর হাতিয়ার।

কৌতুকের সমাজবিদ্যাগত বিশ্লেষণ বা Sociology of Humour নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের অনেকেরই মতে, ব্যঙ্গ-কৌতুক আসলে দুর্বলের অস্ত্র। ক্ষমতাবান শত্রুকে কথার মারপ্যাঁচে, তির্যকভঙ্গিতে পরাভূত করা; পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অস্বস্তিকর অবস্থার মোকাবিলা করতে গিয়ে হাসি-ঠাট্টা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে নিজেদের সত্তাকে সপ্রমাণ করা—এইসব তাগিদ-ই সচরাচর Comic-এর উৎস বলে বিবেচিত হয়েছে।[১]

অবশ্য আরও গভীর উৎসে হাতড়াতে গিয়ে দেখা যায় অসংগতির উপলব্ধি থেকেই কৌতুকবোধের জন্ম। ইচ্ছার সঙ্গে অবস্থার গরমিল, উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের বৈসাদৃশ্য, কথার সঙ্গে কাজের অমিল—এই ধরনের বেখাপ্পা পরিস্থিতিই হাসি-মস্করার ইন্ধন যোগায়। পাশ্চাত্যে Henri Bergson-এর *Laughter* (১৯০০) ও Sigmund

Freud-এর *Wit and Its Relation to the Unconscious* (১৯০৫)-এ শতাব্দীর শুরুতে কৌতুকবোধের অন্তরালে এই অসংগতিবোধের অবস্থানের প্রতি সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দৈনন্দিন জীবনের এই ধরনের বেমানানসই অবস্থার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়ে মানুষে পরিহাস-রসিকতার আশ্রয় নেয়। এসব পরিস্থিতিতে হাসবার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি দরকার তা Bergson-এর ভাষায় a momentary anaesthesia of the heart বা হৃদয়ের সাময়িক অনুভূতি বিলোপ। যাকে দেখে হাসছি, বা যে ঘটনা হাস্যোদ্রেক করছে তার সঙ্গে কোনো আবেগজড়িত সম্পর্ক বা তার প্রতি কোনো সহানুভূতিশীল মনোভাব থাকার কথা নয়।

কৌতুকপ্রবণতার সঙ্গে এই সহৃদয়তা-শূন্যতার যোগাযোগ, Bergson বা Freud-এর বহু পূর্বে লক্ষ করেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপর্বের কলকাতায় বসে এক যুবক বাঙালি কবি। ১৩০১ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধে কৌতুকবোধের পিছনে অসংগতির উপলব্ধির উল্লেখ করে, তারপর লিখেছিলেন এসব অসংগতির মধ্যে একটা 'নিষ্ঠুরতা' আছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, পরিহাসবোধের সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা ও কৌতুকরসগ্রাহিতার সাংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য-সূচক চরিত্র—এই বিষয়টি নিয়ে একটা চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেছিলেন। পাশ্চাত্য সমাজের চোখে যা কৌতুকোদ্দীপক, তা প্রাচ্যে হয়তো দুঃখদায়ক। অর্থাৎ কৌতুকবোধ Culture-specific। ইউরোপকেন্দ্রিক আলোচনায় এই তফাতটা সচরাচর চোখে পড়ে না; Comic সম্বন্ধে একটা সর্বজনীন ব্যাখ্যার প্রবণতা দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের লেখায় এই Culture-specifity-র উপর গুরুত্ব আরোপ সমসাময়িক বাঙালি সমাজের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে কৌতুকবোধের সমাজবিদ্যাগত বিশ্লেষণে। তাঁর ভাষায়—"দুর্ভিক্ষে যখন দলে দলে মানুষ মরিতেছে তখন সেটাকে প্রহসনের বিষয় বলিয়া কাহারও মনে হয় না। কিন্তু আমরা অনায়াসে কল্পনা করিতে পারি, একটা রসিক শয়তানের নিকট ইহা পরম কৌতুকাবহ দৃশ্য; সে তখন এই সকল অমর-আত্মাধারী জীর্ণ কলেবরগুলির প্রতি সহাস্য কটাক্ষপাত করিয়া বলিতে পারে, ঐ তো তোমাদের ষড়দর্শন, তোমাদের কালিদাসের কাব্য, তোমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা পড়িয়া আছে, নাই শুধু দুই মুষ্টি তুচ্ছ তণ্ডুলকণা, অমনি তোমাদের অমর আত্মা...একেবারে কণ্ঠের কাছটাতে আসিয়া ধুক ধুক করিতেছে।"[২]

অতীতের গৌরব নিয়ে আত্মশ্লাঘা আর বর্তমানের রক্তমাংসের দারিদ্রের অসংগতি কি দুর্ভিক্ষের বলিদের কাছে কৌতুকোদ্দীপক? অসংগতি মাত্রেই হাস্য-কৌতুকের উসকানি দেয় না। "অসংগতি দুই শ্রেণীর আছে; একটা হাস্যজনক, আর একটা

দুঃখজনক...অসংগতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে, তখনই আমাদের কৌতুকবোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে আমাদের দুঃখবোধ হয়।''[৩]

'অনতিগভীর' স্তরেই আমরা নিষ্ঠুর হতে পারি; অন্যের অস্বস্তিজনক বেসামাল অবস্থা দেখে (যার সঙ্গে আমাদের কোনো আবেগ জড়িত নেই, যার প্রতি আমাদের কোনো সমবেদনা নেই) তখন আমরা ঠাট্টা-রসিকতা করতে পারি। এমনকি দরদের ভান করে কৌতুকবোধটাকে আরও উসকে দিতে পারি। ভণ্ডামির বোকা শিকারকে নিয়ে ব্যঙ্গ-কৌতুক তো হালফিলই ঘটে—এবং বিশেষ করে সে শিকার যদি এক জুতসই বড়ো রকমের হোমরাচোমরা কেউ হয়। দুর্বলের মুখে তখন কৌতুক 'হাসির মার' হয়ে ওঠে। ঢাকাই কুট্টির সেই গল্পটা স্মরণীয়। কুট্টি গাড়োয়ান বসে আছে ছ্যাকরা গাড়ির কোচবাক্সে। অপেক্ষা করছে বড়োলোক সওয়ারিকে নিয়ে বেরুবে বলে। বাবু সেজেগুজে তাঁর বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। হঠাৎ পা-ফসকে পড়ে গেলেন। গড়াতে গড়াতে অবশেষে পৌঁছোলেন ছ্যাকরা গাড়ির পাদদেশে। কুট্টি গাড়োয়ান একলাফে কোচবাক্স থেকে নেমে এসে বাবুকে কোলে তুলে নিল। সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দরদভরা কণ্ঠে বলতে লাগল—''আহা, হো, কত্তার বড় লাগছে। আহা, হা, হা, এইখানে লাগছে, এ হে হে, ঐখান ল্যাগছে।'' গা বুলোয় আর আদর করে। শেষটায় সান্ত্বনা দেবার ছলে এক মোক্ষম মারণাস্ত্র ছাড়ে—''কিন্তু কত্তা আইছেন জলদি।''

পরিহাসবোধ একমাত্র মনুষ্যজগতেই সম্ভব বলে ধরা হয়। জন্তুসমাজে তা অনুপস্থিত। বাঁদরের বাঁদরামো দেখে মনে হয় বাঁদর বুঝি রসিক, আমাদের হাসাচ্ছে। কিন্তু আমাদের বোধ হয় হাসি পায় তার মানুষকে নকল করার চেষ্টা দেখে। এখানেও রয়েছে সেই অসংগতি—যে যা নয়, সে তা হবার চেষ্টা করছে এবং তার ফলে বিসদৃশতা দেখা যায়। ফরাসি কবি-সাহিত্যিক Charles Baudelaire হাসির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছিলেন মানুষের মনের কোনো গভীর কোণে রয়েছে এক অন্তর্দ্বন্দ্ব। জন্তু-জানোয়ারের উপরে তার শীর্ষস্থান, অথচ পরম সত্যের আদর্শের কাছে সে অতি নিকৃষ্ট এক জীব—এর টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত মানুষ কখনও নিজের অক্ষমতা নিয়ে ঠাট্টা করে, কখনও তার থেকে অপকৃষ্ট জীবগুলির প্রতি অনুকম্পা-মিশ্রিত শ্লেষ বার হয়ে আসে। অন্যের তুলনায় নিজের বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব-র অহংকার থেকেই জন্মায় diabolical laughter বা শয়তানের অট্টাহাস্য।[৪] নিষ্ঠুরতার সঙ্গে কৌতুকবোধের যোগাযোগটা লক্ষণীয় এ ক্ষেত্রেও।

মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে কৌতুকবোধের জন্মের সম্ভাবনার উল্লেখ করেছিলেন

আরও আগে প্রাচ্যের এক পণ্ডিত—দশম শতাব্দীর আরব দার্শনিক Abu Hayyan at Tawhidi, এর মতে তাঁর গুরু Abu Sulayman-এর উদ্ধৃতি দিয়ে। অবশ্য Baudelaire-এর মতো জন্তুজগৎ থেকে মানুষের উৎকৃষ্টতার দোহাই দেননি তিনি। বরং অনেকটা উলটো দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর মতে, 'হাসির উৎস মানুষের যুক্তিবাদী মনন ও জান্তব প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কে।' হাসির প্রেরণা আসে একটা অনুসন্ধিৎসু মানসিকতা থেকে। কোনো ঘটনা দেখে বিস্মিত হয়ে তার কারণ অনুসন্ধানের প্রবণতা হয়। এই স্তরে হাসি, যুক্তি বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আবার অপর স্তরে, হাসি নির্ভর করে আমাদের জান্তব প্রকৃতির উপর এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তার পরিব্যাপ্তির উপর। (চোখে-মুখে, কথায়-বার্তায়, অঙ্গহেলনে—সবকিছু দিয়েই মানুষ তার পরিহাস-প্রবণতা প্রকাশ করে)। বিস্ময়ের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে যখন যুক্তিবাদী মন ও জান্তব প্রকৃতি দুদিকে ছুটোছুটি করে তখনই হাসির জন্ম হয়। সঙ্গে সঙ্গে Abu Sulayman কিন্তু এটাও লক্ষ করেছিলেন যে এই tension যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে অনুসন্ধিৎসু মন ক্রোধে ফেটে পড়তে পারে। জান্তব প্রকৃতি তখন বদমেজাজি রূপ নিয়ে যুক্তিকে পরাজিত করবে।[৫]

আসলে পরিহাসবোধ একটা সূক্ষ্ম সুতোর উপর অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে ভারসাম্য রক্ষা করছে। এদিক-ওদিক হলেই হয়তো কান্নায় ভেসে যাবে। কিংবা রাগে ফেটে পড়বে। রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারটা ধরেছিলেন ঠিকই—"স্থূল কথাটা এই যে, অসংগতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।"[৬]

কৌতুকপ্রবণতার আশেপাশেই ঘোরে বিষণ্ণতা ও আক্রোশ। নানা কারণে আত্মপ্রকাশের অসুবিধার ফলেই তা পরিহাস ও ব্যঙ্গ-কৌতুকের আশ্রয় নেয়। সুযোগ পেলেই তা নিজমূর্তি ধরে। উনিশ শতকের কলকাতার নাগরিকেরা তাঁদের পুঞ্জীভূত রাগ-অপমান, অন্তর্জ্বালা-যাতনা, ক্ষোভ-উষ্মা—এ সবকে হাসি-মস্করা, রঙ্গ-রসিকতার ছদ্মবেশ পরিয়ে আসরে নামিয়েছিলেন।

নেপথ্যে আরও একটা ভাবনাও বোধ হয় ছিল। সেটা ভয়। ভয়কে অতিক্রম করার উদ্দেশে, কোনো কোনো অবস্থায় হেসে তাকে পরাক্রান্ত করার প্রবণতাটা চোখে পড়ে অনেক সময়—যদিও কৌতুকের সমাজবিদ্যাগত আলোচনায় এর উল্লেখ বড়ো একটা দেখা যায় না। গভীর রাত্রে একলা জঙ্গলপথে যেতে যেতে উচ্চহাস্য, গলা ছেড়ে গান করারই আর এক প্রতিকল্প। ভূত-প্রেত নিয়ে ঠাট্টা করা, মৃত্যুকে উপলক্ষ করে মস্করা (মেক্সিকোর সুবিখ্যাত El dia de muerte বা 'মৃতের দিনে' অনুষ্ঠিত

উৎসব স্মরণীয়) মানুষের মনের উদ্ভটরসেরই পরিচায়ক। ভয় ভাঙার আর এক উপায়। উনিশ শতকের কলকাতার অবরুদ্ধ সামাজিক পরিবেশে নানা আশঙ্কা, আতঙ্ক ভিড় করে থাকত চারিদিকে। নিত্য-নতুন ব্যাধি, মৃত্যু, খুন-রাহাজানি, 'গোরা'দের মারণাস্ত্রের সর্বনাশী ক্ষমতার অভূতপূর্ব পরিচয়, শহরের অন্ধকার, অপরিচিত গলি-ঘুঁজিতে অপ্রত্যাশিত শত্রুর চোরাগোপ্তা—এ সবই যেন এক অতিপ্রাকৃত জগতের বাসিন্দা! এদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে শহরের অধিবাসীদের এক ধরনের Black Humour বা মর্মান্তিক উদ্ভট হাস্যকৌতুকের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। তাদের কল্পিত 'কলিকাল' যেমন ভয়াবহ, তেমনই আবার উপহাস্যাস্পদ।

২

সে-যুগের কলকাতার বাঙালি বাসিন্দারা ছিলেন নানাভাবে বিপর্যস্ত। একটা স্তরে—বিদেশি ঔপনিবেশিক প্রভুদের হাতে Black Town-এর অধিবাসীদের দৈনন্দিন লাথি-ঝাঁটা, অপমান-অবজ্ঞার অভিজ্ঞতা ছিল প্রচণ্ড পীড়াদায়ক—বিশেষ করে নব্যশিক্ষিত বাঙালি চাকুরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই আত্মধিক্কারমূলক—কিন্তু হাস্যোদ্দীপক—উক্তিটি স্মরণীয়। "কিসের চাপে বঙ্কিম হলে?" রামকৃষ্ণের এই প্রশ্নের জবাবে তাঁর ব্যাখ্যা—"বিদেশী আমলার চপেটাঘাতে।" এই অপমান থেকে রেহাই পাবার আর কী রাস্তা ছিল সে যুগে—যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংগঠিত রাজনৈতিক প্রতিবাদের পথ তৈরি হয়নি? আত্মধিক্কার বা নিজেকে বিদ্রূপবাণে বারংবার জর্জরিত করে, নিজেদের নিয়ে ঠাট্টা করে, পুঞ্জীভূত আক্রোশকে আসল শত্রুর দিক থেকে সরিয়ে এনে অন্তর্মুখীন করার প্রবণতাটা লক্ষণীয়। চাকুরিজীবী বাঙালি মধ্যবিত্ত স্বয়ং তাই এই ব্যঙ্গ-কৌতুকের নায়ক। নিজের পেশাকেও বঙ্কিম রেহাই দেননি যখন এই মধ্যবিত্তের 'দশ অবতার' বর্ণনা করেন—"কেরাণী, মাস্টার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকীল, হাকীম, জমিদার, সংবাদপত্র সম্পাদক ও নিষ্কর্মা।" যাঁদের "ইষ্টদেবতা ইংরাজ", এঁরা "নিজগৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান এবং মনিব সাহেবের গৃহে গলা-ধাক্কা খান।"[৭]

তীব্র বিদ্রূপের খোঁচায় স্ব-সমাজকে খাবলানোর এই মর্ষকাম কেবল বঙ্কিমেই নয়, সমসাময়িক বাঙালি যে-কোনো সংবেদনশীল লেখক মাত্রেই দেখা যাবে। একটি স্বল্প-পরিচিত রচনা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। লেখাটির শিরোনামা—'বৃদ্ধবোধ ব্যাকরণ' থেকেই মেজাজটা বোঝা যায়। লেখকের উদ্দেশ্য নতুন করে বাংলা বর্ণ নির্ণয়—"বাঙ্গালাভাষায় বর্ণগুলি দুই ভাগে বিভক্ত, শ্বেতবর্ণ ও মেটেবর্ণ। সাধারণত, শ্বেতবর্ণকে

স্বরবর্ণ ও মেটেবর্ণকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। স্বরবর্ণের অপর নাম সাহেব বর্ণ। এই বর্ণ বারটি, যথা, গবর্নর জেনেরেল, লেফটেনান্ট গবর্নর, ম্যাজিস্ট্রেট, জজ ইত্যাদি। এই বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ব্যতীত প্রকাশিত হইতে পারে। ব্যঞ্জনবর্ণের অপর নাম বাঙালী বর্ণ। এ বর্ণ পূর্ব্বে কেবল ছত্রিশটি ছিল। এখন 'টি' উঠিয়া গিয়া এট্‌সেটেরা বসিয়াছে। এই বর্ণ এক্ষণে সাহেব বর্ণের সাহায্য ব্যতীত কোন কার্যে আইসে না, এই জন্য পূর্ব্বে বা পরে স্বরবর্ণ যোগ করতে হয়। যথা, হরিহর দাস এই বর্ণটি পূর্ব্বে একেবারে উচ্চারিত হইত না। এইক্ষণ ইডেনবর্গের সাহায্যে উচ্চারিত হয় যথা, হরিহর বাবু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট" ('ইডেনবর্গ', বলতে লেখক বাংলাদেশের সমসাময়িক লেফটেনান্ট গভর্নর অ্যাশলে ইডেন-এর কথা বলছেন)। এরপর লেখক ব্যঞ্জনবর্ণ বা বাঙালি বর্ণগুলি পাঠকদের চিনিয়ে দিচ্ছেন। যেমন, ডেপুটিবর্গ ("আস্তে চলে বক্র গলে, বুকটি ফোলা তাতে/মুটে মজুর করছে হুজুর, পিচের ছড়ি হাতে/ছড়ির মাথা ভাঙ্গা"); উকিলবর্গ ("ছোঁড়া উকীল, বড়ই ফিকিল/সামলা আছে হাতে/সামলা দেখতে রাঙ্গা); মুন্সেফবর্গ ("মলিন মুখ নাইক সুখ, যেন মাথা ধরেছে/গাধার মত খেটে খেটে আঙ্গুল ফুলেছে/আঙ্গুলে জোর কম")। একই ঢং-এ এক এক করে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় স্কুলমাস্টারবর্গ, পোস্টামাস্টারবর্গ, স্টেশন মাস্টারবর্গ, পুলিশবর্গ, কেরানিবর্গ সবার সঙ্গে। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক জগতের বাঙালি বৃত্তিধারীদের চরিত্রের একটা অসামান্য শ্লেষাত্মক ছবি পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিদেশি প্রভুদের—'সাহেববর্ণ'—সম্বন্ধে তির্যক মন্তব্য ("এই বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ব্যতীত প্রকাশিত হইতে পারে।") পুরো রচনাটিকে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার একটা সামগ্রিক ব্যঙ্গচিত্রে পরিণত করেছে।[৮]

উনিশ শতকের বাঙালি লেখকদের স্বসমাজের সমগোত্রীয় সহকর্মীদের চরিত্রের উপর এই যে বিদ্রূপ বর্ষণ,[৯] তার অন্তরালে এক ধরনের self flagelation বা আত্মনিপীড়নের প্রবণতার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। মুখ্য নিশানা—যে ইংরেজ প্রভু এই দুর্বল সামাজিক দো-আঁশলার জন্মদাতা—তার বিরুদ্ধে সরাসরি সম্মুখসমরে নামা সম্ভব ছিল না। (ঐ শতকের শেষপর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল অনুরূপ প্রত্যক্ষ আক্রমণের সুযোগ ও সাহসের জন্য।)[১০] ফলে চাবুকটা ফেরাতে হয়েছিল নিজেদের দিকে। একটা হীনম্মন্যতাবোধ চেপে বসেছিল মানসিকতার উপর। ইংরেজ শাসকশ্রেণির সর্বাত্মক ক্ষমতার উদ্ধত আস্ফালন, তাদের সংবাদপত্র ও বক্তৃতায় বাঙালি 'বাবু'দের প্রতি প্রাত্যহিক কটুভাষণ, Babu English নিয়ে ঠাট্টা, এ সবই হীনমস্কতাটাকে আরও জোরদার করে তোলে। ইংরেজরা বাঙালি মধ্যবিত্তর যে হাস্যকর stereotype বা বাঁধা

ছক তৈরি করেছিল, তা হয়তো অনেকাংশে এই মধ্যবিত্ত লেখকেরাও আত্মীকরণ (internalize) করেছিলেন। শুনতে শুনতে, পড়তে পড়তে, বাঙালির এই হাস্যোদ্রেককারী প্রতিমূর্তিই যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল। দুর্বল, অক্ষম, পরোপজীবী ইংরেজের অনুকরণপ্রিয় বাঙালি মধ্যবিত্তই সমগ্র বাঙালি সমাজের প্রতিভূ হয়ে দাঁড়াল। উনিশ শতকের কলকাতার সামাজিক পটভূমিকায় রচিত 'রজনী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র হঠাৎ প্রচণ্ড হতাশায় বলে ওঠেন—"যে দেশে অগ্নি নাই, সে দেশে ইন্ধন আহরণ করিয়া কি হইবে?" অসহনীয় মর্মপীড়ার অসাধারণ অভিব্যক্তি! কিন্তু অগ্নি কি একেবারেই ছিল না? যে সত্তর দশকে বসে বঙ্কিম 'রজনী' লিখেছিলেন, তখনই সিরাজগঞ্জে কৃষকেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে জমিদারের অতিরিক্ত কর আদায়ের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিলেন। কলকাতার সর্বগ্রাসকারী অবরুদ্ধ নগরকেন্দ্রিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় বাস করে, পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ কৃষক সমাজের অগ্ন্যুদ্‌গম চোখে পড়ার কথা নয়। মধ্যবিত্ত সরকারি আমলা রূপান্তরিত ঔপন্যাসিক বঙ্কিমকে দোষ দিয়ে লাভ নেই! তাঁর নাগরিক প্রতিবেশী যে গরিব, খেটে খাওয়া কলকাতার বাঙালি নিম্নবর্গ, তাঁরাও সমসাময়িক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিদ্রোহ সম্বন্ধে হয় উদাসীন ছিলেন, নয় বিরূপ মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন।[১১]

আসলে, মনে হয়, কলকাতা শহরে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার আধিপত্য এত ব্যাপক ও কেন্দ্রীভূত ছিল যে কি মধ্যবিত্ত নাগরিক, কি নিম্নবর্গ অধিবাসী, কারুরই পক্ষে এই নাগরিক কাঠামোর বাইরের জগৎটা মনে রাখা বা উপলব্ধি করার ক্ষমতা ছিল না। এক শ্বাসরুদ্ধকারী পরিবেশে, নাগরিক জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা ও তার মোকাবিলার সংগ্রামই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে, বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিকদের মানসিকতায় ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সাংস্কৃতিক hegemony বা কর্তৃত্ব, এক ধরনের দোদুল্যমানতার জন্ম দিয়েছিল। যে ইংরেজ এই বাঙালি মধ্যবিত্ত যুবককে পাশ্চাত্য উদারনীতির তত্ত্বে শিক্ষিত করেছে, শেলী-বাইরনের কাব্যে দীক্ষিত করেছে, সেই ইংরেজই চাকুরিক্ষেত্রে এই শিক্ষিত বাঙালিদের দৈনন্দিন অপমানিত করছে, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে। এই ইংরেজেরই আনুকূল্যে বাঙালি মধ্যবিত্ত করে খাচ্ছে; অথচ অপমান সহ্য করতে হচ্ছে। এই অসংগতিবোধ উনিশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মননে পীড়াদায়ক ছিল। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় ছিল একমাত্র ব্যঙ্গ-কৌতুকে। কিন্তু, কাকে নিয়ে হাস্য-কৌতুক, ঠাট্টা-ইয়ার্কি করা যায়? চাকুরিদাতা ইংরেজ কর্তৃপক্ষ, না তার চাকুরিজীবীরা, যারা এই ব্যঙ্গ-কৌতুকের সহজলভ্য নিশানা হতে পারে? উপহাসের হাতিয়ারটা অন্তর্মুখী করাই নিরাপত্তাজনক বলে বিবেচিত হয়েছিল।

অবশ্য ইংরেজ শাসক পুরোপুরি রেহাই পায়নি। কিন্তু তাকে নিয়ে পরিহাস করতে গিয়ে তির্যক ভঙ্গি অবলম্বন করতে হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র *লোকরহস্য*-এ তাঁর সাহেব আমলাদের চপেটাঘাত করেছেন তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণে। কিন্তু তাঁর "ইংরাজস্তোত্র"-র মর্মার্থ ("হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি।...তুমি কলিকালে গৌরাঙ্গবতার তাহার সন্দেহ নাই। হ্যাট তোমার সেই গোপবেশের চূড়া, পেন্টুলুন সেই ধরা আর হুইপ সেই মোহন মুরলী...") সে যুগের বাংলা ভাষায় পারদর্শী ইংরেজের মাথাতেও ঢোকেনি। তাই বঙ্কিম বোধহয় বেঁচে গিয়েছিলেন রাজরোষ থেকে।

ঠিক একই ঢং-এ লেখা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা—মহারানী ভিক্টোরিয়াকে উদ্দেশ্য করে—

তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস।
যেন রাঙা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙ্গে না,
আমরা ভুষি পেলেই খুসী হব—
ঘুষি পেলে বাঁচব না।[১২]

অবশ্য এখানেও সেই আত্মধিক্কারের সুর মিশে আছে Mock Heroic ভঙ্গির সঙ্গে।

হিন্দুধর্মের দেব-দেবী নিয়ে ইংরেজদের অবজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্যের পালটা জবাব দিয়েছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে খ্রিস্টধর্মকে আক্রমণ করে—

গোকুলে গোপাল খান ননি ছানা খির
খানকি মেরির পুত্র মাখন পনির[১৩]

ইংরেজদের আর একটা উপহাসের লক্ষ্য ছিল বাঙালিদের ইংরেজি-কথন—যাকে তারা ঠাট্টা করে Babu English বলত। এ নিয়ে নানা গল্প আজও সাহেবি বৈঠকখানায় হাসির খোরাক জোগায়। সে-যুগে, এর প্রত্যুত্তরে বাঙালি লেখকেরাও ইংরেজদের বিকৃত বাংলা উচ্চারণ নিয়ে ঠাট্টা করতেন। ব্যঙ্গ-পত্রিকা 'বসন্তক' এ-বিষয়ে একটি লম্বা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল। তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি—"সহরের ও পল্লিগ্রামের কৃষ্ণ বিষ্ণুগোচ বাঙ্গালী ইংরাজী লেখক সকলে বাবু ইংলিশ নিয়ে বড় মাথা কোটাকুটি কর্ত্তে মেতেছেন আর আমাদের মত লোক সকল তফাতে দাঁড়ায়ে তামাসা দেখছে।...আজকাল বিলাতের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক যিনি কলিকাতায় অনেকদিন ওরিএন্টল স্কলার বলে কবলাতেন, লেখা বক্তৃতা পাঠ কর্ত্তে ২ বলেছিলেন—

"এই ভিড্যালয় এইষ্ঠানে পুনর্ব্বার ষ্ঠাপিত হইলেন" আর কলিকাতায় মিশনারীগিরী ক'রে বয়েস গুড়য়ে লঙ্ সাহেব...দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "হোতা কে হয় তুমি না তোমার দাদা হয়?" তুলনায় এর চেয়েও কি বাঙালীতে ইংরাজী কম শিখে?"[১৪]

১৮৭৩ সালে ডেভ্ কার্সিন নামে এক ইংরেজ অভিনেতা কলকাতার 'অপেরা হাউস'-এ বাঙালিদের বিদ্রূপ করে কিছু নকশাধর্মী প্রহসন মঞ্চস্থ করে। তার জবাবে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী তদানীন্তন কলকাতার ইংরেজ সমাজের হিন্দি-ইংরেজি মিশ্রিত অশুদ্ধ কথা বলার অভ্যাসকে উপহাস করে পালটা প্রহসন নামান। অর্দ্ধেন্দু স্টেজের উপর সাহেব সেজে গান ধরতেন—

হাম বড়া সাব্ হ্যায় দুনিয়ামে
নান্ ক্যান বি কম্পেয়ার্ড হামারা সাথ
*   *   *
কোট পিনি প্যান্টলুন পিনি পিনি মোর ট্রাউজর্স
এভ্রি টু ইয়ার্স নিউ সুট্স পিনি
ডিরেক্ট ফ্রম চাঁদনী বাজার—
রোম-টি-টোম-টি টোম্...[১৫]

ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাঙালি বিদ্বেষ, তির্যক ব্যঙ্গ বা হাস্যোদ্দীপক অনুকরণের (caricature) আড়ালে বেশিকাল আত্মগোপন করে থাকেনি। সরাসরি প্রতিবাদ ও বিদ্রূপের চেহারা নিয়ে তা বাংলা নাট্যমঞ্চে উপস্থিত হয় সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকেই। ১৮৭৬ সালে ইংরেজ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া-তনয় যুবরাজ এডওয়ার্ড যখন কলকাতায় আসেন তখন হাইকোর্টের সরকারি উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় যুবরাজ ও তাঁর সঙ্গীদের ভবানীপুরে তাঁর নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ করেন ও পরিবারের মহিলারা এডওয়ার্ডকে অভ্যর্থনা ও বরণ করেন। এই ব্যাপার নিয়ে কলকাতায় হুলস্থূলু পড়ে গেল এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ জগদানন্দের উপর খড়্গহস্ত হয়ে তীব্র সমালোচনা ও উপহাস-বিদ্রূপে তাঁকে নাস্তানাবুদ করে তোলে। নাটের গুরু যুবরাজ এডওয়ার্ডের বিরুদ্ধে অবশ্য সরাসরি কেউ কিছু তখনও বলেননি। বিপদটা বাধল এডওয়ার্ড চলে যাবার পর। ১৮৭৬-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার', বর্তমান মিনার্ভা থিয়েটার যেখানে, ঐখানে *গজদানন্দ ও যুবরাজ* নামে একটি প্রহসন মঞ্চস্থ করে। তাতে জগদানন্দর সংবর্ধনা উৎসবের হাস্যকর অনুকরণ করে সমস্ত ঘটনাটিকে ব্যঙ্গ করা হয়। এর কিছুদিন পরে বড়োলাট নর্থব্রুক এক অর্ডিনান্স জারি করে 'কুৎসাপূর্ণ

মানহানিকর, সরকার-বিরোধী, অশ্লীল বা জনস্বার্থ পরিপন্থী' নাটক বন্ধ করার ক্ষমতা ঘোষণা করলেন। 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' এর জবাবে *The Police of Pig and Sheep* (তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার স্টুয়ার্ট হগ্ ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট ল্যাম-এর নামের ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণে) প্রহসনটি মঞ্চস্থ করে। ৪ মার্চ, ১৮৭৬-এ যখন উপেন্দ্রনাথ দাশের 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'র সঙ্গে যখন এই প্রহসনটি অভিনীত হচ্ছিল, তখন পুলিশ এসে উপেন্দ্রনাথসহ নাট্যকার-অভিনেতা অমৃতলাল বসু ও আরও ছয়জন অভিনেতাকে ধরে নিয়ে যায়। হাইকোর্টে আপিলের পর অবশ্য এঁরা সবাই ছাড়া পান।[১৬]

'জগদানন্দ' প্রহসনের ফলশ্রুতি তাৎপর্যপূর্ণ। এর পর-পরই ইংরেজ সরকার Dramatic Performances Control Act পাস করে। ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙালি মধ্যবিত্তের বিদ্রূপকে সরকারি কর্তৃপক্ষ শোষিতের হাতিয়ার রূপে শনাক্ত করতে শুরু করল। 'হাসির মার বড় মার' সত্যি সত্যিই প্রমাণিত হল।

৩

কলিকাতা কৌতুকালয়ের সভাপণ্ডিত কালীপ্রসন্ন সিংহ। হুতোম-পূর্ববর্তী যুগে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু-বিবিদের বিলাস নিয়ে নকশা ও রামনারায়ণ তর্করত্নের সামাজিক কুপ্রথা-বিষয়ক প্রহসনগুলিতেও ছিল অন্তর্দ্বন্দ্ব-প্রসূত আত্মধিক্কারের প্রবৃত্তি। বিদেশ থেকে নতুন চিন্তাধারার ও চাল-চলনের আমদানি এতদিনের সযত্নপালিত ঐতিহ্যাশ্রয়ী মূল্যবোধগুলিকে ওলট-পালট করে দিচ্ছিল; পুরোনো দিনের পূজনীয় আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণাগুলিকে নতুন চোখে যাচাই করতে হচ্ছিল। নবীন ও প্রাচীনের এই মুখোমুখি হবার ফলে যে সব বেদনাদায়ক অসংগতি (পূজা-পার্বণ পালনের পাশাপাশি গোমাংস ভক্ষণ ও মদ্যপান) এবং সুযোগ-সন্ধানীদের চোখ টাটানো আধিপত্য (ভুঁইফোঁড় মোসাহেবদের 'বাবুয়ানা' ও ধর্মীয় কর্মকর্তাদের ভণ্ডামি), দেশীয় সমাজের এই সব কাণ্ড-কারখানা দেখে সংবেদনশীল বাঙালি পর্যবেক্ষক মাত্রেই পীড়াবোধ করতেন। ভবানীচরণ-রামনারায়ণ-বঙ্কিম-দীনবন্ধু এর মোকাবিলা করতে গিয়ে নিজেদের কিছুটা দূরে সরিয়ে নিয়ে এগুলিকে বিদ্রূপ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। স্ব-সমাজের এই সমগোত্রীয় মানুষগুলির প্রতি সম্পূর্ণ সহৃদয়তাশূন্য হয়ে নিষ্ঠুর হওয়া সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠেনি। নানা ধরনের দ্বিধা-দোদুল্যমানতা এসে ব্যঙ্গের ধারকে ভোঁতা করে দিয়েছে। ভবানীচরণ, রামনারায়ণ, দীনবন্ধু বিদ্রূপের ঝালকে তরল করে দিয়েছিলেন নৈতিক উপদেশ দিয়ে, সমাজ সংস্কারের বাণী এনে বা কখনো-কখনো আবেগপরায়ণতায় পর্যবেসিত করে।

আর একটা অসুবিধা ছিল—ভাষার। ভবানীচরণের নকশা বা রামনারায়ণের প্রহসনে বা বঙ্কিমের *কমলাকান্তের দপ্তর* ও *লোকরহস্য*-র চরিত্রের কথোপকথনে সমকালীন চলতি বাংলা এলেও, মূলত এগুলি সাধুভাষার গণ্ডি থেকে পুরোপুরি বার হয়ে আসতে পারেনি। টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮-এ প্রকাশিত) এরও মূল বিবরণী সাধুভাষায় রচিত। এইসব রস-রচনায় ব্যঙ্গ-কৌতুকের গতিটা যেন কিছুটা আড়ষ্ট হয়েছিল। ব্যাজস্তুতি, বক্রোক্তি, তির্যক উপহাস এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল অধিকাংশ সময়।

হুতোম এসে কৌতুকরসের বন্যা বইয়ে দিলেন। নির্ভেজাল শ্লেষ ও নির্মম বিদ্রূপ এই প্রথম পাওয়া গেল উনিশ শতকের বাংলা লিখিত সাহিত্যে। Anaesthesia of the heart বা সমস্ত অনুভূতিকে অসাড় করে দিয়ে নৈর্ব্যক্তিক দর্শক হিসেবে সমাজকে পর্যবেক্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন হুতোম। কারুর প্রতি কোনো দয়া-মমতা, কাউকে সংস্কার করার কোনো বাসনা, অন্যায়-অনাচার থেকে মুক্তির উপায় বাতলানোর কোনো চেষ্টা—এসবের বিন্দুমাত্র রেশ নেই *হুতোম প্যাঁচার নকশা*-য়। বীরকৃষ্ণ দাঁ, তাঁর ম্যানেজার কানাইধন দত্ত, সোনাগাজীর রামহরিবাবু, প্যালানাথবাবু, নদেরচাঁদ গোস্বামী—হঠাৎ বড়োলোক ও তাদের মোসাহেবের দলকে যেভাবে হুতোম চপেটাঘাত করেছেন, সেইভাবেই এক হাত নিয়েছেন শহরের নন্নি, নুন্নী, মুন্নী, খন্নী ও সন্নী প্রভৃতি ডিগ্রি, মেডেল ও সার্টিফিকেটওয়ালা বড়ো বড়ো বাঈদের ও গোলাপ, শ্যাম, বিদু, খুদু, মুনি ও চুণী প্রভৃতি খ্যামটাওয়ালিদের। পক্ষপাতশূন্য, প্রায়-নিষ্ঠুর চোখে দেখেছেন শহরের সবরকম শ্রেণিরই স্বার্থপরতা ও সুযোগসন্ধানী মনোবৃত্তি। লখনউ থেকে নির্বাসিত নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্ কলকাতার মুচিখোলায় এসে বসতি স্থাপন করলেন, এবং তারপরে "চোর বদমাইসরাও বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় করে নিলে, দোকানদারদেরও অনেক ভাঙ্গা পুরোন জিনিষ বেধড়ক দামে বিক্রী হয়ে গ্যালো, দুই এক খ্যামটাওয়ালী বেগম হয়ে গ্যালেন...", সারা বইটি জুড়ে রয়েছে এক সর্বগ্রাসী cynicism, শহরের কোনো মানুষেরই প্রতি কোনো আস্থা নেই। বড়োলোকেরা লম্পট, ভণ্ড, মনিব-সাহেবদের চাটুকার, খেটে-খাওয়া মানুষেরা যে-কোনো সুযোগে দুটো পয়সা করে নিতে ব্যস্ত। 'শোভাবাজারে রাজাদের ভাঙ্গা বাজারে মেচুনীরা প্রদীপ হাতে করে ওঁচা পচা মাচ ও লোনা ইলিশ নিয়ে ক্রেতাদের—"ও গামচাকাঁদে, ভালো মাচ নিবি?" "ও খেংরাগুঁপো মিন্‌সে চার আনা দিবি" বলে আদর কচ্চে—মধ্যে মধ্যে দুই একজন রসিকতা জানাবার জন্য মেচুনী ঘেঁটিয়ে বাপান্ত খাচ্চেন। রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল ও মাতালরা লাঠি হাতে করে কানা সেজে "অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর দাতাগণ" বলে ভিক্ষা করে মৌতাতের সম্বল কচ্চে...'

খাঁটি বিদ্রূপবর্ষণের জন্য যে হৃদয়াবেগশূন্যতা প্রয়োজন, যে মানবিক শীর্ষস্থান দখল করে সাধারণ নাগরিকদের পার্থিব অনাচারগুলিকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, তা কালীপ্রসন্নের আয়ত্তাধীন ছিল। কলকাতার ধনী জমিদার বংশের সন্তান কালীপ্রসন্ন যেমন নিজের শ্রেণির সমাজটাকে হাড়ে-হাড়ে চিনতেন, ঠিক তেমনই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন কলকাতার রাস্তাঘাটের, বাজার-হাটের মানুষদের জীবনযাত্রার সঙ্গে। উভয় জগৎ সম্বন্ধে এই অভিজ্ঞতাই তাঁর কলমকে শাণিত করেছিল। উনিশ শতকের কলকাতার Black Town-এর এই দুই পরিবেশের নাগরিকদের আচার-আচরণে—শ্রেণি পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল একটি সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—লোকঠকানো। যে যা নয়, তা ভান করে নতুন শহর কলকাতায় দুটো পয়সা রোজগার করা। বানিয়া-মুচ্ছুদিরা সাহেবদের ভজিয়ে কুবের হয়েছিল। তাদের মোসাহেবেরা এই সব হঠাৎ বড়োলোকদের ঠকিয়ে পয়সা আদায় করেছিল। আর, তাদের নীচে শহরের যে নিম্নবর্গের মানুষ—কারিগর-মিস্ত্রি, দোকানদার, ফেরিওয়ালা, রাস্তার গাইয়ে-বাজিয়ে, ভিক্ষুক তারা এই উপরওয়ালাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী হুকুম পালন করে, তাদের বশংবদ চাকরের ভান করে জীবনধারণের উপায় আবিষ্কার করেছিল। নাগরিক জীবনের এই স্তর পরম্পরায়, কারুর পক্ষেই সততাপরায়ণ জীবনযাপন সম্ভব নয়। এই মহৎ সত্যটিই যুবক কালীপ্রসন্ন আবিষ্কার করেছিলেন ২২ বছর বয়সে যখন *হুতোম প্যাঁচার নকশা* লিখেছিলেন। সমাজ সংস্কার করে এ অবস্থার পরিবর্তনের আশা বোধ হয় তাঁর ছিল না। অবশ্য সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনার প্রতি তাঁর সংবেদনশীল মন উদাসীন থাকতে পারেনি। 'নীলদর্পণ' অনুবাদক রেভারেন্ড লঙ-এর বিচারের সময়, তাঁর উপর দণ্ডাদিষ্ট জরিমানার টাকা কালীপ্রসন্নই তৎক্ষণাৎ কোর্টে এসে মিটিয়ে দেন।

উনিশ শতকের কলকাতার নাগরিক চিন্তাবিদ্ হিসেবে কালীপ্রসন্ন সিংহের সঠিক মূল্যায়ন আজও হয়নি। বিচিত্রপথগামী এই চরিত্র। মাত্র তিরিশ বছর আয়ুষ্কালে (১৮৪০-১৮৭০) প্রায় পরস্পরবিরোধী সাহিত্যরচনাশৈলীর পৃষ্ঠপোষক হওয়া কি করে সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে? একদিকে দেখছি, তিনি মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করাচ্ছেন একেবারে সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলায়। অন্যদিকে, যখন *হুতোম প্যাঁচার নকশা* লিখছেন, তখন অভূতপূর্ব সাহসের সঙ্গে তৎকালীন কলকাতার রাস্তার ভাষা—যাকে বলা যেতে পারে কলকাতার cockney—সর্বপ্রথম বাংলা লিখিত-সাহিত্যে উপস্থাপিত করছেন। এ অসংগতির আড়ালে কি কোনো মানসিক, চিন্তাগত অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল? যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব এখনও বাঙালি মধ্যবিত্ত চিন্তাকে পীড়িত করে? বাঙালি সমাজের উপরিজগতের

ভাষার ও নিম্নবর্গের ভাষার ফারাকে যে শ্রেণিবৈষম্যের আসল চেহারাটা ধরা পড়ে, তা আজও বাংলা সংস্কৃতিকে দ্বিধাবিভক্ত করে রেখেছে নানা স্তরে। তৎকালীন কলকাতার নিম্নবর্গের cockney ভাষায় 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' রচনার পিছনে কালীপ্রসন্নের কি অনুপ্রেরণা কাজ করেছিল, তা আজও অভিনিবিষ্ট গবেষণার অপেক্ষায় আছে।

তবে, হুতোমের ভাষা নির্বাচনই যে বাংলা রসরচনার মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমসাময়িক এক পাঠকের প্রতিক্রিয়া উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "পাঠদ্দশায়...একখানি পুস্তক আমাকে আলোড়িত করিয়াছিল। আনন্দও পাইয়াছিলাম। সেখানি কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নকশা।...আমরা তখন নিতান্ত বালক, তাহার ভাষার ভঙ্গিতে, রচনার রঙ্গেতে, একেবারে মোহিত হইয়া গেলাম। মনে করিলাম, আমাদের বাঙ্গালা ভাষাতে বাজি খেলান যায়, তুবড়ি ফোটানো যায়, ফুল কাটান যায়, ফুয়ারা ছোটান যায়। মনে করিলাম, আমাদের মাতৃভাষা সর্ব্বাঙ্গে রঙ্গময়ী।"[১৭]

আসলে সমসাময়িক কলকাতার এই slang বা রাস্তার বাংলা, হুতোমের মেজাজের সবচেয়ে উপযুক্ত বাহক ছিল। এ ভাষায় কোনো আবেগপ্রবণতার স্থান ছিল না। কাঠখোট্টা বাচনভঙ্গি, চাঁচাছোলা উচ্চারণপ্রণালী, এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক, cynical বিদ্রুপের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। দয়া, মমতা, সহানুভূতি, করুণা—এ-সব অনুভূতির কোনো উপযুক্ত সমার্থশব্দ তদানীন্তন কলকাতার slang-এ মেলা ভার। রাস্তার নিজস্ব গোষ্ঠী-ভাষায় (social dialect) কোমল অনুভূতির বদলে স্বার্থান্বেষী চিন্তার প্রভাবই বারংবার ঘুরে-ফিরে আসে। চুরি, জোচ্চুরি, ভণ্ডামি, খুন-খারাপি এবং সর্বোপরি দেহোপজীবীনীদের ব্যবসা সংক্রান্ত জটিল স্তরপরম্পরা—নাগরিক জীবনের এই সব দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাষাই 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ-কৌতুকের মূল অবলম্বন। হাসি-ঠাট্টার আড়ালে রয়েছে এক পঙ্কিল, তমসাচ্ছন্ন জগৎ। সেই জগতের অনাচার নিয়ে, ধনী পৃষ্ঠপোষক ও তার মক্কেলদের নিয়ে, তারই বাসিন্দাদের ভাষায়, কৌতুকপ্রবণতা।

কিন্তু মনে রাখা দরকার, 'হুতোমের' মালমশলা—ভাষাগত ও বিষয়গত—উভয়ই, কালীপ্রসন্ন সিংহ আহরণ করেছিলেন সে-যুগের কলকাতার লৌকিক সংস্কৃতির এক দীর্ঘ ঐতিহ্য থেকে। আজকে আমরা *হুতোম প্যাঁচার নকশা* পড়ে উনিশ শতকের কলকাতার সমাজজীবনের লৌকিক ভাষা—বা সে যুগের শহরের রাস্তার মানুষের চোখে দেখা দৃশ্য হিসেবে বইটিকে গ্রহণ করছি। কিন্তু, হুতোমের আসল উৎসে ফিরে যাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ উনিশ শতকের কলকাতার রাস্তা-ঘাট-বস্তি-বাজারের মানুষেরা

সমসাময়িক সামাজিক জীবনের হাস্যকর অসংগতি দেখে নিজেরাই কৌতুক করতেন, ব্যঙ্গাত্মক গান বাঁধতেন, রাস্তায় সঙ নামাতেন, কবির লড়াইতে বড়োমানুষদের নিয়ে বিদ্রূপ করতেন, ইংরেজ শাসকদের পৃষ্ঠপোষিত খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের বক্তৃতায় ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতেন, নিজেদের সমাজের ধার্মিক ভণ্ড-তপস্বীদের তীব্র উপহাসে নাস্তানাবুদ করতেন। হুতোমের রম্যরচনার আদি সংস্করণ রয়েছে এই নাগরিকদের অপ্রকাশিত, অনেক সময় অদৃশ্য (আমাদের আধুনিক উপলব্ধিতে) ছড়া ও গানে, ব্যঙ্গ-কৌতুকে, মৌখিক গল্প-উপাখ্যানের শ্রুতি ও স্মৃতিতে। অতীত কলকাতার এই লৌকিক সংস্কৃতির কৌতুকাবহ ঐতিহ্য আজ আর বড়ো একটা মনে পড়ে না।

৪

উনিশ শতকের কলকাতার নিম্নবর্গের মানুষের অধিকাংশই এসেছিলেন তাঁদের গ্রামীণ পৈতৃক পেশা ও ভিটে থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে। শহরের নতুন রীতি-নীতি, হাবভাবের সঙ্গে সাযুজ্য রাখতে গিয়ে প্রতি পদেই হোঁচট খেতেন। 'ভদ্রলোক'দের কাছ থেকে শুনতে হত গালাগালি—'ইতর', 'ছোটলোক', 'গেঁইয়া'। গরিব বলে কি তাঁদের আত্মসম্মানবোধ ছিল না? এ অপমানের প্রতিশোধ নেবার একমাত্র উপায় ছিল ঐ উন্নাসিক 'ভদ্রলোকদের' নাকে-কানে খত দেওয়ানো—যেটা বাস্তবে সম্ভব ছিল না। তাই বিদ্রূপাত্মক প্রবাদে, গানে, কবির লড়াই-এর খেউড়ে, পাঁচালিতে, সঙ-এর মিছিলে, সে-যুগের কলকাতার রাস্তায় আর বাজারে শহরের এক দরিদ্র, অপাঙ্‌ক্তেয় মানুষেরা তাঁদের অবরুদ্ধ ক্ষোভ প্রকাশ করার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন।

এই হাসির জগতের একটা নিজস্ব শহুরে চরিত্র ছিল। অতীত বাংলা লোকসংস্কৃতিতেও প্রচুর হাস্য-কৌতুকের উপাদান ছিল—মঙ্গলকাব্যে শিবকে নিয়ে ঠাট্টা, গ্রামীণ প্রবাদ, প্রচলিত মেয়েলি ছড়া, গোপাল ভাঁড়ের গল্প। যদিও এই জাতীয় প্রাচীন প্রবাদ ও ছড়া অনেক সময় নাগরিক রূপ নিয়েছিল, মূলত উনিশ শতকের কলকাতার লৌকিক হাসি-মস্করা, ব্যঙ্গ-কৌতুকের উপাদান ছিল নতুন শহরের বিচিত্র ঘটনাবলী। ঔপনিবেশিক আওতাতে তৈরি এই শহরের সামাজিক জীবনে নতুন সম্পর্ক—দোকানদার-ক্রেতা, বাবু-মোসাহেব, সাহেব-মুৎসুদ্দি, রক্ষক-রক্ষিতা—এইসব নিয়েই সে-যুগের কলকাতার ঠাট্টা-মস্করা, প্রবাদ ও গান, প্রহসন ও সঙ। অতীতের ঢাকা শহরের 'কুট্টি' রসিকতাও ছিল এই ব্যবসায়িক সম্পর্ককে উপলক্ষ করে। বহুল-প্রচলিত দুটি গল্প এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এক 'কুট্টি' ঘোড়ার গাড়োয়ানকে নির্দিষ্ট ভাড়ার কম দিতে চাওয়ায় 'ভদ্রলোক' আরোহীকে তার মোক্ষম জবাব—''আর বলবেন না

সাব্, ঘোড়ায় হাসব।'' আর একবার, এক ভীষণ কালো লোমশ ভদ্রলোক এক কুট্টি কাপড়ওয়ালার দোকানে গেছেন আচকানের জন্য সাদা কাপড় কিনতে। কাপড় দেখেশুনে তাঁর পছন্দ হল বটে, কিন্তু প্রতি গজের দাম শুনে তিনি আর কিনলেন না এবং ফিরে চললেন। কুট্টির বিদায়কালীন উপদেশ তাঁর প্রতি—''সাব্, এক কাম করেন। দোকান থাইক্যা চারটি সাদা বোতাম কিইন্যা লন। বুকের মধ্যে দিয়া লইলে আচকান ভি হইব, শেরওয়ানী ভি অইব।''

দুটি গল্পতেই Patron-Client সম্পর্কের আওতাতে একটা অসংগত দৃশ্যের কল্পনা করে হাসির উদ্রেকের প্রচেষ্টা। উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষদের মধ্যে যে দুর্বল, (আর্থিক ও সামাজিক অর্থে) সে-ই উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ভদ্রলোকের ব্যয়-সংকোচের প্রবৃত্তিকে এমন-এক চূড়ান্ত বিদ্রুপবাণ হানে, যার আর কোনো জবাব নেই!

কলকাতাতেও পৃষ্ঠপোষক-প্রতিপালিত সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যে কৌতুক-রসের অবতারণা করেছিলেন নিম্নবর্গের মানুষেরা। উনিশ শতকের শুরুতে জমিদার-বেনিয়ান-দেওয়ানদের প্রশ্রয়ে ও আনুকূল্যে আসর জমিয়েও কবিওয়ালারা একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতেন, এবং সুযোগ পেলেই ঐ সব পৃষ্ঠপোষকদের দুটো কথা শুনিয়ে দিতে কসুর করতেন না। ভোলা ময়রার সেই বিখ্যাত গানটি স্মরণীয়—

আমি ময়রা ভোলা, বাগবাজারে রই।
নই কবি কালিদাস, তবে খোসামুদের মাথা খাই।

তারপরই উপস্থিত জমিদারকে উদ্দেশ্য করে কর্তাদের চেহারা ও কিপটে স্বভাব নিয়ে বক্রোক্তি—

পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুকতের মধু অলি,
মাপ কর গো রায় বাবু, দুটো সত্য কথা বলি।
মোষের মত মুন্সী বাবু মসীর ন্যায় কালো।
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙায়ে চেহারাখানা ভালো।[১৮]

ঢাকাই কুট্টির রসিকতার মতো, এখানেও দেখতে পাই কর্তা-ব্যক্তিদের ব্যয়কুণ্ঠা ও দৈহিক অসৌষ্ঠব নিয়ে ঠাট্টার প্রবণতা। শহরে কিছু বড়োলোকদের টাকা জমিয়ে পাহাড় করা এবং তাদের হাতভারী স্বভাব—এই যে অসংগতি, এর সঙ্গে তাদের শারীরিক সৌষ্ঠবহীনতাকে এক করে দেখে, একটা হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।

আর একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, গোড়া থেকেই—প্রায় শহরের সূত্রপাত থেকেই, কলকাতার এই রাস্তাঘাটের, বস্তি-বাজারের বাসিন্দারা কোনোদিন এ শহর সম্বন্ধে

কখনো গর্ববোধ করেননি, বরাবরই এর উৎকট, কদর্য, কদাকার সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলিই নিয়ে ঠাট্টা করেছেন। প্রচলিত প্রবাদগুলি নেওয়া যেতে পারে। "জাল, জুয়োচুরি, মিথ্যে কথা, এই তিন নিয়ে কলিকাতা"—এই প্রবাদটি আঠারো শতক থেকেই (অর্থাৎ শহর যখন গড়ে উঠছে, তখন) চালু। বাংলায় অঞ্চলভিত্তিক, স্থানীয় বৈশিষ্ট্য-কেন্দ্রিক প্রবাদ বহুকালাবধি প্রচলিত। কিন্তু এই পুরোনো প্রবাদগুলিতে, ঠাট্টার সঙ্গেও কিছুটা আঞ্চলিক আত্মশ্লাঘা জড়িত ছিল। যেমন, "উলোর মেয়ে কুলুজী, অগ্রদ্বীপের খোঁপা/শান্তিপুরের হাত নাড়া, গুপ্তিপাড়ার চোপা" বা "লম্বা কোঁচা, কাছা টান/তবে জানবে বর্দ্ধমান" অথবা, "পোস্ত, টক, কলাইয়ের ডাল, এই তিন বীরভূমের চাল"। কিন্তু, এ তুলনায় কলকাতায় আমরা কি পাই? "কলকাতার ছিষ্টি, গুড়ে নেই মিষ্টি।" কালীপ্রসন্নর *হুতোম প্যাঁচার নকশা*-য় এই সব নিন্দাত্মক প্রবাদেরই ঐতিহ্যধর্মী গানটি কলকাতার চরিত্র তুলে ধরে—

> আজব সহর কলকেতা'
> রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি কথার কি কেতা।
> হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা;
> যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদমাইসির ফাঁদ পাতা।

শহরের রাস্তাঘাটে বা পার্শ্ববর্তী বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের খ্যাতি (বা কুখ্যাতি) ছড়িয়ে পড়েছিল সেখানকার যথেচ্ছাচারিতা ও কুকীর্তি কেন্দ্র করে। কাশী-বৃন্দাবন-মথুরার মতো এই পাড়াগুলিও যেন পালটা তীর্থস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল শহরের লোচ্চা-লম্পটদের কাছে। সমসাময়িক একটি লৌকিক ছড়া উল্লেখযোগ্য—

> বাগবাজারে গাঁজার আড্ডা, গুলির কোন্নগরে,
> বটতলায় মদের আড্ডা, চণ্ডুর বৌবাজারে
> এই সব মহাতীর্থ যে না চোখে হেরে,
> তার মত মহাপাপী নাই ত্রিসংসারে।[১৯]

ঠিক একই ঢং-এ, পঞ্চসতী নিয়ে বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোকের Parody বানিয়েছিলেন *মধ্যস্থ* পত্রিকার সম্পাদক মনোমোহন বসু, সমসাময়িক বারবনিতা সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রতিপত্তি (কলকাতার ধনী 'বাবুদের' মধ্যে) লক্ষ্য করে—

> ফুলমণি, জয়মণি, আন্দী,
> লক্ষ্মী পদ্মমনিস্তথা
> পঞ্চ বেশ্যাং স্মরেন্নিত্যং
> মহাপাতক-নাশনং।[২০]

মাতাল-গুলিখোর-গঞ্জিকাসেবী-বেশ্যা-দালাল—এরা সবাই কলিকাতা কৌতুকালয়ের নায়ক-নায়িকা। প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী সামাজিক রীতি-নীতি, মূল্যবোধ থেকে এদের চাল-চলন, আলাদা। তা অতীতের নৈতিক কষ্টিপাথরে নিন্দার্হ ছিল, অথচ, এই নতুন শহরে, এরাই সর্বজনবিদিত। বাগবাজারের ধনীর দুলাল শিবচন্দ্র মুখুজ্যের খ্যাতির ভিত্তি ঐ অঞ্চলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত গাঁজার আড্ডা।[২১] সোনাগাছির বারবনিতারা কলকাতার বিখ্যাত বংশের বাবুদের রক্ষিতা ও প্রেয়সী হয়ে নাম কেনেন। অতীতের লালিত সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে নাগরিক জীবনের নতুন মূল্যবোধের এই যে চূড়ান্ত অসংগতি—এইটেই খোরাক জুগিয়েছে উনিশ শতকের কলকাতার লৌকিক কৌতুকহাস্যের। সমসাময়িক পাঁচালীকার দাশু রায় (যদিও দাশরথি রায় কলকাতাবাসী ছিলেন না, তাঁর 'পাঁচালী'তে কলকাতার সমাজজীবনের চিত্র স্পষ্ট, এবং ঐ যুগের কলকাতায় এ পাঁচালী জনপ্রিয় ছিল) অসঙ্গতিটা স্পষ্ট ধরতে পেরেছিলেন—

> সতীদের অন্ন জোটে না, বেশ্যাদের জড়োয়া গহনা,
> রাবণের স্বর্ণপুরী শ্রীরামচন্দ্র বনচারী
>
> . . .
>
> সৃষ্টি সব সৃষ্টিছাড়া, বাজিয়ে পায় শালের ঘোড়া
> পণ্ডিতে চণ্ডী পড়ে দক্ষিণা পান চারটি আনা।[২২]

কলকাতার পণ্য বেচাকেনার পরিবেশে, নতুন মূল্যবোধের আবহাওয়ায়, অনুগত সতী-সাবিত্রী স্ত্রীর থেকে বেশ্যার মূল্য বেশি, চণ্ডীপাঠের থেকে বাজনদারের চাহিদা বেশি। মজা হচ্ছে, দাশু রায় নিজেই এই নতুন সমাজ-ব্যবস্থা ও তার মূল্যবোধের সুবিধাভোগী ছিলেন। তাঁর শিল্পীজীবনের (যেটা কর্ম্মজীবনও হয়ে উঠেছিল) শুরুতে লোকে "তিনটি মাত্র টাকা দিয়া পাঁচালীর গান করাইত, শেষে শত মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হইলেও সেই দাশরথী তাঁহাদের দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিলেন।"[২৩]

কলিকাতা কৌতুকালয়ে মাতালদের দুই ভূমিকায় দেখি। এক উপহাসের পাত্র হিসেবে। আর এক, সেই যাত্রা-ধর্মী 'বিবেক'-এর ভূমিকায়—সমসাময়িক সমাজের আচার-ব্যবহারের উপর নৈর্ব্যক্তিক টীকাকারের ভূমিকায়। উপহাসনীয় চরিত্ররূপে মাতালদের পাওয়া যায় সে-সময়কার অজস্র লৌকিক গল্প-কাহিনিতে, হেটো গানে, বটতলার সাহিত্য ও প্রহসনে। মদ্যপের বেসামাল অবস্থা, স্মৃতি-বিভ্রম ইত্যাদি স্বভাবতই দর্শকদের অসংগতিবোধজনিত কৌতুকরসকে জাগিয়ে তুলত। অসহায় মাতালের দুরবস্থার প্রতি এক ধরনের নিরীহ নিষ্ঠুরতা জনমানসের 'অনতিগভীর' স্তর থেকে বার হয়ে আসত।

বিশেষ করে, নিম্নবর্গের চোখে, মদ প্রভু-ভৃত্য সবাইকেই সমপর্যায়ের মানসিক স্তরে নামিয়ে আনত।

শোভাবাজারের বনেদি ঘোষ পরিবারের ঘোর তান্ত্রিক কালীশঙ্কর ঘোষ বিষয়ে একটি লৌকিক কাহিনি প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মশাই উদ্ধার করে আমাদের শুনিয়েছেন। সুরাপান ছাড়া এই পরিবারে আহ্নিক সম্পন্ন হত না। পুরোহিত, কর্তা, অন্দরে গৃহিণী এবং দাস-দাসী সবাইকে মদ্যপান করতে হত। "একদিন সান্ধ্যাহ্নিক অন্তে কালীশঙ্কর একটি পা মুড়িয়া একটি পা বাড়াইয়া মালা জপ করিতেছেন, মাতাল ভৃত্য সেই পা-খানি টিপিতে টিপিতে কাঁদিতেছে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই কাঁদিতেছিস কেন রে? উত্তর হইল, কর্ত্তা এতদিন চাকুরী করিতেছি, কখনও কোন অপরাধ করি নাই, আজ আপনার একখানা পা হারাইয়া ফেলিয়াছি, খুঁজিয়া পাইতেছি না। কর্ত্তা হাসিয়া বললেন, তার জন্য চিন্তা কি, বোধহয় জলখাবার জায়গায় ফেলিয়া আসিয়াছি, যা বাটীর ভিতর হইতে লইয়া আয়। ভৃত্য অন্দরে গিয়া অনেক অনুসন্ধান করিল, শেষে গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, একবার আহ্নিকের জায়গায় দেখিয়া আয়, তাহাও হইল, কিন্তু পা পাওয়া গেল না। কাঁদিতে কাঁদিতে ভৃত্য আবার কর্ত্তাকে সমস্ত অনুসন্ধানের কথা জানাইল, তিনি বলিলেন, তবে বুঝি আহ্নিকের নৈবেদ্যর সহিত ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে গিয়াছে, যা সেখানে জিজ্ঞাসা করিয়া আয়। ভৃত্য গুরুর গৃহে গিয়া জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, ওরে কালীশঙ্করের পা যদি আমার বাটীতে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি কাল সকালে মাথায় করিয়া পহুঁছাইয়া দিয়া আসিব, তুই এখন যা। ভৃত্য আশ্বস্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।"[২৪] মাতালের মনোযোগ-শূন্যতাকে একটা উদ্ভট কল্পনার জগতে নিয়ে গিয়ে হাসির ইন্ধন জোগানোই ছিল সুরাপান-সংক্রান্ত রসিকতার মূল উদ্দেশ্য।

কিন্তু সুরাসক্ত মানুষ 'জাতে মাতাল' হলেও 'তালে ঠিক'। তাই আবার আর-এক ধরনের কৌতুক-কাহিনিতে দেখি মাতালের মুখে বসানো হচ্ছে বাঁকা বিদ্রূপ, যার লক্ষ্য সামাজিক অজ্ঞতা। আশেপাশের সদাভয়ার্ত অন্ধবিশ্বাসী মানুষদের প্রতি অনুকম্পা থেকে এক ধরনের Devil's laughter বার হয়ে আসে। বটতলার একটি কাব্যোপাখ্যানের অংশবিশেষ এ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে, অনুমান ১৮৭৫/৭৬ সালে কলকাতায় হঠাৎ গুজব রটল মাছের বসন্ত রোগ হয়েছে। ফলে বাঙালির মাছ খাওয়া প্রায় শিকেয় উঠল। খদ্দেরদের আক্ষেপ, মেছুনিদের বাজার নষ্ট ইত্যাদি নিয়ে তখন বটতলা থেকে বহু সস্তাদরের ছড়ার বই প্রকাশিত হয়েছিল। তারই একটিতে দেখতে পাই, যখন সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসেছে মৎস্যাভাবে, তখন এক মাতাল তাদের বোঝাচ্ছে—

মাছেতে হয়েছে পোকা তাহে ক্ষতি নাই
কিনে আনো ভাজা করি মদ দিয়া খাই
সুরা দেবীর কাছে বল আছে কার বল
পোঁকা টোকা যত আছে যাবে রসাতল।
আরো এক কথা বলি শোন মন দিয়া
যখন ভাজিবে মৎস্য কাটিয়া কুটিয়া
পোঁকাগুলি তখন কি জীয়ন্ত থাকিবে
যে পেঁটে গিয়া নাড়ি ভুঁড়ি খাইয়া ফেলিবে।

তারপর মাতালটি তার বন্ধু-ইয়ারদের নিয়ে;

বাজারে যাইয়া মৎস্য কিনিয়া লইল
যতেক রকম সেই দিনে এসেছিল।
ঝাঁকামুটে করি তবে বেশ্যালয় গিয়া
হাতাহাতি করে সব ফেলিল ভাজিয়া।

. . .

নিশিযোগে সকলেতে একত্র হইল
মহা সমারোহে মদ্যপান আরম্ভিল
গোটা গোটা মৎস্যভাজা তুলি দেয় মুখে
কাঁটাশুদ্ধ খায় সবে চিবাইয়া সুখে।[২৫]

আসলে কলকাতার লৌকিক সাহিত্যে মাতালদের প্রতি একটি ambivalence বা দোদুল্যমান মনোভাব বেরিয়ে আসে। সুরাপানের বিপদ ও সর্বনাশ নিয়ে বহু গান-কবিতা প্রচলিত ছিল। পাশাপাশি আবার রাস্তা-ঘাটের, হাট-বাজারের গল্প-কাহিনিতে মাতাল নায়কদের প্রতি একটা গোপন শ্রদ্ধা সিঁধ কেটে ঢুকে পড়ত। মাতালের মুখ-আলগা স্বভাবের সুযোগ নিয়ে তার মুখে এই কাহিনিকাররা সাদামাঠা সত্যকথাটা বলিয়ে দিতে পারতেন—যে সত্যকথা অনেক সময়ই ভণ্ডামি ও তথাকথিত ভদ্রতার মুখোশটা ছিন্ন করে দিত। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এ গল্পটার বহুধাবিস্তৃত ব্যঞ্জনা তদানীন্তন সামাজিক আবহাওয়ার ছবিটা তুলে ধরে। একজন বোষ্টম গোঁসাই মদ খেয়ে চুর হয়ে এক বুড়ো খাসির মাংস হাতে নিয়ে টলতে টলতে চলেছে, মুখে হরিবোল চলছে। বুড়ো খাসির মাংস দেখে লোকজন বলে উঠল—"প্রভু, এ পাকা মাংস এনেছো, গলবে কেন?" গোঁসাইজী বললেন—"যে হরিনামে, বাবা, পাষাণ গলে, সে নামে মাংস গলবে না?"[২৬]

মাতাল, মাংসপ্রিয় বোষ্টম-গোঁসাইয়ের চরিত্রেই রয়েছে হাস্যকর অসংগতির উৎস। তার ওপর, হরিনাম আউড়ে মোক্ষলাভের বৈষ্ণবী বিধিনির্দেশের ব্যাজস্তুতি গোঁসাই-এর মুখ দিয়ে বার করে গল্পটা ধর্মীয় আচারপরায়ণতার অসারত্বের এক তির্যক বিদ্রূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ ঠিক অনুরূপ ভঙ্গিতে মাতালের মুখ দিয়ে মূর্তিপুজোর হাস্যকর দিকটা তুলে ধরেছিলেন 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য়। তাঁর অনুকরণীয় ভাষায়—"...একজন বাবু মাতাল পাত্র টেনে বিলক্ষণ প্যেঁকে যাত্রা শুনছিলেন, যাত্রা ভেঙ্গে যাওয়াতে গলায় কাপড় দিয়ে প্রতিমে প্রণাম কত্তে গ্যালেন (প্রতিমে হিন্দুশাস্ত্র সম্মত জগদ্ধাত্রী-মূর্তি), কিন্তু প্রতিমার সিংগি হাতীকে কামড়াচ্ছে দেখে বাবু মহাত্মার বড়ই রাগ হলো ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে করুণা সুরে—

তারিণী গো মা কেন হাতির উপর এত আড়ি।
মানুষ মোলে টেডটা পেতে তোমার যেতে হতো হরিণবাড়ি।
সুরকি কুটে সারা হতে, তোমার মুকুট যেতো গড়াগড়ি।
পুলিশের বিচারে শেষে সঁপতো তোমায় গ্রান যুড়ি
সিঙ্গিমামা টেরটা পেতেন ছুটতে হতো উকীলবাড়ী।[২৭]

গান গেয়ে প্রণাম করে চলে গেলেন।"

মাতালের মুখনিঃসৃত হলেও কথাগুলোর যথার্থতা অস্বীকার করা যায় না। পৌরাণিক উপাখ্যানের নায়ক-নায়িকাদের (ও জন্তু-জানোয়ারদেরও) শহরে প্রশাসনের মুখোমুখি আনলে, অসংগতিটা হাসি ছাড়া আর কি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায়?

মাতালদের মুখ দিয়ে পৌরাণিক দেব-দেবীদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশার একটা রেওয়াজ গড়ে উঠেছিল উনিশ শতকের কলকাতার লোক-সাহিত্যে। বটতলার চটি বইগুলিতে এর ভূরি-ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়। মাছের বসন্তরোগের গুজবের প্রায় একই সময় কলকাতায় বাগবাজারে মদনমোহনের মন্দিরে চুরি ও সিদ্ধেশ্বরীর মূর্তির হাত ভাঙা নিয়ে কলকাতায় হুলস্থুল বেধে যায়। বটতলার কবি-সাহিত্যিকেরা এ নিয়ে লিখতে শুরু করে দেন। মতিলাল সুরের প্রকাশিত—"হুলস্থূল ব্যাপার—বাগবাজারের মদনমোহন চটে লাল এবং সিদ্ধেশ্বরী ও মাতালের যুদ্ধ" বইটিতে ঘটনাটিকে বেশ রসালো ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। মন্দিরে চুরির পর মদনমোহন অভিমান করে—

বঙ্গের দুর্দশা হেরি বিচারি অন্তরে
অপমানে চলে যাবে বঙ্গ ত্যাগ করে।

কবি তাঁকে অনুরোধ করেন—

আমি বলি মদনমোহন যাবেন যদি চলে
হাজার টাকা গহনা বেচে যাওনা বিলেত চলে।

সিদ্ধেশ্বরীর হাতভাঙার এক কৌতুকাবহ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বইটিতে। দেবীর এক মাতাল ভক্তের প্রার্থনা নামঞ্জুর করার জন্য ভক্তটি সিদ্ধেশ্বরীর মূর্তির হাত ভেঙে দেয়। কবির মন্তব্য—

ধন্য সুরা তোর তেজ, ধন্য শিষ্য তোর
দেবী হাত মোচড়াইল হইয়া বিভোর।[২৮]

ঠাকুর-দেবতাদের নিয়ে এই জাতীয় রঙ্গ-রসিকতার একটা ঐতিহ্য ছিল বাংলা লোকসাহিত্যে। মঙ্গলকাব্যে এবং গ্রামীণ সংস্কৃতিতে এর একটা স্বীকৃত স্থান ছিল।[২৯] এরই জের ধরে উনিশ শতকের কলকাতার নাগরিক, লৌকিক কথা-কাহিনি, গান ও ছড়ায়, কবিওয়ালাদের খেউড়ে আর বটতলার প্রহসনে পুরাণের এক ধরনের বিকল্প ভাষ্য গড়ে ওঠে, রাশভারী ধর্মীয় ব্যাখ্যার পাশাপাশি parody-র প্রবহমাণ স্রোত বইতে থাকে। বাঁধাধরা, সামাজিক নিয়মকানুন অনুশাসিত জগৎ থেকে এ-জগৎটা স্বতন্ত্র। এ জগতের বাসিন্দারা শহরের তথাকথিত ইতরজন, অভিজাতদের উপাস্য চরিত্রগুলোকে স্বর্গ থেকে মাটিতে নামিয়ে এনে পারিপার্শ্বিক জগতের মানব-মানবীতে পরিণত করে এরা আনন্দ পেত। পার্বতীর মুখে শিব সম্বন্ধে এই বিদ্রূপাত্মক কথাগুলি পাওয়া যায় সে যুগের কলকাতার এক ঝুমুরওয়ালির গানে—

বাপ হয়ে জামাই এনেছে
দোষ দিব কি পরকে?
মোটাসোটা ঢোলের মতন
যম নারে তার বলকে।
এমন এনেছে জামাই
ভাঙ-ধুতুরা নাইকো কামাই গো,
পাকা দাড়ি ত্রিশূল ধারী
তা দেখে মন টলকে।[৩০]

সমসাময়িক সমাজের মাদকাসক্তি, বুড়ো স্বামীর পরিচিত চরিত্রের ছাঁচেই শিবকে দেখতে পাই। পৌরাণিক দেব-দেবীদের নিয়ে এই verbal desecration বা বাচনিক অপবিত্রকরণের প্রবণতায় কি একটা বিদ্বেষের তির্যক অভিব্যক্তি ছিল? নিম্নবর্গের মানুষের উচ্চবর্গের উন্নাসিকতার বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে প্রতিহিংসা নেওয়ার ইচ্ছা ছিল কি? উচ্চবর্গের সযত্নে সংরক্ষিত মূল্যবোধগুলি, সংস্কৃত-ঘেঁষা দুর্বোধ্য শব্দের খাঁচায়

লালিত সাহিত্যশিল্প, ছোটোলোকদের ছোঁয়া থেকে বাঁচানো শুদ্ধ দেব-দেবী—এই সব কিছুর বিরুদ্ধে একটা বেপরোয়া অবজ্ঞা প্রকাশের মনোভাব লৌকিক সংস্কৃতিতে বেরিয়ে আসে বলে মনে হয়।

তাই কলকাতার এই নাগরিক লোকসংস্কৃতির শব্দসূচিতে এমন অনেক ধরনের কথা থাকত যেগুলি সচরাচর ভদ্রলোকের সমাজে নিষিদ্ধ বলে পরিগণিত হতে শুরু করেছিল উনিশ শতকের শুরুতেই। সমসাময়িক ভিক্টোরীয় নৈতিক মূল্যবোধের কাঠামোয় তৈরি ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের কানে এই সব কথাগুলি 'অশ্লীল' বলে বিবেচিত হতে লাগল। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত এই শব্দগুলি শরীরাঙ্গ ও শারীরিক ক্রিয়াকলাপ-সম্বন্ধীয়। এইসব মাজাঘষাহীন শব্দ লোক-সংস্কৃতিতে ঝাঁঝালো, তীব্র শ্লেষ বিদ্রূপ প্রকাশের একটা শক্তিশালী হাতিয়ার ছিল—বিশেষ করে পুরুষ-শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে উদ্দিষ্ট মেয়েলি প্রবাদও ছড়ায়। যেমন এই ব্যঙ্গাত্মক আক্ষেপ—"অভাগীর বক্ত (ভাগ্য), জোয়ান দেখে ধরলাম ভাতার, সেও হাগে রক্ত।"[৩১] প্রভু-ভৃত্যের, পৃষ্ঠপোষক প্রতিপালকের সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যেও নিম্নবর্গ মানুষ ঠাট্টা করত এই শব্দগুলির সাহায্যে। যেমন ঐ সময়ের প্রচলিত একটি প্রবাদ—"কর্তার পাদে গন্ধ নেই।"[৩২]

৫

উনিশ শতকের কলকাতার নিম্নবর্গের সম্প্রদায়ের হাস্য-কৌতুক, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা প্রতিবাদধর্মী চরিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু প্রতিবাদের চেহারাটা খুঁটিয়ে দেখা দরকার। আজকের মাপকাঠিতে সবসময় তা প্রগতিপন্থী নাও মনে হতে পারে। সমকালীন সামাজিক ঘটনা ও প্রবণতা নিয়ে যেসব ছড়া-গান ও কৌতুক-রসিকতা প্রচলিত ছিল, তার লক্ষ্য অনেক সময়ই ছিল নব্যশিক্ষিত বাঙালিদের সমাজ-সংস্কারের প্রচেষ্টা। স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ, মদ্যপান বিরোধী প্রচার—এইসব নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ কলকাতার লোকসংস্কৃতিতে প্রায়ই দেখা যায়। যেমন, কাঁড়াদাসের এই গানটি—

হদ্দমজা কলিকালে কল্লে কলকেতায়।
মাগীতে চড়লো গাড়ী ফেটিং জুড়ি।
হাতে ছড়ি হ্যাট মাথায়।
ষষ্ঠী মাকাল আর মানে না,
সেঁজুতির ঘর আর মানে না,
আরসিতে মুখ আর দেখে না,

এখন কেবল ফটোগ্রাফ চায়।
এখন গাউন পরে ঘোড়ায় চড়ে,
গঙ্গাস্নান তো দেছে ছেড়ে,
গোসলখানায় খানসামাতে টাউয়েল দিয়ে গা মোছায়।[৩৩]

নব্যশিক্ষিত মহিলাদের আচার-আচরণকে অতিরঞ্জিত করে একটা হাস্যকর ছাঁচ বা stereotype তৈরির প্রচেষ্টাটা লক্ষণীয়। শহরে এই মহিলাদের জগৎটা ছিল অচেনা, দূরবর্তী এই সব লোককবিদের কাছে। তাই দেখি, রন্ধনশালা থেকে 'খানসামাকে' স্থানচ্যুত হয়ে গোসলখানায় এসে 'টাউয়েল' দিয়ে কর্ত্রীর গা মোছাতে হচ্ছে।

নব্যশিক্ষিত বাঙালি পুরুষরাও, একইভাবে, লোককবিদের ছড়ায় উপহসিত হয়েছেন। তাদের হাস্যোদ্দীপক বর্ণনা পাওয়া যায় প্যারিমোহন কবিরত্নের এই গানটিতে।

চাঁপদাড়ি রাখা, চোখে চস্‌মা ঢাকা,
ভয়ানক ঢং লেগেছে বাংলাতে।
এ পথের পথিক, নম্বরে অধিক,
যায় কেবল ইয়ং বেঙ্গলেতে।

তারপর কবি তাঁর আপত্তির কারণটা ব্যাখ্যা করেন—

চেনা যায় না এখন হিন্দু মুসলমান,
চেহারায় চোকে ঠেকে সব সমান,
বাঁডুয্যে কি রসুলব' রমজান,
অনুমান করা কঠিন এক্ষণেতে।
দাড়ি রাখে লোকে হলে মহারোগ,
দাড়ির সঙ্গে নাই ধর্ম্মের সংযোগ,
তবে দাড়ি রাখা কেবল কর্ম্মভোগ,
কামানো পয়সাটা পায় না নাপিতে।[৩৪]

শিক্ষিত সম্প্রদায় নিয়ে লোককবিদের এই বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের কারণটা কী ছিল? এই সব সমাজসংস্কারক ভদ্রলোক শ্রেণির নতুন চিন্তা ও মানসিকতার সঙ্গে নিম্নবর্গের মানুষেরা সম্পৃক্ত হতে পারেননি বলেই কি বিরূপতা? চিরকালের একটা দূরবর্তী জগতের জটিল গূঢ় তর্কবিতর্কের বিষয় বলে এই সব সংস্কার বিবেচিত হতো কি গরিব মানুষের চিন্তায়? স্ত্রী-শিক্ষা, মেয়েদের প্রকাশ্যে ঘোরা-ফেরা, শিক্ষিত ভদ্রলোকদের সভা-সমিতি নিয়ে হৈচৈ ও হিন্দু সমাজের অনাচার বন্ধ করার প্রচেষ্টা—এ সবই, উচ্চবর্গের রুচি ও রীতিনীতির হালচালের অঙ্গীভূত করার একটা প্রবণতা দেখা যায়

লোককবিদের চিন্তায়। পড়াশোনার সঙ্গে 'বাবু' সংস্কৃতির বেলেল্লাপনা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার সঙ্গে ইংরেজি কায়দা ও কেতাকে অভিন্নরূপে দেখার একটা ঝোঁক ছিল এঁদের গানে ও কবিতায়।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় বাঙালি 'ভদ্রলোক' শ্রেণির নব্য-অর্জিত আদব-কায়দা, পোশাক-আশাক, আবার ভণ্ড তপস্বীদের দুষ্কর্ম—এ সব নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের একটা বিশেষ মাধ্যম ছিল কালীঘাটের পট। এগুলি আরও প্রখর হয়ে প্রকাশিত হতো রাস্তায় সঙ-এর প্রদর্শনীতে। লোকশিল্পীরা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ব্যঙ্গ বা কুপ্রথাগুলিকে নিন্দা করে প্রকাশ্য রাজপথে সঙ সেজে জনসাধারণকে আমোদ বিতরণ করতেন।[৩৫]

সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়, ধনী অভিজাতবর্গের ও 'বাবু'দের কেতা-কানুন, হাব-ভাব, আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদি নিয়ে লোকসঙ্গীত, ছড়ায়, বটতলার সাহিত্যে ও সঙ-এ হাস্য-কৌতুকের মাধ্যমে এক ধরনের group identity বা নিজস্ব গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য প্রমাণের চেষ্টা দেখা যায়। নব্য-শিক্ষিতরা, ধনীরা—এরা আলাদা ধাঁচের মানুষ। এদের শিক্ষা ও অর্থের গর্বকে ভাঙবার জন্য এবং ঐ বিষয়ে নিজেদের হীনম্মন্যতাভাব অতিক্রমের জন্য লোকশিল্পীদের প্রয়োজন ছিল বিদ্রূপের মাধ্যম। এই শিক্ষিত, ভদ্রলোক সম্প্রদায় বাইরের গোষ্ঠী। তাই তাদের আচার-আচরণকে হাস্যকরভাবে অতিরঞ্জিত করে হীন প্রমাণ করার প্রবণতাটা এত তীব্র।

এই একই ধরনের মানসিকতা থেকে উপাস্য দেব-দেবীদের ভাবমূর্তিকে অবজ্ঞা করার চেষ্টা দেখা যায়। আর-এক স্তরে, নিজেদের মৃত্যু-ভয় অতিক্রমণের উদ্দেশ্যে মৃত্যুকে হেয় প্রতিপন্ন করা বা মৃতদেহকে নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কির নজিরও দেখতে পাওয়া যায়। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব ১৭৯৭-এর ২২ নভেম্বর নিদ্রিত অবস্থায় সকলের অলক্ষ্যে মারা যান। তাঁর প্রতিবেশী ও প্রতিদ্বন্দ্বী চূড়ামণি দত্ত ঠিক করেছিলেন জাঁকজমকের সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হতে হবে, যাতে রাজার পরিবারের উপর টেক্কা দিতে পারেন। গুরুতরভাবে পীড়িত হবার সঙ্গে সঙ্গে চূড়ামণি বহু ঢুলি ভাড়া করে, নিজে রুপোর চতুর্দোলায় চেপে গঙ্গাযাত্রায় চললেন, প্রায় বিয়েবাড়ির মিছিলের মতো, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলল সহরের ছেলে-ছোকরার দল। কীর্তনীয়ারা এই মজার গানটি বেঁধে গেয়েছিল—

আয়রে আয় নগরবাসী দেখবি যদি আয়
জগৎ জিনিয়া চূড়া জম জিনিতে যায়।
জম জিনিতে যায় যে চূড়া জম জিনিতে যায়,
জগতপ কর, কিন্তু মরিতে জানিলে হয়।[৩৬]

আজও কলকাতা শহরের রাস্তায় মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় "বলহরি হরিবোল" চিৎকারের মধ্যে বিলাপের থেকেও এক ধরনের উল্লাসের সুরই যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে যুগে মড়ক-মহামারী নিয়ে রচিত ছড়া-কবিতাতেও অনুরূপ স্ফূর্তির মেজাজটাই বার হয়ে আসে। কলের জলের প্রবর্তনের আগে সহরে মড়কের উপদ্রব নিয়ে এই কবিতাটি লক্ষণীয়—

সবে জলের জন্যে জলে মরতো
  করতো হাহাকার
সিদ্ধিগোলা পচা জল
  করতো ব্যবহার
তাতে ওলাউঠা দেবীর বড়
  হতো কেরামত
ঘরে ঘরে কান্নাকাটি
  খুলতো যমের বাড়ির পথ
নিমতলার ঘাট হতো
  অতি গুলজার
কত লোক পুড়তো তার
  সংখ্যা করা ভার।[৩৭]

৬

ভবানীচরণ থেকে কালীপ্রসন্ন, উমিচাঁদের দাড়ি নিয়ে ছড়া থেকে শহুরে বাবুদের লোচ্চামি নিয়ে কবিতা-গান, কবিওয়ালাদের খেউড় থেকে বটতলার সাহিত্য আর কালীঘাটের পট — এইসব নিয়েই উনিশ শতকের কলিকাতা কৌতুকালয় গড়ে উঠেছিল। কী এক কুক্ষণে যে শহরটার জন্ম হয়েছিল, কোনোদিনই তার বাসিন্দাদের কাছ থেকে সে সম্মান বা শ্রদ্ধা পেল না; শুধু রঙ্গ-রসিকতা, বিদ্রূপ-উপহাসের পাত্র-ই হয়ে রইল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একবার লিখেছিলেন—"কলকাতার অসাধারণত্ব বা অদ্ভুতত্ব এই, নাগরিকেরা এ নগরকে ভালবাসে না।" ভালোবাসতে বোধহয় লজ্জাবোধ করে। সেই তার জন্মসূত্র থেকেই চুরি-জোচ্চুরি, মিথ্যাকথন-বাটপাড়ি, চাটুকারিতা-কোট্‌নাগিরি—এইসব অপকর্মের মারফতই তো শহরের হর্তা-কর্তাদের অভ্যুত্থান, নাগরিক সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক রূপে তাদের প্রতিষ্ঠার আর্থিক ভিত। এদের, এবং এদের প্রতিপালিত শহরকে, কেন শ্রদ্ধা করবেন তাঁরা যাঁরা তাঁদের গ্রাম থেকে উন্মূলিত হয়ে এই শহরে

আসতে বাধ্য হয়েছিলেন গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনে? অথচ, এই 'বিদেশী' শহরেই তাঁদের বাসস্থান খুঁজে নিতে হয়েছিল, ভরণপোষণের নানা রকম উপায় আবিষ্কার করতে হয়েছিল। দীর্ঘকালের অনুসৃত নিয়ম-কানুনের সঙ্গে সংঘাত বাঁধত প্রতি পদে, নাগরিক জীবনের নতুন আচার-আচরণের। বলা যেতে পারে, একটা cultural shock—বিহ্বলতাদায়ক আকস্মিক মানসিক আঘাত। এর মোকাবিলার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁরা তাঁদের নৈতিক অসমন্বিত দ্বন্দ্বটাকে কৌতুকের অরাজকতায় বিক্ষিপ্ত করে। ''এলোমেলো করে দে মা, লুটে পুটে খাই''—এই নৈরাজ্যধর্মী নীতিবাক্যটি তাঁরা তাঁদের নিজস্ব ভঙ্গিতে কলকাতার লৌকিক সংস্কৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন হাসির হুল্লোড়ে। হাসির উপলক্ষ্য নির্বাচনে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না তাই। রক্ষণশীল সমাজের প্রতিভূ ভণ্ড-ব্রাহ্মণ বা বোষ্টমও তাঁদের নিশানা, আবার 'ইয়ং বেঙ্গল' নামধেয় ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি যুবতীও তাঁদের চাঁদমারি। অভিজাত জমিদার-দেওয়ান-মুৎসুদ্দিরা অনেক সময় তাঁদের পৃষ্ঠপোষক হয়েও (যেমন কবিওয়ালা ও যাত্রাদলের ক্ষেত্রে)—তাঁদের উপহাসের হাত থেকে রেহাই পায়নি। আবার, নিজেদের সামাজিক পরিবেশভুক্ত, স্বশ্রেণি উদ্ভূত প্রতিবেশী বারাঙ্গনা, দালাল, মাতাল, গুলিখোর—তারাও এই উপহাস-বিদ্রূপের শিকার ছিল। একটা সর্বগ্রাসী cynicism-এর হাস্যোদ্দীপক অভিব্যক্তি পাওয়া যায় কলিকাতা কৌতুকালয়ের এই লোক-সংস্কৃতিতে।

সে-যুগের কলকাতার সমাজের উপরিকাঠামোতে, নিম্নবর্গের এই মেজাজের একমাত্র দোসর রূপে দেখতে পাই কালীপ্রসন্ন সিংহকে। নিবাত-নিষ্কম্প নির্মমতার সঙ্গে চাবুক মেরেছেন শহরের সর্বশ্রেণির লম্পট নচ্ছার দুর্বৃত্তদের। তাঁর জনপ্রিয়তায় অনুপ্রাণিত হয়ে আরও অনেকে আসরে নেমেছিলেন সামাজিক নকশা লিখে।[৩৮] কিন্তু কেউই হুতোমের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারেননি।

মনে হয়, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি 'ভদ্রলোক' সমাজে ভবানীচরণ থেকে শুরু করে, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, ও পরবর্তী যুগে কালীপ্রসন্নের অনুকরণকারী নকশা-রচয়িতাদের লেখায়, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের চরিত্রটা ছিল ভিন্নধর্মী, রাস্তার মানুষের ঠাট্টা-ইয়ার্কির কাছাকাছি এসেও যেন কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন এঁরা। আত্মধিক্কারের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যেন একটা আত্মদুঃখকাতরতা এসে মিশেছিল। নৈতিক উপদেশ, সমাজ সংস্কারের বাণী (যে দায় থেকে নিম্নবর্গের উপহাসকেরা অনেকটা বোধহয় মুক্ত ছিলেন) শ্লেষ ও বিদ্রূপের খোঁচাটা অনেক সময় ভোঁতা করে দিয়েছিল। এঁদের লেখায় তাই প্রায়-ই কৌতুকের শেষে একটা বেদনাবোধের রেশ থেকে যায়; রবীন্দ্রনাথের সেই কথাগুলো মনে পড়ে—''হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।'' একশো বছর

পরে বিশ শতকের কলকাতায় কবিকেও তাই তীব্র বিদ্রূপের পরই হঠাৎ বলতে শুনি—

> আমরা বাঙালী; মীরজাফরী অতীত, মেকলের
> বিষবৃক্ষের ফল।
> . . .
> মীরজাফরী বদরক্ত আবার অন্তঃশীলা
> পাতি কেরাণীর ঘরে, আনাচে কানাচে অনেক সংসারে,
> বেনিয়ার গদীতে, অহিংসার পরম আস্তানায়।[৩৯]

টীকা

১. দ্রষ্টব্য—Jeffrey H. Goldstein ও Paul E. Meghee। Mikhail Bakhtin.

২. "কৌতুকহাস্যের মাত্রা" (ফাল্গুন, ১৩০১), 'পঞ্চভূত', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬২৪-২৬।

৩. ঐ।

৪. Charles Baudelaire, pp. 109-130.

৫. Franz Rosenthal, pp. 137-38.

৬. পূর্বোক্ত "কৌতুকহাস্যের মাত্রা"।

৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাবু'।

৮. 'বৃদ্ধবোধ ব্যাকরণ', *গ্রামবার্তা প্রকাশিকা*, ভাদ্র ১২৮৮।

৯. উল্লেখ্য যে অধিকাংশ বাঙালি মধ্যবিত্ত Satirist-র ছিলেন হয় সরকারি আমলা, নয় উকিল, নয় কেরানি, নয় সম্পাদক, বা ঐ জাতীয় পেশায় নিযুক্ত। ব্যতিক্রম অবশ্য পাওয়া যায় বনেদি জমিদার বংশোদ্ভূত কালীপ্রসন্ন সিংহ, হাটখোলার দত্ত পরিবারের কেদারনাথ দত্ত এবং মুষ্টিমেয় কিছু অপেশাদারি প্রহসন রচয়িতাদের মধ্যে।

১০. পরে দ্রষ্টব্য, ঐ শতকের সত্তরের দশকে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর কৌতুকাভিনয় ও অমৃতলাল বসুর ইংরেজবিরোধী প্রহসনের উল্লেখ।

১১. ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ উপলক্ষে কলকাতার লৌকিক প্রতিক্রিয়ার দুটো নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে। এক, ঐ বিদ্রোহ দমনকল্পে স্কটিশ হাইল্যান্ডের সৈন্য যখন উত্তরভারতে যাবার পথে কলকাতায় এসে হাজির হয়, তখন একটা ছড়া প্রচলিত হয়—

> "বিলাত থেকে এলো গোরা,
> মাথার পর কুর্তি পরা,
> পদভরে কাঁপে ধরা,

হাইল্যাণ্ডনিবাসী তারা
টানটিয়া টোপীর মান
হবে এবে খর্বমান,
সুখে দিল্লী দখল হবে
নানা সাহেব পড়বে ধরা।"

ছড়াটি পাওয়া যায় কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য়। জানি না এটা তাঁর নিজের রচনা, না লৌকিক গাথা থেকে সংগৃহীত। তবে, স্কটিশ হাইল্যান্ডারদের বিচিত্র পোশাক—হাঁটু অবধি চৌখুপি নকশা আঁকা ঢিলা পরিচ্ছদ, বাকি পায়ের অংশ অনাচ্ছাদিত—(যা সমসাময়িক ইংরেজ অধিবাসী ও সৈন্যদের পোশাক থেকে আলাদা ছিল), কলকাতার রাস্তার মানুষের কাছে হাসির খোরাক হয়েছিল। তাঁরা এদের "ন্যাংটা গোরা" বলে অভিহিত করতেন।

দ্বিতীয় নিদর্শন—লর্ড ক্যানিং-এর সিপাহী বিদ্রোহ দমনের পর, উত্তর কলকাতার পরান ময়রা, লেডি ক্যানিং-এর সম্মানার্থে এক বিশেষ মিষ্টির প্রবর্তন করেন তাঁর নামে। আমাদের প্রচলিত বাংলায় 'লেডিকেনি' নামে তা এখনও প্রসিদ্ধ অরুণকুমার মিত্র, পৃ. ১৮০)।

১২. *ঈশ্বর গুপ্ত রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১১।
১৩. *বসন্তক*, ১২৮১, পঞ্চম সংখ্যা।
১৪. ঐ, ১২৮২, দ্বিতীয় পর্ব একাদশ সংখ্যা।
১৫. সুবীর রায়চৌধুরী, পৃ. ৪০-৪১ ও Major H. Hobbs রচিত 'John Barleycorn Bahadur', Calcutta। (তারিখ অনুল্লিখিত)।
১৬. বিস্তৃত বিবরণের জন্য সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'যুবরাজের কলিকাতায় আগমন', এই সংকলনে।
১৭. অক্ষয়চন্দ্র সরকার, পৃ. ৫২৮।
১৮. প্রমথনাথ মল্লিক, পৃ. ৮৩।
১৯. হরিহর শেঠ, পৃ. ৩২২।
২০. সুনীল দাস, 'মধ্যস্থ পত্রিকা ও কলকাতা পুরসভা', *পুরশ্রী*, পৌষ ১৩, ১৩৮৬, পৃ. ১০০৯।
২১. পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, 'কলিকাতা বাগবাজারের প্রাচীন ইতিহাস', *দেশ*; জানুয়ারি ২০, ১৯৪০, পৃ. ৪০৫।
২২. 'সীতা-অন্বেষণ', (উদ্ধৃত হরিপদ চক্রবর্তী,) পৃ. ৩৭৫।
২৩. দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ২০৭।
২৪. প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, পৃ. ১৩৩-৩৪।
২৫. জহরিলাল শীল, 'মাছের পোকা', কলিকাতা, ১২৮২।
২৬. বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়, 'দেদার মজা'; কলিকাতা, ১৩১২।

২৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), পৃ. ৩১। 'হরিণবাড়ি' ছিল সেযুগের কলকাতার জেলখানা। 'গ্র্যান্‌যুড়ি' বলতে বোঝানো হচ্ছে Grand Jury।
২৮. 'হুলুস্থুল ব্যাপার...'—মতিলাল শীল কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, শ্যামবাজার বৃন্দাবন পালের লেন নং ২২ মতিলাল যন্ত্রে উদয়চন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। ১২৮১।
২৯. এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—অজিত ঘোষ। Sumanta Banerjee, 'Bogey of the Bawdy–Changing Concept of 'Obscenity' in 19th Century Bengali Culture'; *Economic & Political Weekly*; July 18, 1987।
৩০. ভবানী ঝুমুরওয়ালীর গান (উদ্ধৃত দুর্গাদাস লাহিড়ী), পৃ. ১০৪১।
৩১. অনুরূপ আরও উদাহরণের জন্য সুশীলকুমার দে, Sukumar Sen. (1979) দ্র.।
৩২. উনিশ শতকের কলকাতার লোকসংস্কৃতির ভাষায় 'অশ্লীলতা'র অভিযোগ নিয়ে বিতর্কের বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—পূর্বোক্ত, Sumanta Banerjee–'Bogey of the Bawdy' এবং সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সরস্বতীর ইতর সন্ধান', এই সংকলনে।
৩৩. বৈষ্ণবচরণ বসাক, (প্রকাশের তারিখ নেই; সম্ভবত; বিংশ শতাব্দীর শুরুতে) পৃ. ৪৫৭-৫৮।
৩৪. ঐ, পৃ. ৪৬১-৬২।
৩৫. এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩৬. প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, পৃ. ১৯।
৩৭. উদ্ধৃত, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দুশো বছর আগের ধর্মতলা ও আশেপাশের বাজার'; *পুরশ্রী*, ২৬শে আগস্ট, ১৯৭৮।
৩৮. কালীপ্রসন্নের জীবিতকালেই বটতলার ছাপাখানা থেকে 'হুতোম'-এর অনুকরণে প্রায় দুশো চটি বই প্রকাশিত হয়। অনুরূপ ভঙ্গিতে রচিত সামাজিক নকশার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের *আপনার মুখ আপুনি দেখ* (১৮৬৩); ক্ষেত্রমোহন ঘোষের *কাকভুষুণ্ডীর কাহিনী* (১৮৬৫); ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের *সমাজ কুচিত্র* (১৮৬৫); চুনিলাল মিত্রের *কলিকাতার নুকোচুরি* (১৮৬৯); কেদারনাথ দত্তের *সচিত্র গুলজারনগর* (১৮৭১); চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জটাধারীর রোজনামচা* (১৮৮৩)।
৩৯. সমর সেন, 'পঞ্চম বাহিনী', ১৯৪২।

তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না

একটি দেবীর রূপান্তর

১

বাংলা সাহিত্যে ও বিশেষ করে সঙ্গীতে রাধার ভাবমূর্তি এক স্বতন্ত্র স্থান জুড়ে আছে। আমাদের আগমনী ও বিজয়ার গানে, উমা বাঙালি ঘরের দুর্ভাগিনী কন্যারূপে আবির্ভূত। আমাদের শ্যামাসঙ্গীতে এই একই উমা কখনও সদাশয়া অন্নপূর্ণা, কখনও-বা দুর্দান্ত সর্বগ্রাসী মহাকালী!

এই কন্যারূপিণী ও মাতৃভাবধারিণী দেবীর মূর্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রাধার চরিত্র। যদি উমা বা কালীকে মাতৃকা-দেবী বা mother-goddess হিসেবে বিবেচনা করা যায়, তবে রাধাকে বলা যেতে পারে প্রেমিকা-দেবী বা lover-goddess! গ্রিক পৌরাণিক Venus-এর মতো প্রণয়ের দেবী।

কিন্তু শ্রীরাধার কৌলীন্যের দাবি কিছুটা বিতর্কিত আমাদের ধর্মশাস্ত্রে। *শ্রীমদ্ভাগবত*-এ রাধার নামের উল্লেখ নেই। তা সত্ত্বেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব পণ্ডিতসমাজ উক্ত পুরাণে 'আরাধিতাঃ', এই একটিমাত্র শব্দ (যা শ্রীকৃষ্ণের এক প্রিয় গোপিনী সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে) আঁকড়ে ধরে দাবি করেন যে রাধা-ই এই গোপিনী। পরবর্তী পুরাণ ও অন্যান্য সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার যেসব আদিরসাত্মক বর্ণনা পাওয়া যায়, তার

ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আজও বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা কিছুটা বিব্রত বোধ করেন। অনেকে এই লীলার যৌনাত্মক বিবরণীকে ভগবৎ-প্রেমের (অর্থাৎ রাধা ও গোপিনীরূপী উপাসক জগতের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপী উপাস্যর আরাধনা) রূপক বলে যুক্তিগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেন। রাধা ও কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের মধ্যে তাঁরা উপাসক-উপাস্যের সম্পর্কের বিভিন্ন ভাব আবিষ্কার করে থাকেন—যা বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্রে পঞ্চরস নামে পরিচিত : শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। কিন্তু, আমাদের আটপৌরে জীবনে নর-নারীর প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কি আমরা এই পাঁচটি ভাব, বা তার আরও রকমফের খুঁজে পাই না? যুবক-যুবতীর প্রেমানুরাগের নানা স্তরে ও পরবর্তী জীবনে বিবাহিত দম্পতির জীবনযাপনের বিভিন্ন সময়ে কি আমরা এই ভাবগুলি দেখি না? তাই, বৈষ্ণব ধর্মালোচনায় রাধা-কৃষ্ণের সম্পর্কের যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তা কি এই দৈনন্দিন মানবিক অভিজ্ঞতার জগৎ থেকেই আহৃত নয়?

এ প্রসঙ্গে এক অমীমাংসিত তাত্ত্বিক তর্কে ফিরে যেতে হচ্ছে। Great tradition ও little tradition-এর সম্পর্ক এক বহু-আলোচিত বিষয় গবেষকমণ্ডলীতে। শাস্ত্রীয় ধর্মের সঙ্গে লোকায়ত ধর্মের সম্পর্ক, প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিধিবদ্ধ অনুশাসনের সঙ্গে অসংগঠিত লৌকিক ধর্মাচরণের সম্পর্ক—এই বিভিন্ন স্তরে, কোন ঐতিহ্য, কোন ধর্মীয় চিন্তাধারা, কোন সংস্কৃতি পরস্পর থেকে উপকরণ আহরণ করেছে, পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করেছে? প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় গোষ্ঠীর ধর্মশাস্ত্র কি আসলে আদিম লৌকিক বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ (উচ্চবর্গের প্রয়োজন ও চিন্তার আলোকে)? না, এইসব লোকায়ত ধ্যান-ধারণা ও লৌকিক দেব-দেবী (যা আজও প্রচলিত ও উপাস্য) উচ্চবর্গের প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় চিন্তা ও পূজনীয় দেব-দেবীর অমার্জিত ও স্থূল অনুকরণ—যাকে শিক্ষিত সমাজ ইতর জনসাধারণের অধঃপতিত কল্পনাবিলাস বলে ব্যঙ্গ করে?[১]

এই তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ধর্মে ও সংস্কৃতিতে দেব-দেবীর উদ্ভব ও উচ্চবর্গের শিক্ষিত সমাজ ও নিম্নবর্গের লৌকিক সমাজে এইসব দেবদেবীর ভিন্ন ব্যাখ্যান ও কল্পমূর্তি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কালী কি আসলে পুরাকালের অনার্য উপজাতিদের উপাস্য কোনো লৌকিক দেবী, যাকে পরে তথাকথিত আর্য হিন্দু অবতারবাদের অঙ্গীভূত করা হয়েছে? ঐতিহ্যাশ্রয়ী হিন্দুশাস্ত্রে শিবের যে রুদ্র মূর্তি, তার সঙ্গে আমাদের বাঙালি লোকসংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠিত গাঁজাখোর শিবের কি কোনো মিল পাওয়া যায়? কবে, কোন ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে, কোন সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই রূপান্তর ঘটেছে?

অন্যান্য দেবদেবীর মতো রাধাও বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধিশালিনী। অনুমান করা যেতে পারে আমাদের লৌকিক সংস্কৃতিতেই রাধার জন্ম। প্রয়াত শশিভূষণ দাশগুপ্ত মশায়ের মতে "...মনে হয়, ব্রজের রাখাল কৃষ্ণের গোপীগণের সহিত যে প্রেমলীলা তাহা প্রথমে আভীর জাতির মধ্যে কতগুলি রাখালিয়া গান রূপে ছড়াইয়াছিল। চপল আভীর বধূগণ এবং নবযৌবনে অনিন্দ্যসুন্দর গোপযুবক কৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলার উপাখ্যান গোপজাতির মধ্যে অনেক গানের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। ...ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করার পরে বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা আস্তে আস্তে পুরাণগুলিতে স্থান পাইয়া কবিকল্পনায় আরও পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল।"[২]

বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যে, রাধার ভাবমূর্তি পল্লবিত হয়েছে অপ্রত্যাশিতভাবে নানারূপে বহু যুগ ধরে। কিন্তু এই বিভিন্ন রূপান্তরের মধ্যে যে মূল বর্ণনামূলক সুরটি অবিচ্ছিন্নভাবে বেজে এসেছে তা একান্ত-ই বাংলার নিজস্ব। বাঙালি রাধা বরাবরই বর্ণিত হয়েছে এক গোপবধূ রূপে যার স্বামী আয়ান ঘোষ। আয়ান কৃষ্ণের মাতুল। অর্থাৎ কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার প্রণয় লোকচক্ষুতে কেবল ব্যভিচার নয়, অজাচার (incest)-ও বটে। লক্ষণীয়, 'ঘোষ' পদবি বাঙালি কায়স্থ ছাড়াও বাঙালি গোপসম্প্রদায়ে প্রচলিত। সুতরাং গোপিনী রাধার স্বামী আয়ান ঘোষ ও তার ভাগ্নে কৃষ্ণ ও জটিলা-কুটিলা—এসব চরিত্রই বাঙালি লোকসাহিত্যিকদের-ই সৃষ্টি বলে ধরে নিতে হয়।[৩]

আসলে রাধা-কৃষ্ণের উপাখ্যানে যে পরকীয়া প্রেম (এবং বৈষ্ণব তাত্ত্বিকেরা যার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেছেন পরকীয়াবাদ-এর তত্ত্বে) দেখতে পাই, তার বহু নজির পাওয়া যায় প্রাচীন বাংলা লোককবিদের পল্লীগীতিকায়—যেগুলি ধর্মবিযুক্ত নিছক প্রেমের কাহিনি। এগুলির অনেক নায়িকা-ই পরপুরুষ-অনুগত। যেমন 'শ্যামরায়ের পালা'তে ডোমরমণী তার স্বামী ছেড়ে শ্যামরায়ের সঙ্গে চলে গেল; 'আঁধাবধূর পালা'তে রাজকুমারী তার স্বামীকে বলে-কয়ে তার অনুমতি নিয়ে অন্ধ বংশীবাদকের সঙ্গিনী হল। এই অতীতের পল্লীগীতিগুলি সংগ্রহ করে শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন মশায় তাদের রচয়িতা লোককবিদের সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"কোথায় সমাজ, কোথায় স্মৃতি, কোথায় শাস্ত্র? কোথায় পল্লীকবি সে সব কিছুই মানে না। সে প্রকৃত জহুরী, সে কেবল সত্য ও শিবকে দেখিয়াছে—তাহা আস্তাকুঁড়ে পাইলেও সে তাহা শিরোধার্য করিয়া লইয়াছে। ...সে বুঝিয়াছে প্রেম জিনিসটা খাঁটি সোনা, তাহার কাছে পুরোহিতের মন্ত্র, সামাজিক আদর্শ এবং লোকনিন্দা অতি অকিঞ্চিৎকর। সে সেই প্রেমের প্রকৃত মূল্য বুঝিয়াছে ও দিয়াছে। এজন্য তাহারা অসতী পরপুরুষকে ভালবাসিয়া এমন সকল কার্য করিয়াছে,

এমন নির্ভীকভাবে তাহাদের নায়কদিগের অনুগমন করিয়াছে, যে তাহারা সীতা-সাবিত্রী হইতেও চিত্র হিসাবে উজ্জ্বল হইয়া আমাদের চোখের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে।"[৪]

রাধা এই ঐতিহ্যের-ই ধারয়িত্রী। অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত রাধা, জাতি, কুল, শীল সব কিছু ডুবিয়ে দিয়ে প্রেমাস্পদ কৃষ্ণের জন্য গৃহত্যাগ করতে প্রস্তুত। দু'জনের মিলন ও বিহার ঘটে আত্মীয়সমাজের চোখের আড়ালে, কিন্তু তাদের বন্ধু-বান্ধবীদের গোপন সমর্থন ও সহযোগিতায়। এক অর্থে বলা যেতে পারে রাধা কেবলমাত্র বাংলা লোকসাহিত্যের 'অসতী' নায়িকাদের নেত্রী নয়, পরকীয়া প্রেমের আধুনিক সাহিত্যের নায়িকাদের পূর্বসূরি। গোঁড়া পণ্ডিতসমাজ ক্ষুব্ধ হলেও, বলতে বাধ্য হই, রাধার দুঃসাহসিকতা, প্রেমাস্পদের জন্য আকুলতা, কৃষ্ণের বিরহে উৎকণ্ঠা, তার অন্যথাচরণে অভিমান, এবং শেষে তার বিশ্বাসঘাতকতায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত অবস্থা—এই যে ধারাবাহিক বিবরণী বৈষ্ণব পদাবলীতে বারংবার পাওয়া যায়, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিধ্বনি কি শুনি না *Anna Karenina* বা *Madame Bovary*-তে? রাধা আসলে প্রতি যুগের বঞ্চিতা গৃহবধূদের প্রতিভূ—যারা পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক বাধা-নিষেধের শিকার এবং একই সময় তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী।

মধ্যযুগের বাঙালিদের রচনায় রাধা নানারূপে অবতীর্ণ। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রাধা গ্রাম্যবধূ, দরিদ্র গোয়ালিনী। বিদ্যাপতির কাব্যে রাধা গোয়ালিনী হলেও, সাজেসজ্জায়, চালচলনে যেন সচ্ছল নাগরিকা। মিথিলার রাজকবি ছিলেন বলেই কি বিদ্যাপতি তাঁর নায়িকাকে এঁকেছিলেন রাজসভার নর্তকী ও বারবিলাসিনীর আদলে? এর পাশাপাশি বাংলা কথাসাহিত্যে রাধাকে দেখতে পাই নিম্নবর্গের বিনোদিনী রূপে উত্তরবঙ্গের 'কৃষ্ণ-ধামালী' গানে বা পশ্চিমপ্রান্তের 'ঝুমুর' গান ও নৃত্যে। নরনারীর আদিম প্রবৃত্তির স্বাভাবিক গতি, উদ্দাম লীলার প্রকাশ এইসব গানে।

চৈতন্যের ভাব-কল্পনায় কিন্তু রাধা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে আর গরিব গোয়ালিনী, বা লাস্যময়ী বিমোহিনী বা প্রত্যাখ্যাত অভিমানিনী নয়। রাধা এখানে কৃষ্ণের পদতলে অবলুণ্ঠিতা সেবিকা। পঞ্চরসের মধ্যে 'শান্ত' ও 'দাস্য' ভাবই প্রধান হয়ে দাঁড়াল রাধার কল্পমূর্তিতে। চৈতন্যর 'রাধাভাব' যখন আসত তখন নিজেকে রাধা বলে কল্পনা করতেন কৃষ্ণের দাসীরূপে। দেবতার কাছে ভক্তের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রতীক হয়ে উঠল রাধা।

চৈতন্যের পরবর্তী গোস্বামীরা রাধার এই দাস্যভাবের উপরই জোর দিয়েছিলেন। অতীতের লৌকিক উৎস থেকে রাধাকে তুলে নিয়ে এঁরা তাকে প্রেমিকার পরিবর্তে দাসীতে রূপান্তরিত করেছিলেন। মনে হয়, চৈতন্যের ধর্মান্দোলনে যে অসংখ্য নিম্নবর্গের

মানুষ এসেছিলেন, তাঁদের অবাধ স্বাধীনতার ঘোষণাকে স্তব্ধ করার উদ্দেশেই উচ্চবর্ণের গোস্বামীরা রাধার দাসীরূপকে তুলে ধরেছিলেন। কৃষ্ণের ভক্ত হতে হলে মাথা পেতে মেনে নিতে হবে ঊর্ধ্বতনের নির্দেশ, সেবা করতে হবে তাকে।[৫]

এইভাবেই পরবর্তীযুগে বৈষ্ণব সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় উচ্চবর্ণের আধিপত্য, যার ফলে বহু নিম্নবর্গের শিষ্যরা বার হয়ে আসতে বাধ্য হন, এবং নিজ নিজ অনুগামীদের নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে পড়েন—সাহেবধনী, কর্তাভজা, বলরামী ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় গোস্বামী-কর্তৃত্বাধীন বৈষ্ণব সমাজে মেয়েদের উপর শোষণ। নারী-পুরুষ মাত্রই রাধা-কৃষ্ণ, এই তত্ত্ব হাজির করে ভণ্ড বৈষ্ণব গুরুরা বহু ভক্ত মহিলাকে ফুসলিয়ে সেবিকা বানিয়েছে। ফলে, চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম তাঁর সমকালীন বাঙালি সমাজের জনপ্রিয়তা অনেকাংশেই হারিয়ে ফেলেছিল পরবর্তী শতকে। আঠারো-উনিশ শতকে পৌঁছে দেখা যায় বৈষ্ণব গুরু ও তাদের শিষ্য-শিষ্যারা ভণ্ডামি ও লাম্পট্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে জনমানসে। এ যুগের একটা জনপ্রিয় ছড়া—"মাগুর মাছের ঝোল, যুবতীর কোল। মুখে হরি বোল, হরি বোল!" আরও তির্যক বিদ্রূপ দেখি কালীঘাটের সেই বিখ্যাত পটে—গলদা চিংড়ি মুখে নিয়ে এক বেড়াল, কপালে তার বৈষ্ণবী তিলক!

এ সত্ত্বেও, রাধা কিন্তু তার জনপ্রিয়তা কখনোই হারায়নি। যে জনসাধারণ বৈষ্ণব গুরুদের ভণ্ডামি ও লোচ্চামি নিয়ে হাসি-মস্করা করেছে, তারাই চিরকাল ধরে গান তৈরি করেছে ও গান শুনেছে তাদের প্রিয় নায়িকাকে ঘিরে। আজও তারা ভিড় করে শোনে রাতের-পর-রাত পালা-কীর্তনের অনুষ্ঠানে রাধার প্রেমের কাহিনি। কৃষ্ণের বাঁশির সুর রাধার চিত্তচাঞ্চল্যের অনুরণন বাজে শ্রোতাদের মনে। শাশুড়ি-ননদের চোখে ধূলি দিয়ে, জল আনার ছুতো করে যমুনা-পারে কৃষ্ণের জন্য রাধার দুঃসাহসিক অভিযান শ্রোতারা অনুসরণ করেন নিশ্বাস বন্ধ করে। তারপর এই প্রেম-কাহিনির বিভিন্ন যে পর্যায়—'নৌকা-বিলাস', 'বিরহ', 'মাথুর' ইত্যাদি—তার বিবরণী শুনতে শুনতে শ্রোতারা কিন্তু শেষে রাধারই দুঃখে অশ্রুপাত করেন। কী পুরুষ, কী নারী সবারই চোখে কৃষ্ণই ('মাথুর' অংশে) villain of the piece বা আজকের ভাষায় 'খলনায়ক'। মহাভারতের ও পুরাণের অসুর-দময়িতা, সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে গিয়ে, তাঁরা মনে রাখেন এক কপটাচারী কৃষ্ণকে, যে এক গ্রাম্য বধূকে ভুলিয়ে তাকে পরিত্যাগ করে সিংহাসনের লোভে মথুরাতে চলে যায়।

আমাদের বাংলা লোকসংস্কৃতির রাধাকৃষ্ণের কাহিনিতে তাই রাধাই নায়িকা। পুরাণের কৃষ্ণের বীরত্বপূর্ণ কাজকর্মের ('গোষ্ঠ' অংশে বর্ণিত)-এর বিশেষ স্থান নেই এখানে।

বরং, কৃষ্ণ এখানে রাধার তুলনায় কিছুটা অধম—কখনো মিনতি করছে রাধার পদপ্রান্তে, কিন্তু লুকিয়ে চন্দ্রাবলীর ঘরে রাত্রিবাস করছে, এবং শেষে তার একান্ত প্রেমনিষ্ঠ রাধাকে ত্যাগ করে লুকিয়ে চলে যায় মথুরাতে।

২

আভীরদের লোকগাথার গোপিনী থেকে পুরাণের দেবীতে রূপান্তর, বাংলার পল্লীগীতিকার প্রেমিকা থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদে ভক্তির প্রতীকে পরিণতি—এই বিভিন্ন স্তর পার হয়ে রাধা যখন ঔপনিবেশিক রাজধানী উনিশ শতকের কলকাতায় এসে পৌঁছুল, তখন তাকে আবার আর এক বিবর্তনের প্রবেশপথে এসে দাঁড়াতে হলো।

কলকাতায় রাধাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল গ্রামবাংলার অসংখ্য মানুষ যারা নতুন শহরে ভিড় করে জীবিকার্জনের তাগিদে। তাদের ঐতিহ্যাশ্রয়ী পল্লীসঙ্গীত ও জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলির আঙ্গিক নাগরিক পরিবেশে কিছুটা পরিবর্ধিত কাঠামোতে রাধাকেও নতুন পোশাক পরতে হল। এক বৈচিত্র্যময়ী নাগরিকা রূপে রাধা আবির্ভূত হল, যার অবয়বে ও আচরণে অতীতের পল্লীগীতি ও পদাবলী কীর্তনের নায়িকার আদলও পাওয়া গেল, আবার নতুন পরিবেশের শহরে সমাজের বিভিন্ন নারীদের ব্যথা-বেদনা, প্রণয়-বিচ্ছেদ, রঙ্গকৌতুক—এসবেরও প্রতিবিম্ব ধরা পড়ল।

এক অর্থে বলা যেতে পারে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব পণ্ডিতদের তত্ত্বালোচনায় রাধাকৃষ্ণের প্রেম যেমন দেবতা ও ভক্তের প্রেমের প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যাত হয়েছিল, কলকাতার লোককবিদের গানে ও অনুষ্ঠানে এ কাহিনি পারিপার্শ্বিক নাগরিক জীবনে নারী-পুরুষের সম্পর্কে যে নানা জটিলতা দেখা দিচ্ছিল, তারই রূপক হিসেবে যেন পরিবেশিত হলো। সে সময়কার কলকাতার সামাজিক অবস্থাটা মনে রাখা দরকার। এক নব্য-শিক্ষিত বাঙালি বাবু সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে যারা ঘরের স্ত্রীকে উপেক্ষা করে বারবনিতাদের সঙ্গে দিবানিশি যাপন করে। তাদের বাগানবাড়িতে লাম্পট্য, রক্ষিতার জন্য সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়ে নিঃস্ব হওয়া এবং এর ফলে বাঙালি ঘরের অন্তঃপুরিকাদের দুরবস্থা ও মর্মবেদনা—এসবই তদানীন্তন সাহিত্যে, নাটকে ও প্রহসনে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এই প্রবঞ্চিতা ও উপেক্ষিতা বাঙালি অন্তঃপুরিকাদেরই প্রতিনিধি হয়ে রাধা আবির্ভূত হল সে যুগের কবিগানে, পাঁচালী, যাত্রায়।

লক্ষণীয়, কলকাতার লোককবিরা রাধা-কৃষ্ণ উপাখ্যানের 'বিরহ' ও 'মাথুর' বিষয়ক অংশগুলি-ই বেশি বেছে নিতেন। কারণ এই অংশেই সে-যুগের বাঙালি ঘরের বধূদের মর্মবেদনার প্রতিবিম্ব দেখা যেত। তাদের মানসিক বিপত্তির সঙ্গে কৃষ্ণ-পরিত্যক্তা রাধার

সাদৃশ্য শ্রোতাদের কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠত। কপটাচারী কৃষ্ণের সঙ্গে বারফটকা লম্পট স্বামীর মিলটা সহজেই ধরা পড়ত। চন্দ্রাবলী বা কুব্জা—যারা কৃষ্ণের প্রেয়সী—তাদের মধ্যে অনায়াসেই আবিষ্কার করা যেতে পারত এইসব স্বামীদের রক্ষিতাদের।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক সে যুগের বিখ্যাত কবিয়াল হরু ঠাকুরের দুটি চরণ থেকে। কৃষ্ণের আগমনের বিলম্বে উৎকণ্ঠিতা রাধা (অর্থাৎ 'বিপ্রলব্ধা' অবস্থায়) সখী এসে রাধাকে গঞ্জনা করছে—

তুমি রাধে অতি সাধে, করেছ প্রণয়।
সে লম্পটো কভু নয় সরল হৃদয়।।
তোমারো সঙ্কেতো জানায়ে
শ্যাম বিহরিছে অন্যেরে লোয়ে।
দেখিবেতো এসো রাধে, দেখাই তোমারে।

তারপর মোক্ষম এক বর্ণনা—

আছে চন্দ্রাবলীর ঘরে।
দেখে এলেম তোমার শ্যাম চাঁদেরে।।
শুয়ে কুসুম শয্যাপরে।
নিশির শেষেরো অলসে অচেতন,
কারো সঙ্গে নাহি বসনো ভূষণ,
ভুজে ভুজে বাঁধা, যুক্ত অধরে অধরে।[৬]

এরকম নিদারুণ বেদনাত্মক সমাচার সে-সময়ের কলকাতার গৃহবধূদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অঙ্গ ছিল। মনে পড়ে দীনবন্ধু মিত্রের *সধবার একাদশী*-তে ননদ-ভাজের কথোপকথন? সৌদামিনী তার বৌদি কুমুদিনীকে খবর দিচ্ছে তার স্বামী অটলের নতুন বান্ধবী, সোনাগাছির বারবনিতা কাঞ্চন সম্বন্ধে, আর কুমুদিনীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে বলছে—

> "তোর এই যৌবন, এমন সোমত্ত মাগ রেখে সেই শুটকো মাগীকে নিয়ে থাকে...তুই বাপের বাড়ী গেলে দাদা বিকেলবেলা কাঞ্চনকে বৈঠকখানায় এনেছিলেন...দাদা আবার কোঁচা দিয়ে পা পুঁচিয়ে দেন—মাইরি..."[৭]

বা হরু ঠাকুরের (১৭৩৮-১৮০৮)-এর সমকালীন কবিয়াল রাম বসু (১৭৮৭-১৮২৯)-র একটি গানে, 'বিরহ' অবস্থায় রাধার এই বিলাপ সে যুগের বহু বাঙালি প্রোষিতভর্তৃকা গৃহবধূদের মনের কথা অসাধারণরূপে ভাষান্তরিত করেছে—

মনে রইল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি বলা হ'ল না
শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না
যদি নারী হ'য়ে সাধিতাম তাকে
নির্লজ্জ রমণী বোলে হাসিত লোকে।

. . .

যখন আসি আসি সে আসি বলে,
সে আসি শুনিয়া ভাসি নয়ন জলে।
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে,
মন চায় ধরিতে, লজ্জা বলে ছি ছি ছুঁইও না।[৮]

সে-সময়ের কলকাতায় বহু চাকুরিজীবীর গ্রামে ফেলে আসা স্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদ, বছরে ক্ষণিকের মিলনের সুযোগ ও তারপর আবার ছাড়াছাড়ি—অন্তঃপুরিকাদের এই বিয়োগব্যথা-ই রাম বসুর রাধার 'বিরহ'-বেদনায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

গ্রামে পরিত্যক্তা স্ত্রী বা কুমুদিনীর মতো কলকাতার গৃহস্থ ঘরের প্রত্যাখ্যাত গৃহবধূ, আর পৌরাণিক নায়িকা রাধা এক-ই যন্ত্রণায় বিড়ম্বিত হয়—প্রেমাস্পদের সঙ্গে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা, নয় তার দ্বারা প্রত্যাখ্যান ও প্রতারণার যাতনা।

মধুরাতে কৃষ্ণের সঙ্গিনী কুব্জা কলকাতার লোকসঙ্গীতে একটা বিশেষ স্থান জুড়ে ছিল। কুব্জা রাধার অযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিনী রূপে চিত্রিত। কখনও যেন সোনাগাছির জরাগ্রস্তা বেশ্যা, যেমন দাশু রায়ের পাঁচালির এই বর্ণনায়—

মাথার ফাঁকে টাকের উপর পরচুলেতে ঘেরেছে।
ভাল ভাল গহনা গাঁটা, তাতে আবার ডায়মনকাটা,
প'রে যেন ভাঙন বুড়ি সেজেছে।[৯]

কখনও-বা কুব্জা, নগরের এক কুহকিনী যে গ্রামের রাখালকে বশ করেছে। যেমন গদাধর মুখোপাধ্যায় (ভোলা ময়রা, নীলু পাটুনির সমসাময়িক কবি)-এর এক গানে বৃন্দা মথুরাতে এসে কুব্জার খোঁজ করছে—

এই মথুরা নগরে কুব্জা নাম কে ধরে,
এখন যারে, কৃষ্ণ করেছেন নতুন সুন্দরী?...
...কি প্রকার, কি গুণে বেঁধেছে শ্যামে প্রেমডোরে।...
...এমন মোহিনী-বিদ্যাসিদ্ধ কোন নারী[১০]

যদিও 'বিরহ' ও 'মাথুর'-ই সে-যুগের কলকাতার লোকসংস্কৃতির বড়ো অংশ জুড়ে ছিল রাধা-কৃষ্ণ উপাখ্যানের অন্যান্য স্তরে—যেমন 'পূর্বরাগ', 'সম্ভোগ', 'অভিসার', 'নৌকা-বিলাস' ইত্যাদিতেও—রাধাকে তদানীন্তন শহুরে ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়।

যেমন, রাম বসুর একটি গানের নিম্নলিখিত চরণে অভিসারিণী রাধা যেন শহরের বাজারে পসারিণী :

> আমার যৌবন কিনে লয়, প্রেমধন দেয়,
> এমন পাইনে রসিক ব্যাপারী।
> . . .
> কেবল মিছে ভ্রমে ভ্রমে মরি।।
> অরসিক গ্রাহকে এ রস চায়।
> মূল্য শুনে কাণে, মাথা নোওয়ায়।।
> পশরা নামাতে এসে অনেকে,
> আগে দুই বাহু পশারি।।[১১]

আসল দেবতা ('রসিক ব্যাপারী')-র জন্য ভক্তের (রাধার) 'রস' বা অনুরাগ প্রদান করার ব্যাকুলতা-ই এ কথাগুলির গূঢ় রহস্য। কিন্তু রাধার ভাষাতে এসে গেছে সমসাময়িক বাজারের কেনা-বেচার পরিভাষা। 'যৌবন' বেচার জন্য 'ব্যাপারী' খোঁজার তাড়না শহরের বারবনিতাদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

এইটি রাধার অন্যরূপ। লোককবিরা 'বিরহ' ও 'মাথুর' অংশে রাধাকে কলকাতার গৃহস্থ ঘরের দুঃখিনী বধূ ও অন্তঃপুরিকাদের প্রতিভূরূপে হাজির করেছিলেন। কিন্তু অন্য ভূমিকায় তাঁদের রচনায় রাধা যেন ঐ কলকাতারই আর এক নারীসমাজের প্রতিনিধি। খেমটাওয়ালি, বাঈজী, সোনাগাছির বেশ্যা, রক্ষিতা—এই নানাধরনের ব্যবসায়িনীর প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় রাধার রূপায়ণে।

রাম বসুর আর একটি গানে, তিনি রাধাকে 'নৌকাবিলাস'-এর এক পর্যায়ে হাজির করেছেন এমনভাবে যেন মনে হয় রাধা সমকালীন কোনো জনপদবধূর ভাষায় কথা বলছে—

> তুলে তরণির উপর,
> নটবর করে কত ছল্।
> বলে দেখিছ কি, রাই, যমুনা প্রবল।।
> তুমি পোরেছ রাই নীল বসন।

মেঘ ভেবে বাড়ে পবন।।
বলে তরঙ্গের মাঝে, উলঙ্গ হোতে,
একি লজ্জা আই গো আই।[১২]

বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ এই এক-ই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে নানা উপমা সহযোগে, যার আধ্যাত্মিক মর্ম ও বাণী—আরাধ্য দেবতা ('নটবর')-র কাছে পার্থিব সব কিছু বিসর্জন দিয়ে ('উলঙ্গ') ভক্তকে ('রাধা') আত্মসমর্পণ করতে হবে। বড়ু চণ্ডীদাস-ও নানা আদিরসাত্মক উপমা এনেছিলেন। যেমন নিতম্ব, জঘন ও পয়োধর যুগলে ভারাক্রান্ত রাধাকে নৌকার নাবিক কৃষ্ণ বলছেন—ঝড়াক্রান্ত যমুনা পার হতে গেলে তাঁকে ভার লাঘব করতে হবে। সুতরাং নৌকাকে হালকা করার জন্য তাঁর দেহের আভরণ, বসন-ভূষণ জলে ফেলে দিতে হবে।

রাম বসু রাধার মুখে যেভাবে এই পর্বের বর্ণনা দিয়েছেন, তা স্মরণ করিয়ে দেয় সে যুগের 'হুতোম' (কালীপ্রসন্ন সিংহ) বর্ণিত সেই বিখ্যাত মাহেশের স্নানযাত্রা, যেখানে কলকাতার ফুলবাবুরা 'মেয়েমানুষ' নিয়ে ফুর্তি করতে বার হয়েছে : "বোট, বজরা, পিনেস ও কলের জাহাজ গিজ্‌গিজ্ কচ্চে, সকলগুলি থেকেই মাতলামো রং, হাসি ও ইয়ারকির গররা উঠচে, কোনটিতে খ্যামটা নাচ হচ্ছে, গুটি ত্রিশ মোসাহেব মদে ও নেশায় ভোঁ হয়ে রং কচ্চেন..."। খ্যামটা প্রসঙ্গে হুতোম বলছেন—"কোন কোন বাবুরা স্ত্রীলোকদের উলঙ্গ করে খ্যামটা নাচান—কোনখানে, কিস্ না দিলে প্যালা পায় না।..."[১৩]

আশ্চর্য কী যে এই সামাজিক পরিবেশে 'নৌকাবিলাস'-এর নায়িকা রাধা খেমটাওয়ালির আদলে চিত্রিত হবে? '*শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*'-এর কৃষ্ণ রাধাকে যমুনা পার করে দিতে রাজি নয় যতক্ষণে না রাধা তার কাছে দেহ আত্মসমর্পণ করে। আর উনিশ শতকের কলকাতার কৃষ্ণের অবতার যে নব্যবাবু সম্প্রদায় তারা খেমটাওয়ালিদের, প্যালা—অর্থাৎ পুরস্কার—দেবে না যদি না তারা উলঙ্গ হয়ে নাচে ও তাদের 'কিস্' দেয়!

উনিশ শতকের 'বাবু কালচার-এ', রাধার 'অভিসারিকা' রূপ ক্রমশই তদানীন্তন বারবনিতা বা রক্ষিতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছিল। এই বাবুসমাজে প্রচলিত গানগুলি বিচার করলে দেখা যাবে যে রাধা এখানে কখনও ইয়ার-বকশিদের মধ্যে মক্ষিরানিরূপে, কখনো-বা চতুর ছিনালের ভূমিকায় বিরাজ করছে। 'সধবার একাদশী'তে অটলের বন্ধুরা যখন গণিকা কাঞ্চনকে গান গাইতে অনুরোধ করে, তখন সে রাধা হয়ে গায়—

বিনে নটবর জ্বলে কলেবর,
তাপিত অন্তর পুড়ে হলো ছাই।[১৪]

'হুতোম প্যাঁচার নকশা'তে মাহেশের স্নানযাত্রার পর সন্ধ্যাবেলা একজন গান ধরলেন—

যে যাবার সে যাক সখি আমি তো যাবো না জলে
যাইতে যমুনাজলে সে কালা কদম্বতলে,
আঁখি ঠেরে আমায় বলে, মালা দে রাই আমার গলে।[১৫]

বা, এই অজ্ঞাতনামা কবি রচিত মজার গানটি আড়খেমটা তালে গাওয়া হত—

রাধা বই আর নাইকো আমার রাধা বলে বেড়াই ছুটে
সে যে আমার প্রেমের কলসী, আমি যে তার নগদা মুটে;
খুঁজে এলাম পাড়া পাড়া, কোথাও তার পেলাম না সাড়া,
শুনলেম নাকি কজন ছোঁড়া, ধরেছে তার জুটে-পুটে।[১৬]

ও যুগের বাবুদের বৈঠকে গীত এই জাতীয় কিছু গান বর্তমানে রামকুমার চট্টোপাধ্যায় মশায় গেয়ে জনপ্রিয় করেছেন, যেমন লালচাঁদ বড়ালের "কাদের কুলের বউ গো তুমি?" বা রূপচাঁদ পক্ষীর "আমারে ফ্রড় করে প্রাণকৃষ্ণ কোথায় গেলি" বা "কেমন করে খোলা ঘাটে নাইব বল না? কালো ছোঁড়া কদমতলে"—এসব গানগুলিতেই রাধা তৎকালীন বাবু সম্প্রদায়ের চিত্তবিনোদিনী বা প্রমোদসঙ্গিনী।

শহরের নিম্নবর্গের গায়ক-গায়িকাদের রচনায় রাধা আরও বৈষয়িক ও রূঢ় বাস্তববাদিনী। চণ্ডীদাসের রাধার মনে হয়েছিল—

অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।

আর উনিশ শতকের কলকাতার ঝুমুর গায়িকা ভবানীর গানে এরই এক নির্মম লালিকা বা parody পাই, যখন রাধা সখীদের বলে—

চল সই বাঁধা ঘাটে যাই
অ-ঘাটের জলের মুখে ছাই।
ঘোলাজল প'ড়লে পেটে
গাটা ওমনি গুলিয়ে ওঠে
পেট ফেঁপে আর ঢেকুর উঠে
হেউ হেউ হেউ...[১৭]

বা, ও-যুগের এক বেশ্যাসঙ্গীতে যখন গায়িকা তার নতুন কোনো নাগর সম্বন্ধে বলে—"গয়লাপাড়ার ময়লা ছোঁড়া প্রাণে মেরেছে"[১৮] তখন কৃষ্ণাঙ্গ গোপালক শ্যামের সঙ্গে রাধার পিরিতের কাহিনীর অনুষঙ্গটা চট করে ধরা পড়ে।

কলকাতার রাস্তাঘাটের এইসব লৌকিক গানে (যেমন ভবানীর ঝুমুরে) রাধা যে ভাবে চিত্রিত হত, পরবর্তী যুগের ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের রচয়িতারা (বিশেষ করে বাংলা থিয়েটারের নাট্যকারেরা) অনেক সময়-ই তার থেকে ভাষা ও ভাব গ্রহণ করতেন। যেমন উনিশ শতকের শেষার্ধের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৬) রচিত এই গানটিতে রাধা বৃন্দাবনের গোপকুলবধূ থেকে কলকাতার বস্তির গোয়ালিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। রাধার 'বিপ্রলব্ধা' (অর্থাৎ অন্য নায়িকার সঙ্গে কান্তের মিলনাশঙ্কাপূর্ণ) অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে এইভাবে—

সরলা গোপের বালা, দুধ যোগাতে যাই
রাত পোহাল, ফরসা হল, মিনসে ঘরে নাই,
কোথা কার আঁচল ধরে
পড়ে আছে নেশার ঘোরে,
মন বাঁধা তার যায় কি জোর করে...[১৯]

রাধার এই চপল ভাবটি—অভিসারিকা রূপে, বা সখীদের নিয়ে যমুনায় জল তুলতে যাবার ভূমিকায়—সে যুগের কৃষ্ণ-যাত্রায় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠত। নাচ-গানের উপর সেকালের যাত্রার দল খুব ঝোঁক দিত। আসলে, কৃষ্ণ-যাত্রায় নৃত্যের চলন বহুকাল থেকে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ নৃত্যের উপর জোর দেন। *চৈতন্যভাগবত*-এ নানা নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়—শ্রীবাসাঙ্গনে নৃত্য, কাজিদলন অভিযানে নৃত্যে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্যগৃহে সন্ন্যাসীবেশে নৃত্য প্রভৃতি। সুতরাং কলকাতায় কৃষ্ণযাত্রায় নৃত্যের প্রাধান্য ছিল স্বাভাবিক।

যাত্রায় এই নৃত্যভঙ্গিমা বিশেষ করে রাধার বিভিন্ন ভাব ও অবস্থা তুলে ধরতে সাহায্য করত। ও-যুগে গোবিন্দ অধিকারী (১৭৯৮-১৮৭০) ছিলেন কৃষ্ণ-যাত্রার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা। রাধার দূতী বৃন্দারূপে তিনি যখন নাচতেন ও গাইতেন তখন সকলকে নাকি মুগ্ধ করে রাখতেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষায় : "গোবিন্দ অধিকারী বৃদ্ধ বয়সেও স্ত্রীলোকের পোষাক পরিয়া বিন্দে দূতী সাজিয়া আসরে নামিতেন, অথচ কিছুমাত্র বেমানান বলিয়া মনে হইত না...সঙ্গীতের তালে তালে এক পা, দুই পা, তিন পা অগ্রসর হইয়া আবার এক পা, দুই পা পশ্চাতে হাঁটিয়া বিন্দে দূতীর নৃত্য তাহার গানকে অধিকতর মধুর করিয়া দিত..."[২০]

তবে মনে হয় কলকাতার নিম্নবর্গের অনুষ্ঠিত যাত্রায় রাধা-কৃষ্ণ উপাখ্যানের যে-সব অংশ কিছুটা প্রগল্‌ভ মেজাজধর্মী, তাই নিয়েই নাচ ও গান তৈরি হতো। স্বামী বিবেকানন্দের ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে, তাঁদের প্রতিবেশী গোয়ালাদের আয়োজিত গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছেন :

"যাত্রা ছিল 'রাধিকার মানভঞ্জন'। ...বুড়ো গোবিন্দ অধিকারী—দাঁত পড়ে গেছে, গায়ের মাংস ঝুলে গেছে, ঈষৎ গৌরবর্ণ, বেশ লম্বা চওড়া—এসে দাঁড়াল।...পালা গাওয়া সুরু হইল। একজন এসে বলল 'বৃন্দাবনসে দূতী আয়া।' অমনি গোবিন্দ অধিকারী উত্তর দিল 'কেয়া বিলাতসে ধূতি আয়া'।" এরপর মহেন্দ্রনাথের টিপ্পনী: "বোধ হইতেছে এই সময়ে প্রথম বিলাতী কাপড় উঠিয়াছে।" অর্থাৎ, জরাজীর্ণ হলেও বৃদ্ধ গোবিন্দ অধিকারী ঐ সময়কার ব্যবসা ও পণ্য আমদানির খবর রাখতেন এবং কীভাবে এইসব পারিপার্শ্বিক আর্থ-সামাজিক ঘটনা রাধা-কৃষ্ণের উপাখ্যানের যাত্রা-সংস্করণে সংশ্লিষ্ট করা যায় যাতে তা দর্শকদের কাছে প্রাসঙ্গিক মনে হয়, সে ব্যাপারে বৃদ্ধ সচেতন ছিলেন। দর্শকেরা ঠিক-ই বুঝেছিলেন। মহেন্দ্র দত্ত জানাচ্ছেন : "এই রকমভাবে কথা চলিতে লাগিল এবং সকলে খুব হাসিতে লাগিল।" এই হাসির পরিবেশে রাধার আবির্ভাব! "...রাধিকা সেজে একজন বেরুল। সে ছড়া কাটতে লাগল, 'কালামুখ আর দেখব না, কাল জল আর খাব না, কাল চুল আর বাঁধব না', ইত্যাদি কাল শব্দ দিয়ে অনেকক্ষণ ছড়া চলিল।...তারপর একটু বেলা হলে একজন নাচতে শুরু করলে..."[২১]

এই ছড়ার তাল নৃত্যধর্মী। আসলে কীর্তনের অনেকাংশেই নৃত্যধর্মী তাল আছে। শুনতে শুনতে স্বাভাবিকভাবেই নাচবার ইচ্ছা হয়। কলকাতার যাত্রা-পরিচালক ও অভিনেতারা (সে-যুগে রাধার ভূমিকাতে পুরুষ অভিনেতারাই অভিনয় করতেন—যদিও অন্যান্য লৌকিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, যেমন ঝুমুর নৃত্য, খেমটা বা ঢপ কীর্তনে, মহিলারাই নায়িকা ছিলেন) নৃত্যের এই জনপ্রিয়তা কাজে লাগিয়েছিলেন রাধাকে দর্শকদের সামনে পরিবেশিত করতে গিয়ে। নিঃসন্দেহে যাত্রা যত বেশি লৌকিক হতে থাকে, নাচের আধিক্য তত বেড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমপ্রান্তে—বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর অঞ্চলে নিম্নবর্গের ঝুমুর গান ও নৃত্যে যেমন চৈতন্যদেবের প্রভাবে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়কাহিনি প্রবর্তিত হয়েছিল, তেমনই পরবর্তী যুগে কলকাতার যাত্রায় ঝুমুরের নৃত্যভঙ্গিমা প্রচলিত হয় রাধার বিভিন্ন ভাব প্রকাশের তাগিদে।

কৃষ্ণলীলার অভিনয়ে নিম্নবর্গের এই নৃত্যরীতির প্রবেশ বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণি ভালো চোখে দেখেনি। রাধাকৃষ্ণের কাহিনিকে অপবিত্র করা হচ্ছে বলে অনেকেই অভিযোগ করেছিলেন। বঙ্কিম-অগ্রজ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় যাত্রা প্রসঙ্গে *বঙ্গদর্শন*-এ লিখেছিলেন—"এক্ষণকার যাত্রার নৃত্যই প্রবল, সকলেই নৃত্য করে। কি মেহতর, কি ভিস্তি, কি মালিনী, কি বিদ্যা, সকলেই নৃত্য করে। কৃষ্ণ নৃত্য করেন, রাধা নৃত্য

করেন..."। তারপর শেষে মন্তব্য করেন—"আধুনিক যাত্রার দোষে কৃষ্ণরাধাকে গোয়ালা বলিয়া বোধ হয়, পূর্বে কবির গুণে তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া বোধ হইত।"[২২]

যাত্রায় নৃত্যরত রাধার জনপ্রিয়তা এত প্রবল ছিল যে তাকে ঘিরে একটা প্রবাদ প্রচলিত হয়েছিল—'সাত মণ তেলও পুড়বে না রাধা-ও নাচবে না।' সারা রাত ধরে যাত্রা হতো। যদি বাতি জ্বেলে রাখার মতো যথেষ্ট তেল না থাকে তাহলে আর রাধা নাচবে কী করে? দর্শকেরা উন্মুখ হয়ে বসে থাকবে কেবল—যেমন অসম্ভব কিছুর জন্য অক্ষম মানুষের দাবি!

কলকাতার লোকসংস্কৃতিতে রাধার এই অন্তিম—প্রায় হাস্যকর রূপান্তর, বলা যেতে পারে অতীতের মধ্যযুগের রাধার যে মধুর মনোরম ভাবমূর্তি ছিল তার সম্পূর্ণ বৈপরীত্যে অবস্থিত। শহরে এসে নায়িকার আর সে যৌবনের লাবণ্য নেই : বয়সের ছাপ দেখা দিয়েছে। বহু তিক্ত অভিজ্ঞতায় জর্জরিত রাধা কিছুটা কুটিল হতে শিখেছে, ভাষাতে এসেছে শহরের অন্ধকার জগতের চটুল সুর। বাবুরা তার নতুন নাগর। কিন্তু বাইরের এই চটকের নেপথ্যে তার মন শূন্যতায় ভরা। ভবানী ঝুমুর গায়িকার ভাষায়—

চোখের জল চোখে মরে
বেড়াই আমি আমোদ করে
জ্বালায় জ্বলি তবু রসে ঢলি...[২৩]

আসলে বরাবর-ই—সেই আভীরদের আমল থেকেই রাধাকে সমকালীন আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও দাবির সঙ্গে সমঝোতা করতে হয়েছে। মেষপালক সমাজের 'চপল আভীর বধু'; বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের যুগে পরপুরুষের প্রেমে বিভোর গোপবধূ; চৈতন্যদেবের ধর্মান্দোলনে ভগবৎ-ভক্তির সর্বোচ্চ আদর্শ; ঝুমুর নৃত্যে চঞ্চলা দামিনী; কলকাতার নাগরিক সংস্কৃতিতে কখনও বাবুদের রক্ষিতা বা ভাড়া করা খেমটাওয়ালি; কখনও-বা কবিগানে স্বামী-পরিত্যক্তা ও প্রবঞ্চিতা বাঙালি গৃহবধূ; কখনও যাত্রার আসরে রাতজাগা নাচুনি! এই নানা ভূমিকায় রাধাকে অবতীর্ণ হতে হয়েছে গত কয়েক শতক ধরে। এ ভূমিকা কখনও পুরুষ-নির্ধারিত—যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদে রাধারূপে নারীর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই ভগবৎ-ভক্তির চরম নিদর্শন বলে প্রতিপাদ্য, বা আর এক স্তরে উনিশ শতকের কলকাতার বাবু-'কালচার'-এ যেখানে রাধা পুরুষ সমাজের বিনোদনের পণ্যদ্রব্য।

কিন্তু কখনো-কখনো দেখা যায় রাধার ভূমিকা নির্মাণ করছেন স্ত্রী-কবিরা নিজেদের মতো করে। মধ্যযুগের বাঙালি বৈষ্ণবী কবি ইন্দুমুখী, রাধার মুখ দিয়ে 'পূর্বরাগ' পর্বে, তার লক্ষ্যবস্তু অর্জনের সংকল্প যে ভাষায় প্রকাশ করেছেন তা প্রথাগত বৈষ্ণবপদাবলীর রাধার বাগ্‌বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা—

ফণিমণি ধরব শমন ভবনে যাব
যৈছে সিধায়ব কাজে (যেভাবে হোক কার্যসিদ্ধি ক'রব)
হাম আগুয়ানি আগুনি পৈঠব
বৈঠব যোগিনী সাজে।
তন্ত্র মন্ত্র যত শত শত ঢুড়ব (খুঁজব)
বুড়ব (উত্তীর্ণ হব) সাগর মাঝে[২৪]

এ এক ভিন্ন রাধা। সদাক্রন্দনরতা ও অনুযোগিনী রাধার পরিবর্তে দেখি এক বিজয়াভিলাষিণী রণোন্মাদিনী!

আবার অন্য এক স্তরে, উনিশ শতকের কলকাতার লোকসংস্কৃতিতে স্ত্রী-কবিরা রাধার মূর্তি তৈরি করেছিলেন তৎকালীন পুরুষ-শাসিত নাগরিক সমাজে নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে। এঁদের রচনায় দেখতে পাওয়া যায় শহরের মেহনতি নারী (যাদের মেয়েলি ভাষাতে বলা হত 'গতর-খাটিয়ে')-দের চোখ দিয়ে রাধার বিকল্প চেহারা। মহিলা কবিয়াল যজ্ঞেশ্বরী-র (যিনি ছিলেন রাম বসু-ভোলা ময়রাদের সমকালীন) কবিগানে, ভবানী ঝুমুর গানে, মেয়েদের ঢপ কীর্তনে, মেয়ে পাঁচালিতে আর বেশ্যাদের সঙ্গীতে[২৫]—এসবে রাধা নানা বর্ণে ও বৈচিত্র্যে হাজির হয়।

রাধার এই বর্ণবৈচিত্র্য-ই এত শতাব্দী ধরে তাকে বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতিতে চির আদরিণী করে রেখেছে। সর্বস্তরেই, সর্ব যুগেই সবাইকেই সে নানা রূপে পরিতুষ্ট করে এসেছে। আজ থেকে একশো বছরেরও আগে শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন, পুরাকালের রাধার আবির্ভাবের অভ্যর্থনা করতে গিয়ে যা লিখেছিলেন বাংলা সাহিত্যে তার প্রাসঙ্গিকতা আজও বর্তমান—

"রাধা প্রথমত : ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও আর কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া শুভদিনে আর্য্যাবর্ত্তের দেব-মণ্ডপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন; চির-শ্রদ্ধেয় দেবদেবীগণ প্রকৃতির এই আভরণহীনা সৌন্দর্য-প্রতিমার আড়ালে পড়িয়া গেলেন; সদ্যচ্যুত অনঘ্রাত মালতী-পুষ্পের ন্যায় এই দেবীকে পাইয়া কবি ও ভক্ত আনন্দিত হইল। চিরারাধ্যা দুর্গা ও কালীর উদ্দেশে আহৃত পুষ্পমালা শ্রীরাধিকার কণ্ঠে দোলাইয়া দিল। বঙ্গদেশে কুসুম-সিংহাসনে ফুল্ল পঙ্কজ ও চন্দনার্দ্র তুলসীদলে সজ্জিত হইয়া শ্রীরাধিকা অধিষ্ঠিত হইলেন...।"[২৬]

টীকা

১. লোকায়ত ধর্ম ও লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে এই বিতর্কের ইতিহাসের জন্য গ্রন্থপঞ্জি দ্রষ্টব্য—Jacques Le Goff, E. Delarvelle, Aron Gurevich, ও D.D. Kosambi.

২. শশীভূষণ দাশগুপ্ত, পৃ. ২৪৯। এ বিষয়ে আরও বিস্তৃত তথ্যসম্বলিত গবেষণার জন্য দ্রষ্টব্য—ড. সতী ঘোষ।

৩. *হরিবংশ*-এ অবশ্য আয়ান নামে এক চরিত্র পাওয়া যায়, যে পূর্বজন্মে বিষ্ণুর উপাসনা করে লক্ষ্মীকে পত্নীরূপে পাবার পর প্রার্থনা করে এবং তার ফলে রাধাকে পত্নীরূপে লাভ করে। ক্লীব বলে সে পরিচিত ছিল। এই কারণেই কি রাধা পরপুরুষ-উপগত?

৪. দীনেশচন্দ্র সেন, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৯৮।

৫. রাধার এই রূপান্তরের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Sumanta Banerjee-র 'Appropriation of a Folk Heroine : Radha in Medieval Bengali Vaishnavite Culture' Shimla, 1993.

৬. *ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০০-০১।

৭. *সধবার একাদশী*, দ্বিতীয় অঙ্ক; প্রথম গর্ভাঙ্ক।

৮. দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ১৬৬।

৯. বৈষ্ণবচরণ বসাক, পৃ. ৩৭০।

১০. দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ২০০।

রাধা-কৃষ্ণ উপাখ্যানের 'মাথুর' অংশে, রাখাল কৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরাতে রাজা হয়ে গিয়ে অতীতের বিস্মরণ—এই বিষয়টি সে-যুগের লোককবিরা যেভাবে বর্ণনা করতেন, তাতে ধরা পড়ত সমকালীন হঠাৎ বাবুদের স্বভাব-চরিত্র, যারা গ্রামে পরিবার-পরিজন ভুলে কলকাতা শহরে এসে রাজকীয় চালে জীবনযাপন করত। কলকাতার লোকসংস্কৃতিতে 'মাথুর'-এ এই সমকালীন সামাজিক অবস্থার ব্যঞ্জনা ও তার তাৎপর্যের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলকাতার লোকসংস্কৃতির আদিপর্ব'; (বর্তমান পুস্তকে) দ্রষ্টব্য।

১১. *ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী*, পৃ. ১৫৩।

১২. ঐ, পৃ. ১৪৮-৪৯।

১৩. কালীপ্রসন্ন সিংহ, পৃ. ১০১ ও ৩৮।

১৪. *সধবার একাদশী*, প্রথম অঙ্ক; প্রথম গর্ভাঙ্ক।

১৫. কালীপ্রসন্ন সিংহ, পৃ. ১০৬।

১৬. বৈষ্ণবচরণ বসাক, পৃ. ৫৩৮।

১৭. *বাঙালীর গান*; পৃ. ১০৪১।

১৮. মহেন্দ্র গুপ্ত, পৃ. ১০।

১৯. দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ৯৪০।

২০. রাধামাধব করের স্মৃতিচারণ (উদ্ধৃত বিপিনবিহারী গুপ্ত) পৃ. ২৫৪।

২১. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ২৪-২৫।

২২. *বঙ্গদর্শন*, কার্তিক, ১২৮০।

২৩. দুর্গাদাস লাহিড়ী; পৃ. ১০৪১।

২৪. রমণীমোহন মল্লিক, পৃ. ৩।

২৫. ঐ যুগের লোকসংস্কৃতিতে মহিলা-কবিদের ভূমিকার বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাঙ্গণ-বিহারিণী রসবতী—উনিশ শতকের কলকাতার লোকসংস্কৃতিতে মহিলা-শিল্পী' (বর্তমান পুস্তকে) দ্রষ্টব্য।

২৬. দীনেশচন্দ্র সেন (১৯৮৬), প্রথম খণ্ড। পৃ. ১৭৭।

প্রাঙ্গণ-বিহারিণী রসবতী
উনিশ শতকের কলকাতার লোকসংস্কৃতিতে মহিলাশিল্পী

কবি চণ্ডীদাসের সঙ্গিনী, রজক-কন্যা রামমণি, যিনি রামী ধোপানী নামে পরিচিতা ছিলেন, এবং বাংলার আদি মহিলা কবি বলে বিবেচিত হন, একদা গ্রামবাসীদের অপবাদে উত্ত্যক্ত হয়ে গান গেয়ে অনুযোগ করেছিলেন :

কি কহিব বঁধু হে বলিতে না জুয়ায়,
কাঁদিয়া কহিতে পোড়ামুখে হাসি পায়।
অনামুখ মিন্‌সেগুলোর কি বা বুকের পাটা
দেবীপূজা বন্ধ করে কুলে দিয়ে বাটা।
... ...
অবিচার দূরী দেশে আর না রহিব
যে দেশে পাষণ্ড নাই সেই দেশে যাব।[১]

রামমণির উত্তরসাধিকা কবি ও গায়িকাদের কপালে 'মিন্‌সে' শাসিত বা male-dominated সমাজের অপবাদ ও লাঞ্ছনা পরবর্তী যুগেও জুটেছে। কিন্তু এই অপবাদের প্রচার অভিযান ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় যত তীব্র আকারে দেখা যায়, তার নজির অন্য যুগে বিরল। তদানীন্তন 'অশ্লীলতা'-বিরোধী অভিযান ও ইংরেজি শিক্ষা-

বিস্তারের দাপটে নাগরিক লোকসংস্কৃতির কিছু মূল্যবান ধারা অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সেই সংস্কৃতির শিল্পীদের এক বিরাট অংশ—মহিলা অনুশীলনকারিণী—ক্রমে ক্রমে বাঙালি সাংস্কৃতিক জগতের প্রান্তীয় সীমায় নির্বাসিত হয়ে যান। 'অবিচারপুরী' কলকাতা ছেড়ে 'পাষণ্ড'-বিবর্জিত দেশ আর তাঁরা কোনোদিনই খুঁজে পাননি।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় গ্রামীণ অর্থনীতির অবনতি ও কলকাতায় এক নতুন নাগরিক সভ্যতার গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম থেকে অগণিত মানুষ চলে আসেন কলকাতায়। তাঁরা তাঁদের স্ব-স্ব পেশা অনুযায়ী যেসব অঞ্চলে বসতি গড়েন, সেই সব অঞ্চলের নামগুলি এখনও বর্তমান—জেলেপাড়া, কাঁসারীপাড়া, পটুয়াটোলা, শাঁখারীটোলা—যদিও আদি বাসিন্দারা আজ আর নেই।

গ্রাম থেকে আগত এই নিম্নবর্গের মানুষগুলি কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের সমৃদ্ধশালী লোক-সংস্কৃতি, দৈনিক আমোদ-প্রমোদের সামগ্রী—গান, পাঁচালি, কথকতা, যাত্রা, কীর্তন, ইত্যাদি। এর ভিতরে, মেয়েদের নিজস্ব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান, ব্রতকথা, ধাঁধা-ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, এক বিরাট স্থান জুড়ে ছিল।

মহানগরীর সদা-পরিবর্তনশীল সামাজিক আবহাওয়ায় এই লোকসংস্কৃতি এক বিচিত্ররূপ ধারণ করল। পারিপার্শ্বিক ঘটনার মিছিল থেকে কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনি থেকে নিত্যনতুন রূপকল্প, শব্দালঙ্কার নিয়ে তৈরি হল এক-জাতীয় নাগরিক লোকসংস্কৃতি—হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট, মেলা-পরবের সংস্কৃতি। অতীতের কীর্তন, পাঁচালি ধরনের ধর্মীয় উপকথা-ভিত্তিক সঙ্গীতানুষ্ঠানের পাশাপাশি দৈনিক জীবনের সমস্যাকে উপলক্ষ করে কবিগান, সঙ, যাত্রা, ঝুমুর, তরজা এসে আসর জমাল। রাজপথের এই লোক-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সমসাময়িক জীবনের মিলনোৎসব হয়ে দাঁড়াল।

ঐতিহাসিক প্রবণতার সংযোগের চাপে অবলুপ্ত এই নাগরিক লোকসাহিত্যের জন্য চোখের জল ফেলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। সে-যুগের নিম্নবর্গের নগর-সংস্কৃতির মহিলা-শিল্পীদের সাহিত্যকর্মের বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে জানা প্রয়োজন কী কারণে তা তদানীন্তন শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই বৈশিষ্ট্যগুলির অবলুপ্তির ফলে পরবর্তী যুগের বাঙালি মহিলা সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্ম কি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, না অধিকতর সংস্কৃতিসম্পন্ন হয়েছে? এ প্রশ্নটাও বিবেচ্য।

লোকসংস্কৃতিতে মহিলা সাহিত্য

উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার লোকসংস্কৃতিতে মেয়েদের যেসব গান, কথকতা, নৃত্যানুষ্ঠান

ও অনুরূপ সাংস্কৃতিক নিদর্শনের সন্ধান পাই, তার অধিকাংশই অতীতের ঐতিহ্য অনুযায়ী যৌথ রচনা, বা নামহীন কোনো শিল্পীর সৃষ্টি। নাগরিক সভ্যতায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্ভবের আবহাওয়াতে অবশ্য এই মহিলা-শিল্পীদের মধ্যেও নিজেদের পরিচয়-প্রদানের রীতি প্রবর্তিত হয়। ফলে, আমরা কিছু নাম ও তাঁদের কবিতা-গান হাতে পেয়েছি।

আগেই উল্লেখ করেছি, গ্রামীণ সমাজজীবনের পেশা-বিভাজনের ঐতিহ্যাশ্রয়ী রীতি তদানীন্তন কলকাতাতেও প্রচলিত ছিল। তাই, নাপতিনী, মালিনী, ধোপানী, গোয়ালিনী প্রভৃতি বিভিন্ন উপজীবিনীর কলকাতার রাস্তায় ঘাটে সদাই আনাগোনা ছিল। ফেরিওয়ালার ডাকের মতো এদের ছড়া ও গান সে-যুগের কলকাতার সমাজ-জীবনের এক বিশেষ আকর্ষণীয় অঙ্গ ছিল। পুরোনো বাংলা 'থিয়েটার'-এ নাপতিনী, গোয়ালিনী, মেথরানীর গান, হাসির উপাদানরূপে ব্যবহৃত হত। এ ছাড়াও এই স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বনকারিণী মেয়েদের সে-যুগের সাংস্কৃতিক জগতে এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের অন্দরমহলের প্রায় অসূর্যম্পশ্যা মহিলাদের কাছে এরাই পৌঁছে দিত বাইরের সমাজের সংস্কৃতি। রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী শৈশবের স্মৃতিচারণে বলছেন—''মনে আছে বাড়িতে মালিনী বই বিক্রী করতে আসিলে মেয়েমহল সেদিন কিরকম সরগম হইয়া উঠিত। সে বটতলার যত কিছু নূতন বই, কাব্য উপন্যাস, আষাঢ়ে গল্প—ইহার সংখ্যাই যদিও অধিক—অন্তঃপুরে আনিয়া দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া যাইত...''।[২]

বলাবাহুল্য, অন্তঃপুরের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের তুলনায় এই সব খেটে-খাওয়া, বা তাদের নিজস্ব ভাষায়, 'গতর খাটিয়ে' মেয়েদের অনেক বেশি স্বাধীনতা ছিল প্রকাশ্যে ঘুরে-বেড়ানোর, এমনকি নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও। এই ধরনের স্বাধীন জীবনযাপনের এক বিশেষ নজির স্থাপন করেন সে-যুগের বৈষ্ণবীরা। কুলীন ঘরের অবহেলিত বউ, বালবিধবা, কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবারের বর্ষীয়সী মেয়েদের মতো অনাথিনীদের সঙ্গে সঙ্গে কুলত্যাগিনী, বৃদ্ধা বারাঙ্গনা প্রভৃতি যেসব মহিলারা সমাজের কোথাও স্থান পেতেন না, তাঁরা আশ্রয় পেতেন বৈষ্ণব আখড়ায়।[৩] সর্বসাধারণ্যে ভিক্ষা করে বা গান গেয়ে, বা সম্ভ্রান্ত বাঙালি পরিবারের অন্দরমহলে শিক্ষাদান করে এঁরা নিজেদের জন্য এক-ধরনের স্বাধীন জীবিকার পথ তৈরি করে নিয়েছিলেন।

স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর শৈশবের স্মৃতিচারণে বলছেন প্রতিদিন প্রভাতে ''স্নানবিশুদ্ধ শুভ্রবসনা, গৌরী বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী বিদ্যালোক বিতরণার্থে অন্তঃপুরে আবির্ভূত হইতেন। ইনি নিতান্ত সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন না।...ইহার চমৎকার বর্ণনাশক্তি ছিল, কথকতা-ক্ষমতায় ইনি সকলকে মোহিত করিতেন।...''[৪]

অন্দরমহলে এই বৈষ্ণবী ঠাকুরানীদের সঙ্গীতবিদ্যার সমাদরের খবর পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসে, যেখানে হরিদাসী বৈষ্ণবী বেশে দেবেন্দ্র অন্দরমহলে প্রবেশ করতেই "শ্রোত্রীগণ নানাবিধ ফরমায়েস আরম্ভ করিলেন; কেহ চাহিলেন 'গোবিন্দ অধিকারী'—কেহ 'গোপাল উড়ে'। যিনি দাশরথির পাঁচালী পড়িতেছিলেন তিনি তাহাই কামনা করিলেন। দুই একজন প্রাচীনা কৃষ্ণবিষয় হুকুম করিলেন। তাহারাই টীকা করিতে গিয়া মধ্যবয়সীরা 'সখীসংবাদ' এবং 'বিরহ' বলিয়া মতভেদ প্রচার করিলেন। কেহ চাহিলেন 'গোষ্ঠ'—কোন লজ্জাহীন যুবতী বলিল—'নিধুর টপ্পা গাহিতে হয় তো গাও—নহিলে শুনিব না", সে-যুগের বিভিন্ন ধরনের এইসব জনপ্রিয় সঙ্গীতের চর্চায় বৈষ্ণবীদের পারদর্শিতা এবং অন্দরমহলের মহিলাদের রুচির বৈচিত্র্যের এক কৌতূহলোদ্দীপক পরিচয় পাওয়া যায় এর থেকে।

বৈষ্ণবীদের জনপ্রিয়তা কেবল অন্দরমহলেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৮২৬-এর ১১ই মার্চের *সমাচার দর্পণ*-এর সংবাদ থেকে আমরা জানতে পাই যে, কৈকালা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত দত্তের বাড়িতে সরস্বতীপূজা উপলক্ষে "কলিকাতা হইতে গোলকমণি ও দয়ামণি এবং রত্নমণি তিন দল নেড়ি কবি গান করিতে আসিয়াছিল..."। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের 'নেড়া-নেড়ী' বলে বিদ্রূপ করলেও এই নেড়ি কবিদের দাপটে একবার পুরুষ কবিওয়ালারা বেশ বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। বৈষ্ণবী কবিওয়ালারা পুরুষ কবিওয়ালাদের মতনই নিজস্ব দল নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। ১৮২৮-এর ২২শে নভেম্বরের *সমাচার দর্পণ*-এ ভবঘুরে মুচে ডোম-কবিওয়ালার এক চিঠির প্রতিলিপি থেকে জানা যায় কীভাবে এই নেড়ি বৈষ্ণবীর দল ওঁদের ওপর দৌরাত্ম্য করেছিলেন—"তাহারা, প্রায়সকল পরবে লোকের বাটীতে নাচিয়া কবি গাইত, কিন্তু তাহা সদরে কোন উপায় করিয়া নেড়ীর দায় হইতে রক্ষা পাইয়াছি।"[৫]

লক্ষ করার বিষয়, নিম্নবর্গের মহিলাদের ছড়া, গান, পাঁচালী ও লোকনৃত্যের আবেদন সে-যুগের কলকাতার সর্বশ্রেণির মহিলাদের কাছেই ছিল। রাস্তার জনসাধারণ ও সম্ভ্রান্ত ঘরের অন্তঃপুরবাসিনী—এই উভয় গোষ্ঠীই এর রসাস্বাদনে সমভাবে উৎসাহী ছিলেন। এই জনপ্রিয়তার একটা কারণ ছিল এই সব গানের বাচনভঙ্গি। অন্দরমহলে ইংরেজি বিদ্যাশিক্ষার ছাঁচে তৈরি নারীশিক্ষার সূত্রপাতের আগে পর্যন্ত বাঙালি মহিলাদের ভাষায় 'শিক্ষিত-অশিক্ষিত' এই শ্রেণি বিভেদ বড়ো একটা ছিল না। মেয়েলি কথ্য ভাষায় টিপ্পনী, রঙ্গ-রসিকতা, প্রবাদ প্রভৃতিতে যে বাক্‌রীতি, সহজ প্রকাশভঙ্গি ও সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনা, তা সকল শ্রেণির মহিলাদেরই বোধগম্য ছিল। ভাষাতে 'ভদ্র-ইতর'—এই শ্রেণিবিভেদও ছিল না। যেসব কথা আজকে অশ্লীল বলে ভদ্রসমাজে বর্জনীয়,

তা সে-যুগের সর্বশ্রেণির মহিলাদের মুখেই শোনা যেত। সুশীলকুমার দে-র ভাষায় বলা যেতে পারে—"নিজেদের লজ্জাশীল বা 'অবোলা' বলিলেও এই ভাষার সরস্বতীদের মুখে কোন বোলই আটকায় না, ভাষাতেও রাখাঢাকার বালাই নেই।"[৬] ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সে-যুগের 'প্রাঙ্গণবিহারিণী রসবতীদের' ভাষা-ব্যবহার বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আরও নির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়েছেন—"তাঁহারা 'পোড়ামুখো' 'ডেকরা' ইত্যাদি নিপাতনসাধ্য শব্দ আধুনিক প্রাণনাথ প্রাণকান্তাদির স্থলে ব্যবহার করিতেন এবং 'আবাগী' 'শতেকখুয়ারী' প্রভৃতি আধুনিক 'সখী' 'ভগিনী' স্থানে প্রয়োগ করিতেন।"[৭]

এইসব গান-কথকতা পাঁচালীর বিষয়বস্তুর জগৎটাও ছিল মেয়েদের সাধারণ জ্ঞানের পরিবেশ আশ্রিত—পৌরাণিক কাহিনি, শিব-পার্বতী, রাধা-কৃষ্ণ, মহাভারত-রামায়ণের গল্প ইত্যাদি। এইসব কাহিনির স্বচ্ছ আবরণের আড়ালে অবশ্য তৎকালীন নারী-সমাজের সামাজিক সমস্যাও অনেক সময় উঁকিঝুঁকি মারত। বিজয়া-আগমনী গানে, পার্বতীর স্বর্গীয় মাহাত্ম্য থেকেও বড়ো হয়ে উঠত বাঙালি ঘরের মেয়ের বিয়ের জন্য দুশ্চিন্তা, বিয়ের পর পতিগৃহে মেয়ের দুঃখে মায়ের ব্যাকুলতা, বছরে একবার বাপের বাড়িতে মেয়ের আগমনে আনন্দ ও তাঁর শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তনে দুঃখ ইত্যাদি। বিজয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী বলছেন—"পল্লী পুরস্ত্রী সাশ্রুনয়নে বায়ু গদগদ ভাষায় বরণ করিয়া মাকে বিদায় দিলেন তখন মহামায়া মহাশক্তির কথা যেন কাহারও মনে রহিল না—পল্লী বালিকাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার করুণ অভিনয় হইয়া গেল।"[৮]

ঠিক একইভাবে, রাধা-কৃষ্ণের কাহিনির বিভিন্ন স্তর পরম্পরা—পূর্বরাগ, অভিসার, প্রবাস, মাথুর বর্ণনার ছলে অনেক সময়ই বাঙালি ঘরের প্রোষিতভর্তৃকার অভিযান বা পরপুরুষের প্রতি কোনো কুলকামিনীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষা (রাধা-কৃষ্ণ উপাখ্যানের বাঙালি ভাবান্তরে রাধা আয়ান ঘোষের স্ত্রী এবং পরপুরুষ কৃষ্ণের প্রেমিকা) বা লম্পট স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর অনুযোগ (যা সে-যুগের একাধিক নাটক-নভেল-প্রহসনে পাওয়া যায়), ইত্যাদি সমসাময়িক গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের গোপন বা অর্ধ-অস্ফুট অনুভূতিগুলিই বিবৃত হত। এই প্রসঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের একজন স্ত্রী-কবিয়াল যজ্ঞেশ্বরীর (যিনি তদানীন্তন বিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন) একটি গানের নিম্নলিখিত কলিগুলি দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যেতে পারে :

অনেক দিনের পরে, সখা তোমারে
দেখ্‌তে পেলাম চোখেতে।
ভাল বল দেখি, তোমার সখার সংবাদ,

ভাল ত আছেন প্রাণেতে।।
তার মনে ত নাই এ অধীনীরে,
নবীনার প্রাণধন, হ'য়ে তিনি এখন,
ভেসেছেন সুখসাগরে।
ভাল মুখে থাকুন তিনি, তাতে ক্ষতি নাই,
আমায় ফেলে গেলেন কেন শাঁখের করাতে।।
বলো বলো প্রাণনাথেরে,
বিচ্ছেদকে তাঁর ডেকে নে যেতে।
যদি থাকে ধার, না হয় শুধেই আসব তার,
কেন তসিল করে পোড়া মসিল (মাসুল?) বরাতে।
আমার হল উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়েতে।
তিনি প্রাণ লয়ে হে হলেন স্বতন্তর,
মদন তা বুঝে না, বল্লে শুনে না,
আমার ঠাঁই চাহে রাজকর।
... ...।[৯]

শব্দচয়নে প্রয়োজনবোধে আরবি শব্দের ('তসিল' বা তহ্‌সিল; মসিল বা মহ্‌সুল্‌) ও বাংলা চলতি প্রবাদ ('উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে')-এর প্রয়োগ লক্ষণীয়। সমসাময়িক সমাজের কৃষিব্যবস্থার নিয়ম-কানুন থেকে রূপকল্প (তহ্‌সিল, রাজকর ইত্যাদি) তুলে, জমিচ্যুত কৃষকের সঙ্গে প্রেমবঞ্চিত বিরহিণীর দুর্দশার তুলনাটাও অর্থপূর্ণ।

এই ধরনের 'বিরহ'শ্রেণির গানগুলিতে গম্ভীর সুর ছিল, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কাতর অনুযোগ থাকত। কিন্তু এর থেকে অনেক জোরালো ও ঝাঁঝালো ছিল সে-যুগের লঘু মেজাজের পরিহাসপ্রধান গানগুলি, যার মধ্যে 'খেউড়' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষিত সমাজের নব্য-অর্জিত নৈতিক মাপকাঠিতে এগুলি অশ্লীল ও অমার্জিত বিবেচিত হলেও, এইগুলিতে সে-যুগের নারীসমাজের রঙ্গপ্রিয় হাস্যোচ্ছল আশা-আকাঙ্ক্ষার মেজাজটা ফুটে বেরোয়। নিম্নবর্গের সমাজে (যেখানে শেষে 'খেউড়' ভদ্র সমাজের তাড়নায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়) গাওয়া 'খেউড়ে' পুরুষের সঙ্গে নারীর সমকক্ষ অবস্থানের হদিশ মেলে। শ্রী হরিপদ চক্রবর্তীর মতে "খেঁড়ু বা খেউড় গানই খুব সম্ভবত বাঙ্গালাতে প্রেমিক-প্রেমিকার সরাসরি হৃদয়াবেগ প্রকাশের প্রথম নিদর্শন। ...পরবর্তীকালে কবি-সঙ্গীতের মধ্যে ইহাই একদিকে বিরহ এবং অন্যদিকে খেউড়, লহড়, কবির টপ্পা ইত্যাদি এই দুই শাখায় যথাক্রমে মার্জিত ও অমার্জিত রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।..."[১০]

'খেউড়' মূলত লৌকিক। নারী-পুরুষে পরস্পর ছড়া-কাটাকাটি ও উত্তর-প্রত্যুত্তর এর এক বিশেষ অঙ্গ। শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র পাল পুরনো খেউড়ের এক নিদর্শন দিয়েছেন :

"স্ত্রীর উক্তি; ওরে আমার কাল ভ্রমর, মধু লুটবি যদি আয়।

পুরুষের উক্তি; আমি থাকতে চাকের মধু পাঁচ ভ্রমরে খেয়ে যায়?"[১১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে অশ্লীলতা-বিরোধী অভিযানের সামনে পিছু হঠতে হঠতে 'খেউড়' গ্রামাঞ্চলে নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে আশ্রয় পায়। সমকালীন এক বিবরণী থেকে আমরা জানতে পাই বর্ধমান ও বীরভূম জেলাতে "স্ত্রীপুরুষ একত্র মিলিত হইয়া দাঁড়াইয়া কৃষ্ণলীলাঘটিত সখীসংবাদ, বিরহ ও খেউড় লহরাদি গান করিয়া থাকে। কবির গানের মত ইহাতে উত্তর-প্রত্যুত্তরও আছে।..."[১২]

হালকা-মেজাজের গান, রঙ্গরসিকতাপূর্ণ লঘুসঙ্গীত ও নাচের ক্ষেত্রে সে-যুগের কলকাতার নিম্নবর্গের মহিলারা আসর জমিয়ে ছিলেন। ঢপ কীর্তন এর মধ্যে প্রধান। এই কীর্তনাঙ্গ গানের স্রষ্টা কে, এ নিয়ে মতভেদ আছে। দুর্গাদাস লাহিড়ীর মতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে যশোর-নিবাসী মধুসূদন কিন্নর বা মধু কাণ রাধামোহন নামে এক বাউলের কাছ থেকে ঢপ-সঙ্গীত শেখেন ও সেই সুর মিলিয়ে এক নতুন ধাঁচের কীর্তনাঙ্গ গান সৃষ্টি করেন।[১৩] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, ঢপের সৃষ্টিকর্তা মুর্শিদাবাদ জেলার রূপচাঁদ অধিকারী। মনোহরশাহী কীর্তনের সুর ভেঙে রূপচাঁদ হালকা সুরের সৃষ্টি করেন এবং এই নতুন সুরে গাওয়া কীর্তন-ই ঢপ নামে পরিচিত। পরে মধু কাণ এই ধারায় গান গেয়ে বিখ্যাত হন।[১৪]

ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় এই ঢপ-কীর্তন মেয়ে-কীর্তনীয়াদের প্রায় একচেটিয়া হয়ে যায়। ১৮৪০ সালে সহচরী নামে এক বৈষ্ণবী কীর্তনীয়ার কথা শোনা যায়। তারপরে শুনতে পাই জগন্মোহিনী নামে কাণ জাতীয় এক মহিলার নাম, যিনি ঢপের কীর্তনে অসাধারণ যশস্বিনী হয়েছিলেন। "জগন্মোহিনীর ঢপ তৎকালীন লোকে অতিশয় আদর করিতেন। তাহার যেমন বাক্‌পরিষ্কার তেমনি স্বরসঞ্চার ছিল... এই জগন্মোহিনীর পর বামা, শ্যামা, রমা, গুরুদাসী, ঠাকুরদাসী প্রভৃতি অনেক কীৰ্ত্তনীর দল হইয়া গিয়াছে।..."[১৫] সহজ বাক্য-বিন্যাস ও অনুপ্রাসের ব্যবহারের জন্যই বোধ হয় মেয়ে-কীর্তনীয়াদের কণ্ঠে ঢপ-কীর্তন অত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মধু কাণের গানের নিদর্শন:

এখন বাঁশী ভালবাসিনে, তাইতে আসি নে,
নইলে থাকত যাওয়া আসা,
আর সে আশা রাখি নে
যখন ছিল ব্রজে বাঁশি,

তখন ভালবাসতাম বাঁশি
এখন নাই সে ভালবাসাবাসি,
এ কোন বাঁশি তা চিনি নে।[১৬]

প্রায় একই সময়—১৮৫০ নাগাদ—কলকাতার রাস্তায় ভবানী বা ভবরানী নামে এক স্বর্ণকার জাতের মহিলার ঝুমুরের দলের উদ্ভব হয়। "কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণপ্রসঙ্গঘটিত কালিয়দমন যাত্রার অঙ্গবিশেষের নাম ঝুমুর...ঝুমুরের ভাবেই রসজ্ঞ ও মতবিজ্ঞ ভাবুকেরা, মান, মাথুর কি কলঙ্কভঞ্জন কোন্ পালার যাত্রা হইবে, তাহা বুঝিতে পারেন।"[১৭] কিন্তু ঝুমুরের লৌকিক উৎসের সন্ধান দিচ্ছেন আর একজন—"পশ্চিমবঙ্গের ঝুমুর গান কতদিনের পুরাতন কেহ বলিতে পারে না...ঝুমুর গানের প্রধান লক্ষণ হইতেছে দুই দলে সম্পর্ক পাতা যা পরস্পরে পর্যায়ক্রমে গানে উত্তর-প্রতিউত্তর করা।...গায়ক হিন্দু, শ্রোতাও হিন্দু, অথচ দুই দল কবিওয়ালাই হিন্দুর দেবদেবীকে যথেচ্ছ গালাগালি দেয়..."[১৮]

ভবানীর ঝুমুরে দুরকম রীতি-ই দেখতে পাই—কৃষ্ণলীলা উপলক্ষ করে একক সঙ্গীত, আবার হিন্দু দেবদেবীকে 'যথেচ্ছ গালাগালি' দিয়ে ছোটো ছোটো গানের কলি। প্রথম ধরনের একটি নিদর্শন দিচ্ছি :

চল সই বাঁধা ঘাটে যাই
অ-ঘাটের জলের মুখে ছাই
ঘোলাজল প'ড়লে পেটে
গাটা অমনি গুলিয়ে ওঠে
পেট ফেঁপে আর ঢেকুর উঠে
হেউ হেউ হেউ

... ...

তাই তো আমি মরছি ভেবে
কাশী কি মক্কা যাই...

রাধাকৃষ্ণ কাহিনির সেই চিরপরিচিত ঘাটে জল নিতে যাবার 'রোমান্টিক' ঘটনাকে তার রঙিন পরিচ্ছদ থেকে বিবস্ত্র করে একেবারে সাদামাঠা নোংরা বাস্তবে নিয়ে আসার পরিহাসটা স্বভাবসিদ্ধ মেয়েলি রসিকতার ঢঙে। ঐ একই ঝুমুর গানের পরবর্তী কলিতে কিন্তু একটা বিষাদের সুর স্পষ্ট হয়ে ওঠে—আবার সবিশেষ (typical) মেয়েলি ভাষায়।

চোখের জল চোখে মরে
বেড়াই আমি আমোদ করে
জ্বালাই জ্বলি তবু রসে ঢলি।
আমি হেলে দুলে চলেছি পোড়া গয়না বুঝি রয় না আর
পাঁচ আবাগীর পাঁচ নজরের ছার...[১৯]

ভবানীর আর একটি ঝুমুর গানে শিবকে নিয়ে ঠাট্টা করা হচ্ছে :

বাপ হয়ে জামাই এনেছে
দোষ দিব কি পরকে
মোটা সোটা ঢোলের মতন
যম নারে তার বলকে।
এমন এনেছে জামাই
ভাঙ ধুতুরা নাইকো কামাই (গো)
পাকা দাড়ি ত্রিশূলধারী
তা দেখে মন টলকে।[২০]

ঝুমুরের বিরুদ্ধে শিক্ষিত ভদ্রসমাজের প্রচার অভিযান সত্ত্বেও, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ঝুমুরের দলগুলিকে কলকাতা থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা যায়নি। মহেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভাই) তাঁর শৈশবের স্মৃতির (আনুমানিক ১৮৭০) কথা বলতে গিয়ে লিখছেন—"তখনকার দিনে বিবাহতে গরুর গাড়িতে কাগজের ময়ূরপঙ্খী করে তার উপর ঝুমুরওয়ালীর নাচ দিত। ঝুমুরওয়ালীরা সেই ময়ূরপঙ্খীর উপর নাচিত আর পিছনে একটা লোক ঢোল কাঁসি বাজাইত। তাদের গানের একটা উদাহরণ দিচ্ছি, সেটা কালীর বর্ণনা, 'মাগী মিনসেকে চিৎ করে ফেলে দিয়ে বুকে দিয়েছে পা, আর চোখটা করে জুলুর জুলুর মুখে নেইকো রা'।"[২১]

লক্ষণীয় যে, ভবানীর ঝুমুর গানের মতন, এখানেও হিন্দু দেব-দেবীকে নিয়ে ঠাট্টা করা হচ্ছে। ভাষাতেও কোনো পরিমার্জনের বল্গা নেই।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। আশ্চর্য লাগে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজ-সংস্কারকরা সে-যুগের নারীসমাজের যেসব সমস্যাগুলি নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন—সতীদাহপ্রথা, কৌলীন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ—এই সমস্যাগুলির উল্লেখ সমসাময়িক লোকসংস্কৃতির মহিলা কবি বা গায়িকাদের রচনায় বড়ো একটা পাওয়া যায় না। সতীদাহ নিয়ে কেবল একটি মেয়েলি ছড়া চোখে পড়ে :

কার আগুনে কেবা মরে, আমি জাতে কলু
মা আমার কি পুণ্যবতী, বলছে—দে উলু

অর্থাৎ জোর করে এক কলু বউকে ধরে এনে অন্যের চিতায় পোড়ানো হচ্ছে। প্রথম পঙ্‌ক্তিটি কলু বউ-এর উক্তি। আর দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি জনতার, যারা উলু দিয়ে কলু বউ-এর প্রতিবাদ ডুবিয়ে দিচ্ছে।

বিধবাবিবাহ নিয়ে অবশ্য বেশ কয়েকটি গান পাওয়া গেছে—সমর্থনসূচক ও বিরোধীমূলক, উভয়ই। কিন্তু 'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে' বা ঐ ধরনের গানগুলি মহিলাদের দ্বারা রচিত ছিল বলে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। কৌলীন্যপ্রথা ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যেসব গানের সন্ধান পাওয়া গেছে তা অধিকাংশই সাধু ভাষায় শিক্ষিত সমাজ-সংস্কারক ভদ্রলোকদের রচিত।

নিম্নবর্গের সমাজে কৌলীন্যপ্রথা ছিল না। বিধবাদের বিবাহ অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বীকৃত ছিল। 'সাঙ্গা' রীতির বিবাহের প্রচলনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই প্রবাদটি থেকে—"ঘর পড়লে ছাগলে মাড়ায়, রাড় হলে সবাই এসে সঙ্গা করতে চায়।" অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে মেয়েদের বিবাহের চল ছিল বলে নিম্নশ্রেণির সমাজে বাল্যবিবাহ বড়ো একটা সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি। এইসব কারণই উচ্চবর্গের বাঙালি সমাজে মহিলাদের যেসব পীড়নকর প্রথার অবসানের জন্য শিক্ষিত সংস্কারকেরা আন্দোলন করছিলেন, সে-বিষয় নিয়ে উদ্বেগ বা চিন্তার ছাপ নিম্নবর্গের মহিলাদের লোকসংস্কৃতিতে বড়ো একটা দেখা যায় না। এগুলি তাঁদের দৈনিক অভিজ্ঞতার জগতের বাইরে ছিল। বরং নিম্নবর্গের আর এক সম্প্রদায়ের মহিলারা তাঁদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা, অভিজ্ঞতা নিয়ে তিক্ত পরিহাসপূর্ণ গান বাঁধতেন। এ গানগুলি 'বেশ্যাসঙ্গীত' নামে পরিচিত। ক্রমবর্ধমান মহানগরীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন নানা জাতীয় স্বাধীন বৃত্তি ও উপজীবিকায় মহিলাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে, দেহোপজীবিনীদের ব্যবসারও প্রসার ঘটে। ১৮৫৩-এর কলকাতায় প্রায় ৪০০,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে বারাঙ্গনাদের সংখ্যা ছিল ১২,৪১৯। ১৮৬৭তে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩০,০০০-এ। আমরা জানতে পারি যে, এদের অধিকাংশই ছিলেন কুলীন ঘরের অপরিণীতা কন্যা ও দারিদ্র্যতাড়িত নীচের জাতের মহিলারা।[২২]

প্রচণ্ড অবমানকর অবস্থার মধ্যে দিন ও রাত্রি যাপন করেও কিন্তু এই শ্রেণির মহিলারা হাস্যরস বজায় রেখে বিদ্রূপাত্মক গান রচনা করতে পারদর্শিনী ছিলেন। পারিপার্শ্বিক দৈনিক জীবন থেকেই রূপকগুলি বাছতেন। ফলে অনেক সময়ই এগুলির যৌনাত্মক ব্যঞ্জনাটা স্পষ্ট; কিন্তু কল্পনাশক্তির গুণে কিছু কিছু গান বেশ সরস হয়ে উঠত। যেমন, এই গানটি নেওয়া যেতে পারে :

আমার ভালোবাসা আবার কোথায় বাসা বেঁধেছে।
পীরিতের পরোটা খেয়ে মোটা হ'য়েছে।
মাসে মাসে বাড়ছে ভাড়া
বাড়ীউলি দিচ্ছে তাড়া
গয়লাপাড়ার ময়লা ছোঁড়া প্রাণে মেরেছে।[২৩]

'গয়লাপাড়ার ময়লা ছোঁড়া'র রূপকল্পে গোপালক কৃষ্ণাঙ্গ শ্যামের অনুষঙ্গ লক্ষণীয়।

আর একটি ঐ জাতীয় গানে সমসাময়িক জনপ্রিয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা 'ঘুড়ির লড়াই' থেকে রূপালঙ্কার নেওয়া হয়েছে :

কেটে দিয়ে প্রেমের ঘুড়ি আবার কেন লটকে ধর?
একটানাতে বোঝা গেছে তোমার সুতোর মাঞ্জা দড়।[২৪]

ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার লোকসংস্কৃতির এই মেয়েলি গান ও অনুষ্ঠানগুলিতে প্রায়শই দেখা যায় এক ধরনের সাবলীল, মাজা-ঘষাহীন খাঁটি বাংলার ব্যবহার। ঝুমুর গান, তরজা, ঢপ-কীর্তন, এমনকি রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক কবিগানেও (যেমন যজ্ঞেশ্বরীর উদ্ধৃত গানে) ছন্দের চাতুর্য, বাক্‌চাতুর্য, সমসাময়িক পরিবেশ থেকে শব্দচয়ন ছাড়াও, তৎকালীন কথ্যভাষার প্রয়োগে এক ধরনের সরসতা উপভোগ করা যায়। এই সরস রঙ্গ অনেক সময়ই পুরুষদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হত; বিশেষ করে মেয়েলি প্রবাদগুলিতে তা সুস্পষ্ট। যেমন—"ভাত দেবার নাম নেই, কিল মারার গোঁসাই" বা "দরবারে না মুখ পেয়ে ঘরে এসে মাগ ঠেঙায়"—এই জাতীয় প্রবাদগুলি অকর্মণ্য বা কাপুরুষ স্বামীদের নিন্দা। সে-যুগের বাঙালি নারীসমাজের সর্বজনীন অভিজ্ঞতার ফলে সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্দরমহলেও এই প্রবাদগুলির প্রচলন ছিল।

পরিহাস ও আদিরসাত্মক রঙের প্রাধান্যকে (বিশেষ করে খেউড় বা ঝুমুরজাতীয় গানে) সে-যুগের শিক্ষিত ভদ্রসমাজ 'ইতর মেয়েমানুষদের' বেলেল্লাপনা বলে উড়িয়ে দিতে চাইতেন। ঝুমুরওয়ালিদের সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ দত্তের কথাগুলি অর্থপূর্ণ—"তাহারা ছোটলোক, কেলে কেলে মাগী, কাছ দিয়ে চলে গেলে একটা দুর্গন্ধ ছাড়িত...।"[২৫] ঢপ-কীর্তনীয়াদের সম্বন্ধে তৎকালীন একজন শিক্ষিত সমালোচকের মত—"কীর্তন ও ঢপের দল এখানকার বেশ্যাদিগের অর্থাগমের অবান্তর উপায় হইয়া উঠিয়াছে।"[২৬]

কিন্তু সে-যুগের নাগরিক লোকসংস্কৃতির বিরুদ্ধে নব্যশিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকশ্রেণির প্রচার-অভিযানের বিশ্লেষণের পূর্বে, আমাদের বোঝা প্রয়োজন মেয়েদের গানে এই ধরনের আদিরসাত্মক রঙ্গ-তামাশার তীব্র ব্যঙ্গ-কটূক্তির প্রবণতার তাৎপর্য।

মনে রাখা দরকার যে, সে-যুগের কলকাতার লোকসংস্কৃতি এক অর্থে একটা বিকল্প সংস্কৃতি ছিল। অভিজাতশ্রেণির শিক্ষিত রুচিপ্রসূত সাহিত্যশিল্পের পাশাপাশি একটা সমান্তরাল, কিন্তু অনেকটা বিপরীত মেজাজের ধারা। হাটবাজারের এই সমান্তরাল সংস্কৃতি পুরোনো সমাজেও ছিল—সংস্কৃতঘেঁষা ধর্মীয়, বা রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট সঙ্গীত নাটকের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত বহুধাবিস্তৃত লোকসংস্কৃতি। অনেক সময়ই এই বিকল্প লোকসাহিত্য অভিজাত সংস্কৃতির লালিকা বা parody রূপে প্রকাশিত হত। তাই যে-মহাদেব ধ্রুপদী সাহিত্যে সর্বশক্তিমান বলে উপাস্য, সেই দেবতাই বাঙালি লোকসাহিত্যে—গাঁজাখোর, অকর্মণ্য বুড়ো শিব হিসেবে ঠাট্টার বস্তু। পুরাণের প্রবল পরাক্রান্তা কালী, গ্রাম্য শ্যামাসঙ্গীতে মুখঝামটা কুশলী কোনো ঝগড়াটে স্ত্রীলোকের রূপে আবির্ভূত হত। দেবদেবী নিয়ে এই হাস্যপরিহাসের ব্যাখ্যা করতে গেলে বলা চলে যে, এ ছিল নিম্নবর্গের মানুষের তির্যক প্রতিবাদের কায়দা—সমাজের কর্তাব্যক্তিদের অলঙঘনীয় নিয়মকানুন, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের রুচিবাগীশ পবিত্রতার প্রতি এক ধরনের অবজ্ঞাপূর্ণ বিরোধিতা। মেছোহাটা ভাষা দিয়ে সংস্কৃত ঘেঁষা দুর্বোধ্য বাংলার গতিরোধের চেষ্টা। এর নজির অন্যান্য দেশের লোকসাহিত্যেও পাওয়া যায়। মধ্যযুগের ইউরোপীয় লোকাচার প্রসঙ্গে একজন রুশ-সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—"Coupled with cults which were serious in tone and organization were other comic cults which laughed and scoffed at the deity...coupled with serious myths were comic and abusive ones ; coupled with heroes were their parodies and doublets..." এই comic cult ও parody-র লোকশিল্পীরা "offered a completely different, non-official, extra ecclesiastical and extrapolitical aspect of the world, of man and of human relations, they built second world and a second life outside officialdom..."[২৭]

কলকাতার লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত মেয়েদের নৃত্যগীতে এই জাতীয় হাস্যরসের প্রাধান্যর আরও এক বিশেষ অর্থ থাকতে পারে। রঙ্গ-রসিকতা, খেউড়ের অমার্জিত বেপরোয়া অবজ্ঞা এক ধরনের defence mechanism, বা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি প্রতিহত করবার জন্য অবচেতন মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবেদন। পুরুষের কর্তৃত্বাধীন সমাজে, অন্তঃপুরবাসিনী সম্ভ্রান্ত মহিলা ও নিম্নবর্গের খেটেখাওয়া মহিলা—উভয়কেই যথেষ্ট ভোগান্তি পোহাতে হত। "পুড়বে নারী উড়বে ছাই, তবে নারীর গুণ গাই"—এই যেখানে প্রচলিত মনোভাব, সে সমাজে মেয়েদের বহু লড়াই করে বেঁচে থাকতে হত। দুর্ভিক্ষ, মহামারীর সময় নিম্নবর্গের সমাজে মেয়েদেরই সহ্য করতে হত সংকটের

আসল ধাক্কা। পুরুষেরা হয় তাদের পরিত্যাগ করত, নয় বিক্রি করে দিত। উচ্চবর্গের ঘরে মেয়েদের উপর ছিল নানা ধরনের সামাজিক উৎপীড়ন—কুলীন স্বামীর অবহেলা বা লম্পট ও মদ্যপ স্বামীর অত্যাচার। এমনকি মহিলা কবিওয়ালা, যাঁরা নিজেদের সৃজনশীল ক্ষমতা প্রদর্শন করে জনসমাজে প্রশংসা অর্জন করতেন, তাঁরাও পুরুষ সহযোগীদের কাছে পদে পদে অপমানিত হতেন। যজ্ঞেশ্বরী যখন ভোলা ময়রার সঙ্গে কবির লড়াইয়ে অবতীর্ণা হয়েছিলেন, তখন ভোলা ময়রা তাঁকে 'গাভী' বলে সম্বোধন করে বলেন :

কেন এসে এই আসরে
ঘন ঘন দিচ্ছো জোরে ডাক।
বুঝি তোমার হ'য়েছে কাল
বেহায়ার নাই কালাকাল
তাই বাবুদের সভায় এত হাঁক...[২৮]

এর আগেই উল্লেখ করেছি কীভাবে 'ভবঘুরে মুচে ডোম কবিওয়ালা' 'নেড়ি' কবিদের হঠিয়ে দিয়েছিলেন 'সদর'-এ অভিযোগ করে।

এই ধরনের সামাজিক আবহাওয়াতে মেয়েদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির নমুনাগুলি—ঝুমুর, ঢপ-কীর্তন, পাঁচালী, প্রবাদ, ছড়া, ইত্যাদির চর্চাকে এক জাতীয় স্বাধীন ক্রিয়াকলাপ বলা চলে। পুরুষ-কর্তৃত্বের প্রাত্যহিক চোখরাঙানো থেকে সাময়িক অব্যাহতির সুযোগ পাওয়া যেত। মেয়েলি ভাষার এই গান, ছড়া-প্রবাদে, একটা Symbolic inversion বা সাংকেতিক উপায়ে মেয়েপুরুষের প্রচলিত অধিপতি-অধীনা সম্পর্কটাকে উলটে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। তাতে গায়িকা-শ্রোত্রী উভয়ই অপূর্ব সাধের বা পুরুষ-আধিপত্যের বিরুদ্ধে কাল্পনিক প্রতিশোধের আনন্দ পেতেন বলে মনে হয়। চিৎপাত শিবের বুকে কালীর নৃত্য নিয়ে স্ফূর্তি বা বুড়ো স্বামী হিসেবে শিবের গাঁজাখুরি নিয়ে তীব্র রসিকতা—এর দ্বারা নিজেদের সংসারে মেয়েদের প্রতি পুরুষের বৈষম্যমূলক আচরণের মতো প্রতিকূল অবস্থার বিপক্ষে তির্যক কায়দায় সমালোচনা করা যেত। অনেক গানে এই মনোভাবটা স্বেচ্ছানুবর্তিতা রূপে আত্মপ্রকাশ করত। যেমন ভবানীর একটি মজার তর্জার এই কথাগুলি :

ঠক্ ঠকা ঠক্ ঠক্
সখের প্রাণ বাগ মানে না মানে
বেরিয়ে পড়ে হেঁচকা টানে।
আনাচ কানাচ মানবো নাকো ধর্ম্মে হবে বক্।
রামা শ্যামা মিষ্টি বড় ভাতার বড় টক্।[২৯]

আরও প্রত্যক্ষভাবে, বাসরঘরে মেয়েদের স্বাধীন-আচার-আচরণের সুযোগ ছিল। সারাজীবন ধরে স্বামী কর্তৃত্ব করবে, মাত্র এক রাতের জন্য সে মেয়েদের হাতে বন্দি; বাসরঘরে নারী পুরুষের ভূমিকা উলটে যেত। এই reversal of roles-এ নববিবাহিত পুরুষের হেনস্থার এক কৌতূকহলোদ্দীপক বর্ণনা পাই সে-সময়কার এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত পত্র থেকে :

"স্ত্রী-আচার সময়ে কানমলা, নাকমলা, ধাক্কা, চড় ও মুষ্ঠ্যাঘাত সহ্য করিয়া বসবার ঘরে প্রবেশ করিলাম। তথায় দেখি চতুর্দ্দিকে কেবল স্ত্রীলোকের হাট।...সুন্দরীগণ আমাকে প্রথমে মহাসমাদর করিয়া ক্রমশঃ হাত চালাইতে লাগিলেন...চড় ও চাপড় ও কানুটিতে সেগুলি (দাড়ি গোঁফ) যায় যায় বোধ হইল। কিঞ্চিৎ পরে এই যুদ্ধ থামিল। তখন কামিনীগণ আমাকে আমার স্ত্রীকে কোলে লইতে বলিয়া খোলা ঠাট্টা আরম্ভ করিলেন। আমি সেগুলি লিখিতে পারিলাম না। আপনি ও পাঠকগণ আঁচে বুঝিয়া লইবেন। কোন প্রকারে এই ফাঁড়া হইতে রক্ষা পাইয়া সৌভাগ্যের বিষয় করিতেছি, এমন সময়ে যুবতীরা আমাকে গান করিতে বলিলেন। অধ্যয়ন অবস্থায় আমার কিঞ্চিৎ গান বাদ্য শিক্ষা ছিল, অতএব মনে করিয়া টেনে এনে একটি ব্রহ্মসঙ্গীত গাইলাম। তৎক্ষণাৎ 'চুপ চুপ' শব্দ পড়িল। আমি তৎক্ষণাৎ একটি রামপ্রসাদী পদ ধরিলাম। সে-বারও প্রশংসা পাইলাম না। শেষে হতাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি প্রকার গীত আবশ্যক?' ইহা শুনিয়াই দশ জন যুবতী বলিয়া উঠিলেন (দুই এক কানমলাও মধ্যে মধ্যে চলিতেছে) 'টপ্পা' 'খেয়াল', একজন হরি ঠাকুরের খেউড় শুনিতে চাহিলেন। আমার মাথা ঘুরিয়া গেল।..."[৩০]

বিশেষ কোনো উপলক্ষে, মেয়েদের এই জাতীয় সাময়িক স্বাধীনতার অনুমতি দিয়ে সমাজের কর্তারা হয়তো safety value-এর ব্যবস্থা করতেন। অন্তঃশীল সংঘাত যাতে প্রকাশ্যে ফেটে না পড়ে, নিরাপদ রঙ্গ-রসিকতায় নিরসন হয়, এটা তার-ই উপায় বলে গ্রাহ্য হত।

ভদ্রসমাজের প্রচার-অভিযান

কিন্তু মেয়েলি গান বা আচার-অনুষ্ঠানের এই স্বাধীনতা—সমসাময়িক ও সীমিত হলেও—ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ভদ্রলোক সমাজের কাছে ক্রমশই আসন্ন অমঙ্গলের লক্ষণরূপে দেখা দিচ্ছিল। নিম্নবর্গের মহিলাদের সংস্কৃতিতে অবাধ ভাবপ্রকাশ ও তাদের জীবনযাত্রা-প্রণালীতে স্বেচ্ছানুবর্তিতার দৃষ্টান্ত অন্তঃপুরের মহিলাদের সামনে তাঁদের ব্যবহারিক জীবনে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে গণ্য হবার আশঙ্কা ছিল। ঊনবিংশ

শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই আমরা দেখতে পাই যে অন্তঃপুরবাসিনীরা সমানাধিকারের দাবি জানাচ্ছেন। চুঁচুড়া থেকে কয়েকজন মহিলা ১৮৩৫-এর ২১শে মার্চের *সমাচার দর্পণ*-এ তাঁদের পুরুষ তত্ত্বাবধায়কদের উদ্দেশ্য করে লিখেছেন যে, অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা "যেমন স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সঙ্গে আলাপাদি করে আমারদিগের তদ্রূপ করিতে কেন না দেন...আমরা কি আপনারই বিবেচনাপূর্বক স্বামী মনোনীত করিতে পারি না...ভার্য্যার মৃত্যুর পরে স্বামী পুনর্বিবাহ করিতে পারে তবে কেন স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর বিবাহ করিতে না পারে..."[৩১]

সম্ভ্রান্ত বাঙালি ঘরের অন্দরমহলের চরিত্র বহির্জগতের তাপ লেগে কলুষিত হতে পারে— এ ভয়টা শিক্ষিত ভদ্রলোক সমাজের ঘাড়ে চেপে বসেছিল। সমকালীন অন্তঃপুরিকাদের বিপদ সম্বন্ধে ব্রাহ্মদের *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* সাবধান করে লিখেছিল— "আপনারা কারারুদ্ধ থাকিয়া বেশ্যাদিগকে যখন সম্পূর্ণ স্বাধীনা দেখে, অনেকে যখন স্বীয় পতিকে তাহাদিগের প্রমোদে আসক্ত দেখিতে পায়, তখন সুখ ভ্রমে কুকর্ম্মের লালসা তাহারদিগের (অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী) চিত্তে প্রজ্জ্বলিত হওয়া কি অসম্ভব?"

কিন্তু কারারুদ্ধ অন্তঃপুরিকাদের স্বাধীনতা দিতে, বা "স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সঙ্গে আলাপাদি" করতে দিতে, তখনও শিক্ষিত ভদ্রলোকশ্রেণি সম্মত ছিলেন না (যদিও তাঁদের অনেকেই বিধবা বিবাহের সমর্থক ছিলেন)। অন্দরমহলের মেয়েদের সতীত্ব বজায় রাখার জন্য তাঁরা যে উপায় বাতলে ছিলেন তা হলো স্বামীদের চরিত্র সংশোধনও "বেশ্যাদিগের বসতির নিয়ম পরিবর্তন।"[৩৩] বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৫৬ সালে, কলকাতার নির্দিষ্ট অঞ্চলে বারাঙ্গনাদের বসতি সীমাবদ্ধ করার জন্য আন্দোলন করেন।[৩৪] অবশ্য এর আগে থেকেই ভদ্রপল্লী থেকে বারাঙ্গনা উচ্ছেদ শুরু হয়ে গেছে। ১৮৫৪-এর *সংবাদ প্রভাকর*-এ প্রকাশিত একটি চিঠিতে "বাসভ্রষ্ট বারাঙ্গনানাং" তাঁদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ তুলে লিখেছিলেন "পাঠশালা সন্নিকর্ষে হীনজাতি বেশ্যাবর্গের বাস থাকায় বালকবৃন্দের বিদ্যাবিষয়ক ক্রটিকর বিবেচনা...স্কুলাধ্যক্ষগণ...কতিপয় সহায়সম্পত্তিবিহীনা বারাঙ্গনাকে ইংরেজী স্কুলের নিকট হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন।..." কিন্তু "এক যাত্রায় পৃথক ফল ফলিল, যে কামিনী ঐশ্বর্যশালিনী ও স্বসহায়া ছিল সে অকাতরে ঘরে বসিয়া ভ্রূক্ষেপও করিল না। কিন্তু কতকগুলি অনাথিনী বাররমণীগণ স্থানভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ চিরদুঃখিনীর ন্যায় কেহ বা পর্ণকুটিরে, কেহ বা হট্টমন্দিরে, কেহ বা তরুতলে বৃক্ষাচ্ছায়াতে যুথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় হা হুতাশ করত দিন যাপন করিতেছে।"[৩৫]

এটা সাধুভাষায় লিখিত। এর কথ্য ঝাঁঝালো সংস্করণ মেলে ভবানীর এক সমসাময়িক তরজায়।

ভাল আইন কল্লো এবার কোম্পানী রাজায়
বেশ্যারা সব শশব্যস্ত পালিয়ে যাবে কে কোথায়
কেহ বা ত্যজে সোনার ঘর
পারে গিয়ে পালিয়ে গেছে হয়ে আতান্তর
কেহ বা দেখে শুনে বেচে কিনে শ্রীবৃন্দাবনে যেতে চায়।
... ...
বলে লাজে মরি, কি ঝকমারি
মৃত্যু হ'লে প্রাণ জুড়ায়।[৩৬]

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শিক্ষিত ভদ্রসমাজের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল শুধু বারাঙ্গনাই ছিলেন না। তার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নবর্গের মহিলা গায়িকারাও তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন। আসলে তদানীন্তন নব্যপ্রবর্তিত নারীশিক্ষার পরিকল্পনায়, কলকাতার এই লোকসংস্কৃতির ও বিশেষ করে মেয়েদের গান ও আচার-অনুষ্ঠানের উচ্ছেদ এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে ছিল। নব্যশিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকের এই উচ্ছেদ-অভিযানের নেপথ্যে ছিল ইংরেজ মিশনারি, সরকারি পরিচালক ও শিক্ষকদের অবিরাম মন্ত্রণা ও পরামর্শ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই এই ইংরেজরা বাংলার লোকসংস্কৃতি ও বিশেষ করে কলকাতার হেটো সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এনে প্রচার-অভিযান শুরু করেন। ১৮০৬ সালে রেভারেন্ড ওয়ার্ড শোভাবাজারের রাজকৃষ্ণ দেবের বাড়ির পূজামণ্ডপে রাস্তা থেকে আগত 'a vast world of natives' অর্থাৎ আপামর জনসাধারণের সঙ্গে বসে হরু ঠাকুর, ভবানন্দ (ভবানী বেনে) ও নিতাই বৈরাগী প্রভৃতি সে-যুগের বিখ্যাত কবিওয়ালাদের গান শুনেছিলেন। গানের ভাষা ও শ্রোতাদের উৎসাহ শুনে ও দেখে ইংরেজ যাজকটি ধর্মভয়ে কাতর হয়ে পড়েন এবং মন্তব্য করেন যে ইংলন্ডে যদি কোনো পল্লীগীতিকার এই জাতীয় গান গাইতে সাহস করে, তাহলে তাকে house of correction বা চরিত্র-সংশোধনের জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় সমন্বিত কারাগারে পাঠিয়ে প্রহার করা হয়।[৩৭] এরও পরে সে-সময়ের কলকাতায় অধিষ্ঠিত ইংরেজ লেখকেরা জনপ্রিয় লোকগাথাগুলির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন এই বলে যে, এগুলি মেয়েদের পক্ষে ক্ষতিকারক। *বিদ্যাসুন্দর* সম্বন্ধে ১৮৫০-এ *Calcutta Review*-এর মন্তব্য— "...essentially and grossly immoral and its perusal by native feamales must be injurious in the extreme."[৩৮]

হিন্দু কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা বাঙালি ভদ্রলোকেরা এর পর থেকে ঠিক একই ভাষায় বলতে শুরু করলেন, এই লোকসংস্কৃতি ভদ্রঘরের মহিলাদের চরিত্র খারাপ করবে। ১৮৬৩-এ *সোমপ্রকাশ*-এর কথকতা-বিষয়ে এক সম্পাদকীয়তে লেখা হল—"কৃষ্ণলীলা বর্ণনাবসরে রাস ও বস্ত্রহরণাদি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অশিক্ষিত যুবতীর চিত্ত অবিচলিত থাকা সম্ভাবিত নয়...যাঁহারা কুলকামিনীদিগকে কথকতার স্থলে গমনে অনুমতি দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সতর্ক হওয়া উচিৎ।"[৩৯] ঐ একই পত্রিকায় বাসরঘরে মেয়েদের রঙ্গতামাশার নিন্দা করে বলা হল—"বাসর ঘরে গান ও শ্লোক পাঠ করিতে হইবে বলিয়া অনেকে বাল্যাবস্থায় অশ্লীল গানাদি শিক্ষা করে। এই সমস্ত কারণেই আমরা অশিক্ষিতাবস্থা স্ত্রীগণের স্বাধীনতালাভ প্রস্তাবের প্রতিপোষক নহি।"[৪০] আরও কিছুকাল পরে আর একজন ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালি, বাসরঘরে, 'সখীসংবাদ' ও 'বিরহ' গানের গাওয়ার সমালোচনা করে লিখলেন—"Frail as women naturally are, the example of such a God (অর্থাৎ কৃষ্ণ) combined with the sanction of religion, has undoubtedly a tendency to impair their virtue..."[৪১]

ঐ একই ভদ্রলোকের পাঁচালি সম্বন্ধে মন্তব্য—"The Panchali (with female characters only) which is given for the amusement of the females...is sometimes much too obscene and immoral to be tolerated in a zenana having any pretension to gentility."[৪২] যাত্রা, নাটক ইত্যাদি মেয়েদের দেখতে নিষেধ করে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* লিখল—"হিন্দুশাস্ত্রকারকগণ স্ত্রীলোকদিগকে যাত্রা উৎসবাদি দর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ফলত যে বিষয়ে কেবল আমোদই লক্ষ্য, কি ধর্ম কি নীতি কি জনসমাজ কোন বিষয়েরই শ্রীবৃদ্ধি নাই, তাহাতে যোগ দিলে তরলমতি স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ অনিষ্ট সম্ভাবনা।"[৪৩]

লোকসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই অপরাধের সঙ্গে সঙ্গে তার অনুশীলনকারিণী মহিলা শিল্পীরাও একে-একে তাঁদের পেশা থেকে উচ্ছেদ হতে থাকেন। ঢপ-কীর্তনের কথাই ধরা যাক। আগেই বলেছি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহিলা কীর্তনীয়ারা ঢপ-কীর্তন নিজেদের প্রায় একচেটিয়া করে ফেলেছিলেন। ঐ শতাব্দীর শেষে কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু হতে থাকে। এক সমসাময়িক ভদ্রলোক পর্যবেক্ষক তাঁর চারিপাশের ঢপ-কীর্তনীয়াদের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—"তাহাদিগের সঙ্গীতশক্তি, স্বরসঞ্চার ও কীর্তন করিবার আর কোন উপযোগিতা থাকুক আর নাই থাকুক, যৌবনের প্রথমে কিছুদিন কোন বৈরাগীর নিকট ঢপের কি কীর্তনের কোন একটা পালা অভ্যাস করিয়া

একটি দল খুলিয়া থাকে...।"[৪৪] ঢপ-কীর্তনীয়ারা যেহেতু নিম্নশ্রেণি থেকে অনেক সময় আসতেন, তাই কলকাতার শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণি তাদের নিয়ে ঠাট্টা করে বলতেন—"যত ছিল নাড়াবুনে সব হলো কীর্তুনে, কাস্তে ভেঙে গড়ালে খোল করতাল।"

নিম্নশ্রেণির মানুষদের কল্পনা ও ভাষাতে, হিন্দু দেবদেবীদেরকে ঘরোয়া মানবিক চরিত্রে রূপান্তরের যে রীতি লোকসংস্কৃতিতে প্রচলিত ছিল—নব্যশিক্ষিত ভদ্রলোকশ্রেণি সেটা মেনে নিতে পারেনি। সমসাময়িক যাত্রার সমালোচনা করে *বঙ্গদর্শন* আক্ষেপ করেছিল—"জেলে, মালা, কুমার, কামার প্রভৃতি অশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে যে কেহ কথায় মিল করিতে পারিল সেই মনে করিল আমি গীত গাইলাম...আধুনিক যাত্রার দোষে কৃষ্ণ রাধাকে গোয়ালা বলিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বে কবির গুণে তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া বোধ হইত।"[৪৫]

তাই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হলেন নিম্নবর্গের মহিলা-শিল্পীরা এবং বৈষ্ণবীদের মতো সমাজের জাতিচ্যুত মানুষেরা। মেয়েদের ঝুমুরের দল ক্রমে ক্রমে লোপ পেল। এ শতাব্দীর শুরুতে—আনুমানিক ১৯০৫ সালে—আমরা জানতে পারি—"সমগ্র বাঙ্গালায় এখন কুড়িটা তর্জা ও ঝুমুরের দল পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। পুলিশের আইনানুসারেও অনেক স্থলে উভয় দলের আখড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।"[৪৬] মেয়েপাঁচালীর দল—যাঁরা মেয়েদের ব্রত-পরব উপলক্ষে গাইতেন—আস্তে আস্তে উঠে গেল। মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন—"...মেয়ে-পাঁচালী বেশীদিন চলিল না। শিক্ষিত লোকেরা নিন্দা করিতে লাগিল ও উঠিয়া গেল।"[৪৭]

শিক্ষিত লোকেরা আরও বেশি নিন্দা রটিয়েছিলেন বৈষ্ণবীদের বিরুদ্ধে। নূতন নারী শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্দরমহল থেকে তাঁরা উচ্ছেদ হয়েছিলেন। এর বাইরে যখন তাঁরা রুজি-রোজগারের চেষ্টা করেন, সে পথও বন্ধ করে দেওয়া হয়। উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে 'নর্ম্যাল স্কুল' নামে কিছু প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় যার উদ্দেশ্য ছিল কিছু বাঙালি মহিলাদের শিক্ষয়িত্রী রূপে তৈরি করে তাদের দ্বারা অন্তঃপুরিকাদের পড়ানো। অনেক বৈষ্ণবী মহিলা এই নর্ম্যাল স্কুলগুলিতে শিক্ষানবিশি করেন। কিন্তু এই নিয়ে তৎকালীন 'ভদ্রলোক' সমাজে প্রবল আপত্তি ওঠে। ১৮৬৬ সালের *সোমপ্রকাশ*-এ একজন চিঠি লিখে জানান—"ঢাকায় একটি নর্মাল বিদ্যালয় হইয়াছে, কিন্তু তথায় প্রায় বৈষ্ণবীর সংখ্যা অধিক। আমরা ইহাদিগের অবমাননা করিতেছি না, কিন্তু বলিতেছি, বৈষ্ণবীদিগের উপরে সর্ব্বসাধারণের ভক্তি অতি অল্প। এ অভক্তির কারণ আছে, এবং লোকে এ শ্রেণীর শিক্ষকের নিকটে যদি কন্যাগণকে না পাঠান, তাহা হইলে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। যাঁহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া গৃহের অলঙ্কার

স্বামীর সুখ ও সন্তানগণের চরিত্রের আদর্শ হইবে, তাহাদিগের শিক্ষকতা ও শ্রেণীর স্ত্রীলোকের কাজ নহে...বৈষ্ণবীদিগের প্রতি চরিত্রঘটিত...আপত্তি আছে...।"[৪৮] এর কিছুকাল পরে, হাওড়া বিভাগের বিদ্যালয় উপ-পদর্শক, মাধব চন্দ্র শর্মা 'বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর কাছে এক বয়ানে, বৈষ্ণবী শিক্ষিকাদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেন যে, এঁরা "not women of good character; and if, after receiving a limited education, they become mistresses, they will prove injurious to society, instead of doing any good to it..."[৪৯]

শুধু বৈষ্ণবী নয়, নীচুতলার অন্যান্য মহিলারা যারা সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় বলে বিবেচিত হতেন—তাঁরা যখন শিক্ষিতশ্রেণি প্রবর্তিত নব্য সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণের চেষ্টা করতেন, তখন প্রবল বাধার সম্মুখীন হতেন। ১৮৩৫ সালের অক্টোবরে কিছু সম্ভ্রান্ত ঘরের নাট্যামোদীদের উদ্যোগে রামতনু বসুর বাড়িতে মঞ্চস্থ 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকে রাধামণি, জয়দুর্গা ও রাজকুমারী (রাজু) নামে তিনটি মহিলা অভিনয় করেছিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষ করে "বেশ্যা অভিনেত্রী-র বিরুদ্ধে তখনকার দিনে খবরের কাগজে তুমুল আন্দোলন হয়েছিল, এবং বেশ কিছুকালের জন্য নাটকের উদ্যোক্তারা মহিলা অভিনেত্রী নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করতে সাহস করেন নি।"[৫০]

এর অনেক পরে ১৮৭৩ সালে মাইকেল মধুসূদনের উৎসাহে যখন পেশাদারি মঞ্চে অভিনেত্রীদের দিয়ে অভিনয়ের প্রথা আবার চালু হয়, তখনও শিক্ষিত বাঙালি সমাজের অনেকেই প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের কর্তারা স্বভাবতই সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদমুখর ছিলেন। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র মন্তব্য—"নাট্যশালায় অসম্মানিত স্ত্রীলোকের অধিকার; ইহা একটা বহুল অনর্থের মূল হইয়া উঠিয়াছে। যে দূষিত বায়ু দূর হইতে পরিহার্য্য তাহাই অতি যত্নে ব্যবহার্য্য হইতেছে।"[৫১] এমনকি মনোমোহন বসু, যিনি সে-যুগের যাত্রা, থিয়েটার, হাফ-আখড়াই, পাঁচালী—সব ধরনের সৃষ্টিকর্মে পারদর্শী ছিলেন, তিনিও এই শ্রেণির মেয়েদের অভিনয় জগতে প্রবেশের ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেননি। ১৮৭৩-এ জাতীয় নাট্যসমাজের সম্বাৎসরিক উৎসবকালে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মনোমোহন বসু বলেন—"ভদ্র যুবকগণ আপনাদের মধ্যে বেশ্যাকে লইয়া আমোদ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে একত্র সাজিয়া রঙ্গভূমিতে রঙ্গ করিবেন, ইহাও কি কর্ণে শুনা যায়? ইহাও কি সহ্য হয়?..."[৫২]

বারাঙ্গনা প্রথার মূল কারণগুলি অপসারণের চেষ্টা না করে, তাদের অস্পৃশ্য বলে সমস্ত সামাজিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রাখার প্রবণতাটা ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালি সমাজের সর্বস্তরেই প্রকট ছিল। অবমাননাকর জীবিকা-ত্যাগের চেষ্টায়

বারবনিতারা এই 'ভদ্রলোক'-এর সাংস্কৃতিক জগতে বা সামাজিক পরিবেশে যখনই প্রবেশের চেষ্টা করেছেন, তখনই ঘোরতর আপত্তি উঠেছে। এমনকি, নব্য শিক্ষাপ্রণালীতে নিজেদের শিক্ষিত করে কিছু বারবনিতা যখন এই 'ভদ্রলোক'দের-ই মার্জিত বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন, তখন সম্ভ্রান্ত সমাজের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁদের এই অনধিকার প্রবেশকে প্রচণ্ডভাবে প্রতিহত করা হয়েছে। ১৮৭৩ সালে নবীনকালী দেবী নামে এক বারাঙ্গনার আত্মজীবনী 'কামিনী-কলঙ্ক' যখন *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকায় সমালোচিত হয়, তখন কেশব সেনের (যিনি সে-যুগের শিক্ষিত সমাজে নারীহিতাকাঙ্ক্ষী বলে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন) *Indian Mirror* পত্রিকা মন্তব্য করে—"Imagine a public woman depicting in her peculiar language the scenes of her early life...the repentance was all a sham for we were told the authoress was still pursuing her ignominous course...[৫৩]

শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' সমাজের বিরোধিতা প্রবল আকার ধারণ করে যখন ১৮৭৫ সালে সে-যুগের এক অভিনেত্রী 'গোলাপ', গোষ্ঠবিহারী দত্ত নামে এক 'ভদ্র-সন্তান'কে বিবাহ করেন। মনোমোহন বসুর *মধ্যস্থ* পত্রিকায় একটি শ্লেষাত্মক গান ছাপা হয়, যেটি গেয়ে নগর-সঙ্কীর্তন করা হত। গানটির নিম্নলিখিত কয়েকটি পদ থেকেই বোঝা যায় ঐ বিবাহ সম্বন্ধে তৎকালীন বাঙালি সম্ভ্রান্ত সমাজের মনোভাব :

> আজ বঙ্গদেশে, কে এক যুবতী এসে, লীলা উদ্দেশে, ভ্রমে সতী বেশে,
> উন্নতি উন্নতি মুখে ঘোষে, রঙ্গভূমে রঙ্গে নাচে হাসে।
>
> ... ...
>
> সতি গো। বারবধু যখন ছিলো গো—শত-পতি-বধূ যবে ছিলে গো।
>
> ... ...
>
> ঐ সেই মধুর গ্রিনরুম (Green Room)—
> যথা পতি-নিধি বিধি মিলিয়ে দিলে।...[৫৪]

দীর্ঘকাল ধরে এই ধরনের কটূক্তি ও অপবাদের সঙ্গে লড়াই করে এই মহিলারা শেষ পর্যন্ত বাংলা রঙ্গমঞ্চে নিজেদের জন্য স্থান অধিকার করে নেন। শুধু তাই নয়, অসাধারণ অধ্যবসায়ের গুণে বিনোদিনী, তিনকড়ি, তারাসুন্দরীর মতো মহিলারা এমন অভিনয়নৈপুণ্যের অধিকারী হয়েছিলেন যে থিয়েটার জগতে তাঁরা চিরস্মরণীয়া হয়ে থাকলেন।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, এঁরা সকলেই এই সম্মানীয় অবস্থায় পৌঁছুতে পেরেছিলেন নিজেদের অতীত সাংস্কৃতিক সত্তাকে খর্ব করে। খোল-নোলচে পালটিয়ে, ঘষে-মেজে

নতুন মানুষে তৈরি হতে বাধ্য হয়েছিলেন, তদানীন্তন শিক্ষিত বাঙালি সমাজের গৃহীত 'সভ্য' 'পরিমার্জিত' আদর্শের চাহিদা অনুযায়ী। ফলে বার্নার্ড শ'র Pygmalion-এর নায়িকার মতো, এক নতুন ভাষা আয়ত্ত করতে হল (শিক্ষিত সমাজের সাহিত্যিক বাংলা); চলনে-বলনে, পোশাকে-আশাকে 'ভদ্রমহিলা' হতে হল, অতীতের বাচন-ভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি ভুলতে শিখতে হল। এইভাবেই এঁরা শিক্ষিত বাঙালির নতুন সংস্কৃতির পরিমণ্ডল—থিয়েটারে প্রবেশলাভ ও স্থান করে নেবার অধিকার পেয়েছিলেন। এটাই ছিল তাঁদের বাঁচার উপায়।

লোকসংস্কৃতির যেসব মহিলা শিল্পীরা, 'ভদ্রলোক'-এর সাংস্কৃতিক আদর্শের সদ্যসূত্রবদ্ধ নিয়মকানুন মেনে নিয়ে তাঁদের সাংস্কৃতিক জগতের নাটমন্দিরে প্রবেশ করলেন না, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে যাঁরা অতীতাশ্রয়ী পাঁচালী, ঝুমুর, কীর্তন প্রভৃতির চর্চা চালিয়ে যেতে চাইলেন, তাঁরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই সরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। আদমসুমারি থেকে জানা যাচ্ছে, ১৮৯১ সালে যেখানে বাংলাদেশে ১৭,০২৩ বিভিন্ন ধরনের মহিলা গায়িকা, নর্তকী, যাত্রা প্রভৃতি দেশী অনুষ্ঠানের অভিনেত্রী ও তাদের সঙ্গত বাদক-বাদিকা ছিল, পরবর্তী দশ বছরে তা কমতে কমতে ১৯০১ সালে মাত্র ৩,৫২৭-এ এসে দাঁড়ায়।

প্রকৃতপক্ষে, নাগরিক লোকসংস্কৃতির বেশ কয়েকটি ধারা ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বিপন্নগ্রস্ত বোধ করছিল। পূর্বে উল্লিখিত 'ভবঘুরে মুচে ডোম কবিওয়ালা'র চিঠি থেকে জানতে পাই—"সম্প্রতি আমারদিগের অন্ন কতকগুলিন বিশিষ্ট সন্তানেরা মারিয়াছেন যেহেতুক ইহারা সকের (সখের) কবির দল করিয়া বিনামূল্যে অন্যের বাটীতে বেতনভুক্ত কবির দল হইতে অধিক পরিশ্রম করিয়া নৃত্যগীতাদি করেন সুতরাং আমারদিগকে লোকেরা আর ডাকে না..."[৫৪ক]

১৮৩১ সালে যখন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগানে শিক্ষিত বাঙালি সমাজের শৌখিন নাট্যামোদীরা ইংরাজি থিয়েটারের অনুপ্রেরণায় 'হিন্দু থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন 'সমাচার দর্পণ'-এ এক ভদ্রলোক পাঠক সন্তোষ প্রকাশ করে লেখেন যে, এবার থেকে 'কালীয়দমন, রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা যাহা রাঢ়দেশীয় ক্ষুদ্রলোকের সন্তানেরা করিয়া থাকে,' তার 'ছোঁড়াগুলো'-কে আর 'পেলা দিতে হৈবেক না।'[৫৪খ]

পুরোনো পৃষ্ঠপোষকদের আনুকূল্য থেকে ক্রমশই বঞ্চিত হতে হতে এবং নব্যশিক্ষিত ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের পরিবর্তিত রুচির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে অপরাগ হয়ে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে লোকসংস্কৃতির অনুশীলনকারীরা কলকাতা থেকে আস্তে আস্তে স্থানচ্যুত হন। ১৮৭৪ সালের এক বিবরণী থেকে আমরা খবর পাচ্ছি—

"এক্ষণে সামান্য লোকের আমোদ আহ্লাদ ও উৎসব তো সকলি একে একে শেষ হইতেছে। এক্ষণে যাত্রা নেই, পাঁচালী নাই, কবির তো কথাই নাই। সামান্য লোকেরা কি লইয়া থাকিবেক? কেবল ধান্যেশ্বরী (অর্থাৎ চোলাই মদ), আর ছোবড়া টেনে কি দিনপাত হয়? সামান্য লোকের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে এ সভ্যতা দেখান কেন?..."[৫৪গ]

এই 'সভ্যতা'র প্রসার, লোকসংস্কৃতির মহিলা শিল্পীদের আঘাত করেছিল বিশেষ ভাবে। এই শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকের এক বিরাট অংশ—সম্ভ্রান্ত ঘরের অন্দরমহলের মহিলারা—ইতিমধ্যে পালটাতে শুরু করেছেন। আধুনিক ধাঁচের নারীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সাংস্কৃতিক রুচির পরিবর্তন ঘটছিল, নব্যশিক্ষিত স্বামীদের প্রয়োজন অনুযায়ী আদর্শ গৃহিণী রূপে তাঁরা বিবর্তিত হচ্ছিলেন। জীবনযাপনের এই নতুন প্রণালীতে পাঁচালী, রাধাকৃষ্ণের কীর্তন, ঝুমুরের গানের স্থান ছিল না। ১৮৯০ সালে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* একটি প্রবন্ধে শিক্ষিত বাঙালি যুবকের নতুন চাহিদাগুলি কী, তার একটা তালিকা দিয়েছিল—"নব্যসম্প্রদায় চায় যে স্ত্রীটি বাঙ্গালা বেশ জানে, ইংরেজীতে কথাবার্তা কহিতে পারে, সেলি-বায়রন পড়িতে পারিলে তো সোনায় সোহাগা। পিয়ানো বাজাইতে জানে, চিত্রবিদ্যায় নিপুণতা থাকে এবং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করিতে পারে। স্ত্রীতে এইসব গুণ থাকিলে তবে তাহাদের মন উঠে এবং হৃদয়ের আকাঙ্খার তৃপ্তি হয়।"[৫৫]

স্বভাবতই এই নব্য বঙ্গ মহিলাদের কানে, পাঁচালি গায়িকাদের দিলখোলসা কণ্ঠস্বর, ঝুমুরওয়ালিদের অনাবৃত রসিকতা, ঢপ-কীর্তনীয়ার অনাড়ম্বর 'বিরহ'সঙ্গীত, অস্বস্তিকর পীড়াদায়ক ছিল; 'ভদ্রমহিলা' হবার পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৮৩ সালে এইসব অন্তঃপুরিকাদের পরিবর্তিত রুচির প্রশংসা করতে গিয়ে একজন ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালি লিখেছিলেন :

"...it is pleasing to reflect that the progress of enlightenment has...wrought a salutary change in their minds. Instead of the former kobis (songs), which were shamefully characterized by the worst species of obscenity and immorality, they have imbibed a taste for more sober and refined entertainments..."[৫৬]

নাগরিক লোকসাহিত্যকে কলকাতা থেকে বিদায় নিতে হল। একজন আধুনিক সমালোচকের ভাষায়—"গ্যাসের আলোকের নাগরিক পরিবেশ ত্যাগ করে কবিগান, তর্জা ও পাঁচালীর লড়াই পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ঝিল্লি-ঝঙ্কৃত ও স্বল্পালোকিত গ্রাম্য আসরে অবতীর্ণ হল।"[৫৭] এর পরবর্তী ইতিহাস বর্তমান প্রবন্ধের এক্তিয়ারের বাইরে।

'ভদ্রমহিলাদের' আবির্ভাব

কলকাতার মহিলা সংস্কৃতিতে এবার যাঁরা আবির্ভূতা হলেন, তাঁদের লেখার বিষয়ও আলাদা, রচনাশৈলীও আলাদা। ইংরেজি ধাঁচের শিক্ষাপ্রণালীর সন্তান এঁরা। প্রায় সবাই-ই সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের কন্যা বা বধূ। অল্পবয়সে হয় পিতা, বা বিবাহের পর স্বামীর কাছে ইংরাজি সাহিত্যে শিক্ষালাভ হয়। ঠাকুরবাড়ির স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), পাবনার জমিদার বংশের কন্যা প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৭-১৯৩৯), কলকাতার বিখ্যাত কোটিপতি অক্রুর দত্তের বংশের পুত্রবধূ গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪), মাইকেল মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) বেথুন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)। এঁরাই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের বাংলা মহিলা সাহিত্যে যশস্বিনী হয়েছিলেন।

এঁদের সাহিত্যকর্মে তদানীন্তন নারীশিক্ষার প্রভাব ও নতুন ধাঁচের 'ভদ্রমহিলা'র model-এর গুণাবলী স্পষ্ট। শিক্ষার আলোকে যে নতুন ভদ্রমহিলা তৈরি হবেন, তার নকশা শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকরা বহু আগেই বেঁধে দিয়েছিলেন। ১৮৫৬ সালে এক 'ইয়ং বেঙ্গল' প্রগতিশীল বাঙালি কৈলাশচন্দ্র বসু কলকাতার 'মেডিকাল কলেজ'-এর থিয়েটার হলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"Woman has but one resource—Home. The end and aim of her life is to cultivate the demestic affections, to minister to the comfort and happiness of her husband, to look after and tend her children, and exercise her little supervision over domestic economics...তারপর, বাঙালি মহিলাদের এই উদ্দেশ্যে কীভাবে শিক্ষিত করে তোলা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেন—"She must be refined, reorganized, recast, regenerated..."[৫৮]

এর প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে, এই শিক্ষাপ্রণালীতে 'পরিমার্জিত, নতুন ছাঁচে পুনর্নির্মিত এবং নবজন্ম' লাভ করে বাঙালি শিক্ষিত মহিলা সমাজের এক প্রতিনিধি লিখলেন—"পতি রাগান্ধ হইয়া কটু কাটব্য বলিলে অথবা মর্মান্তিক রুক্ষ ও কর্কশ ব্যবহার করিলে, নীরবে সহ্য করাই মঙ্গল ও পত্নীর কর্ত্তব্য। পতির নিকট অবাধ্যতা প্রকাশ করা যারপরনাই গর্হিত কর্ম্ম। প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও পতির নিকট দোষ অন্যকে বলা উচিত নহে...তিনি বিপথগামী হইলে অভিমানী না হইয়া তাঁহাকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করা তাঁহার অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা এবং কোন প্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিলে শত কার্য্য ত্যাগেও তাহা করা কর্তব্য..."[৫৯]

শিক্ষিতা মহিলা সাহিত্যিকদের কাব্যে ও অন্যান্য সাহিত্যকর্মে এই মূল্যবোধগুলিই প্রকাশিত হয়েছিল। লোকসাহিত্যের রাধাকৃষ্ণের অবৈধ প্রণয় বা স্বাধীনা স্ত্রীর স্বচ্ছন্দচারিতার পরিবর্তে স্বামী ও সন্তানপালনের দায়িত্বের প্রতি আজীবন আনুগত্যই এঁদের রচনার মূল সুর হয়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, এঁদের পাঠ্যতালিকায় সে-সময় একটি বিশেষ বই প্রায় অবশ্যপাঠ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল—অষ্টাদশ শতাব্দীর এক ফরাসি প্রেমের কাহিনি—Bernardin de St. Pierre-এর *Paul and Virginia*। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী তাঁর বাবার কাছ থেকে এটির ইংরেজি অনুবাদ আদ্যোপান্ত পাঠ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি* থেকে জানতে পারি যে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে, *অবোধবন্ধু* পত্রিকাতে প্রকাশিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য-কৃত এর বাংলা অনুবাদ 'পৌল ও বর্জিনী', বিশেষ স্থান জুড়ে ছিল। কাহিনিটি গরিব Paul, ও এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা Virginia-র স্বর্গীয় প্রেমের বিষয় নিয়ে। গল্পের শেষে, Virginia-র জাহাজ ঝড়ে ডুবে যায়। এক নাবিক তাকে বাঁচাতে যায়, কিন্তু যেহেতু নাবিকের গায়ে কোনো বস্ত্র ছিল না, তাই মার্জিত রুচিসম্পন্না Virginia শালীনতাবোধ থেকে এ সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে জলে ডুবে প্রাণত্যাগ করে।[৬০]

এই জাতীয় পাঠ্যপুস্তকে লালিত হয়ে যে ভদ্রমহিলারা গড়ে উঠেছিলেন, খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের সাহিত্যে নারী-চরিত্রগুলি প্রায় অশরীরিণী হয়ে দেখা দিয়েছিল। লোকসাহিত্যের সেই ধিঙ্গি বেহায়া কালীর তাণ্ডবের বদলে এসেছে নারী হৃদয়ের শান্ত মিহি অনুরণন। আবেগের বর্ণনাতে পারিপার্শ্বিক নোংরা বাস্তব থেকে সদাই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা। যদিও কিছু কিছু কবিতাতে সামাজিক সমস্যার হদিশ পাওয়া যায়—বালবিধবার দুঃখ, কুলীন কন্যার বিলাপ—অধিকাংশ কাব্যই ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ অবলম্বন করে, ইংরেজি 'রোম্যান্টিক' সাহিত্য থেকে অনেক সময় ভাব আহরণ করে।

স্বামীর মৃত্যুতে শোক (গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'অশ্রুকণা') সন্তানের প্রতি স্নেহ (প্রসন্নময়ী দেবীর 'হাস') বা নিসর্গদৃশ্যের বর্ণনা—ইত্যাদিতে ব্যবহৃত ভাষার পরিবর্তনটাও লক্ষণীয়। লোকসাহিত্যের সেই মেয়েলি বাচনভঙ্গির অকপট সারল্য, বল্‌গাহীন চাপল্যের পরিবর্তে এসেছে সংস্কৃতঘেঁষা মার্জিত বাংলা শব্দের প্রয়োগ।

ঝুমুর গায়িকার বর্ণিত কালীর সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর কালীর নিম্নলিখিত বর্ণনার তুলনা করলেই মেজাজ ও প্রকাশভঙ্গির তফাতটা পরিষ্কার হয়ে যায় :

> ...করাল মুরতি,
> সিঁদুরে কপাল ঢেকেছে তাঁর
> চন্দনচর্চ্চিত ভীষণ কৃপাণ
> গলায় দুলিছে জবার হার...[৬১]

বা, ভবানীর ঠাট্টা-তামাশাপূর্ণ শিবের বর্ণনার সঙ্গে মানকুমারী বসুর এই শিবস্তুতির পঙ্‌ক্তিটির তুলনা করা যেতে পারে :

এমন আপনা ভোলা
এমন পরাণ খোলা
এমন রজতগিরি—শ্বেত শতদল
পবিত্র শঙ্কর কোথা দেখিনি কেবল।[৬২]

লোকসাহিত্যে, রাধাকৃষ্ণের কাহিনির ঐতিহ্য আশ্রয় করে নায়িকার অভিমান প্রকাশের যে প্রচলিত রীতি, তাকে উপলক্ষ করে স্বামী বা প্রেমাস্পদকে দুটো কটু কথা শুনিয়ে দেওয়া যেত। শিক্ষিতা মহিলাদের কাব্যে এ রীতি বর্জিত হল; স্বামীর কাছে স্ত্রীর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের আদর্শ তুলে ধরা হল। কামিনী রায়ের 'নিরুপায়' কবিতা থেকে এই অংশটি একটা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন :

প্রিয়তম, কহ তুমি যাহা ইচ্ছা তব,
যত রুক্ষ তীক্ষ্ণ বাণী আছে গো ভাষায়
সব আনি হান প্রাণে, আমি সয়ে রব
সিক্ত চোখে মৌন মুখে, আমি নিরুপায়।
তুমি পতি, তুমি প্রভু; মন, মান মম
সকলি তোমার হাতে...[৬৩]

আর একটা বিষয়ও লক্ষণীয়। এইসব মহিলাদের সাহিত্যকর্মে হাস্যরস প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অবশ্য, স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রহসনগুলিতে নারী-চরিত্রের মুখে কখনো-কখনো মেয়েলি রসিকতা শুনতে পাওয়া যায় এবং মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের (জাতীয় কংগ্রেসের নেতা ডব্লিউ. সি. বনার্জির বোন) ব্যঙ্গ কবিতা 'বাঙালীর বাবু'-তে চাকুরিজীবী ভদ্রলোকদের নিয়ে ঠাট্টা করা হয়েছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতা মহিলা সাহিত্যিকদের রচনার ব্যাপক জগৎ থেকে শুনতে পাওয়া যায়, হয় হা-হুতাশ ও বিলাপধ্বনি, নয়তো স্বামীপুত্রকন্যা নিয়ে সংসারপালনের গুণগানের মৃদু সুর। রঙ্গ-রসিকতা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, চিৎকার-অট্টহাসি এ জগতে থেমে গেছে।

নব্যশিক্ষিতা এই ভদ্রমহিলাদের আচার-আচরণ লক্ষ করে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন—"প্রাচীনার অপেক্ষা নবীনার রুচি কিছু ভাল"; কিন্তু অতীতের সেই হারিয়ে যাওয়া 'প্রাঙ্গণবিহারিণী রসবতীদের' একটু অনুরাগের সঙ্গে স্মরণ করেই বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে বঙ্গ মহিলাদের "কলকণ্ঠধ্বনি পাপিয়ার মত গগনপ্লাবী না হইয়া মার্জ্জারের মত অস্ফুট হইয়াছে।"[৬৪]

টীকা

১. রমণীমোহন মল্লিক, পৃ. ১২।

২. স্বর্ণকুমারী দেবী, 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার', *প্রদীপ*, ভাদ্র ১৩৫৬; —ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*, ২৮, পৃ. ৭ (কলকাতা, ১৩৫৫)-এ উদ্ধৃত।

৩. দ্রষ্টব্য—পঞ্চানন মণ্ডল, পৃ. ৮৯, ৩২৬। ১৮৭২-এর বাংলার আদমসুমারির বিবরণীতে জানা যায় যে বৈষ্ণব সমাজ "Open their arms to those who are rejected by all others—the outcasts, the crippled, the diseased and the unfortunate". (*Census Report of Bengal*. 1872. Part I: p. 190).

৪. স্বর্ণকুমারী দেবী, 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার' দ্র.।

৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড পৃ. ১৪৪।

৬. সুশীলকুমার দে, পৃ. ২৬।

৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীনা ও নবীনা, *দ্র.* ১৮৭৯।

৮. দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, পৃ. ৫৩।

৯. দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ১৮৬।

১০. হরিপদ চক্রবর্তী, পৃ. ১৩-১৫।

১১. প্রফুল্লচন্দ্র পাল, পৃ. ৩৬।

১২. *বিশ্বকোষ*, তৃতীয় খণ্ড, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।

১৩. দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ৩৩২।

১৪. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৯২-৯৩।

১৫. *বিশ্বকোষ*, চতুর্থ ভাগ, ১৩০০ বঙ্গাব্দ।

১৬. দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ৩৫২।

১৭. *বিশ্বকোষ*, তৃতীয় খণ্ড, ১২৯৯।

১৮. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১১৭-১৮।

১৯. দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ১০৪১।

২০. ঐ।

২১. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ২৯-৩০।

২২. কলকাতার প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট ও কলকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি—ড. (মিসেস) ঊষা চক্রবর্তী—'Condition of Bengali Women Around the second half of the 19th Century'. Calcutta, 1963, p.16.

২৩. মেঘনাদ গুপ্ত, পৃ. ১০।
২৪. ঐ, ৪১।
২৫. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ২৯।
২৬. *বিশ্বকোষ*, চতুর্থ ভাগ; ১৩০০।
২৭. Mikhail Bakhtin, pp. 20-27.
২৮. প্রফুল্লচন্দ্র পাল, পৃ. ৮০।
২৯. দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ১০৪১।
৩০. *সোমপ্রকাশ*, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৭০; পৃ. ৪৭।
৩১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড; পৃ. ২৫৭।
৩২. বিনয় ঘোষ, চতুর্থ খণ্ড; পৃ. ১০৬।
৩৪. ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪৪।
৩৫. ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৮৫।
৩৬. দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ১০৪১।
৩৭. দ্রষ্টব্য—Shib Chunder Bose, pp. 118-19.
৩৮. *Calcutta Review*, No. XXV; Vol. XIII; 1850 pp. 257-283.
৩৯. বিনয় ঘোষ, চতুর্থ খণ্ড; পৃ. ৭০১-২।
৪০. *সোমপ্রকাশ*, নভেম্বর ৩০, ১৮৬৩; পৃ. ৩৮।
৪১. Shib Chunder Bose, p. 66.
৪২. ঐ, p. 19.
৪৩. বিনয় ঘোষ, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৮৪।
৪৪. *বিশ্বকোষ*; চতুর্থ ভাগ, ১৩০০।
৪৫. 'যাত্রা'; *বঙ্গদর্শন*; কার্তিক, ১২৮০।
৪৬. দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ১০৪১।
৪৭. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ২৯।
৪৮. বিনয় ঘোষ, চতুর্থ খণ্ড।
৪৯. Bela Dutta Gupta (ed.) দ্র.।
৫০. Alok Ray, pp. 190-196.
৫১. বিনয় ঘোষ, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৮৪।
৫২. *মধ্যস্থ*, পৌষ ১২৮০, পৃ. ৬২১-২৩।
৫৩. উদ্ধৃত—*Hindoo Patriot*, October 13, 1873.
৫৪. দ্রষ্টব্য—মনোমোহন গীতাবলী, পৃ. ২৪১।
৫৪ক *সমাচার চন্দ্রিকা*-য় প্রকাশিত চিঠি; ১৮২৮-এর ২২ নভেম্বরের *সমাচার দর্পণ*-এ উদ্ধৃত।

৫৪খ. *সমাচার দর্পণ,* ১৫ই পৌষ ১২৩৮, (উদ্ধৃত—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৪৯)।

৫৪গ. *বসন্তক,* দ্বিতীয় পর্ব, দশম সংখ্যা, ১৮৭৫, পৃ. ২৫-২৬।

৫৫. বিনয় ঘোষ, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬৩।

৫৬. Shib Chunder Bose, p. 309.

৫৭. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা—দিনেশচন্দ্র সিংহ, পৃ. ২।

৫৮. দ্রষ্টব্য : Alok Roy, pp.200 & 214. কৈলাশচন্দ্র বসু ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং ডিরোজিয়ো-র ছাত্রদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত Society for the Acquisition of General Knowledge-এর সক্রিয় সদস্য। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য—Gautam Chattopadhyay (ed.).

৫৯. হেমাঙ্গিনী চৌধুরী, 'স্ত্রীলোকদিগের কর্তব্য', অন্তঃপুর মাসিক পত্রিকা, মে ১৮৯৯।

৬০. দ্রষ্টব্য : William S. Walsh (ed.), p. 374.

৬১. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃ. ৪৭-৪৮।

৬২. ঐ, পৃ. ১৪৬।

৬৩. ঐ, পৃ. ১০৩।

৬৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'প্রাচীনা ও নবীনা' *(বিবিধ প্রবন্ধ)*; কলিকাতা, ১৮৭৯।

জনৈকা 'ব্যভিচারিণী' প্রসঙ্গে

উনিশ শতকের সত্তরের দশকে একটি মহিলার মামলা উপলক্ষে বাঙালি শিক্ষিত সমাজে একটা ছোটোখাটো আলোড়ন ওঠে। মামলায়, কলকাতার প্রধান বিচারালয় যে রায় দেয় তা মামলার তাৎক্ষণিক প্রসঙ্গের এক্তিয়ার ছাড়িয়ে আরও বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছিল। শুনানির বিবরণী ও জনসভা ও পত্রপত্রিকার মন্তব্যের অনুষঙ্গে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। প্রথমত, (দেশীয়) ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধর্মীয় আইন-কানুন ও আচার-অনুষ্ঠানে, (ঔপনিবেশিক) রাষ্ট্র-ব্যবস্থার হস্তক্ষেপ কি উচিত, না অনুচিত? আর, এরই অনুগামী আর একটি প্রশ্ন—ধর্মীয় সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায়, (রাষ্ট্র-পৃষ্ঠপোষিত সংস্কারের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে) রাষ্ট্র-বিরোধী জনবিক্ষোভ পরিচালনা কি যুক্তিসঙ্গত? আর এইসব প্রশ্নের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল আরও একটি গভীর আশঙ্কা—ধর্মীয়-সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার সংস্কারের ফলে মেয়েরা কি 'ব্যভিচারিণী' হয়ে যাবে?

হঠাৎ এতকাল পরে আমাদের এই আধুনিক ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই প্রশ্নগুলিই আবার প্রাসঙ্গিক হয়ে দেখা দিয়েছে। মৌলবাদী হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও অন্যান্য ধর্মীয় নেতৃত্ব, এবং জাত ও ভাষা-ভিত্তিক আঞ্চলিক দলপতিরা ব্যক্তিগত বা শ্রেণিস্বার্থে রাষ্ট্র-বিরোধী আন্দোলনে নিজ নিজ সম্প্রদায়কে শামিল করছেন—

তাদের নিজস্ব অতীতাশ্রয়ী সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান (তা যতই অমানবিক হোক)-এর ধর্মীয় অলঙ্ঘনীয়তার দাবিতে। রাজস্থানে সতীদাহের পুনরুজ্জীবন, বা বাল্যবিবাহের অবিরাম অনুবৃত্তি (আইনকে লঙ্ঘন করে) যেমন হিন্দু মৌলবাদের রাষ্ট্র-বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সোচ্চার ঘোষণা, ঠিক তেমনই মুসলমান মৌলবাদীরা 'শাহ্ বানু' মামলাকে কেন্দ্র করে, তাঁদের সমাজের নারীদের অধিকার খর্ব করার উদ্দেশ্যে, ধর্ম-ভিত্তিক আন্দোলনের ভয় দেখিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করেছেন। বা, কেরালাতে, মৌলবাদী খ্রিস্টীয় নেতারা যেমন এখন চেষ্টা করছেন তাঁদের সম্প্রদায়ের মেয়েদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে—অতীতের ধর্মীয় আইনের নাম করে।[১]

লক্ষণীয়, উনিশ শতকে যেসব বিতর্কিত বিষয় নিয়ে বাঙালি সামাজিক নেতৃত্ব (এবং ঐ শতকের শেষে, ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব) তৎকালীন ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচার অভিযানে নেমেছিলেন, তার একটা বিরাট অংশ ছিল স্ত্রী-অধিকার সংক্রান্ত। ঐ শতকের শুরুতে, সতীদাহ প্রথা একটা দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ও তার বশংবদ বাঙালি মুৎসুদ্দি বানিয়া গোষ্ঠীর মধ্যে। পরবর্তী পর্যায়ে বিধবা বিবাহের আইন এবং বহুবিবাহ প্রথা বন্ধ করার প্রচেষ্টা—এই উভয়ই রক্ষণশীল বাঙালি সমাজপতিদের হাতে, তৎকালীন শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার একটা সুযোগ এনে দেয়। এরও পরে, ১৮৯০-৯১ সালে, সহবাস সম্মতি আইন (বা Age of Consent Bill, যা মূলত বাল্যবিবাহ বন্ধ করার প্রয়াসে বিধিবদ্ধ হয়েছিল) কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্রে তিলক ও বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে ধর্মভিত্তিক বিক্ষোভ গড়ে তুলতে সক্ষম হন। দেখা যাচ্ছে, নারীজাতির উপর পুরুষপ্রধান সমাজের কর্তৃত্ব বজায় রাখা, জাতীয় স্বাধিকারের একটা প্রতীক হয়ে দাঁড়াচ্ছিল উনিশ শতকের বাঙালি মানসিকতায়। স্ত্রী-শিক্ষার ফলে মেয়েদের স্বাধীনভাবে ঘোরা-ফেরা, বিধবাদের বিবাহের অধিকার, বাল্যবিবাহ ও কুলীন প্রথা থেকে মেয়েদের পরিত্রাণ—এ-সবই বিজাতীয় ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও আইন-প্রসূত বলে ধিকৃত হয়েছিল। উনিশ শতকের শেষ তিন দশকে (১৮৭০-৯০), এ সবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ ক্রমশই ইংরেজ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ নিচ্ছিল। নব্য-উন্মেষিত জাতীয়তাবাদের বেদীতে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রথম বলি হয়েছিল বলে মনে হয়।

মণিরাম কলিতা বনাম কেরি কলিতানি

যে মহিলার মামলার প্রসঙ্গ দিয়ে এ প্রবন্ধের সূত্রপাত, তাতে ফিরে যাওয়া যাক এবার। আসামের শিবসাগর অঞ্চলে, কেরি কলিতানি নামে এক বিধবা তাঁর স্বামী,

গেণ্ডেলার সম্পত্তি, উত্তরাধিকার সূত্রে পান। গেণ্ডেলার এক দূর সম্পর্কের ভাই, মণিরাম কলিতা, কেরির বিরুদ্ধে মামলা ঋজু করে অভিযোগ করে যে কেরি ব্যভিচারিণী, সুতরাং তাঁর স্বামীর সম্পত্তিতে তাঁর আর অধিকার নেই, এবং সে সম্পত্তির আসল দাবিদার মণিরাম স্বয়ং। কলকাতা প্রধান বিচারালয়ে, ১৮৭৩-এর এপ্রিল মাসে মামলাটি ওঠে। প্রধান বিচারপতি Richard Couch সহ আরও সাতজন বিচারক (যাঁরা সবাই-ই ইংরেজ) রায় দেন যে হিন্দু আইন মতে, কোনো বিধবা একবার যদি তাঁর স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী হন, তাঁকে তার থেকে অধিকারচ্যুত করা যাবে না কখনোই—ব্যভিচারের অভিযোগ সত্ত্বেও। বিচারকমণ্ডলীর বাকি তিনজন (যাঁদের মধ্যে একমাত্র বাঙালি ছিলেন দ্বারকানাথ মিত্র) এই রায়ের বিরোধিতা করেন।

'অসতী মোকদ্দমা' নামে বিজ্ঞাপিত এই মামলার শুনানির সময় হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মতামত চাওয়া হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও ডাকা হয়েছিল, কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতাহেতু আসতে পারেননি। যাঁরা এসেছিলেন (সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক—মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ভারতচন্দ্র শিরোমণি ও পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি) তাঁরা সকলেই একবাক্যে সায় দেন যে হিন্দু শাস্ত্রমতে স্বামীর সম্পত্তিতে 'অসতী' বিধবার কোনো অধিকার নেই।[২]

এই সূত্রে, আদালতের অভ্যন্তরে এবং বাইরেও (জনসভা ও পত্রপত্রিকায়), হিন্দু শাস্ত্রীয় বিধি-নির্দেশের তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা নিয়ে দীর্ঘ তর্ক-বিতর্ক হয়। এই সব আলোচনা থেকে, তদানীন্তন বাঙালি সমাজের হিন্দু নেতৃত্ব, ও ইংরেজ বিচারব্যবস্থা—উভয়ের, সে-যুগের নারী অধিকারের প্রশ্নে—তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থান্বেষী উদ্দেশ্যের একটা স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'অসতী মোকদ্দমা' আসলে দুই ভিন্ন রাজনীতির কুস্তির আখড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাজি ধরা হয়েছিল, এক বিধবার সম্পত্তিতে অধিকার।

লক্ষণীয়, ইংরেজ বিচারকগোষ্ঠীও দ্বিধা-বিভক্ত ছিল। দু'জন ইংরেজ বিচারক—Kemp ও Glover বাঙালি দ্বারকানাথ মিত্রের সঙ্গে একযোগে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকদের রায়ের থেকে স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করেন। ইংরেজ বিচারকদের মধ্যে এই মতান্তরের সূত্র সেই ঔপনিবেশিক আমলের শুরুতে, যখন তৎকালীন ইংরেজ শাসকদের মধ্যে তর্ক বেধেছিল, এদেশের ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধর্মীয় আচার-ব্যবহারে 'কোম্পানি'র শাসনব্যবস্থা কতটা হস্তক্ষেপ করবে, এই প্রশ্নে। ১৭৯৩-এ 'কোম্পানি'র প্রশাসন এক নিয়ম বিধিবদ্ধ করে (Regulation IV, Section 15) যাতে ইংরেজ বিচারকদের নির্দেশ দেওয়া হয় যেন হিন্দু ও মুসলমান 'আইন' অনুযায়ী তাঁরা ঐ সকল সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মামলা—উত্তরাধিকার, সম্পত্তি-প্রাপ্তি, বিবাহ, জাতি এবং সমস্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত নিষ্পত্তি করেন। এই Regulation-এর আওতাতেই, ১৮৭৩-এর এপ্রিলে

কলকাতা হাইকোর্ট-এর বিচারকগোষ্ঠীকে কেরি কলিতানির মামলায় রায় দিতে হয়েছিল। বিবাদের বিষয় ছিল উত্তরাধিকার ও সম্পত্তি-প্রাপ্তির প্রশ্ন, এবং যেহেতু হিন্দু 'আইন' মোতাবেক-এর নিষ্পত্তি প্রয়োজনীয় ছিল, এ ব্যাপারে হিন্দু 'আইন' কী তার অনুসন্ধান জরুরি হয়ে দেখা গেল। ইংরেজ বিচারক ও বাঙালি হিন্দু পণ্ডিতদের খুঁজে বার করতে হলো অতীতের শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি—জীমূতবাহন, কাত্যায়ণ, মিত্রমিশ্র প্রভৃতি, স্মার্ত পণ্ডিতদের টীকা-টিপ্পনী, এবং তার চুলচেরা ব্যাখ্যায়।

এই ব্যাখ্যা নিয়ে তখনকার দুই দল প্রতিদ্বন্দ্বীর বাদানুবাদ আজকে হয়তো অবান্তর মনে হতে পারে। কিন্তু, এর পিছনে একটা অকথিত উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন ছিল। হিন্দুশাস্ত্রে, মহিলাদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের কঠোর নিয়মাবলি (যার সমর্থক ছিলেন বাঙালি হিন্দু সমাজের মাতব্বরেরা)—এর ফাঁক দিয়ে কীভাবে, ইংরেজ বিচারকদের অনুগ্রহে, বিধবা বা দুঃস্থ মহিলা মক্কেলদের অনুকূলে কিছু সুবিধা আদায় করে নেওয়া যেতে পারে—এ ওকালতি-কৌশলে সে-যুগে অনেক বাঙালি উকিলই পারদর্শী ছিলেন। যেহেতু বিধবাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে স্বামীর আত্মীয়-স্বজন প্রায়ই মামলা ঠুকে দিত নানা অজুহাতে, এবং যেসব বিধবাদের মোকদ্দমা লড়াই-এর সামর্থ্য ছিল, তাঁরা আইনজীবীদের শরণাপন্ন হতেন, এবং যেহেতু এইসব মামলা 'হিন্দু আইন' মতে বিচার্য ছিল, এইসব বাঙালি উকিলেরা হিন্দু স্মার্ত নিয়মাবলির মধ্যে, পালাবার ছিদ্র আবিষ্কারে কুশলী হয়ে উঠেছিলেন।

মনে হয়, নিছক পেশাদারি ওকালতি দক্ষতার গুণেই (স্ত্রী-স্বাধীনতার সমর্থনে কোনো আদর্শবাদী অবস্থান থেকে নয়)—এবং তদানীন্তন কিছু ইংরেজ বিচারকদের (ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে civilize বা 'সভ্যতার' স্তরে উন্নত করার) উৎসাহ-র আওতাতেই—এই বাঙালি আইনজীবীরা বিধবাদের সম্পত্তি অধিকারের প্রশ্নে কিছু আইন-সম্মত সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

হিন্দু সমাজে ধিকৃতা 'ব্যভিচারিণী' কেরি কলিতানির কপাল ফিরে যায় এই দুই-এর যোগাযোগে—একদিকে বাঙালি ওকালতি বুদ্ধি ও অন্যদিকে ঔপনিবেশিক বিচারপতির এদেশের হিন্দু নারী সমাজের উন্নতিসাধনের কর্তব্য (সেই 'White Man's Burden'-এর দায়-দায়িত্ব)।

বাঙালি পণ্ডিত ও বাঙালি উকিল

কেরি কলিতানির মামলায় বাঙালি পণ্ডিতসমাজের মূল বক্তব্য ছিল যে স্বামীর মৃত্যুর পর তার সম্পত্তিতে অধিকার একমাত্র সাধ্বী স্ত্রীর, অসতীর নয়। এর সমর্থনে তারা জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ', কাত্যায়ণ ও অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র উদ্ধৃত করেন।[৩]

কেরির পক্ষে উকিল ছিলেন মোহিনীমোহন রায়। তাঁর যুক্তি ছিল—জীমূতবাহন ও অন্যান্যরা যদিও বিধবার উপর স্বামীর প্রতি আজীবন ভক্তিপ্রদর্শনের অনুজ্ঞা আরোপ করেছেন, তাঁদের কোনো উক্তিতেই এমন কোনো সূত্র পাওয়া যায় না যে সে অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করলে বিধবার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে।

আসলে সত্যিই, হাজার খোঁজাখুঁজি করেও পণ্ডিতরা এমন কোনো শাস্ত্রীয় বিধান বার করতে পারলেন না যাতে করে 'ব্যভিচারিণী' বিধবাকে হিন্দুশাস্ত্র মতে তার স্বামীর সম্পত্তির দখল থেকে বঞ্চিত করা যায়। জীমূতবাহন, কাত্যায়ণ প্রভৃতি বিধানদাতারা ব্যভিচারিণী বিধবার বিরুদ্ধে নানা গালি-গালাজ করেছেন—এবং অভিশাপও দিয়েছেন। কিন্তু স্থূল, বৈষয়িক স্তরে, তাঁরা এমন কোনো শাস্তি সুপারিশ করেননি, যার দ্বারা ঐ বিধবাকে তার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি থেকে বিযুক্ত করা যায়।

জীমূতবাহনের একটি বচনের এক কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা করে কিছু পণ্ডিত অবশ্য নিজেদের মত প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। বচনটি বিধবাদের দৈনিক জীবনযাপনের রীতি-নীতি বেঁধে দিয়েছে—

"উপভোগোঽপি ন সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধানাদিনা কিন্তু স্বশরীর ধারণে পত্যুরুপকারকত্বাৎ দেহাধারণোপচিতোপ ভোগ্যভানুজ্ঞানং এবঞ্চ ভর্তুরৌর্দ্ধদেহিকক্রিয়াদ্যর্থ্যাং দানাদিকমপ্যনুমতং অতএব নাপহরেৎ স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুরি তাপহারবচনং অপহারশ্চ ধনস্বামানুপযোগে ভবতি।"

অর্থাৎ—'(স্বামীর সম্পত্তি) উপভোগ যে (বিধবা) করবে, তার পক্ষে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান, ইত্যাদি, নিষিদ্ধ। কিন্তু কেবল নিজের শরীর ধারণে (অর্থাৎ বিধবারূপে বেঁচে থেকে) শ্রাদ্ধ-তর্পণ ইত্যাদি করে পতির উপকার করা যায় বলে, একমাত্র দেহধারণাযোগ্য ভোগ-ই (বিধবার পক্ষে) শাস্ত্রানুমত। স্বামীর শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ক্রিয়ার জন্য (বিধবা কর্তৃক) দান-ও শাস্ত্রানুমত। অতএব, স্ত্রীলোকেরা অপহার করবে না। যে ব্যয় ধনস্বামী (মৃত পতি)-র কোন উপকারে লাগবে না, তা-ই অপহার।'[৪]

এর সাদামাঠা অর্থ—বিধবারা বেঁচে থাকতে পারে একমাত্র তাদের মৃত স্বামীর ঔর্ধ্বদেহিক কাজকর্মের প্রয়োজনে। এবং এ বেঁচে থাকা মানে নিছক গ্রাসাচ্ছাদন। কোনো ব্যক্তিগত শৌখিনতা (সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান) সম্পূর্ণ বর্জনীয়। সুতরাং—যেহেতু কোনো প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচের প্রশ্ন ওঠে না,—বিধবারা অপহরণ করবে না। স্বামীর (পারলৌকিক) উপকারে (শ্রাদ্ধ, দান ইত্যাদি) যা খরচ প্রয়োজনীয়, তার বাইরে যদি বিধবা কিছু খরচ করে, তা অপহার (অপব্যবহার? অপব্যয়?)।

বাঙালি পণ্ডিতরা 'অপহার' কথাটার একটা সুবিধাজনক ব্যাখ্যা করলেন। 'অপহার'-কে 'ব্যভিচার'-এর সঙ্গে সমার্থক করে, তাঁরা বললেন—"...যে ব্যয়ে মৃত স্বামীর

পারলৌকিক উপকার নাই তাহাই অপহার, অর্থাৎ অপব্যয়। বিধবা নিজের গ্রাসাচ্ছাদনার্থে যাহা কিছু ব্যয় করে তাহা কেবল এই জন্য অপব্যয় নহে যেহেতু তাহার নিজের শরীর ধারণ না হইলে সে পতির পারলৌকিক উপকার করিতে পারে না।...যে কর্ম দ্বারা বিধবা আপনাকে যেরূপ উপকার করলে সম্পূর্ণ অসমর্থ করিবে, সেই কর্মের দ্বারা তাহার যে স্বামী সম্পত্তিতে স্বত্বধ্বংশ এবং গ্রাসাচ্ছাদনেরও অধিকারিণী হইবে না ইহা সদ্বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। ব্যভিচার সেইরূপ একটি কর্ম।”[৫]

কিন্তু, এ ব্যাখ্যা সত্ত্বেও, এর থেকে দাবি করা যেতে পারে না যে এই ‘অপহার/ব্যভিচার’-এর শাস্তিস্বরূপ অপরাধিনী বিধবাকে সম্পত্তিচ্যুত করার অধিকার ‘দায়ভাগ’ স্পষ্ট করে কোথাও নির্দেশ করেছে।

‘দায়ভাগ’ (ও অন্যান্য শাস্ত্র)-এ এই ফাঁক থেকেই কেরি কলিতানির উকিল তাঁর যুক্তি খাড়া করেন। মোহিনীমোহন রায় স্বীকার করেন যে ‘দায়ভাগ’ ও কাত্যায়ণের বক্তব্য অনুযায়ী বিধবার কর্তব্য তার স্বামীর ‘শয্যা পবিত্র’ রাখা, এবং ব্যভিচারিণী হলে তার স্বামীর আত্মা বীভৎস নরকে পতিত হবে। কিন্তু এর থেকে এমন সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে বিধবার সতী-সাধ্বী থাকার উপরই তার (স্বামীর) সম্পত্তি ভোগের অধিকার নির্ভর করছে। কাত্যায়ণ ও জীমূতবাহনের নির্দেশ, কেবল বিধবার আচার-আচরণ কি হওয়া উচিত, এতেই সীমিত, এ নির্দেশ লঙঘন করলে তার সম্পত্তির কী হবে, এ বিষয়ে কোনো বিধি নেই। সুতরাং কেরি কলিতানি তাঁর মৃত স্বামীর সম্পত্তি ভোগে সম্পূর্ণ অধিকারিণী।[৬]

মোহিনীমোহন রায় আর একটা বিষয়ে বিচারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ‘দায়ভাগ’-এ অসচ্চরিত্র পুত্রকে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে বিযুক্ত করার নির্দেশ আছে, একবার সম্পত্তি প্রাপ্তির পর, অসচ্চরিত্র জীবন-যাপন সত্ত্বেও তাকে ঐ সম্পত্তি থেকে বিচ্যুত করার কোনো নির্দেশ নেই। অর্থাৎ, হিন্দু শাস্ত্রমতে সম্পত্তি ভোগের অধিকার (একবার তার স্বত্বপ্রাপ্ত হলে) নিরবচ্ছিন্ন—সৎ-অসৎ জীবনযাপন নিরপেক্ষ।[৭]

এবং প্রত্যুত্তরে বাঙালি পণ্ডিতসমাজ যে যুক্তি (?) দেখিয়েছিলেন, তা পুরুষের লাম্পট্যের সমর্থনে এক অসাধারণ ধর্মীয় কৈফিয়ত। তাঁদের বক্তব্য—“...পুত্র ব্যভিচার কালে পিতার প্রতি কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে না পরন্তু স্ত্রী কেবল স্বামীর সম্বন্ধে ধনোপায় ব্যভিচার দ্বারা সেই স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা আচরণ করে। অপিচ ইহা অপেক্ষা ব্যাপক ও প্রবল উত্তর এই যে সকল সভ্য সমাজেই পুরুষের ব্যভিচার অপেক্ষা স্ত্রীর ব্যভিচার গুরুতর অপরাধ। যে বিষয়ে সমস্ত সভ্য সমাজের ঐকমত্য আমরাই কেন তাহা অতিক্রম করিয়া অপরিচিত পথে পদার্পণ করিব। হিন্দু

শাস্ত্রমতে বিধবা ব্যভিচার দ্বারা আপনাকে পতির পারলৌকিক উপকারকরণে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ করে পুরুষের ব্যভিচার সেরূপ ফলজনক নহে। যুক্তিপথ অবলম্বন করিলেও ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে পুরুষের পক্ষে প্রণয় জীবনের একদেশ মাত্র, কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে উহা জীবনের যথাসর্বস্ব। ব্যভিচারবশত স্ত্রীর প্রকৃতির সমূহ পরিবর্তন হইয়া যায় কিন্তু পুরুষের সেরূপ ঘটে না।"[৮]

একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। বিধবার পক্ষে কোনো পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন যে ব্যভিচার—এটা প্রায় একটা স্থির সিদ্ধান্ত হিসেবে সবাই-ই (কী বাঙালি পণ্ডিত সম্প্রদায়, উকিলগোষ্ঠী বা ইংরেজ বিচারকমণ্ডলী) মেনে নিয়েছিলেন। গোল বেধেছিল হিন্দু আইনমতে ব্যভিচারিণী বিধবাকে সম্পত্তিচ্যুত করা যাবে কি যাবে না, এই প্রশ্নে।

মজার ব্যাপার—১৮৫৬ সালে যে বিধবা বিবাহের আইন পাস হয়, তা অনুযায়ী, বিধবা পুনর্বিবাহ করলে সে তার পূর্বতন স্বামীর সম্পত্তি হারাবে। কেরি কলিতানি এই আইনের আওতা থেকে অদ্ভুতভাবে পরিত্রাণ পেয়ে গেলেন—কারণ তিনি বিবাহ না করে, এক পুরুষের সঙ্গে সহবাস করেছিলেন। ইংরেজ সরকারের বিধিবদ্ধ আইন, ও হিন্দু সমাজের ধর্মীয় আইন—উভয়েরই, ব্যভিচারিণী বিধবার সম্পত্তির প্রশ্নটা চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়। অতীতে, জীমূতবাহন ও তাঁর সহযোগীরা বোধহয় ভাবতে পারেননি যে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবর্গের হিন্দু বিধবারা প্রকাশ্যে পুনর্বিবাহ বা পরপুরুষের সঙ্গে সহবাসের সাহস পাবে। গোপনে এরকম সহবাস ঘটলেও, সেটা নিশ্চয়ই খুব বহু বিস্তৃত ও ব্যাপক জানাজানির বিষয় হয়ে ওঠেনি, যাতে আইন করে অপরাধিনীকে সম্পত্তিচ্যুত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। আর পরবর্তী যুগে—উনিশ শতকের মধ্যবর্তী পর্যায়ে—বাঙালি সমাজ সংস্কারক (যাঁদের আন্দোলনের চাপে বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল) ও ইংরেজ সরকার, উভয়ই, ভারতীয় নারীর সামাজিক অসহায়তা ও উৎপীড়িত জীবনধারা, এবং তা থেকে তাদের উদ্ধার করার প্রয়োজনীয়তা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। বিবাহের প্রতিষ্ঠানের বাইরে নারী-পুরুষের সহবাসের সূত্রে সম্পত্তি ভোগদখল কেন্দ্র করে সম্ভাব্য বিবাদ নিয়ে মাথা ঘামাননি।

কিন্তু ক্রমশই জমি-জমা, বাড়ি ঘরদোর, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ভোগদখলের সঙ্গে বিধবা অধিকারিণীর নৈতিক আচার-আচরণের প্রশ্নটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে যাচ্ছিল। আসলে, অনেকদিন ধরেই নৈতিকতা ও নারীর সতীত্ব—এ দুটো কথা একার্থবোধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুরুষের চুরি জোচ্চুরি ব্যভিচার দুর্নীতি বলে গ্রাহ্য হত না, কিন্তু কোনো নারীর সামান্যতম চারিত্রিক দুর্বলতা, নৈতিক অধঃপতনের একমাত্র মাপকাঠি হয়ে গিয়েছিল। উনিশ শতকের ষাটের দশকে, মহিলাদের জন্য প্রকাশিত

বামাবোধিনী পত্রিকা-য়, 'মেয়েছেলে এত অনাদরের কেন?' এই শিরোনামায়, দুটি মহিলার কথোপকথনের এই অংশটি উল্লেখযোগ্য—

"অবলা।...একটা মেয়ের যদি স্বভাব খারাপ হয় তার তিনকুলে কলঙ্ক হয়—মুখ দেখাবার কি আর যো থাকে?

"সরলা।...যদি কোন পুরুষের চরিত্র খারাপ হয় তাতেও কি সেই রকম কলঙ্ক হতে পারে না? আমাদের দেশে পুরুষেরা হাজার পাপ করুন, মদ খান, যেথায় সেথায় বেড়ান, যা ইচ্ছে তাই করুন, তাতে লোকে তত দোষ দেয় না বটে।...পুরুষেরা মন্দ হলে ভাল উপদেশ দিয়া সকলে শুধরাইবার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু মেয়েদের দুরাচারের মধ্যেই ফেলিয়া দেন।..."[৯]

তাই বিধবাদের আচরণে, পান থেকে চুন খসলে, সমাজে আর তাঁদের 'মুখ দেখাবার যো' থাকত না। আর, যদি কোনো পুরুষের সঙ্গে 'অবৈধ সম্পর্ক'র অভিযোগ—তা সত্যিই হোক, বা গুজব-ই হোক—একবার উঠেছে, তবে তো আর কথাই নেই। তাঁর স্বামীর সম্পত্তির অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করে, সে সম্পত্তি নিজেদের করায়ত্ত করার জন্য স্বামীর আত্মীয়স্বজনরা কোর্ট-কাছারি করে তাঁকে 'ব্যভিচারিণী' বলে প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লাগতেন।

কেরি কলিতানির মামলা তাই একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। ঐ সময়, ব্যভিচারের অভিযোগ তুলে বাঙালি বিধবাদের গ্রাসাচ্ছাদনের পথ বন্ধ করা, বা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টার নানা নিদর্শন পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য মামলা ঘটে ১৮৬৯-এ কলকাতার প্রধান বিচারালয়ে। এ মামলায় বাদী ও বিবাদী উভয়ই বাঙালি কুলীন ব্রাহ্মণ ঘরের। রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক কুলীন ব্রাহ্মণের চারটি স্ত্রীর মধ্যে, একমাত্র তাঁর চতুর্থ স্ত্রী জয়কালী দেবী বেঁচেছিলেন যখন রামগোপাল ১৮৬১ সালে মারা যান।

সুতরাং জয়কালীই স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী হন। কিন্তু ১৮৬৭ সালে—অর্থাৎ তাঁর স্বামীর মৃত্যুর ছয় বছর পরে—জয়কালী একটি কন্যাসন্তান প্রসব করেন। এই ঘটনার পরে, রামগোপালের পূর্বতন একজন স্ত্রীর কন্যা, মাতঙ্গিনী (যে নিজেকে রামগোপালের একমাত্র জীবিত বংশধর বলে দাবি করে), জয়কালীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে বলে, যেহেতু জয়কালী 'অসতী', তাঁর স্বামীর সম্পত্তিতে তাঁর আর কোনো অধিকার নেই, এবং মাতঙ্গিনী-ই, রামগোপালের একমাত্র কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী হিসেবে, তাঁর সম্পত্তির মালিকানার যোগ্য।

মজার ব্যাপার, এই মামলার রায় শেষপর্যন্ত 'অসতী' জয়কালীর সপক্ষেই যায়।

কেরি কলিতানির ক্ষেত্রে 'ব্যভিচার-এর কোনো ধরা-ছোঁয়া প্রমাণ ছিল না। কিন্তু জয়কালীর 'অবৈধ' সন্তান প্রসব তাঁর 'অসতীত্ব'-র প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে বিচারালয়ে বিবেচিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। অথচ, দুই ইংরেজ বিচারক—Sir Barnes Peacock (প্রধান বিচারক) ও Macpherson—জয়কালীর অনুকূলে রায় দেন। যুক্তি ছিল—হিন্দু আইন অনুসারে কোনো বিধবার হাতে একবার সম্পত্তি যদি বর্তায়, তাহলে তাকে ঐ সম্পত্তি থেকে হাতছাড়া করা যেতে পারে না।[১০] কিছু ইংরেজ বিচারকের, হিন্দু আইনের ব্যাখ্যা কিঞ্চিৎ বাঁকিয়ে-চুরিয়ে অপরাধিনী বাঙালি বিধবাদের সপক্ষে রায়দানের এই প্রবণতা কি নিছক ব্যক্তিগত উদারনীতিপ্রসূত, না সমসাময়িক ইংরেজ রাজনীতি ও সামাজিক টানাপোড়েনের প্রতিফলন?

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রচলন ও বজায় রাখার সমর্থনে ঔপনিবেশিক রাজনীতিবিদ ও চিন্তানায়কেরা একটা তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন যেটা উনিশ শতকের ইংলন্ডের বিভিন্ন মতাবলম্বী, কিন্তু প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলির সমর্থনপুষ্ট হয়ে গড়ে উঠেছিল। মূল বক্তব্য ছিল—দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক অরাজকতা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন ধর্মীয় পরিবেশের ফলে ভারতীয়রা পিছিয়ে পড়ে আছে; তাদের (পাশ্চাত্য) জ্ঞানের আলোকে শিক্ষিত করে, কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে, সভ্যতার স্তরে উন্নত করার মহৎ দায়িত্ব বর্তেছে ইংরেজ শাসকদের উপর। কিন্তু আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে, 'কোম্পানি'র শাসকদের যে অবাধ লুঠতরাজ ও অত্যাচারের কাহিনি এবং তাদের অর্থনৈতিক শোষণের ফলে এদেশে ব্যাপক মন্বন্তরের খবর বিলেতে পৌঁছেছিল, তার একটা বহু-বিজ্ঞাপিত পরিণতি ঘটেছিল ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব বা Impeachment-এ। এই লজ্জাজনক ও অস্বস্তিকর ইতিহাসকে, কখনও মোলায়েম করে যুক্তিগ্রাহ্য করার প্রচেষ্টা, বা কখনও একেবারে অস্বীকার করে ভারতীয়দের নিজেদের উন্নতির জন্যই ইংরেজ-শাসনের প্রয়োজনীয়তার সমর্থনে যুক্তি খাড়া করার প্রবণতা, উনিশ শতকের ইংলন্ডে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কে ক্রমশই দেখা দিচ্ছিল। ঐ শতকের তৃতীয় দশকের মধ্যেই এই তত্ত্বের সমর্থনে একটা জাতীয় ঐকমত্য (বা, আজকের আধুনিক পরিভাষায় National Consensus) গড়ে উঠেছিল ইংলন্ডে। একদিকে Evangelical গোষ্ঠী (যারা 'অসভ্য, বর্বর' ভারতীয়দের খ্রিস্টায় ধর্মের আলোকে সভ্য করার জন্য আকুল) আর অন্যদিকে Bentham ও Mill-অনুপ্রাণিত Utilitarian গোষ্ঠী (যারা পাশ্চাত্য 'প্রগতিশীল' সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতির ভাবধারায় 'পশ্চাৎপদ' ভারতীয়দের উন্নীত করার জন্য ব্যগ্র)—এই উভয় গোষ্ঠী-ই ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক শোষণ ও 'কোম্পানি'র বাণিজ্যিক লাভের আসল উদ্দেশ্যকে কিছুটা ভদ্রভাবে উপস্থাপিত,

ও কিছুটা সমকালীন উদারনৈতিক রাজনীতির কষ্টিপাথরে সমর্থন করার প্রয়াসে সচেষ্ট হয়েছিল।[১১]

তৎকালীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রের হস্তক্ষেপের নীতি, এই উভয় গোষ্ঠীর চিন্তাধারার প্রভাবে তৈরি হয়েছিল। বেন্টিঙ্কের আমলে সতীদাহ প্রথার উপর নিষেধাজ্ঞা, এবং মেকলের উৎসাহে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, ঔপনিবেশিক ছত্রচ্ছায়ায় পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কারের আলোকে বিকিরণ বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। ১৮৫৭-এ এক অজ্ঞাতনামা ইংরেজ পরিব্রাজক কলকাতায় এসে, ইংরেজ শাসনে 'নেটিভ'দের উন্নতি দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে লেখেন—"এইভাবেই ইংলন্ড, অব্যাহত ভাবে, তার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তার উদ্দেশ্য, কলকাতার হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভালো অংশ থেকে, অগ্রগতির একটা টাটকা ও সুপক্ক বীজ তৈরি করা, যা বিশাল বৃক্ষ হয়ে ভবিষ্যতে সারা ভারতবর্ষে তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দেবে, এবং সভ্য জগতে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রূপে অভব্য মুসলমান অজ্ঞতা ও ব্রাহ্মণ্যবাদের স্থান দখল করবে।"[১২]

উনিশ শতকের ভারতবর্ষে, 'নেটিভ'দের উন্নতিবিধান ও তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক বিস্তারের এই ঔপনিবেশিক কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল—ভারতীয় রমণীকুল। ভারতবর্ষে সমকালীন ইংরেজ পর্যটক, আমলা, খ্রিস্টীয় ধর্মযাজক—প্রায় সকলেই তাঁদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে, সরকারি নথিপত্রে, বারংবার ঘৃণা ও আতঙ্ক সহকারে বর্ণনা করতেন ভারতীয় নারীদের দুরবস্থা—সতীদাহ প্রথা, বহু-বিবাহ, বাল্য বিবাহ, বিধবাদের দুর্দশা, শিক্ষার অভাব ইত্যাদি। ঔপনিবেশিক কূটনীতিকরা এইসব তথ্য কাজে লাগিয়েছিল ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন টিকিয়ে রাখার সমর্থনে। তাদের স্বদেশে, উদীয়মান নারী-স্বাধিকার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও ইংরেজ সমাজ সংস্কারকদের সহানুভূতি আদায়—এবং তার মাধ্যমে ব্যাপক ইংরেজ মধ্যবিত্ত সমাজের নৈতিক অনুমোদন (ভারতে ইংরেজ শাসনের সপক্ষে) লাভের উদ্দেশ্যে ইংরেজ আমলা ও তাদের তাত্ত্বিক সমর্থকেরা ভারতীয় নারীদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনি সবিস্তারে বিজ্ঞাপিত করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ সর্বসাধারণের সামনে যে ধারণাটা তুলে ধরা হয়েছিল তা হলো—ভারতবর্ষে নারীরা সবচেয়ে বেশি পদানত ও পশ্চাৎপদতা; সুতরাং তাদের উদ্ধারের জন্য ইংরেজ শাসন প্রয়োজনীয়।[১৩] এদেশে ইংরেজ শাসকদের শোষণ-লুণ্ঠন ও অত্যাচারের ইতিহাসকে চাপা দিয়ে তাদের ভারতীয় সমাজের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যটাই এইভাবে উচ্চনাদে ঘোষিত হলো। ইংলন্ডে, সমাজ-সচেতন প্রগতিশীল ইংরেজদের দৃষ্টি, তাদের রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের মূল শোষণমূলক চেহারা থেকে

বিক্ষিপ্ত হয়ে, তার গৌণ সমাজ-সংস্কারক চেহারাটার উপর নিবদ্ধ হয়ে এসেছিল প্রায় উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত (যখন দাদাভাই নৌরজী, এবং পরে রমেশ দত্ত ও ডিগ্‌বির রচনায়, ভারতবর্ষে ইংরেজের অর্থনৈতিক শোষণের তথ্যমূলক বিবরণী ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ইংরেজ পাঠকের চোখ খুলে দেয়)।

যাই হোক, ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার তত্ত্বের এই (উপনিবেশের) সমাজ-সংস্কারের দৃষ্টিকোণ শুধু ইংরেজ ধর্মযাজক নয় এদেশে আগত অন্যান্য ইংরেজ, যারা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ছিল, তাদেরও উৎসাহিত করেছিল—বিশেষ করে শিক্ষক ও আইনজীবীদের। বাঙালি বিধবার পক্ষে ইংরেজ বিচারকের রায়দান বোধহয় এই মনোভাবেরই পরিচায়ক।

কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে—কঠোর 'ভিক্টোরীয়' নৈতিক মূল্যবোধে লালিত হয়েও, ইংরেজ বিচারপতি প্রায়শই রায় দিয়েছেন এমন সব বাঙালি হতভাগিনীদের সমর্থনে, যাঁরা সমসাময়িক বাঙালি ও বিলেতি নীতিবাগীশদের চোখে 'ব্যভিচারিণী', 'অসতী', 'দেহোপজীবিনী' বলে ধিক্কৃত ছিলেন। এটা কি ভারতীয় নারীদের প্রতি সমবেদনা ও তাদের উদ্ধার করার উৎসাহ থেকে?

কেরি কলিতানি বা জয়কালী দেবীর মামলায় তাঁদের অনুকূলে আদালতের রায়দান নিছক কাকতালীয় ছিল না। ঐ সময়কার আইন-আদালতের নথিপত্র ঘাঁটলে দেখা যাবে, বারবনিতা-সংক্রান্ত মামলাতেও ইংরেজ বিচারকেরা অনেক সময়ই তাদের সমর্থনে রায় দিয়েছেন। দুই-একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে আইনের ব্যাখ্যার কারচুপির নিদর্শন হিসেবে।

১৮৭২-এর সেপ্টেম্বরে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা ওঠে, যাতে বাদীপক্ষ ছিলেন কৃষ্ণনগরের গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায় ও বিবাদী ছিলেন মধুময়ী পেশাকার, একজন বারবনিতা, যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে বাড়ির মালিক গৌরীনাথকে তিনি বহুকাল ধরে বাড়িভাড়া দেননি। উল্লেখযোগ্য যে গৌরীনাথের উকিল এ মামলাটিকে হিন্দু আইনের এক্তিয়ারভুক্ত করার দাবি পেশ করে বলেন যে যেহেতু বাদী-প্রতিবাদী উভয়পক্ষই হিন্দু, হিন্দু আইন মতে মধুময়ী গৌরীনাথের ভাড়া মিটিয়ে দিতে বাধ্য তাদের উভয়ের অনুমোদিত চুক্তি অনুযায়ী। বারবনিতাদের সঙ্গে অনুরূপ চুক্তি হিন্দু আইনসম্মত বলে দাবি করা হয়।

মামলায় প্রধান বিচারপতি ছিলেন Richard Couch (যিনি কেরি কলিতানির মামলাতেও রায় দিয়েছিলেন)। তিনি বলেন যে ১৭৩৯-এর Regulation IV অনুযায়ী কেবল উত্তরাধিকার, জাতি, বিবাহ ও ধর্মসংক্রান্ত বিবাদেই হিন্দু আইন প্রযোজ্য।

যেহেতু গৌরীনাথ-মধুময়ীর মামলা এর কোনোটার আওতাতেই পড়ে না, ইংরেজ আইন অনুসারে এটি বিচার্য। রায়দান প্রসঙ্গে Couch বলেন যে আদালত বারবনিতার সঙ্গে বাড়িওলার চুক্তি গ্রাহ্য করে না, কারণ এক্ষেত্রে বাড়িওলা ঐ চুক্তি দ্বারা এক বারবনিতার অসামাজিক ব্যবসায় সহায়তা করে একটা নীতিবিগর্হিত কাজ করেছে। সুতরাং, আদালত ঐ চুক্তির শর্ত পালনের জন্য কাউকেই কোনো নির্দেশ দিতে অপারগ। ফলত, মধুময়ী বিনা ভাড়ায় গৌরীনাথের বাড়ি দখল করে তাঁর পেশা চালিয়ে যাবার অধিকার পেলেন। গৌরীনাথের প্রতি আদালতের উপদেশ 'যেমন কর্ম তেমনি ফল'।[১৪]

ঐ বছরেরই ফেব্রুয়ারি মাসে হাইকোর্টে আর একটি বারবনিতার মামলা ওঠে। মুক্তা বেওয়াকে ধরে আনা হয় এই অভিযোগে—'খাতায় নাম লেখানো' অর্থাৎ Registered হওয়া সত্ত্বেও, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার (যা ১৮৬৮-এর 'চৌদ্দ আইন' অনুযায়ী প্রত্যেক বারবনিতা করাতে বাধ্য) জন্য ডাক্তারের সামনে হাজিরা দেননি। উল্লেখযোগ্য, ঐ সময় এই হাজিরার বাধ্যবাধকতার সুযোগ নিয়ে বহু বারবনিতাকে—বা এমনকি সাধারণ গরিব শ্রমজীবী মহিলাদেরও পুলিশ লাঞ্ছনা করতে ইতস্তত করত না। মুক্তা বেওয়ার মামলায় রায়দান প্রসঙ্গে বিচারপতি বলেন, মুক্তা কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত করে 'খাতা' থেকে তাঁর নাম যে-কোনো সময় প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। পুলিশের হয়রানি থেকে তার পরিত্রাণের উপায় আদালতই বাতলে দিল।[১৫]

মুক্তা বেওয়ার এই মামলায় বিচারপতি ছিলেন J. Jackson। উক্ত বিচারকই, কেরি কলিতানির মামলায় হাইকোর্টের 'ফুল বেঞ্চ'-এর সদস্য ছিলেন, এবং বিচারপতি Couch-এর সঙ্গে একযোগে কেরির স্বপক্ষে রায়দান করেছিলেন। তবে, কেরির মামলায় Jackson দুটো গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছিলেন, যার থেকে ঐ মামলার একটা ভিন্ন তাৎপর্য চোখে পড়ে।

প্রথমত, Jackson বলেন, বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই বিধবাদের হাতে বিস্তর ভূসম্পত্তি রয়েছে, যার ফলে তাঁরা তাঁদের মৃত স্বামীদের আত্মীয়-স্বজনের চক্ষুশূল। এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি আদালত এমন কোনো রায় দেয় যার ফলে 'ব্যভিচার'-এর দোষে অভিযুক্ত বিধবার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়, তাহলে আদালতের সামনে ভূরি ভূরি পারিবারিক কেলেঙ্কারির মামলা আসতে শুরু করবে, এবং (বিধবাদের সম্পত্তিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে) Perjury বা মিথ্যা হলফ ও আইনের সাহায্যে সেইসব মামলা নিষ্পত্তির ষড়যন্ত্রের প্রশ্রয় দেওয়া হবে।

Jackson-এর দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল আরও অনেক সময়োপযোগী ও যুক্তিসম্মত। বিচারকগোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র Jackson-ই অন্যদের স্মরণ করিয়ে দেন যে মামলায়

জড়িত দুজনেই—কেরি কলিতানি ও মণিরাম কলিতা আসামের নিম্নবর্গের মানুষ। ('কলিতা' পদবি, অসমিয়া কায়স্থ জাতি ছাড়াও, কামার সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল, বরং কেরি ও মণিরাম ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত।) বাঙালি হিন্দু উচ্চবর্ণের সামাজিক-ধর্মীয় নিয়ম-কানুনের মাপকাঠিতে কি এই নিম্ন সমাজে প্রচলিত প্রথা বিচার্য? এই প্রশ্নটা তুলে Jackson তদানীন্তন একটা জটিল আইন-সংক্রান্ত বিতর্কের মধ্যে মামলাটাকে নিয়ে এসেছিলেন। ভারতবর্ষে, প্রথমত, অতীতের হিন্দু (ও মুসলমান) শাস্ত্রীয় বিধান ও লিপিবদ্ধ ধর্মীয় আইন-কানুন, দ্বিতীয়ত, ইংরেজ আমলে বিধিবদ্ধ পাশ্চাত্য ধারানুযায়ী আইন ও শেষে সাধারণ জনজীবনে প্রচলিত customary law বা প্রথাগত আইন—এই তিনটেকে কীভাবে দেখা হবে, এ নিয়ে উনিশ শতকে ইংরেজ আইনজ্ঞদের মধ্যে—ও ভারতীয় পণ্ডিতদের ও সমাজপতিদের সঙ্গে তাদের—একটা দীর্ঘ বিবাদ চলেছিল।[১৬]

এ-যুগের কিছু গবেষক এই বিবাদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন যে ইংরেজ শাসকেরা, জনজীবনে প্রচলিত customary law ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্রাহ্য করে, উচ্চবর্গের অনুসৃত (হিন্দু ও মুসলমান) ধর্মীয় শাস্ত্রের বিধানগুলি, ভারতে সংবিধিবদ্ধ আইন রূপে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং উচ্চ-নীচ সমস্ত জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়। এর ফলে, বিশেষ করে, মেয়েরা—যারা অনেক নিম্নবর্গের সম্প্রদায়ে প্রথাগত আইন অনুসারে কিছু কিছু ব্যাপারে (বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, পুনর্বিবাহ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, ইত্যাদি) স্বাধীনতা উপভোগ করত—ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদী ও (গোঁড়া মোল্লার টীকা-টিপ্পনীসহ) ইসলামি শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের শিকার হয়।[১৭]

এ অভিযোগটা এক অর্থে ঠিক। কিন্তু, আবার, ইতিহাসের এক-রেখাঙ্কিত ব্যাখ্যার ঝোঁকে আমরা অনেক সময়ই ভুলে যাই (বা উপেক্ষা করি) ব্যতিক্রমগুলি এবং এ ব্যতিক্রম কেন ঘটে, তার কারণগুলি। উপেক্ষা করি বলেই, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়, শাসনাধীন জাতির নিগৃহীতা কিছু মহিলা ইংরেজ বিচারকের আদালতে যখন 'সুবিচার' (আজকের feminist চিন্তার মাপকাঠিতে) পান, তখন এই আপাত-দৃষ্ট অসঙ্গতির জটিল সূত্রগুলি, জাতীয়তাবাদী ইতিহাস-রচনার চর্চায় সচরাচর যথেষ্ট গুরুত্ব পায় না।

এটা ঠিকই যে, হিন্দু শাস্ত্রীয় বিধান (ও তার সঙ্গে ইসলামি বিধান-ও)-কে পাশ্চাত্য আইন প্রণালীর রীতিতে বিধিবদ্ধ করার ও তাদেরকে ইংরেজ বিচারব্যবস্থার কাঠামোয় ফেলে, প্রয়োগোপযোগী করার প্রচেষ্টায়, আঠারো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের শেষার্ধের মধ্যে, ইংরেজ শাসনব্যবস্থা সফল হয়েছিল। এ প্রচেষ্টা ঔপনিবেশিক স্বার্থ-প্রণোদিত ছিল।[১৮]

কিন্তু, এই ঔপনিবেশিক বিচার-ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই, আইনের নানারকম ব্যাখ্যার ও প্রয়োগের অবকাশ দেখা দিয়েছিল—বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষার্ধে। তদানীন্তন বিলেতে, সমাজ-সংস্কার ও বিশেষত, স্ত্রী-স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন—সম্ভবত, এ সবের প্রভাব পড়েছিল ভারতে নিযুক্ত ও অবস্থিত ইংরেজ বিচারকদের উপর। তার ফলে, কিছু কিছু মামলা-মোকদ্দমায়, ভারতীয় নারীদের স্বার্থে রায়দান হয়তো খুব একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, ১৮৬৮ সালে ইংলন্ডে উদারনৈতিক দল ও মিলের সমর্থকেরা ক্ষমতায় আসার পর, পার্লামেন্টে দীর্ঘ বাগ্‌বিতণ্ডা ও তার বাইরে সমাজসংস্কারকদের চাপের ফলে, ১৮৭০-এ Married Women's Property Law বা বিবাহিতা মহিলার সম্পত্তি-বিষয়ক আইন পাস হয়। এই আইনে বিবাহিতা মহিলাদের অধিকারলভ্য বিভিন্ন ধরনের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য মৃত ব্যক্তির ভূসম্পত্তিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তবে, এ সম্পত্তির মূল্য দুশো পাউন্ডের বেশি হলে চলবে না।

উনিশ শতকের সত্তরের দশকে, ভারতীয় মহিলাদের সম্পত্তি ও জীবিকা সম্পর্কিত যে মামলাগুলির কথা আগে বলেছি, সেগুলিকে অভিযুক্তা মহিলাদের সপক্ষে ইংরেজ বিচারকদের রায়দানের তাৎপর্যের সন্ধান করতে গেলে, তাই সমসাময়িক ইংলন্ডের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসেও খানাতল্লাশি করা দরকার।

ইংরেজ বিচারক ও বাঙালি ভদ্রলোক

আর-একটা বিষয়ও মনে রাখা দরকার। উনিশ শতকের শেষার্ধে—বিশেষ করে ১৮৬০-৭০ দশকের সময় থেকে ইংরেজ প্রশাসনের সঙ্গে বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংঘাত নানা ব্যাপারে প্রকট হয়ে উঠছিল। শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়দের নীতি-নির্ধারণের অধিকার, সরকারি ও বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত চাকুরিতে ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরেজ কর্মচারীদের সমানাধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা—এইসব দাবি নিয়ে বিক্ষোভ বাঙালি সমাজে সংগঠিত আকারে দানা বাঁধছিল।

এই সংঘাতের ছায়া, আদালতে মামলা-মোকদ্দমাতেও আচ্ছন্ন করেছিল। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ১৮৭১-এর ২০শে সেপ্টেম্বর, কলকাতার টাউন হলের সিঁড়িতে, স্থানাপন্ন (acting) প্রধান বিচারপতি জন নর্ম্যানকে একজন ওয়াহাবী বিদ্রোহী ছোরা মেরে হত্যা করে। এ হত্যাকাণ্ডের পিছনে নিঃসন্দেহে একটা রাজনৈতিক প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা ছিল। কারণ, এর কিছুকাল আগেই, ওয়াহাবী নেতা আমীর খান

(কলকাতা কলুটোলা নিবাসী)-এর উপর পাটনার আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেয়। এবং তার বিরুদ্ধে যখন কলকাতা প্রধান বিচারালয়ে আবেদন করা হয়, তখন বিচারপতি নর্ম্যান তা নামঞ্জুর করে দেন। যদিও, ওয়াহাবী আন্দোলন ও এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না, আমীর খানের মামলা কলকাতার সকল স্তরে প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। বিপিনচন্দ্র পাল তখন যুবক। ঐ ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পরে উনি লেখেন—"(মামলায়) আমীর খানের সপক্ষে বোম্বাই হাইকোর্টের Mr. Annesty-কে নিযুক্ত করা হয়। Mr. Annesty তাঁর এই বক্তৃতায় Lord Mayo-কে (তদানীন্তন বড়োলাট) ভারতবর্ষে মহারানীর অসহায় প্রজাদের উপর অত্যাচারের জন্য অভিযুক্ত করে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন। তাঁর এই বক্তৃতা, মামলার অন্যান্য কার্যবিবরণীর সঙ্গে পুস্তিকা আকারে ছাপানো হয়। বেশ কয়েক বছর ধরে এই পুস্তিকা আমাদের নব্য উন্মেষিত স্বাদেশিকতার বেদমন্ত্রস্বরূপ ছিল।...ওয়াহাবী মামলা, ইংরেজ শাসকদের অন্যায়াচরণ সম্বন্ধে নতুন করে উপলব্ধি জাগিয়ে তুলে আমাদের অপরিণত স্বদেশভক্তিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছিল।"[১২]

এই পরিপ্রেক্ষিতে, অনেক অনুমান ও সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মারে। প্রতিবাদমুখর বাঙালি ভদ্রলোকদের প্রতি ইংরেজ বিচারকদের কি একটা পক্ষপাতদুষ্ট প্রতিকূল মনোভাব তৈরি হচ্ছিল? পারিবারিক বিবাদ-সংক্রান্ত বা বারবনিতার জীবিকাবিষয়ক তুচ্ছ মামলাতেও তাই কি অনেক সময় এই বিচারকেরা এমন রায় দিতেন যা এই বাঙালি ভদ্রলোক নেতৃত্বের ব্যাপক হিন্দু সমর্থকদের সামাজিক ও ধর্মীয় রক্ষণশীল আচার-আচরণ ও মূল্যবোধকে খোঁচা দিত? ইংরেজ শাসকদের চোখে এই হিন্দু সমাজের সবচেয়ে আঘাতযোগ্য স্থান ছিল তার ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার। এতে ঘা মেরে, ইংরেজ বিচারকেরা কি ভারতীয়দের হেয় প্রতিপন্ন করে, তাদের ইংরেজদের সমকক্ষ হবার অযোগ্য বলে প্রমাণ করে, তাদের নেতাদের সমানাধিকারের দাবিকে নাকচ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন?

এই চিন্তাধারার সবচেয়ে ন্যক্কারজনক বিস্ফোরণ ঘটেছিল ১৯৮৩ সালে 'ইলবার্ট বিল' (যাতে বর্ণভিত্তিক বিচারের রেওয়াজ বিলুপ্ত করে ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভারতীয় প্রশাসকদের সমপর্যায়ে উন্নীত করার প্রস্তাব ছিল)-কে কেন্দ্র করে ইংরেজদের আন্দোলনে। তদানীন্তন বড়োলাট রিপন (ইংলন্ডের সদ্য নির্বাচিত উদারনৈতিক দলের প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের মনোনীত)—প্রবর্তিত এই আইনের বিরুদ্ধে এদেশে বসবাসকারী ইংরেজ ব্যবসাদার, ও নিযুক্ত ইংরেজ প্রশাসক ও অন্যান্যরা, প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে জিদ্ করে ঘোষণা করে যে তারা 'নেটিভ্' বা ভারতীয় বিচারকদের কাছে বিচারগ্রহণে রাজি নয়।

এই 'নেটিভ'-বিরোধী আন্দোলনের একজন বিখ্যাত চাঁই ছিলেন তদানীন্তন কলকাতার প্রধান বিচারপতি Sir Richard Garth। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, শহরের ইংরেজ ব্যারিস্টারগোষ্ঠী ছাড়াও, একাধিক কার্যরত এবং অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ বিচারপতি। এই বিচারকদের সহজাত বর্ণবিদ্বেষ যেভাবে 'ইলবার্ট বিল' বিরোধী বিক্ষোভে ফাঁস হয়ে গিয়েছিল, তাতে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রের 'ন্যায়পরায়ণ' বিচারপ্রণালীর মুখোশ খসে পড়েছিল।

এই ইংরেজ বিচারপতিরা, ভারতীয় বিচারপতিদের সমানাধিকার দেবার বিপক্ষে যে যুক্তি খাড়া করেছিলেন, তা হলো যে ভারতীয়রা তখনও পর্যন্ত যথেষ্ট 'সভ্য' (ইংরেজ মতে) এবং কুসংস্কারমুক্ত হয়ে উঠতে পারেনি, এবং তাই ভারতীয় বিচারকেরা, ইংরেজদের (যারা উচ্চ সভ্য-সমাজভুক্ত) বিচার করার ক্ষমতা অর্জনে অক্ষম![২০] এইসব ইংরেজ বিচারপতিরা এতদিন ধরে (১৮৭০ দশকে) আদালতে, ভারতীয় নির্যাতিত নারীদের স্বপক্ষে যে-সব রায় দিয়েছিলেন, তার নেপথ্যের প্রেষণা এই একই মনোভাব-প্রসূত। অর্থাৎ, ভারতীয় সমাজপতি এবং বিচারপতিও রক্ষণশীল মূল্যবোধাক্রান্ত হেতু, তাদের সমাজের নারীদের স্বাধিকার দানে অক্ষম। সুতরাং, এই স্বাধিকার দানের দায়িত্ব বর্তেছে ঔপনিবেশিক প্রশাসন—এবং তাদের ইংরেজ বিচারকদের উপর। সেই White Man's Burden! ভারতীয় নারীদের মুক্ত করার এই মহান ব্রতে নিযুক্ত ইংরেজ বিচারক ও উকিলগোষ্ঠী কি করে মেনে নেবে 'ইলবার্ট বিল'—যার মারফতে সেই রক্ষণশীল, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয় বিচারকেরা তাদের সমকক্ষ হবার স্পর্ধা ঘোষণা করতে পারবে?

'ইলবার্ট বিল'-বিরোধী প্রচার অভিযানে তদানীন্তন ইংরেজ বিচারপতিদের ভূমিকা তাই উল্লেখনীয়। এ অভিযানে, ভারতীয় নারীদের স্বাধিকারের প্রশ্নটি আবার একটা কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দেখা দিয়েছিল। আইন ব্যবস্থায় তাদের অবস্থানের প্রশ্নটিকে একটা সুবিধাজনক ছুতো হিসেবে, ইংরেজ বিচারকেরা বাঙালি ভদ্রলোক সমাজের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন। কলকাতা প্রধান বিচারালয়ের ইংরেজ বিচারকেরা এক স্মারকলিপিতে 'ইলবার্ট বিল'-এর বিরুদ্ধে মতামত জ্ঞাপন করতে গিয়ে বলেন যে হিন্দু ও মুসলমান মহিলারা তাঁদের ধর্মীয় আইন মতে পর্দানশীন; সুতরাং আদালতে হাজিরা দেবার বাধ্যবাধকতা থেকে তাঁরা রেহাই পান। তাঁদের ধর্মের খাতিরে তাঁরা যদি এই বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে পারেন, ইংরেজরাও কেন তাদের সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুবিধা হিসেবে, ভারতীয় বিচারকদের হাতে বিচার থেকে রেহাই পাবার অধিবার পাবে না?[২১]

এ ছাড়াও কলকাতা প্রধান বিচারালয়ের কিছু বিচারক সংবাদপত্রে চিঠি লিখে তাঁদের আপত্তি জানান। ভারতীয় বিচারকদের সম্বন্ধে তাঁদের অভিযোগ ছিল যে তাঁরা কখনও সত্য কথা বলেন না, এবং মফস্‌সলে প্রত্যেক ইংরেজকে তাঁরা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হেনস্তা করতে চান।[২২]

ইংরেজ আইনজীবীদের মধ্যে Branson নামে এক ব্যারিস্টার 'ইলবার্ট বিল'-বিরোধী আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা নেন এবং অত্যন্ত অভদ্র ভাষায় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতীয়দের চরিত্রের উপর আক্রমণ চালান। জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, পর্দানশীনতা, বিধবা বিবাহের নিষিদ্ধকরণ—ইত্যাদি সামাজিক প্রথার উল্লেখ করে ব্র্যান্‌সন সাহেব বলেন ভারতীয়রা নৈতিক অধঃপতনে নিমজ্জিত; সুতরাং ইউরোপীয়দের বিচার করতে তারা সম্পূর্ণ অযোগ্য। কলকাতার টাউন হল, ঢাকা ও অন্যান্য মফস্‌সল শহরে ব্র্যান্‌সনের বক্তৃতা, বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে প্রতিবাদের ঝড় তোলে। কিন্তু, ব্র্যান্‌সন ও অন্যান্য ইংরেজদের কুৎসা রটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে বাঙালি নেতারা অনেক সময়ই অতীতের রক্ষণশীল প্রথাগুলির (যেগুলিকে ব্র্যান্‌সন প্রমুখ ইংরেজরা আক্রমণ করে) জোরালো সমর্থনে এগিয়ে আসেন। ঐ সময়কার বাঙালি মনোভাবের কথা লিখতে গিয়ে বিপিন পাল বলেন ব্র্যান্‌সনের মন্তব্য "আমাদের মধ্যে যারা সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল ছিল, তাদের হাত শক্ত করতে সাহায্য করেছিল।"[২৩]

কেরি কলিতানি ও বাঙালি 'সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল' শক্তি

বিপিন পাল, ১৮৮৩ সালের 'ইলবার্ট বিল'-বিরোধী আন্দোলন প্রসঙ্গে যে 'সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল' চিন্তাধারার কথা বলেছেন, তা কিন্তু উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকেই বাঙালি রাজনীতিতে সংগঠিত আকার নিতে শুরু করেছিল। কেরি কলিতানির মামলায় ইংরেজ বিচারপতির রায়কে উপলক্ষ করে কলকাতায় একাধিক জনসভা হয়, এবং শহরের হোমরাচোমরা ব্যক্তিরা বিলেতে 'প্রিভি কাউন্সিল'-এ ঐ রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করার জন্য টাকা তুলতে শুরু করেন। বাঙালি সম্পাদিত সংবাদপত্রে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে এই রায়ের ফলে হিন্দু সমাজ বিধ্বস্ত হয়ে যাবে।

১৮৭৩-এর এপ্রিল মাসে পাথুরিয়াঘাটায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরদের আদি বসতবাড়িতে, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক সমাবেশে 'প্রিভি কাউন্সিল'-এ আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রবীন্দ্র-অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ সমাবেশে আক্ষেপ করে বলেন—"আমাদের অতীতের ভাল ভাল হিন্দু নিয়ম-কানুনের অধিকাংশই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একমাত্র নারীর সতীত্ব বিষয়ক নিয়ম-কানুনগুলিই টিকে আছে। এবার সেগুলিও আমরা হারাবো।"[২৪]

ঐ একই সময়, ভবানীপুর ধর্মোৎসাহী সভায়, কেরি কলিতানির মামলার রায়-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে এর পর থেকে "ভদ্রাসনে বিধবা...নিরুপায় দেবরদ্বয়ের পুত্র-কন্যা পরিবারের মধ্যে ও সমক্ষে যথেচ্ছ ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হইবে।"[২৫]

বাঙালি সম্পাদিত ইংরেজি সংবাদপত্র *Bengalee* বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করল—"আমরা সজোরে স্বীকার করছি যে আমাদের মধ্যে তেমন তথাকথিত 'উদারনীতি' নেই, যার ফলে আমরা অসতীত্বকে আইনগ্রাহ্য করার প্রচেষ্টাও নির্লিপ্ত হয়ে দেখে যাবে।" ...তারপর সহযোগী ইংরেজ সম্পাদকদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়—"...ইউরোপে অনেক উচ্চবংশজাত মহিলা আছেন, যাঁরা আমাদের মহামান্য মহারাণীর (অর্থাৎ ভিক্টোরিয়া) মত, তাঁদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁদের প্রথম স্বামীর মৃত্যু শোকার্ত হৃদয়ে স্মরণ করেন। আমরা সগর্বে বলতে পারি যে আমাদের দেশে এই ধরনের মহিলার সংখ্যা আরও বেশি।" সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়—"যদিও এটা দুঃখজনক যে অন্যায়কারী পুরুষরা যথোপযুক্ত শাস্তি পায় না, কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে ব্যভিচার...এর কুফল অনেক মারাত্মক। সুতরাং আইনত সমর্থন ও অন্যান্য সুবিধাদানের ফলে এর বৃদ্ধি যাতে না হয়, সেটার প্রতি নজর রাখা অত্যন্ত জরুরী।"[২৬]

অধিকাংশ বাঙালি সম্পাদক-ই মামলার রায়ের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। *মধ্যস্থ* পত্রিকার ভাষায়—"হাইকোর্টের উক্ত নিষ্পত্তিতে হিন্দুসমাজ মহাক্ষুব্ধ, মহাভীত ও মহা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল।" এমনকি যাঁরা গোড়াতে (সংখ্যায় অল্প যদিও) হাইকোর্টের রায়-এর অনুমোদন করে লিখেছিলেন, তাঁরাও পরে পিছিয়ে গেলেন। 'জনমত'-এর চাপে *হিন্দু পেট্রিয়ট* প্রথমে অন্য মত প্রকাশ করে, শেষে সে মত উপেক্ষা করে অন্যান্যদের মতই মেনে নেয়, 'সাধারণ হিন্দুসমাজের অভিপ্রায়' অনুসারে।[২৭]

'সাধারণ হিন্দু সমাজের' মনোভাব কিছুটা আঁচ করা যায় সে যুগের লোকসাহিত্য থেকে। কেরি কলিতানির মামলা নিয়ে তখনকার দিনে লোকগীতি রচিত হয়েছিল। জনপ্রিয় কবি প্যারীমোহন কবিরত্ন এই রকম একটি গানে সাবধান বাণী শুনিয়েছিলেন—

দেশের সর্বনাশ এবারে।
দেশের যত সাধ্বী-সতী, সব হবে অসতী,
অসতী নারীর যদি হয় গতি,
পাপপথে কেনা ক'রবে গতিমতি, হাইকোর্টের নজীরে

*　　　*　　　*

বারাঙ্গনা-বৃক্ষ হবে ফলবতী, এ বিধি প্রচারে।

ভদ্রাসনে বসে কর্বে উপপতি,
বিধবার হবে সন্তান উৎপত্তি,
জ্ঞাতিদের মুখে ধোরে মারবে লাথি, অন্য দেশে যা করে।
বৃদ্ধ হলে পতি অশেষ দুর্গতি,
অল্প অপরাধে কত কুলবতী,
বিষ খাওয়াইয়া মার্বে নিজ পতি, মনে যদি না ধরে।
বহুদিন বাহিরে বেরিয়ে গেছে যারা,
বিষয় পাবে বলে কেঁচে বসবে তারা,
জ্ঞাতিবন্ধুগণে ভেবে হলো সারা, ঘরে যদি আসে ফিরে।

এই ভয়াবহ ভবিষ্যতের ছবি এঁকে, তারপর কবিরত্ন আবেদন করলেন দেশবাসীর কাছে—

বিলাত-আপীলের রয়েছে সুযোগ,
এই শুভযোগে সবাই দাও যোগ,
* * *
ক'সে চাঁদা ফেল, বিলাতে যাই চল, নৈলে কি আর ফেরে?[২৮]

লক্ষ করলে দেখা যাবে, শিক্ষিত ভদ্রলোকের জনসভায় বা তাদের সম্পাদিত পত্রিকায়, বা সাধারণ জনপ্রিয় গানে, যে-সব মতামত প্রকাশ করা হয়েছিল, তাদের মোদ্দা কথা ছিল দুটো—এক, হিন্দু বিধবার পক্ষে, অন্যপুরুষ সংসর্গ তো দূরের কথা, এমনকি পুনর্বিবাহ ও অসতীত্বের শামিল। (এ দেশের অতীতের সতী-সাবিত্রীর আদর্শ নজির ছাড়াও, এ সূত্রে, বিলেতের মহারানী ভিক্টোরিয়াকে-ও সতীত্বের 'মডেল' হিসেবে খাড়া করা হয়েছিল)। দুই, কেরি কলিতানির অনুকূলে আদালতের রায়ের ফলে, বাঙালি মহিলারা ব্যভিচারিণী হতে উৎসাহিত হবে।

হিন্দু মহিলাদের সতীত্ব সহজাত ও ঐতিহ্যগত, এই সব বড়াই করা সত্ত্বেও, বাঙালি ভদ্রলোক নেতৃত্ব আসলে তাঁদের সমাজভুক্ত নারীদের সম্বন্ধে এক ধরনের অবিশ্বাস ও সন্দেহে ভুগতেন। সারা উনিশ শতক ধরে, খবরের কাগজের সম্পাদকীয়তে, প্রবন্ধে এবং অন্যান্য লেখায় একটা আশঙ্কা বারংবার, প্রায় একটা obsession-এর মতো, বার হয়ে আসত। বারবনিতাদের স্বেচ্ছাচারিতা দেখে ঘরের বউ উৎসাহিত হয়ে ঐ পথ অবলম্বন করবে—এই ভয়টা বাঙালি ভদ্রলোকদের পেয়ে বসেছিল। একটা নমুনা দেওয়া যাক। অন্তঃপুরবাসিনী বাঙালি মহিলাদের সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে সে-যুগের একটি বিখ্যাত পত্রিকা মন্তব্য করে—

"আপনারা (অর্থাৎ ভদ্রমহিলারা) কারারুদ্ধ থাকিয়া বেশ্যাদিগকে যখন সম্পূর্ণ স্বাধীনা দেখে, অনেকে যখন স্বীয় পতিকে তাহাদিগের প্রমোদে আসক্ত দেখিতে পায়, এমন সুখ ভ্রমে কুকর্মের লালসা তাহাদিগের চিত্তে প্রজ্জ্বলিত হওয়া কি অসম্ভব? অবগতি হইয়াছে যে এইরূপে অনেক অবলা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গণকাদিগের অনুগামিনী হইয়াছে।"[২৯]

ঘরের বউ ও মেয়েদের উপর এই অবিশ্বাস, এবং তাদের চরিত্র সম্বন্ধে ভদ্রলোকের এই সহজাত সন্দেহ থেকেই, সে-যুগের বাঙালি নেতারা কেরি কালিতানির মামলার রায় নিয়ে এতটা উত্তেজিত হয়েছিলেন। তাঁদের স্ত্রী-কন্যাদের আনুগত্য নিয়ে তাঁরা বরাবরই সন্দিহান ছিলেন। কখন তারা "গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গণিকাদিগের অনুগামিনী" হবে—এই ভয় তাঁদের সদাই ব্যতিব্যস্ত করে তুলত। কেরি কলিতানির অনুকূলে আদালতের রায় তাঁদের এই আশঙ্কাকে আরও বদ্ধমূল করে তুলল। এই আশঙ্কা, প্যারীমোহন কবিরত্নের সাদামাঠা ভাষায় বেরিয়ে এসেছিল—বৃদ্ধ পতিকে বিষ খাইয়ে মেরে, সম্পত্তি অধিকার ক'রে, বিধবা নারী "ভদ্রাসনে ব'সে কর্বে উপপতি"! কেরি কলিতানির মামলার রায় তাই একটা বিপজ্জনক নজির হিসেবে দেখা দিয়েছিল তদানীন্তন বাঙালি সমাজপতি ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চোখে।

উপসংহার

উনিশ শতকের ভারতবর্ষে, ইংরেজ ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকদের কাছে, ভারতীয় রমণীদের দুরবস্থার প্রশ্ন, ও তা থেকে তাদের মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা, এ দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসন বজায় রাখার সমর্থনে একটা বড়ো যুক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই যুক্তির প্রভাবে, এদেশে নিযুক্ত ইংরেজ প্রশাসক ও বিচারক এবং আগত ইংরেজ চাকুরিজীবী, শিক্ষাবিদ, ব্যবসাদার, ধর্মযাজক ও সংস্কারক, স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে তাঁদের পেশাগত অনুষ্ঠানে, এবং প্রচার অভিযানে মূল উপজীব্য করে তুলেছিলেন। এ প্রচারে—কখনও প্রত্যক্ষ কখনও পরোক্ষভাবে—যে বক্তব্যটা বেরিয়ে আসত, তা হলো এই : ভারতীয় রমণীরা, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই, তাদের স্ব-স্ব অতীতাশ্রয়ী রক্ষণশীল ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা অবদমিত ও শোষিত। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন—ও খ্রিস্টীয় ধর্মে ভারতীয়দের ধর্মান্তরকরণ—একমাত্র এইসব সদুপায়েই ভারতীয় নারীদের মুক্তি সম্ভব![৩০]

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে অবশ্যই এ সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয় যে উনিশ শতকে ভারতবর্ষে আগত সব ইংরেজই প্রত্যক্ষ ও সচেতনভাবে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বার্থে

এদেশে শিক্ষা প্রসার ও সমাজ সংস্কারে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। অনেকেই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় রমণীকুলকে একমাত্র পাশ্চাত্য জ্ঞান ও শিক্ষার আলোক দিয়েই 'উদ্ধার' করা যেতে পারে।

কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার—খোদ ইংলন্ডে ঐ সময় ইংরেজ রমণীকুলের অবস্থা তাদের ভারতীয় ভগিনীদের থেকে খুব একটা ভালো ছিল না। এদেশে যদি অতীতাশ্রয়ী ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার নারীদের অবদমিত করে থাকে, ঐ একই সময়ে ইংলন্ডে আধুনিক ধনতান্ত্রিক শোষণব্যবস্থা অনুরূপভাবে ইংরেজ রমণীদের উৎপীড়িত করেছিল। অসহনীয় দারিদ্র্য, অত্যল্প উপার্জন বা সম্পূর্ণ বেকারত্ব, বহু নারীকে দেহোপজীবনী হতে বাধ্য করেছিল।

ভিক্টোরিয়ার আমলে লন্ডনের রাস্তাঘাটে বারবনিতাদের প্রকাশ্য জীবিকা অর্জনের ঘটনার উল্লেখ করে সমসাময়িক এক পর্যবেক্ষক মন্তব্য করেন যে এ ধরনের ব্যাপার প্যারিস, বার্লিন, নিউইয়র্ক, বা "এমনকি এশিয়ার শহরগুলিতেও" দেখা যায় না।[৩১]

এদেশে বাল্যবিবাহ প্রথার নিন্দা করে ইংরেজ শাসকেরা যখন ভারতীয়দের গালিগালাজ করছিল, ঠিক তখনই তাদের নিজেদের দেশে বাল্য-বেশ্যাবৃত্তি আইনের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে অবাধে বিরাজ করছিল। এই ব্যবসায়ে বালিকাদের 'সম্মতি(?)'-র বয়স, ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত বারো বলে ধার্য হয়েছিল। তারপর বাড়িয়ে তেরো করা হয়। ১৮৮৫ সালে *Pall Mall Gazette* পত্রিকায় মেয়ে বেচা-কেনার চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হবার পর, শেষ পর্যন্ত ১৮ বছর বেশ্যাবৃত্তিতে যোগদানের নিম্নতম বয়স হিসেবে আইনত গণ্য হয়।[৩২]

পুরুষ-অধ্যুষিত সমাজের বৈষম্যমূলক নীতি থেকেও ইংরেজ রমণীরা রেহাই পাননি। এদেশে ইংরেজ শিক্ষাবিদ ও প্রশাসকেরা যখন ভারতীয় নারীদের শিক্ষার আলোক-বর্ষণ করে সভ্য ও স্বাধিকার-সচেতন করে তোলবার আদর্শে ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের নিজেদের দেশে ইংরেজ রমণীদের তখন উচ্চশিক্ষার ও স্বাধিকার দাবি করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছিল সেই একই কর্তৃপক্ষ। ১৮৬০ সালে, সাতজন ইংরেজ রমণী এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাতা হন। আদালতে যখন তাঁরা এর বিরুদ্ধে নালিশ করেন, তখন তাঁদের আর্জি খারিজ করে বিচারকেরা বলেন যে চিকিৎসাবিদ্যা পুরুষদের জন্য কেবল; মেয়েদের স্থান নেই সেখানে![৩৩]

উচ্চশিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইংরেজ মহিলাদের এই বৈষম্যমূলক নীতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের প্রবেশাধিকার বন্ধ ছিল ১৮৬৯ পর্যন্ত; অক্সফোর্ডে তারও পরে ১৮৭৮-এ ছাত্রীরা ভর্তির অনুমতি পায়।

আরও আশ্চর্যের বিষয়—১৮৭৩ সালে এদেশে বসে বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা কেরির মামলা উপলক্ষে যে ভয় ও সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, ঠিক একই ধরনের আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন ইংলন্ডে তিন বছর আগে (১৮৭০-এ) ইংরেজ রক্ষণশীল নেতারা, যখন পার্লামেন্টে Married Women's Property Bill, বা বিবাহিতা স্ত্রীর সম্পত্তি-বিষয়ক আইন নিয়ে বিতর্ক হয়। হাউস অফ লর্ডসে একজন সদস্য আইনটিকে এই ভাষায় আক্রমণ করেন—"গত এক হাজার বছরেরও উপর এ দেশে যে গার্হস্থ্য শৃঙ্খলা বিরাজ করেছে, তার সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন!" তারপরই বক্তা, ভবিষ্যতে স্ত্রীরা সম্পত্তি হাতে পেলে কী করবে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন—"যদি কোনো স্ত্রী, তার স্বামী অপেক্ষা অপর কোন পুরুষের প্রতি বেশি অনুরক্ত হয়, তাহলে তারই উপর (সম্পত্তি থেকে উপার্জিত) সমস্ত আয় অপব্যয় করবে।" ঐ একই বিতর্কে অংশগ্রহণকারী আর একজন সদস্য, আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন—"(সম্পত্তির অধিকার পেলে) স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে, আর সব পুরুষকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাবে।"[৩৪]

দেখা যাচ্ছে, কী রাজার জাত ইংরেজ, কী তাদের ভারতীয় প্রজা, নারীর অধিকারের প্রশ্নে উভয় সম্প্রদায়ের পুরুষই সেই একই ভরসা ও ভয়ের দোটানায় দোদুল্যমান ছিল সে-সময়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পদতলে নারীর ঐকান্তিক আনুগত্যই সমাজের নিরাপত্তা ও স্থিতি টিকিয়ে রাখার একমাত্র ভরসা বলে পরিগণিত হয়েছিল তাদের কাছে। এ দেশে—দ্বিজেন ঠাকুরের ভাষায়—"অতীতের ভাল ভাল হিন্দু নিয়ম কানুন" এবং বিশেষ করে "নারীর সতীত্ব বিষয়ক নিয়ম কানুন", এই সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার মূল ভিত্তি। আর সমসাময়িক ইংলন্ডে,—লর্ড ওয়েস্টবারির ভাষায়—এক হাজার বছরের 'গার্হস্থ্য শৃঙ্খলা'—তাদের সমাজের নিরাপত্তার ভরসাস্থল। এই ঐতিহ্যগত নিরাপদ স্থিতাবস্থার গণ্ডি ডিঙিয়ে মহিলাদের কোনো অধিকার দিলেই, ভয়ের কারণ। অধিকার পেলেই নারী ব্যভিচারিণী হয়ে যাবে! এ দেশে সে (ভবানীপুর ধর্ম্মোৎসাহিনী সভার মতে) "ভদ্রাসনে পরিবারের মধ্যে ও সমক্ষে যথেচ্ছ ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হইবে।" আর ইংলন্ডে, সে (Lord Shaftesbury মতে) স্বামীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্য পুরুষদের ঘরে নিয়ে তুলবে।

আসলে, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বা নারীদের স্বাধিকারের প্রশ্নটা, সারা উনিশ শতক ধরেই একটা manipulation বা কাজে লাগানোর ধান্দা হয়ে দাঁড়িয়েছিল—বাঙালি উকিলদের হাতে, ইংরেজ শাসকদের কাছে ও বাঙালি নব্যজাত জাতীয়তাবাদীদের বক্তৃতায়। উকিলরা বিধবা মক্কেলদের সম্পত্তিপ্রাপ্তি বা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে উৎসাহী ছিলেন

নিজেদের পেশাগত মতলবে। ইংরেজ শাসকেরা এ প্রশ্নটাকে ব্যবহার করেছিল নিজেদের ঔপনিবেশিক স্বার্থের নৈতিক অনুমোদন জোগাড়ের তাগিদে—ভারতীয় রমণীকুলের উদ্ধার করার মহৎ কর্তব্যের নামে। এই সূত্রে, মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত বাঙালি বা ভারতীয় মহিলারা, ইংরেজ বিচারকদের হাতে পড়ে অনেক সময় একটা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের দাবাখেলায় নিরীহ ঘুঁটিতে পরিণত হতেন। যেহেতু এইসব মামলায় অনেক সময়ই পুরুষ (বা পুরুষ সমর্থিত মহিলা) বাদী, ও মহিলা বিবাদী থাকতেন, বিবাদীর পক্ষে ইংরেজ বিচারকের রায়, তদানীন্তন বাঙালি সমাজে পিতৃতান্ত্রিক পুরুষ নেতৃত্বের শাসনের বিরুদ্ধে বিদেশি শক্তির হুমকি বলে বিবেচিত হত। উনিশ শতকের শেষে সদ্য-উন্মেষিত জাতীয় নেতৃত্ব, এইসব পারিবারিক বিবাদে ও সামাজিক সমস্যায় ইংরেজ আদালতের সালিশি, বা ইংরেজ প্রশাসনের মধ্যস্থতা, নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধার্থে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁদের ইংরেজ-বিরোধী প্রচার অভিযানে (অন্যান্য অভিযোগের পাশাপাশি) একটা বড়ো নালিশ ছিল—বিজাতীয় শাসন-ব্যবস্থা ভারতীয় নারীদের অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণে ও নিয়মকানুনে হস্তক্ষেপ করে, ভারতীয় জাতীয় আত্মার অন্তঃস্থলে আঘাত করেছে।[৩৫] সে-যুগের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি প্রচার অভিযানে একটা সুবিধাবাদী সরলীকরণের প্রবণতা ছিল। ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনের জন্য গোঁড়া রক্ষণশীল চিন্তাধারাকেও প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। এবং এই প্রশ্রয় দিতে গিয়ে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে জলাঞ্জলি দিতে হয়েছিল। ইংরেজ প্রশাসন, ও বিচারব্যবস্থা (তাদের নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে), ভারতীয় মহিলাদের স্বাধিকারের অনুকূলে যখনই হস্তক্ষেপ করেছে, তখনই ইংরেজ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক কর্মসূচি ও কর্মকৌশলে এই ধরনের হস্তক্ষেপ আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে। যেহেতু ইংরেজ প্রশাসন ভারতীয় নারীদের পর্দানশীনতা ও অন্যান্য কুসংস্কারের বন্ধন থেকে বার হয়ে আসার জন্য প্রচার করেছে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা তাঁদের সর্বব্যাপী ইংরেজ-বিরোধী অভিযানে এই বিজাতীয় প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হতে বাধ্য হয়েছেন।

তাই, উনিশ শতকের শেষদিকে আমরা দেখতে পাই, জাত্যভিমান ও দেশপ্রেমিকতার সঙ্গে গোঁড়া হিন্দু চালচলনের সমর্থন ক্রমশই একাত্ম হয়ে যাচ্ছিল।[৩৬] ঐ শতকের গোড়ায় স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রশ্নে বাঙালি শিক্ষিত সমাজে যে মানসিক প্রশস্ততার, ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ দেখা দিয়েছিল, তা পরবর্তী দশকে ক্রমশই পিছু হটতে হটতে পর্দানশীন হতে বাধ্য হয়েছিল অগ্রগামী জাতীয়তাবাদের রাজনীতির ধাক্কায়।

টীকা

১. *Economic and Political Weekly*, December 11, 1993 pp. 2689-90.
২. *Weekly Reporter*, April 9, 1873, Vol. XIX p. 412.
৩. 'অসতী বিধবার বিষয়াধিকার বিষয়ে বক্তৃতা—ভবানীপুর ধর্মোৎসাহিনী সভায় শ্রীপ্রাণনাথ পণ্ডিত দ্বারা বিবৃত।' ৩০শে বৈশাখ, শকাব্দ : ১৭৯৫।
৪. ঐ, পৃ. ৩-৫।
৫. ঐ, পৃ. ৫।
৬. *Weekly Reporter*, pp. 381-84.
৭. ঐ।
৮. প্রাগুক্ত, 'অসতী বিধবার বিষয়াধিকার...' পৃ. ১৪
৯. *বামাবোধিনী পত্রিকা*; মাঘ ১২৭০; পৃ. ৬৬-৬৭
১০. *Bengal Law Court Reports*, Original Civil 1869, March 10.
১১. Eric Stokes; Percival Spear, pp 122-24. শ্বেতাঙ্গ জাতির, ভাগ্যনির্দেশিত দায়িত্ব, বা White Man's Burden রূপে, ইংরেজরা ভারতবাসীদের সভ্য করার যে উদ্দেশ্য ঘোষণা করত, তার পিছনের মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরবর্তী যুগের একজন ঐতিহাসিক লিখেছিলেন—"ইংরেজের মানসিক ধাতে, সাম্রাজ্য শাসন বেশ একটা সুখদায়ক অনুভূতি। কিন্তু তার রাজনৈতিক বিবেকের কাছে এটা একটু বেমানান। তাই এর সমন্বয় সাধন ক'রতে গিয়ে, তাকে মনে করতে হয়েছিল যে এটা (সাম্রাজ্য-শাসনের প্রয়োজন) তার উপর জোর করে আরোপিত করা হয়েছে কর্তব্য হিসেবে।" (C. Gill, 'National Power and Prosperity', 1916. উদ্ধৃত হয়েছে—R. Hyam ও G. Martin, p. ৪)
১২. Anonymous-*Calcutta in 1857*। পুনর্মুদ্রিত - P. Thankappan Nair, p. 1013
১৩. এ প্রসঙ্গে এক সমসাময়িক ইংরেজের নিম্নলিখিত মন্তব্যটি উল্লেখনীয় :
"...এ দেশের দুঃখী রমণীদের, অবজ্ঞার চোখে না দেখে, তাদেরকে করুণার চোখে আমাদের (ইংরেজদের) দেখা উচিত। ইংরেজ মূলধন বিনিয়োগ, ও দৃষ্টান্ত স্থাপনের দ্বারা, ভারতীয় রমণীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করে ভারতবর্ষে যে উদ্দীপনা সঞ্চারিত করা হয়েছে, তা এ দেশে আমাদের মঙ্গলসাধক কাজকর্মের মধ্যে কম বাহাদুরির কাজ নয়। এমন একদিন আসবে, যেদিন...ভারতবর্ষের কন্যারা...তাদের পূর্বপুরুষদের মুর্খতা স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে...আর তাদের নিজেদের সৌভাগ্য দেখে মৃদু হাসি হাসবে।" (Captain N. Augustus Willard, *A Treatise of the Music of India*. 1834. ১৯৬২ সালে পুনর্মুদ্রিত *Music of India* (কলকাতাতে অন্তর্ভুক্ত। p. 76)
১৪. *Weekly Reporter*, Civil Rulings, Vol, XVIII, 1872, pp-445-46. সে-যুগে সম্ভ্রান্ত বাঙালি বাড়িওয়ালাদের মধ্যে, বারবনিতাদের বাড়ি ভাড়া দেবার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরিবারের কোনো একজন পূর্বপুরুষ উনিশ শতকের শুরুতে বৌবাজার অঞ্চলে বেশ কয়েক ঘর সম্বলিত একটি বেশ্যালয়ের মালিক ছিলেন। (S.N. Mukherjee, p. 13).

১৫. *Weekly Reporter* : Vol. XVII, Criminal Rulings p. 12.

১৬. ভারতবর্ষে নিম্নবর্ণের সমাজে প্রচলিত customary law-কে স্বীকৃতি দেবার সপক্ষে যে মুষ্টিমেয় ইংরেজ আইনজ্ঞ সে-যুগে তর্ক করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন J. H. Nelson—যিনি Jackson-এর সমসাময়িক, এবং মাদ্রাজে Small Causes Court-এ বিচারপতি ছিলেন। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : J. D. M. Derrett রচিত 'J. H. Nelson : A Forgotten Administration...' নামে একটি প্রবন্ধ, যেটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে C. H. Phillips সম্পাদিত *Historians of India, Pakistan and Ceylon*-এ)

১৭. Lucy Carrol, 'Law, Custom and Statutory Social reform' in J. Krishnamurty ed. -এ অন্তর্ভুক্ত।

১৮. ভারতের প্রাচীন আইন-কানুন পরিবর্তন, ও নিজেদের স্বার্থে তাদের উপযোগী করে তোলার ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টার একটা কৌতূহলোদ্দীপক বিশ্লেষণ পাই, উনিশ শতকের শুরুতে এ দেশে ইংরেজ আগন্তুক Viscont-George Valentia-র বিবরণী থেকে। তাঁর মতে ব্রাহ্মণরা একটা শক্তিশালী সম্প্রদায় যাদের নিম্নবর্ণের লোকেরাও সম্ভ্রমের চোখে দেখে। সুতরাং যে নিয়মকানুন-রীতিনীতির বনিয়াদের উপর তাদের ক্ষমতা ও উচ্চ পদমর্যাদা নির্ভরশীল, তাকে উলটোবার চেষ্টা করলে এই ব্রাহ্মণ সমাজ তাদের সমস্ত শক্তি ও প্রভাবের জোরে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে। অতএব, তাদের সম্মান দেখিয়ে ও তাদের কুসংস্কারের প্রতি পূর্ণমাত্রায় সহিষ্ণু হয়ে, তাদেরকে দিয়ে কিছু (ইংরেজদের পক্ষে) উপযোগী ও প্রয়োজনীয় আইন কার্যে পরিণত করা যায়। (Voyages and Travels to India, Ceylon, the Red Sea, Abyssinia, and Egypt, in the years 1802, 1803, 1804, 1805 and 1806 থেকে উল্লিখিত বিবরণী সংকলিত হয়েছে P. Thankappan Nair-এর p. 20)

১৯. Bipin Chandra Pal, pp. 218. 19. এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। ভারতীয় নারীদের অধিকারের ব্যাপারে ইংরেজ বিচারপতিদের সহানুভূতি, তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী অবস্থান থেকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি। যখনই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনো ভারতীয় প্রতিবাদ করেছে, এই একই বিচারকেরা তাঁকে শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ Richard Couch-এর কথাই ধরা যাক। কেরি কালিতানির মামলায় তার রায় পড়ে তাঁকে বেশ একজন উদারনৈতিক ন্যায়পরায়ণ বিচারপতি বলে মনে হয়। কিন্তু এই একই Richard Couch ১৮৭৫ সালে, এক মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে বরোদার রাজা গায়কোয়াড়কে কারাবাসের আদেশ দেন। গায়কোয়াড়ের আসল অপরাধ—বরোদাতে নিযুক্ত ইংরেজ রেসিডেন্ট Colonel Phayre-এর বরোদার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে গায়কোয়াড়ের অস্বস্তি প্রকাশ।

২০. Edwin Hirschman, p. 144.

২১. ঐ, pp. 13, 144.

২২. ঐ, p. 122.

২৩. Bipin Chandra Pal, p. 333.
২৪. *The Bengalee*, April 26, 1873.
২৫. প্রাগুক্ত, 'অসতী বিধবার বিষয়াধিকার...', পৃ. ১১।
২৬. *The Bengalee*, May 17, 1873.
২৭. *মধ্যস্থ*, অগ্রহায়ণ, ১২৮০। দ্রষ্টব্য : *Report of the Native Papers*, Week ending May 3, 1873.
২৮. বৈষ্ণবচরণ বসাক, পৃ. ৪৯৩-৯৫।
২৯. *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, ১লা শ্রাবণ, ১৭৬৮ শক, ৩৬ সংখ্যা। (সূত্রঃ বিনয় ঘোষ, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১০৬)।
৩০. ভারতীয় রমণীদের প্রতি ইংরেজ প্রশাসকদের দায়িত্ব কী হওয়া উচিত, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একজন সমসাময়িক বলেন—"আমরা প্রভাব খাটিয়ে এই দুর্বল মহিলাদের তাঁদের হারানো স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে পারি। তবে দেখতে হবে যাতে আমরা ওঁদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ নৈতিক ও সামাজিক নীতিবোধ সঞ্চারিত করতে পারি যাতে এই নব্যলব্ধ স্বাধীনতা ওঁরা অপব্যবহার না করেন..." (George Campbell, p. 654.
৩১. William W. Sanger, p. 654.
৩২. Angela Leighton, 'Because Men made the Laws...' (Isabel Armstrong সম্পাদিত) p. 343.
৩৩. Jane C. Ollenburger ও Hele A. Moore (ed.), p. 143.
৩৪. Lee Holcombe, pp. 174-75.
৩৫. এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় ১৮৭৬ সালে যুবরাজ সপ্তম এডোয়ার্ডের কলকাতা আগমন। এক রাজভক্ত প্রজা—জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় যুবরাজকে তাঁর ভবানীপুরের বাড়ির একেবারে অন্দরমহলে নিয়ে গিয়ে, তাঁর ঘরের মেয়েদের দিয়ে আপ্যায়ন করান। ঘটনাটা নিয়ে সে সময়ের কলকাতার বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে খুব উত্তেজনা হয়েছিল। অন্তঃপুরবাসিনী বাঙালি মহিলাদের পরপুরুষের সামনে বেআব্রু করার বিরুদ্ধে *অমৃতবাজার পত্রিকা*-র নিম্নলিখিত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—"হিন্দু সমাজ সকল নিষ্পীড়নই সহ্য করিতে পারে, কিন্তু হিন্দু পরিবারের উপর কোনরূপ আঘাত হইলে উহা সহ্য করিতে পারে না। আমরা সর্বস্বচ্যুত হইয়াছি—আমাদের থাকিবার মধ্যে হিন্দু পরিবার আছে, আমাদের গৌরবস্থান এই পরিবার। এই পরিবারে যাহাতে কলঙ্ক হয় এরূপ কার্য যিনি করেন তিনি হিন্দুজাতির শত্রু, হিন্দু সমাজের কলঙ্ক।" জগদানন্দকে তিরস্কার করার পর পত্রিকাটি জগদানন্দের পরিবারের মহিলাদের কী শাস্তি হওয়া উচিত, সে বিষয়ে পরামর্শ দেয়—"যে কুলকামিনীরা যুবরাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাদের স্বামীগণ যদি তাহাদিগকে বলেন যে—তোমাদিগকে আমরা আর গৃহে লইতে পারি না, তাহা হইলে হিন্দু সমাজ, কি কামিনীগণের স্বামীদের প্রতি কেহ কোন দোষারোপ করিতে পারে না।" (২৩শে পৌষ, ১২৮২)

মজা হচ্ছে, নাটের গুরু যুবরাজ এডোয়ার্ডের হ্যাংলামো (বাঙালি অন্দরমহলে প্রবেশের শখ)-র বিরুদ্ধে কোনো উচ্চবাচ্য না করে, বা আসল অপরাধী জগদানন্দ ও তার পুরুষ চেলাদের কোনো শাস্তির কথা না তুলে, *অমৃতবাজার* তাদের বৌ-ঝিদের বলির পাঁঠা করে স্বদেশপ্রেমের বিজ্ঞাপন জারি করল।

৩৬. এই প্রবণতার একটা উৎকট প্রকাশ ঘটেছিল ১৮৮৩ সালে কলকাতার প্রধান বিচারালয়ে এক মামলা উপলক্ষে। মামলাটা ছিল এক পরিবারের দুই বিবদমান শরিকের মধ্যে, বংশপরম্পরাগত এক শালগ্রাম শিলা রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে। Norris নামে এক ইংরেজ বিচারক শালগ্রাম শিলাটিকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেন, এবং যখন সেটি উপস্থিত করা হয়, সেটিকে পরীক্ষা করে Norris সাহেব খারিজ করে দেন এই বলে যে ঐ পাথরের টুকরো একশো বছরের বেশি হতে পারে না। এই রায় শুনে তদানীন্তন বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ তাদের 'ধর্মে আঘাত' করা হয়েছে এই অভিযোগে (যেটা আজকে বিংশ শতাব্দীর এই শেষ পর্বে সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গোঁড়া মুরুব্বিরা যে-কোনো ছুতোতে কাজে লাগাচ্ছে) ফেটে পড়ে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মুখপত্র *Bengalee* সংবাদপত্রে Norris-এর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন এবং এর ফলে Contempt of Court বা আদালতের অবমাননার অভিযোগে দু-মাসের জন্য কারারুদ্ধ হন। জেল থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসে তিনি কলকাতার যুব ও ছাত্র সমাজের তরফ থেকে বিপুল সংবর্ধনা পান এবং defender of faith বা '(হিন্দু) ধর্মের রক্ষক'—এই উপাধিতে ভুষিত হন। এতে কিছুটা বিব্রত বোধ করলেও, পরে সুরেন্দ্রনাথ লেখেন—"এটা সবাই-ই জানত যে গোঁড়া হিন্দুত্বর আমার কাছে কোন আবেদন ছিল না, আমার চিন্তাধারা ছিল প্রগতিশীল, এবং আমার জীবন-যাপনের ধারাও ঐ চিন্তাধারা-সম্মত ছিল। আমার মত, এই ধরনের চিন্তা ও বিশ্বাসসম্পন্ন মানুষ যে আমার দেশের গোঁড়া মানুষের সযত্ন-লালিত বিশ্বাসের সপক্ষে দাঁড়িয়ে শাস্তি ভোগ করবে, এটা একটা কম প্রশংসনীয় কাজ ছিল না..." (*A Nation in Making*, 1925. পুনর্মুদ্রিত OUP সংস্করণ, 1963 p. 76) এই ঘটনাটা, বাঙালি হিন্দু শিক্ষিত নেতৃত্বের চিন্তাধারার পরিবর্তনের পরিচায়ক। উনিশ শতকের শুরুতে যে বাঙালি চিন্তাবিদেরা ধর্মীয় কু-সংস্কার বিরোধী অভিযানে নেমেছিলেন, উনিশ শতকের শেষার্ধে তাদের উত্তরসুরিরা সেই কুসংস্কারকেই আঁকড়ে ধরে, তার সংরক্ষণকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিকল্প আদর্শ হিসাবে তুলে ধরলেন।

সোনাগাজি ও বটতলা : দুই যমজের কাহিনী

১

দূরত্ব বেশি নয়। প্রায় পিঠো-পিঠি বললেই চলে। উনিশ শতকের কলকাতায়, দেহোপজীবিনীরা শহরের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে বসবাস করলেও, আসল কেন্দ্রস্থল ছিল সোনাগাজি, বা আজকে যাকে বলা হয় সোনাগাছি। পূর্বে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, পশ্চিমে চিৎপুর—এর মধ্যিখানের ব্যাপক অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছিল বেশ্যাদের উপনিবেশ। আর চিৎপুরের দুই পাশের অলি-গলিতে, দক্ষিণে বড়বাজার থেকে উত্তরে কুমারটুলি পর্যন্ত, অজস্র ছোটোখাটো ছাপাখানা নিয়ে তৈরি হয়েছিল 'বটতলা'র সাম্রাজ্য। আদি উৎসস্থল, শোভাবাজারের বটতলার বাঁধানো চাতাল (যার আশেপাশেই হয়তো এইসব ছাপাখানাগুলি শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক নাগাদ) ছাড়িয়ে এই জনপ্রিয় সস্তা বই-এর ব্যবসা অল্প সময়ের মধ্যেই উত্তর ও মধ্য কলকাতার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল করায়ত্ত করে 'বটতলা' সাহিত্যের সাম্রাজ্য স্থাপন করে; ঠিক যেমন ভাবে সোনাগাজির কবর-এর আশপাশ ছাড়িয়ে বেশ্যাপল্লী এক ব্যাপক উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি।

বটতলা-সোনাগাজি—যমজ ভাই-বোন বলা যেতে পারে। প্রায় একই সময় দু'জনের জন্ম। উভয়ের খদ্দেরদের ব্যাপক অংশ একই দলভুক্ত—কলকাতার খেটে-খাওয়া,

দিনান্তে ক্লান্ত-বিপর্যস্ত, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, স্বল্পশিক্ষিত চাকুরিজীবী, ফোড়ে-দালাল, পরাশ্রয়ী সুযোগ-সন্ধানী, হঠাৎবাবু ও তার মোসাহেব। এক দঙ্গল যেত সোনাগাজিতে 'ফুর্তি'-র সন্ধানে, দৈহিক উত্তেজনার খোঁজে। আর এক দঙ্গল মানসিক আমোদ পেত বটতলার রোমাঞ্চকর কাব্য-উপাখ্যান-প্রহসনের দৈনন্দিন পসরায়। অধিকাংশ সময়ই, উভয়ের খদ্দের একই মানুষ। সোনাগাজির বারবনিতারা প্রতি রাত্রে এদের জন্য এদের অভীপ্সিত কল্পলোক তৈরি করে ফুর্তি বিতরণ করতেন নিজেদের দেহগুলোকে পণ্যদ্রব্য বানিয়ে। আর, বটতলার সাহিত্যিকেরা এদের চিত্তবিনোদনের জন্য নিজেদের মগজের সুতোগুলোকে পাক দিয়ে দিয়ে আর-এক ধরনের ভোগ্যপণ্য তৈরি করতেন।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক বাঙালি সমাজে, গণিকাবৃত্তি ও লোকসাহিত্যের সঙ্গে পরবর্তী যুগের কলকাতার দেহোপজীবিকা ও বটতলা-সাহিত্যের যথাক্রমে কিছু কিছু আপাতদৃষ্ট সাদৃশ্য থাকলেও, দুটোর চরিত্র আলাদা। সোনাগাজি গড়ে উঠেছিল ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি কলকাতার নাগরিক সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে। যে নতুন ধরনের নাগরিক কলকাতায় জন্ম নিয়েছিল ও পরিবর্ধিত হচ্ছিল, তাদের নিত্যনৈমিত্তিক হরেক রকমের চাহিদা মেটাবার জন্য ও চিত্তবিনোদনের প্রয়োজনে নানা ধরনের পেশা একই সঙ্গে উদ্ভাবিত হচ্ছিল। পৃথিবীর 'আদিম পেশা'-ও এই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতায় নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। সোনাগাজির বাসিন্দাদের নিত্যনতুন বিনোদনের কায়দা আয়ত্ত করতে হয়েছে নতুন প্রজন্মের খদ্দেরদের খুশি করার জন্য।[১] ঠিক একইভাবে, পুরোনো লোকসাহিত্যের ধারা এই নাগরিক পরিবেশে, অতীতের রেশ বজায় রেখেও শহরে মোড় নিয়েছিল পারিপার্শ্বিক সামাজিক পরিস্থিতি ও ঘটনার চাপে। 'বটতলা' সাহিত্য এই নাগরিক লোকসাহিত্যেরই typical নমুনা। ছাপাখানার প্রবর্তন ও তার ব্যাপক বিস্তারের সুযোগ নিয়ে বটতলা সাহিত্যিকেরা লিখতে শুরু করেন। একটা সহজলভ্য পাঠক-সম্প্রদায়ও তৈরি হয়ে গিয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের মধ্যে। অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, অল্প-বিস্তর শিক্ষিত একটা ব্যাপক বাঙালি সমাজ, ধর্মগ্রন্থপাঠে আগেই অভ্যস্ত ছিল। ছাপাখানা আসার ফলে, এইসব গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার সম্ভব হয় এদের মধ্যে। ধর্মগ্রন্থের পাশাপাশি 'বিদ্যাসুন্দর' এবং ঐ জাতীয় জনপ্রিয় প্রেমোপাখ্যানেরও বহুল প্রচার হতে থাকে।[২] এই শেষোক্ত পুস্তিকাগুলির জনপ্রিয়তাই পথ পরিষ্কার করে দেয় বটতলার সামাজিক লিপিকারদের জন্যে। সস্তা কাগজ, সস্তা ছাপাখানা এবং সহজবোধ্য বাংলা ভাষা (বৈয়াকরণিক মাপকাঠিতে অনেক সময়-ই অশুদ্ধ বলে বিবেচিত)—এই তিনটির সমকেন্দ্রাভিমুখতা বটতলার সামাজিক সাহিত্যের সাফল্যের মূলে। বটতলার সাহিত্যিকরা অধিকাংশই

এসেছিলেন তাঁদের পাঠকদের সামাজিক পরিবেশ থেকে। বরাবরই শ্রুতিনির্ভরশীল, এই পাঠকসমাজ কোনোদিনই ব্যাকরণ-সম্মত বানানের ধার ধারেননি। কথ্য ও চলতি বাংলার প্রতিরূপ ছাপার অক্ষরে পেলেই—এবং তা বুঝতে পারলেই তাঁরা সন্তুষ্ট হতেন। ঐ শ্রুতিনির্ভরশীলতার ঐতিহ্যের জন্যেই, বটতলার কবিরা তাঁদের কাব্যপুস্তিকায় ব্যবহার করেছিলেন পুরোনো পয়ার ছন্দ এবং লোকসঙ্গীতের পরিচিত তাল।

সোনাগাজি ও বটতলা তাই হাত ধরাধরি করেই বড়ো হয়ে উঠেছিল। বটতলার চটি বইগুলিতে পাওয়া যায় সোনাগাজির বাসিন্দাদের জীবন-যাত্রার মিঠে-কড়া বর্ণনা—যেগুলিকে শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন খারিজ করে দিয়েছেন 'ইতর ছ্যাবলামির পুস্তিকা' ও 'আদিরসালো ইতরভাবালু পুস্তিকা' বলে।[৩] আবার সোনাগাজির বেশ্যাদের গানে পাওয়া যায় ঐ বটতলার ছাপানো সস্তা জনভাষ্য *বিদ্যাসুন্দর* বা ঐ জাতীয় প্রেমকাহিনি থেকে আহৃত রূপকালঙ্কার। দুই ভাই-বোনের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান চলেছে। দুজনের কপালেই বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোকদের ও ইংরেজ সরকারি কর্তৃপক্ষের অভিশাপ ও নির্যাতন জুটেছে প্রায় একই সময়—১৮৫০-'৭০-এর দশকে। ১৮৬৮ সালে প্রবর্তিত CDA (Contagious Diseases Act) সোনাগাজির বাসিন্দাদের ব্যবসা প্রায় যেতে বসেছিল। আর, ১৮৫৬ সালে অশ্লীলতা-বিরোধী আইন এবং বটতলার প্রকাশকদের বই বাজেয়াপ্ত ও জরিমানা, বটতলার ব্যবসায় প্রায় লালবাতি জ্বালিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিল। অবশ্য, উভয়েই সাময়িক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে, বহাল তবিয়তে উনিশ শতকের কলকাতায় রাজত্ব করে গেছে।

সোনাগাজি ও বটতলার এই যুগপৎ ক্রমবিকাশ ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার অবকাশ আছে। এ প্রবন্ধের অল্প পরিসরে তার সুযোগ নেই। তাই দুই-একটি বটতলার কাব্য-পুস্তিকার আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ রাখছি।

তার আগে, উনিশ শতকের কলকাতার বারবনিতা সমাজের চেহারাটা একটু জানা দরকার। বটতলার প্রকাশনা ব্যবসার তথ্যপূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনা নানা জায়গায় পাওয়া যায়।[৪] সে তুলনায়, সমসাময়িক এবং প্রতিবেশী দেহোপজীবিকা নিয়ে ঐ ধরনের আলোচনা বড়ো একটা চোখে পড়ে না (চটুল, সুড়সুড়ি দেওয়া গপ্পোকাহিনির কথা বলছি না; তার অভাব কখনও হয়নি বাংলা সাহিত্যে)। ব্যতিক্রম দু-একটি গবেষণা।[৫]

সমসাময়িক তথ্য থেকে জানা যায় যে কলকাতায় বারবনিতাদের সংখ্যা ১৮৫৩ সালে ১২,৪১৯ থেকে বেড়ে ১৮৬৭-এ ৩০,০০০-এ গিয়ে দাঁড়ায়।[৬] *হুতোম প্যাঁচার নকশা*-য় (১৮৬২) কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুযোগ করছেন—"বেশ্যাবাজিটি আজকাল এ

সহরে বাহাদুরের কাজ ও বড়মানুষের এলবাত পোশাকের মধ্যে গণ্য, অনেক বড়মানুষ বহুকাল হলো মরে গ্যাচেন কিন্তু তাঁদের রাঁড়ের বাড়িগুলি আজও মনিমেন্টের মত তাঁদের স্মরণার্থ রয়েছে...কলকাতা শহর এই মহাপুরুষদের জন্য বেশ্যাশহর হয়ে পড়েচে, এমন পাড়া নাই যেথায় অন্তত দশঘর বেশ্যা নাই; হেথায় প্রতি বৎসর বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে বই কমচে না।"[৭]

অবশ্য শহরের সব বেশ্যারাই 'বড়মানুষের' সুনজরে পড়ে 'মনিমেন্টের' অধিকারিণী হননি। একটা চালু ধারণা—বিশেষ করে আধুনিক যুগে রচিত উনিশ শতকের কলকাতার উপর খেলো বাংলা উপন্যাসের কল্যাণে—যে সোনাগাজির বেশ্যারা কলকাতার ধনী পৃষ্ঠপোষকদের আশীর্বাদে বেগমের মতো জীবনযাপন করতেন। আসলে, অধিকাংশ বারবনিতাই গরিব ও দুঃস্থ ছিলেন। ঐ সময়কার এক সরকারি বিবরণী থেকে কলকাতায় বসবাসকারিণী বেশ্যাদের একটা শ্রেণি বিভাজন পাওয়া যায়। প্রথম শ্রেণি, "উচ্চবর্ণের হিন্দু মহিলা যাঁরা নিভৃতে বাস করেন এবং স্থানীয় ধনীদের রক্ষিতা।" সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য, এই জাতীয় মহিলাদের বাসস্থান ছিল চিৎপুর, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, উত্তরে বাগবাজার ও মানিকতলা স্ট্রিটের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। এ ছাড়া, মধ্যবিত্ত দেহোপজীবিনীরা "কোন বাড়িওলা বা বাড়িওলীর তত্ত্বাবধানে থাকেন এবং খাওয়া-দাওয়ার জন্য অগ্রিম ভাড়া দিতে হয়।" বাকি বিরাট অংশ, চিৎপুর ও তার আশেপাশের গলিতে বসবাসকারী "হিন্দু ও মুসলমান নর্তকী...যারা জাত-পাত নির্বিচারে খদ্দের আপ্যায়ন করে...মুসলমান, নিম্নবর্গের হিন্দু নিম্নস্তরের খ্রীস্টান বারবনিতা।" শেষোক্ত এই সংখ্যাধিক দেহোপ-জীবিনীদের সম্বন্ধে সরকারি আমলার উক্তিটা কৌতূহলোদ্দীপক—"এরা আমাদের প্রধান রাস্তাঘাটগুলিতে এক ধরনের মহামারীস্বরূপ। নিজেদের এমন বেহায়াভাবে প্রদর্শিত করে, যা পৃথিবীর অন্য কোথাও অচিন্তনীয়..."[৮]

উনিশ শতকের শেষার্ধে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক মন্বন্তর এবং গ্রামীণ অর্থনীতির ছারখারের ফলে, বিপন্ন অভাবগ্রস্ত মহিলাদের অনেকেই কলকাতাতে এসে দেহোপজীবিনী হতে বাধ্য হন। এর আগে, উচ্চবর্ণের কুলীন ঘরের কুমারী ও বধূ, হিন্দু, বাল-বিধবা ও ঘর থেকে ফুসলিয়ে বার করে আনা গৃহস্থ বধূরাই, মনে হয়, কলকাতার পতিতালয়গুলির বাসিন্দাদের প্রথম প্রজন্ম।[৯] পরবর্তী দশকে (১৮৬০-'৭০ থেকে) নিম্নবর্গের মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৭২ সালের এক সরকারি বিবরণী থেকে জানা যায়, কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বারবনিতাদের মধ্যে অধিকাংশই "তাঁতী, মালি, যোগী, কুমোর, কামার, চামার, সোনার বেনে, তেলী, জেলে, কৈবর্ত, ময়রা, বেদে, গোয়ালা, নাপিত," ইত্যাদি শ্রেণিভুক্ত।[১০]

সোনাগাজির ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে এই নানা শ্রেণির বারবনিতারাই ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন। পাকাবাড়ি থেকে শুরু করে বস্তি—খোলার ঘর, নানা ধরনের বাসস্থান গড়ে উঠেছিল। প্রাসাদোপম অট্টালিকার বারান্দা—আবার বড়ো রাস্তায় গ্যাসের আলোর নীচে—নানা জায়গা থেকেই খদ্দের আমন্ত্রণ ও তাদের সঙ্গে দর-দস্তুর পাকা করা হতো। ধনীদের রক্ষিতা (যাঁরা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের স্বনির্মিত বা ভাড়া-করা বাড়িতে স্বতন্ত্রভাবে থাকতেন) ছাড়া, বাকি মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণির দেহোপজীবিনীরা সোনাগাজির বিভিন্ন বাড়ি, খোলার ঘর ও বস্তির বাড়িওলী বা 'মাসির' তত্ত্বাবধানেই ব্যবসা করতেন। বাড়িওলীর উৎপাতে প্রায়ই এক ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে উঠে যেতে হতো। এ নিয়ে বারবনিতাদের সমসাময়িক গানে অনেক অনুযোগ পাওয়া যায়। এ ছাড়াও ছিল খুন-রাহাজানির ভয় এবং বিশেষ করে ১৮৬০-এর শেষে ও ১৮৭০-এর শুরুতে যৌনব্যাধিরোধকল্পে সরকারি আইন প্রয়োগের নামে পুলিশের উৎপাত।

সমসাময়িক সংবাদপত্রে বাঙালি ভদ্রলোকদের চিঠিপত্রে ও সম্পাদকীয় মন্তব্যে যে মনোভাবটা বেরিয়ে আসে তা হলো—বেশ্যারা, ভদ্রসন্তানদের তাদের বিবাহিত সংসার থেকে ফুসলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে; সুতরাং, বেশ্যাদের কলকাতা শহর থেকে বহিষ্কৃত করা দরকার; তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে; এবং নাট্যাভিনয়, বা ঐ জাতীয় প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে, বেশ্যাদের উপস্থিতি বা অংশগ্রহণ বন্ধ করতে হবে।[১১]

মজা হচ্ছে, দেহোপজীবিকার মূল নির্ভরস্থল অর্থাৎ পুরুষ খরিদ্দার, তাদের নিয়ন্ত্রণ বা শাস্তির কথা বাঙালি সমাজপতি এবং ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী—কারোরই ভাবনা-চিন্তায় দেখা যায় না। অবশ্য, সমসাময়িক যুগের সংবাদপত্র বারবনিতাদের কিছুটা স্থান দিয়েছিল তাঁদের তরফ থেকে নিজস্ব অভাব-অভিযোগ পেশ করার জন্য। কলকাতার একটি বারবনিতা ও মেদিনীপুরের 'বাসভ্রষ্ট বারাঙ্গনানাং' দুটি চিঠি লিখেছিলেন, যার থেকে জানতে পারি তাঁদের উপজীবিকা নির্বাচনের উৎস ও ব্যবসা-সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার সমস্যা।[১২]

ঐ যুগের সংবাদপত্রের মন্তব্য ও প্রহসন এবং অনেক নাগরিক লৌকিক ছড়া ও কবিতা থেকে মনে হতে পারে বেশ্যারা পুরুষদের ঠকিয়ে পয়সা লুঠে বাড়ি বাগান তৈরি করছে।[১৩] আসলে কলকাতার নিম্নশ্রেণির খেটেখাওয়া মানুষদের মধ্যেও বেশ্যাদের সম্বন্ধে একটা সন্দেহ-ভীতি-ঈর্ষা মিশ্রিত মনোভাব ছিল, যদিও অধিকাংশ দেহোপজীবিনী ঐ নিম্নশ্রেণিভুক্ত মানুষদের মতোই দারিদ্র্য-অসাচ্ছল্য ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। নারীদের দেহোপজীবিকাও যে আরও পাঁচটা বৃত্তির মতো নাগরিক জীবনে বেঁচে থাকার উপায়, এ কঠিন সত্যটাকে পুরোদস্তুরভাবে মেনে নেওয়া মুশকিল ছিল

নানা কারণে—ঐতিহ্যাশ্রয়ী নৈতিক মূল্যবোধ, নারীদেহ সম্বন্ধে সামাজিক ধ্যান-ধারণা, এবং সর্বোপরি স্ত্রীজাতির প্রতি চিরন্তন পুরুষালি মালিকানা, অবজ্ঞা ও সন্দেহপ্রসূত মনোভাব। একজন পুরুষের অধিকারের গণ্ডি লঙ্ঘন করে নারী স্বেচ্ছায় বহু পুরুষের সঙ্গে শারীরিকভাবে সম্পৃক্ত হচ্ছে ও তার উপার্জনে নিজেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করছে (যদিও বহুলাংশে খণ্ডিত ও অনিশ্চয়তাপূর্ণ)—এ ঘটনাটা স্বীকার করে নেওয়া, সে-যুগের নিম্নবর্গ বা উচ্চবর্গের বাঙালি কেন, আজকের আমাদের পক্ষেও অস্বস্তিকর (যদিও আরও অনেক উপজীবিকা-ভিত্তিক শারীরিক ও মানসিক বিকৃতিপূর্ণ বেচা-কেনা আমরা নির্বিবাদে হজম করি)।

২

বাড়ি-গহনা-ঐশ্বর্য সবার ভাগ্যে জোটেনি। অধিকাংশ বারবনিতার জীবন ছিল বিপদ-সঙ্কুল। সোনাগাজিতে বেশ্যা-খুন ছিল প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বটতলার একটি কাব্য উপাখ্যান ঐ সময়ের একটা অনুরূপ ঘটনার বিবরণী। Sensationalism বা রোমাঞ্চকর উত্তেজনা সৃষ্টির আড়ালে বারবনিতা জীবনের উত্থান-পতনের ইতিহাসের হদিশ পাই অখিলচন্দ্র দত্তের 'সোনাগাজির খুন'-এ (১২৮২)।

পয়ার ছন্দে রচিত উপাখ্যানটির শুরুতে সে যুগের সোনাগাজির সান্ধ্য পসারের, বটতলা ঢং-এ, একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়—

উত্তর বিভাগে কলিকাতা নগরের
সোনাগাজি পল্লি লেন এনাম বক্সের।।
যথা বারাঙ্গনা কুল সদা করে বাস।
রূপের ছটায় করি তিমির বিনাশ।।

… … …

বৈকালেতে বেশভূষা করি আপনার
বারাণ্ডায় আসিয়া যখন দেয় বার।।
নির্ধূম অনল যেন জ্বলে ধক্২।
পথিক পতঙ্গকূল পরাণ নাশক।।

… … …

কারবা সোনার সাট ডায়মন কাটা
কার কত ডায়মন কত আছে মাটা।।
কেহবা জড়াও সিঁতি জড়াইয়া শিরে।

আপনি আপন রূপ দেখিতেছে ফিরে।।
কেহ বা নাকেতে পরি বিবিয়ানা নত
নলকে ঝলক দিয়া আলো করে পথ।।
কেহ বা পরেছে গলে মুকতার হার।
মণিময় ধুকধুকি কোলে দোলে তার।।

... ...

কার সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম শাড়ি শান্তিপুরে
কেহ বা কেরেপ কেহ পরিয়াছে ডুরে।।
টৈরচা ফুলায়ের গুল বাহার ঢাকাই
কত মত বুটিদার কে কহিবে ভাই।।
বেনারসি বুটিদার ফুলদার কত
কামিনী কুলের মন তোষে অবিরত।।

... ...

স্পষ্টতই, দরিদ্র বেশ্যাপল্লীর বর্ণনা এটা নয়। পৌরাণিক কাব্যে বর্ণিত নন্দনকাননের অপ্সরাদের, বা ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দর*-এর, রাজনন্দিনী ও সখীদের বসিয়ে দেওয়া হয়েছে সোনাগাজির বাড়ির বারান্দায়, পারিপার্শ্বিক আটপৌরে বাস্তবকে কিছুটা romanticize করে বর্ণনা করতে গিয়ে এইভাবে অতীতের সাহিত্য থেকে ভাবমূর্তি ধার করার রেওয়াজ বটতলার এইসব কাব্যে প্রায়ই পাওয়া যায়।

উপাখ্যানের নায়িকার বর্ণনাও অনুরূপ ঢং-এ—

গোলাপ নামেতে এক আছিল কামিনী
ভুবনভামিনী রূপে মরাল গামিনী।।
বছর আঠার ষোল বয়স তাহার
সুভ্রবর্ণা সুলোচনা মধ্যম আকার।

এই গোলাপ একদিন হঠাৎ খুন হয়ে গেল। অপ্সরাদের জগতে এসে হাজির হল সাহেবি ধড়া-চূড়া পরা ইংরেজ দণ্ড-বিধাতা—

খুনি বলে যে জন হইল গ্রেরেপ্তার
রক্ষিত উপাধি কালী নাম শুনি তার।।
পুলিশের ডেপুটি কমিস্যানর জিনি
ল্যাম্বার্ট তাহার নাম, আইলেন তিনি।।

হতভাগ্য আসামির হাতকড়া হাতে।
রয়েছে উড়ানি গায় দেখেছি সাক্ষাতে।।
কৃষ্ণবর্ণ কলেবর দোহারা শরীর।।
মুখেতে দুচারি দাগ আছয়ে গুটির।
বয়স বছর ত্রিশ হয় অনুমান।
ল্যাম্বার্টের সঙ্গে রঙ্গে করিছে পয়ান।

তারপর কাতারে কাতারে লোক আসে আসামীকে দেখতে। বিশৃঙ্খলার রংচড়ানো, প্রায় হাস্যকর বর্ণনাতেও, সেই পৌরাণিক কাব্যের ধুন্ধুমারকাণ্ডের অতিরঞ্জিত বিবরণের মেজাজ পাই—

হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি তুমুল ব্যাপার
কে কার গায়েতে পড়ে ঠিক নাহি তার।।
ঝাঁকায় ঝাঁকায় ধাক্কা লেগে অবিরত
পথ যুড়ে ঝাঁকামুটে পড়িতেছে কত।।
গাড়িতে ২ লেগে গাড়ি চুরমার।
হইতেছে শত শত কত কব আর।।

অবশেষে—

ল্যাম্বার্ট ত্বরায় গাড়ি দিল হাঁকাইয়া।
আসামিরে আপনার সঙ্গেতে লইয়া।।[১৪]

অখিলচন্দ্র দত্ত কিছুদিন পরেই, এর একটা উপসংহারও লেখেন। নাম 'সোনাগাজির খুনির ফাঁসির হুকুম'। তার থেকে খুনের বিচারপর্বের বিবরণী পাওয়া যায়—

তিনজন ফিরিঙ্গি বাঙালি দুইজনে।
হইয়াছিলেন জুরি করোনার সনে।।
ডাক্তার উডফোর্ড করেছে রিপোর্ট।
চব্বিশ স্থানেতে তিনি দেখেছেন চোট।।
দশটি আঘাত অতি সাংঘাতিক তার।
স্ব ইচ্ছায় খুনি তারে করেছে সংহার।।

আসামির মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হয়ে গেল। কিন্তু—

শুনিয়া কয়েদি যেন প্রকাশিয়া শ্লেষ
কহিলেন বার বার বেশ বেশ বেশ।।[১৫]

লক্ষণীয়, আগাগোড়া খুনিকে কিন্তু কোথাও villain রূপে দেখানো হয়নি। ধরা পড়ার পরও, পুলিশের কর্তা 'ল্যাম্বার্টের সঙ্গে রঙ্গ করতে করতে, সে প্রস্থান ('পয়ান') করছে।' শেষে, সে তো প্রায় নায়কের পর্যায়ে উঠে গেছে—'শ্লেষ' প্রকাশ করে মৃত্যুদণ্ডকে তুচ্ছজ্ঞান করছে! বেশ্যা বা ব্যভিচারিণীর পুরুষ হত্যাকারীদের প্রতি বটতলা সাহিত্যিকদের বোধহয় একটা গোপন সহানুভূতি ছিল। সে-যুগের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর কেচ্ছা, তারকেশ্বরের মোহান্তের এলোকেশীকে ফুসলানো, এবং তার স্বামী নবীনের আসল অপরাধী মোহান্তকে মারার পরিবর্তে স্ত্রী এলোকেশীকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেওয়ার ঘটনা নিয়ে বটতলায় অজস্র নাটক ও কবিতার বই বার হয়েছিল। প্রায় সবগুলিতেই, নবীনের কারাদণ্ডের আদেশে লেখকেরা মর্মাহত। নবীন যখন ছাড়া পায়, তখন তাকে অভিনন্দন জানিয়ে অনেক বটতলা পুস্তিকা বার হয়। একটি চটি কবিতা বই-এর প্রচ্ছদপটের মুখবন্ধ নমুনা হিসেবে উদ্ধৃত করছি—

> মহাপাপী হোমান্ত জেলেতে করে বাস
> ধর্ম্মের হইল জয় নবীন খালাস
> দেখ রে বঙ্গের লোক মেলিয়া নয়ন
> নবীন করেছে বঙ্গে পুনরাগমন।।[১৬]

পুরুষ অপরাধীদের প্রতি বটতলার পুরুষ লেখকদের এই সহানুভূতির পিছনে কি সেই একই রক্ষণশীল চিন্তা কাজ করেছে? নারী—বিশেষ করে বেশ্যাদের নিয়ে একটা stereotype গড়ে উঠেছিল। দৈহিক আকর্ষণের ফাঁদে তারা 'নিরীহ' পুরুষকে জড়িয়ে ফেলে, তাকে শুষে অস্থিচর্মসার করে ফেলে দিয়ে নিজেরা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করে। বেশ্যাদের এই স্থিরীকৃত image-এর ভূরি ভূরি নিদর্শন মেলে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে বটতলার প্রহসনগুলিতে।

কিন্তু বটতলার প্রহসন থেকে বটতলার কাব্যের একটা তফাত করা দরকার। রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্তুর নির্বাচনে ও তার ব্যবহারে, উভয় জাতের লেখকদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। বটতলার প্রহসন রচয়িতাদের আঙ্গিক ছিল নাট্যধর্মী। আর, বটতলার কবিরা লিখতেন নানা ছন্দে—অধিকাংশ সময়েই পয়ারে। এর ফলে, কবিতাগুলি লোকমুখে প্রচারিত হওয়ার একটা সুবিধা ছিল। অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল বটতলার চটি কবিতা-গানের পুস্তিকাগুলি।

বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বটতলার কবিরা ছিলেন অনেক topical। সদ্য-সদ্য ঘটেছে, এমন বিষয় নিয়ে তাঁরা প্রায়ই দৈনিক পুস্তিকা বার করতেন। অনেকটা bulletin-এর মতো। ঐ সময়কার জনপ্রিয় কিছু বটতলার কবিতা-পুস্তিকার নাম থেকেই সেটা

বোঝা যায়—*পুলিশঘাটের অগ্নিকাণ্ড* (১২৮৩ সালে গঙ্গার ঘাটে জাহাজে আগুন লাগার ঘটনা; উল্লেখযোগ্য, এই ঘটনা নিয়ে ঐ সালে কলকাতার একটি মহিলা কবিও বটতলার ছাপাখানা থেকে একটি পুস্তিকা বার করেন। লেখিকার নাম—শ্রীমতী নিমুমণি দাসী এবং বইটির নাম—*পুলিশঘাটের হত্যাকাণ্ড*, প্রকাশস্থল—১১৭ চিৎপুর); *পঞ্চরং পাঁচালী*, অর্থাৎ কালীমায়ের গহনা চুরি, জগন্নাথের মন্দির পতন, আনন্দময়ী তলার পাঁঠাচুরি এবং মদনমোহনের ছাতভাঙ্গা ও সিদ্ধেশ্বরীর হাত ভাঙ্গার গীত (১২৮২ সালে কলকাতার বিভিন্ন মন্দিরে চুরি-রাহাজানি নিয়ে কাব্য-গাথা); *মাছের পোকা, মাছের বসন্তে জলে মেছুনীর খেদ, মেছো বসন্তে মেছুনির দর্পচূর্ণ* (১২৮২ সালে কলকাতায় *মাছের বসন্ত* এই নিয়ে গুজব উপলক্ষে রচিত); *রাজোপহার, যুবরাজের অভ্যর্থনা, কুমার মঙ্গল, ভারতে যুবরাজ কাব্য* (১৮৭৫ এ প্রিন্‌স অফ্ ওয়েল্‌সের 'ভারত-আগমন' উপলক্ষে রচিত)। পূর্বোল্লেখিত অখিলচন্দ্র দত্তের *সোনাগাজির খুন* ও তার পরবর্তী *সোনাগাজির খুনির ফাঁসির হুকুম* এই রকম আসল ঘটনা অবলম্বন করেই রচিত।

৩

যে ঘটনাটা কলকাতার বেশ্যাপল্লীকে আলোড়িত করেছিল উনিশ শতকে, তার সংক্ষিপ্ত নাম 'চৌদ্দ আইন'। ১৮৬৮ সালে, যৌনব্যাধির সংক্রমণ বন্ধের উদ্দেশ্যে সরকার থেকে একটি আইন প্রস্তাবিত হয়—Contagious Diseases Act, অথবা Act XIV। সেই সময়, বিলেতে প্রচলিত অনুরূপ একটি আইনের ভিত্তিতেই ভারতীয় আইনটি রচিত হয়, যদিও এই দেশীয় সংস্করণের ধারাগুলি এ দেশের বারবনিতাদের উপর আরও বেশি কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করে।[১৭]

'চৌদ্দ আইন'-এর ধারা অনুযায়ী বারবনিতাদের 'রেজিস্ট্রেশন' বা নিবন্ধীকরণ, এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। এর ফলে, নানা ধরনের ঝামেলা এবং বিশেষ করে পুলিশের হয়রানি থেকে রেহাই পাবার জন্য সোনাগাজি ও অন্যান্য বেশ্যাপল্লী থেকে বারবনিতাদের মধ্যে পালাবার হিড়িক পড়ে যায়।

এই ঘটনা বটতলার প্রকাশক ও লেখকদের হাতে একটা অভাবিত অতি সহজলভ্য উপকরণ জুগিয়ে দিয়েছিল। 'চৌদ্দ আইন' নিয়ে রচিত অসংখ্য প্রহসন, কবিতা ও কাব্য-উপাখ্যান-এ বাজার ছেয়ে গেল। যদিও এর রচয়িতাদের প্রায় সবাই-ই পুরুষ, এবং ঐ আইনের প্রবর্তনের ফলে বারবনিতাদের সমস্যা তাঁরা তাঁদের স্বাভাবিক

পুরুষসুলভ সন্দিগ্ধতা ও বিরূপতার আলোকে দেখেছিলেন, বটতলার ঐ সব চটি পুস্তিকার বিবরণী থেকে বারবনিতাদের পেশাগত দুরবস্থার একটা বাস্তবানুগ বর্ণনা পাওয়া যায়। যেহেতু বটতলার প্রকাশকেরা ছিলেন সোনাগাজির অধিবাসিনীদের প্রতিবেশী, তাঁদের ভাষ্যে একটা চাক্ষুষ ধারাবিবরণী বা eye witness account পাবার সম্ভাবনা আছে।

'চৌদ্দ আইন'-এ বিপর্যস্ত বারবনিতাদের যে সব এজাহার তৎকালীন সরকারি নথিপত্রে পাওয়া যায়[১৮], তার সমর্থন ও অনুমোদন দেখতে পাই বটতলার এই চটি বইগুলিতে—আরও বাস্তব ও লৌকিক ভাষায়। ঔপনিবেশিক বাংলাদেশে দেহোপজীবিনীদের পেশা নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে তাই বটতলা এক অতি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক সূত্র বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

'চৌদ্দ আইন' নিয়ে রচিত বটতলার অজস্র প্রকাশনা থেকে কয়েকটি নমুনা বিচার করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়। ১২৭৬ সালে (অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৬৯-এ) কলকাতার মির্জাপুর হলওএলস্ লেন নং ২ থেকে মুদ্রিত 'বাহবা চৌদ্দ আইন' নামে পুস্তিকাটির শুরুতে বলা হচ্ছে—"অধুনা চৌদ্দ আইন প্রকাশ হওয়াতে বারাঙ্গনাকুল কি প্রকার কথাবার্ত্তা ব্যবহারাদি করিয়া কিরূপে দিনযামিনী অতিবাহিত করিতেছে, তাহা সাধারণের গোচরার্থ নাটকচ্ছলে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"

নাট্যকারের নাম নেই। প্রকাশকেরও নাম নেই। নাটকটি পড়লেই বোঝা যায় কেন নেই। নিস্তারিণী নামে এক বারবনিতা পুলিশের চিকিৎসকের হাতে পরীক্ষা দেবার পর, ফিরে এসে পাড়া-পড়শিদের কাছে তার অভিজ্ঞতার বিশদ বর্ণনা দেয়—কেমন করে "আঁটকুড়ির বেটা"রা তাকে বিবস্ত্র করে "ঘেঁটে ঘুঁটে দেক্‌লে"। এই বর্ণনার সুযোগ নিয়ে পাঠকদের (মূলত পুরুষ পাঠক) যৌন-আবেদনে সুড়সুড়ি দেবার প্রবণতাটা বেশ স্পষ্ট। স্বভাবতই অশ্লীলতার অভিযোগে ধৃত হবার আশঙ্কা থেকেই লেখক ও প্রকাশক নিজেদের নাম প্রকাশে গোপনীয়তা অবলম্বন করেছিলেন।

কিন্তু লেখকের এই প্রবণতা সত্ত্বেও চৌদ্দ আইনের ফলে বারাঙ্গনাদের দুরবস্থার একটা জীবন্ত চিত্র বার হয়ে আসে—যার প্রতিলিপি পাওয়া যায় সমসাময়িক সরকারি ও বেসরকারি দলিল-দস্তাবেজে।[১৯] নিস্তারিণী, তার প্রতিবেদনের শেষে বলে—"...তোমাদের পায়ে হাত দিয়ে বলচি, আমার কখনও ব্যাম হয় নাই। তবু পোড়ারমুকোরা বল্লে তোমাকে পাঁচ সাত দিন এখনে থাকতে হবে। তাই বল্লে না প্রত্যয় যাবে, থাকতে হবে যেই বলেচে, ওম্নি এক বেটা পেয়াদা আসিয়া হাত ধরেচে। ...তারপর আমাকে একটা বড় ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেকি, আমার মত কত মেয়েমানুষ

বসে রয়েচে। কেউ কাঞ্চে, কে হাসচে কেউবা ভাবচে, আমিও তাদের দলে মিসে গেলাম।..." নাটকের শেষে, সোনাগাজির দুই বারবনিতা—বসন্তকুমারী ও মোহিনীর কথোপকথন। মোহিনী সজল নয়নে বলে—"ওলো বসন্ত! আর জ্বালাসনে, কি করবি বল, বিধাতা পোড়া চৌদ্দ আইনের সৃষ্টি করেচে আমাদের দুঃখের জন্য।" তার পরের কথাগুলি অর্থপূর্ণ—"ওলো বসন্ত! একি মাসান্নি দু'খের কথা, যে সকল ভদ্রলোকের ছেলেরা যাতায়ত করে, তারা আর কি আসবে। তারাই হলো আমাদের প্রাণধারণের উপায়...।"[২০]

এই 'ভদ্রলোকের ছেলেরা'ই সে যুগের কলকাতার সোনাগাজির বেশ্যাপল্লীর আসল খরিদ্দার ছিল। চৌদ্দ আইন প্রবর্তিত হবার পর, তাদের বিপত্তির কথা-ও বটতলার প্রহসনে পাওয়া যায়। 'কোন নাট্যানুরাগী ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রণীত', ঐ সময়েই, 'বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি' নামে একটি নাটকে শুনতে পাই দুই 'ভদ্রলোক', প্রিয়বাবু ও কেদারবাবুর কথোপকথন।

"কেদার।... দেখ ভাই গরিব দুঃখির কথা দূরে থাকুক, সম্প্রতি বড় বড় লোকের মধ্যেও স্ফূর্তি নাই, অনেকেই হাত ঘাট করেছেন, আজকাল সন্ধ্যের পর গলিখুঁজি অন্ধকার।

প্রিয়।...ওর অন্য কারণ আছে, চৌদ্দ আইন। এই আইনের ভয়ে অধিকাংশ বেশ্যা কলিকাতা পরিত্যাগ করেছে ভাই...।

কেদার। ...এদিকে যেমন পুলিশের টানাটানি, ওদিকে তেমনি কম আমদানি।..."[২১]
ঐ সময়ে প্রকাশিত আর একটি বটতলার পুস্তিকাতে লেখক একটি বারবনিতার মুখ দিয়ে তৎকালীন হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করিয়েছেন। সুধামুখী নামে একটি বারাঙ্গনা চৌদ্দ আইনের কবলে পড়ে পুলিশ থানায় যেতে বাধ্য হয়। কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না। আক্ষেপ করে সুধামুখী বলে—"সোহাগিনী আদরিনী বলে সবে কয়। কিন্তু দিন সঙ্গের সঙ্গি কেহ নয়। ...যদি হতেম কুলের কুলবধূ নারী। সে হলে কি এ দুর্দ্দশা হত আমাদেরি।..." তারপর, তার স্থির সিদ্ধান্ত—"এবার আসিয়ে ভবে বেশ্যা নাহি হব। জবন কুলেতে জন্ম গ্রহণ করিব। স্বামীহীন হলে পুনর্ব্বিবাহ করিব। হিন্দুকুলে জন্ম আর নাহিক লইব। হিন্দুকুলে মনুষ্য-নাহিক একজন। হিন্দু ধর্ম্ম মিছে মাত্র বুঝিনু এখন। ...পরীক্ষা দিয়ে পুনগৃহে আসিব নাই। জাহ্নবি জীবনে দেহ করিয়ে অর্পণ। বাদসা গৃহে জন্ম করিব ধারণ। বাদসা ঘরে জন্ম লয়ে বিবি হয়ে রব। নিজ জোরে হিন্দু ধর্ম্ম বিনাশ করিব। হিন্দু ঘরে জন্ম লয়ে সুখ নাহি হল। হইলে বিধবা দুক্ষে কত দিন গেল। বেশ্যা হইয়ে কিঞ্চিৎ সুখ হয়ে ছিল।" শেষে

ব্রহ্মাকে সম্বোধন করে সুধামুখী বলে—"বিধবা করেছ্ জারে, তারে রাখ কেন। ...কি জন্যে ব্রহ্মা তুমি জাতিভেদ করেছ...গোপনে সকলি করে থাকে হিন্দুগণ। গোপনে করিয়ে কার্য্য সাধু হয়ে রন। ...আমি যা করেছি পিতা তুমি সব জান। নিজ গুণে অধিনীরে কর পরিত্রাণ।"[২২] উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে মনে হতে পারে যে লেখক খুব উচ্চ-শিক্ষিত ছিলেন না। বাংলা শব্দের বানান (যেগুলি হুবহু অনুলিখিত হয়েছে উপরে) এর হদিশ দেয়। যেমন—'দিন' (অর্থাৎ 'দীন'), 'জবন' ('যবন')-এর পরিবর্তে), 'দুক্ষে' ('দুঃখে')। কিন্তু, সমসাময়িক সমাজ-সংস্কারকদের রক্ষণশীলতা-বিরোধী মনোভাবের সঙ্গে লেখক একাত্ম ছিলেন বলে বোঝা যায়।

চৌদ্দ আইনের হাত এড়াবার জন্য তৎকালীন কলকাতার বারবনিতারা নানা রকমের ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিলেন। বটতলার সাহিত্য এর এক সত্যানুগ প্রতিবেদন। প্রকাশিত পুস্তিকাগুলির মধ্যে অঘোরচন্দ্র ঘোষের 'পাঁচালী কমলকলি' একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য-উপাখ্যান। নানা ছন্দে রচিত এই বিচিত্র কাব্যটি বটতলা থেকে প্রকাশিত হয় ১২৭৯ সালে। কাহিনির শুরুতে—

সোনামণি নামে রমণী রূপে কাঁচা সোনা জিনি
সোনা যায় নি এমনি সুঠাম তার।
পরেশ নামে একটি বাবু, পিরীতে তার হাবুডুবু
অদর্শনে তিলেক আন্ধার।।
উভয়ে এমনি ভালবাসা পরেশ বাবু ত্যাজে বাসা,
বাস করেছেন সোনামণি ঘরে।

'বাঁধা বাবু' পরেশের সঙ্গে সোনামণির পিরীতের এই romantic পরিবেশের আকাশে হঠাৎ মেঘ ঘনিয়ে এল—

আবার দেখ বাদল রঙ্গ একে সোনার জ্বলছে অঙ্গ
বঙ্গে আবার চৌদ্দ আইন এলো।
সার্জন জমাদ্দার, ফিরিতেছে দ্বার দ্বার
সোনার দ্বারে অমনি ঢুকিল
বলে কে বাড়িতে আছে জলদি করগে আও হিঁয়াছে,
থামামে আবি জানে হোগা।

সোনামণি 'মরমে মরে' গিয়েও থানায় হাজিরা দেয়, ডাক্তারকে পরীক্ষা দিয়ে 'হেলদি' সই করিয়ে টিকিট নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

সোনামণি তো পার পেয়ে গেল। কিন্তু ওদিকে সারা শহরময় 'গোলযোগ যত রাঁড় নিয়ে।'

ধরাধরির ধুমধাম হেরি পরিহরি ধাম,
কেহ কোচ্ছে কাশীধামে ধাম।
কেউ বা দ্বারকাধামে পরিহরি নিজ ধামে
কৃষ্ণনামে নিচ্ছে ছাপায় নাম।।
কেউ বা গিয়ে প্রয়াগে, মাথা মুড়াইছে আগে
কেউ বা গয়ায় গদাধরে পুজিছে।
কেউ বা চড়ে কলের গাড়ি ফরেশডাঙ্গায় কোচ্ছে বাড়ি
কেউ বা গিয়ে খালি বাড়ি খুজিছে।

ফরাসি-শাসিত বলে ফরাসডাঙায় ইংরেজের 'চৌদ্দ আইন' সেখানে অচল। তাই দলে দলে কলকাতার বারবনিতারা ফরাসডাঙায় গিয়ে হাজির হয়। ফরাসডাঙার চেহারা পালটে যায়। দলে দলে নানা ধাঁচের নতুন খদ্দের এসে ধরনা দেয় বেশ্যাদের তল্লাটে— বোষ্টম সাধু থেকে শুরু করে নব্য বাবু, কুলি-মজুর থেকে নৌকোর মাঝি—

গৌরাঙ্গ স্মরণ করে সিকায় তুলে ঝুলি।
রাঁড়ের বাড়ি উঁকিঝুঁকি মাচ্ছে কুলিকুলি।।
এক্ষণেতে নব্য বাবু আছেন তথা যারা।
দিব্য করে চুল ফিরায়ে বাহার দিয়ে তারা।।
পকেটে ফেলে পাঁচ পয়সা চুরুট গুঁজে মুখে।
রাঁড়ের বাড়ি এয়ারকিটি মাচ্ছে মনোসুখে।।

... ...

আট পয়সার মজুর যারা খাজুর চাটায় থাকে।
খাট পালঙ্কে খাসা বিছানায় শুচ্ছে লাখে লাখে।।
ভাই সাহেবরা কামিয়ে দাড়ি রাঁড়ের বাড়ি যায়।
হেঁদু বলে হোল নাইট নির্ব্বিঘ্নে কাটায়।।
নায়ের মাঝি যারা তারা শুনে গুজব কথা।
আল্লা রছুল স্মরণ কোরে নঙোর কোচ্ছে তথা।।
বলে, হালা হর রোজ কি বেয়ে মরবো লা
হরেশড্যাঙ্গায় হ্যাকটা আত কাবার কোরে যা।।

এদিকে কলকাতায় যে বারবনিতারা রয়ে গেছে, তারা

কেউ বা লয়ে দুধের কেঁড়ে যোগাচ্ছে দুধ কেঁড়ে কেঁড়ে
বাসায় গিয়ে কত বাবুর কাছে।...

...পরীক্ষা ভয়ে কোন ধনী, কোটিতে পরে ডোরকোপিণী,
ন্যাড়া নেড়ীর দলে মিশছে গিয়ে।।

এর পরে কবি হঠাৎ কলকাতার ময়দানে নিয়ে আসেন পৌরাণিক জগৎ থেকে মদনদেবকে। তাঁর পূজারিনিরা কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে শুনে মদনদেব শহরে এসে,

গড়ের মাঠে মনিউমেন্টে তাহাতে বসিল
সহরের খবর নিতে দূতে আজ্ঞা দিল।।

কোকিল সোনাগাজি এবং নানা জায়গা ঘুরে, অবশেষে 'বটতলা'-র কবিদের ওপর ভর করে—

বটতলাতে বটবৃক্ষের শাখার উপর
পিক আসি লয় সোনাগাজির খবর।।

চৌদ্দ আইনের প্রকোপে সোনাগাজির দুরবস্থার কথা (''দুতোলা-তেতোলা, সব দ্বারে তালা'') শুনে মদনদেব বললেন—

শুন ওহে সেনাগণ বচন আমার
চৌদ্দ আইন এলো বোলে না হও ব্যাজার।।
ধাত চালা বাও বাগী এই তিন বেটা
পরম শত্রু যে আমার বাদিয়ে বসে ন্যাটা।
রাজ্যে পা না দিতে আমি আগে এসে তারা।
উড়ে এসে যুড়ে বসে ছুটে যেন তারা।।

যৌনরোগকে ''পরম শত্রু'' বলে চিহ্নিত করে অবশেষে মদনদেব তাঁর ভক্তবৃন্দদের কলকাতায় তাদের পুরোনো বাসস্থানে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ করলেন—

চল সবে ফরেশডাঙ্গা কাশী বৃন্দাবন
প্রয়াগ মথুরা গয়া দ্বারকাভুবন।।
বর্ধমান ত্রিবেণী হুগলী শ্রীরামপুর
চল গিয়ে দেখি কেবা গেছে কতদূর।।
যার দেখা পাব তারে অমনি ধরিব
শরাঘাতে খুন তাকে তখনি করিব।।

বসন্তরাজের শরাঘাত আর কে রুখতে পারে? তাই

গুটি গুটি সবে এলো শহর গুলজার হ'লো
....
পুলিষে লেখায় নাম কোন জাতি কোথা ধাম

পিতৃনাম বয়স বা কত।
গিয়ে সব পরীক্ষায়এড়াইল যার দায়
নিজ নিজ কাজে হলো রত।।[২৩]

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, বিদেশি রাজশক্তির 'চৌদ্দ আইন'-ই মেনে নিতে হলো—কিন্তু স্বদেশি পৌরাণিক দেবতার মধ্যস্থতায়। 'পাঁচালী কমলকলি' আসলে এক নতুন লৌকিক myth তৈরির প্রচেষ্টা। শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ফলে যে অস্বস্তিকর ও অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তার মোকাবিলা করতে গিয়ে প্রথমে বারবনিতারা শহর ছেড়ে পালাল, বা শহরেই ছদ্মবেশের আশ্রয় নিয়ে লুকিয়ে রইল। কিন্তু অবশেষে আইনটাকে মেনে নিতে হল—নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থেই। এই আত্মসমর্পণের নৈতিক অনুমোদন দরকার। তাই মদনদেবকে গড়ের মাঠে হাজির হতে হলো এবং "বাও বাগী" অর্থাৎ উপদংশ প্রমুখ যৌনব্যাধিগুলিকে তাঁর মুখ দিয়েই নিন্দা করতে হলো। তাঁর আশ্বাস পেয়ে এবং 'চৌদ্দ আইন'-এর প্রতি তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণের পর, বারবনিতাদের কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পথ পরিষ্কার হয়ে গেল।

বহিরাগত, কোনো চাপিয়ে দেওয়া পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে তাকে স্বসমাজে অবশেষে স্থান করে দেবার সমর্থনে প্রায়ই নতুন কল্প-কাহিনির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বাংলা লোক-সাহিত্যে এই ধরনের নতুন myth বা এমনকি নতুন কল্প-কাহিনির দেব-দেবীর নজির প্রায়ই দেখা যায়। অতীতের সম্মানার্হ দেব-দেবীরা নতুন অবতারের বেশে হাজির হয়ে এইসব পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জনগণের অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন (যেমন ঔপনিবেশিক বাংলায় নতুন রোগ 'কলেরা'র মোকাবিলার জন্য ওলা বিবির আবিষ্কার)। রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রেও, অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনকে লৌকিক কবিরা এমনিভাবেই পুরোনো সমাজের সঙ্গে সমন্বিত করেছেন পৌরাণিক দেবতাদের অনুমোদন কল্পনা করে। তাঁদের শ্রোতাদের কাছে এই ভাবেই পরিবর্তিত অবস্থাটা সহনীয় বা, অনেক সময় বাঞ্ছনীয় মনে হত। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, মধ্যযুগের বাংলাদেশে, মুসলমান আগমনের সময়কালে (বা তার কিছুকাল পরে) রচিত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' কাব্য-উপাখ্যান, যেখানে বৈকুণ্ঠ থেকে নিরঞ্জন মর্ত্যে নেমে আসেন মুসলমানের বেশে, অত্যাচারী ব্রাহ্মণদের সাজা দেবার জন্য।[২৪] পরবর্তী যুগে, ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তি সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম পর্যায়ে, কিছু-কিছু লোককাব্যে ইংরেজকে অনুরূপ পৌরাণিক সাজে সজ্জিত হতে দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি, উত্তরবঙ্গের রতিরাম দাস তাঁর একটি 'জাগ গান'-এ, তদানীন্তন কুখ্যাত জমিদার দেবী সিং-এর বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ বর্ণনা করে, তারপর এই অত্যাচার থেকে মুক্তিদাতা হিসেবে ইংরেজ

শাসককে শ্রদ্ধা জানালেন এই ভাষায়—

ইংরাজের হাতে রাজ্য দিলেন চক্রপাণি।
সুবিচার করি গেল আপনি কোম্পানি।।[২৫]

ইংরেজ রাজশক্তির কাছে যে আত্মসমর্পণ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় rationalize করেছিলেন, লোককবিরা তা mythologize করেছেন। বঙ্কিম তাঁর 'আনন্দমঠ'-এর শেষে উপদেশ দিলেন—"শত্রু আর নাই, ইংরেজ মিত্র রাজা। ...ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোক শিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব।" আর লোক-কবিরা, অবস্থা দুর্বিপাকে, যখনই এই বৈদেশিক রাজশক্তির আইন-কানুন ও নতুন পরিবর্তনসূচক ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন, তখনই, আত্মসমর্পণের অনুমোদন খুঁজেছেন 'চক্রপাণি' বা 'মদনদেব'-এর মনগড়া ভূমিকায়।

৪

অবশ্য, ইংরেজ ঔপনিবেশিক প্রশাসন, 'চৌদ্দ আইন' বেশিদিন বলবৎ করে রাখতে পারেনি। রোগনির্ণয় পরীক্ষা (যা 'এগ্‌জামিন্‌' নামে বেশ্যাপল্লী ও বটতলা সাহিত্যে সে-সময় অভিহিত হত)-র নামে বারাঙ্গনাদের উপর পুলিশি অত্যাচার এমন ভয়াবহ রূপ নেয়, যে তা এদেশে জাতীয়তাবাদী বাঙালি নেতৃত্বের-ও টনক নাড়া দেয়। ১৮৮৯-এ British India Association সরকারের কাছে এক স্মারকলিপিতে এই আইনের বিরুদ্ধে তাদের মত প্রকাশ করে। ইতিমধ্যে, খোদ বিলেতে-ও সেদেশের বারবনিতাদের নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ CDA (Contagious Diseases Act যার ভিত্তিতে এদেশে-ও অনুরূপ আইন পাস হয়েছিল ১৮৬৮-এ)-এর বিরুদ্ধেও দেশের নারী অধিকার আন্দোলনের নেত্রীরা (Josephine Butler যাদের মধ্যে অগ্রবর্তিনী ছিলেন) সরব হয়ে ওঠেন। ভারতে ইংরেজ প্রশাসন-ও ক্রমশই উপলব্ধি করছিল যে আইন পাস করে যৌনব্যাধি বা গণিকাবৃত্তি—নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। 'চৌদ্দ আইন'-এর যথেষ্ট আঁটোসাঁটো প্রয়োগ সত্ত্বেও, গোরা সৈন্যদের মধ্যে উপদংশ, প্রমেহ-ইত্যাদি যৌনরোগের প্রাদুর্ভাব কমেনি, বরং বেড়েছিল। পারিপার্শ্বিক সামাজিক এই সব চাপে, ও 'চৌদ্দ আইন'-এর বিফলতার তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে, শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার বাধ্য হয় এই আইনটি বাতিল করতে। ১৮৮৮-এ 'চৌদ্দ আইন' প্রবর্তনের ঠিক বিশ বছর পরে—ভারতবর্ষে CDA (যা সরকারি পরিভাষাতে Act XIV, ও লৌকিক বুলি-তে 'চৌদ্দ আইন' নামে পরিচিত ছিল) নাকচ করা হয়।[২৬]

শেষ পর্যন্ত, সোনাগাজি-র পসারিণীরাই বিজয়িনী হয়েছিলেন। চোদ্দ আইন যখন চালু ছিল, তখন বটতলা থেকে প্রকাশিত এক নাটকে একটি বর্ষীয়সী বারাঙ্গনা দম্ভভরে যে কথাগুলি বলেছিলেন, তাই-ই অবশেষে সত্য বলে প্রমাণিত হল—

শতবর্ষে তপস্যায় যা নহে সাধন।
চক্ষুর নিমেষে তাহা করি সমাপন।।
অঘটন ঘটাইতে অসাধ্য সাধিতে।
আমা মম কম নারি গড়েছে বিধিতে।।
ভূমে ফাঁদ পাতি পারি শশাঙ্ক বাঁধিতে।
বালির উনানে ভাত পরিগো রান্ধিতে।।
চালুনিতে জল আনি অপূর্ব্ব কৌশলে।
বিনা বেলুনেতে উড়ি যাদু বিদ্যাবলে।।[২৭]

টীকা

১. দ্রষ্টব্য : ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নব-বিবি-বিলাস* (১৮২২?); ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের—*আপনার মুখ আপুনি দেখো* (১৮৬৩)। প্রায় চার দশকের ব্যবধানে কলকাতার বারবনিতাদের খদ্দেরদের চাহিদা পরিবর্তন ও তার সঙ্গে তাল রেখে বারবনিতাদের ঠাট-ঠমক পালটানোর নিঁখুত বিবরণী পাওয়া যায় এই বই দুটিতে।

২. দ্রষ্টব্য : J. Long.

৩. সুকুমার সেন, পৃ. ১৪ ও ১৬।

৪. দ্রষ্টব্য : বিনয় ঘোষ, ১৯৫৬। Ashit Paul (ed.) এবং সুকুমার সেন, ১৯৮৪।

৫. দ্রষ্টব্য : Kenneth Ballhatchet.

৬. Usha Chakravarty. p. 97.

৭. কালীপ্রসন্ন সিংহ, পৃ. ৮৯।

৮. *Despatch from Dr. C. Fabre Tonnerre.* Health Officer, to Stuart Hogg, Esq., Chairman of the Justices of Peace for the Town of Calcutta, 16th September, 1867. Home Public. 20th February, 1869, pp. 112-115.

৯. দ্রষ্টব্য : Usha Chakravarty, পূর্বোধৃত।

১০. *Home Judicial,* No. 156. 17th October, 1872.

১১. *সংবাদ প্রভাকর*, ১৯ শে নভেম্বর, ১৮৫৬, ৩১শে জানুয়ারি, ১৮৫৪; *সুলভ সমাচার*, ১০ই ফাল্গুন, ১২৭৭; *সংবাদ ভাস্কর*, ৩০শে মার্চ, ১৮৪৯; *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩, পৃ. ৬২১-২৩।

১২. *বিদ্যাদর্শন*, ১৮৪২; নং ৫ (উদ্ধৃত : বিনয় ঘোষ সম্পা., তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২০-২১); *সংবাদ প্রভাকর*, ৩/৬/১২৬১; (উদ্ধৃত : বিনয় ঘোষ সম্পা., প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮৪-৮৫)। আধুনিক

এক গবেষকের তথ্য অনুযায়ী, ১৮৫৮ এর 'চৌদ্দ আইন' চালু হবার পর, *সোমপ্রকাশ* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে চিৎপুর নিবাসিনী কিছু বারবনিতা প্রশ্ন তোলেন শুধু তাঁদেরকেই কেন এই পরীক্ষা দিতে হবে—পুরুষরা কেন এর থেকে ছাড়া পাবে? (উদ্ধৃত : স্বপন বসু, 'উনিশ শতকে বাঙালি নারীর চিন্তা চেতনার ধারা', *বারোমাস*, শারদীয় ১৯৯৯)।

১৩. তুলনীয়—দাশু রায়ের পাঁচালির অভিযোগ—
"সতীদের অন্ন জোটে না, বেশ্যাদের জড়োয়া গহনা", (উদ্ধৃত: হরিপদ চক্রবর্তী, পৃ. ৩৭৫)।

১৪. দ্রষ্টব্য : শ্রী অখিলচন্দ্র দত্ত।

১৫. দ্রষ্টব্য : শ্রী অখিলচন্দ্র দত্ত।

১৬. দ্রষ্টব্য : জহরিলাল শীল।

১৭. এই আইন ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—1. Judith R. Walkowitz 2. Kenneth Ballhatchet. 3. Report of the Committee appointed by the Secretary of State for India to inquire into the Rules, Regulations and Practice in the Indian Cantonments and elsewhere in India with regard to prostitution and the treatment of Venereal Disease. London, 1893. এবং 4. Sumanta Banerjee, 1998.

১৮. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—পূর্বোল্লিখিত বইগুলি।

১৯. দ্রষ্টব্য : Antoinette Burton.

২০. *বাহবা চৌদ্দ আইন*। কলিকাতা। ১২৭৬।

২১. দ্রষ্টব্য : *বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি*।

২২. দ্রষ্টব্য : *বেশ্যাবিবরণ নাটক*।

২৩. দ্রষ্টব্য : অঘোরচন্দ্র ঘোষ।

২৪. দীনেশচন্দ্র সেন, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৫-৫৭।

২৫. রণজিৎ কুমার সমাদ্দার, পৃ. ৬১।

২৬. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পূর্বোল্লিখিত Sumanta Banerjee, 1998.

২৭. দ্রষ্টব্য : *ভারত-দর্পণ নাটক*।

মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা

১

পুলিশের হেফাজতে স্বীকারোক্তি, বিচারালয়ে প্রদত্ত সাক্ষ্য, এই সব নিয়ে বিশেষ ধরনের এক 'জবানবন্দি সাহিত্য' আবিষ্কার করা যায়। কলকাতার গোয়েন্দা বিভাগের মহাফেজখানায় ও হাইকোর্টের অন্ধকার খুপরির তাকে যেসব এজাহার ও মামলা-মোকদ্দমার বিবরণী ফাইলবদ্ধ হয়ে আছে, সেগুলি ঘাঁটলে কেবল লোমহর্ষক কাহিনির সন্ধান-ই পাওয়া যাবে না, অভিযুক্ত ও অভিযোক্তার, এই দু'জনের কথোপকথনের বা প্রশ্নোত্তরের থেকে দুটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক ও দ্বন্দ্বের এক অদ্ভুত মানসিক জগৎ উদ্‌ঘাটিত হয়।

এই ধরনের দলিল দস্তাবেজ-এর বাহ্যিক চেহারার ওপর নির্ভর করে, নিছক ওপর-ওপর চোখ বোলালে সত্যানুসন্ধান ও ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা যে কতটা বিভ্রান্তিকর হতে পারে, তা আজকের যে-কোনো নিষ্ঠাবান ও অধ্যবসায়ী ঐতিহাসিক-ই স্বীকার করবেন। তাই এগুলি পরীক্ষা করতে গেলে খেয়াল রাখা দরকার কয়েকটি বিষয়। প্রথমত, মনে রাখতে হবে কী অবস্থাতে অভিযুক্ত আসামি বা সাক্ষী, তাঁদের বিবৃতি দিচ্ছেন। পুলিশের হাজতে বা বিচারালয়ের কাঠগড়াতে দাঁড়িয়ে, তাঁরা আর আগের মতো স্বাধীন নন তাঁদের মতামত প্রকাশের ব্যাপারে। নানা ভয়-ভাবনা তাঁদের বক্তব্যকে

নির্ধারিত করছে। কী বললে কী হয়, কোন সাক্ষ্য তাঁদের বিরুদ্ধে অভিশংসার (public prosecution) কাজে লাগবে, কোন প্রশ্নের জবাবে নীরব থাকা বাঞ্ছনীয়, বা মিথ্যা কথা বলে নিজেকে বাঁচানো যায় ও অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানো যায়, সহ-অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করে রাজসাক্ষী হয়ে মুক্তি পাওয়া যায় কীভাবে—এইসব নানা হিসেব ও সতর্কমূলক বিচার-বিবেচনা এসে বাসা বাঁধে তাঁদের মাথায়। তখন আইন ব্যবস্থার শর্তের চাপে তাঁদের কথা বলতে হয়, স্বতঃস্ফূর্ততা ব্যাহত হয়।

দ্বিতীয়ত, এটাও মনে রাখা দরকার যে এই সব এজাহার ও জবানবন্দি রচিত হয়েছে এক অসম সম্পর্কের বাঁধুনির মধ্যে। যাঁরা এজাহার ও স্বীকারোক্তি করেছেন, তাঁরা তা স্বেচ্ছায় করেননি, করেছেন তাঁদের থেকে অনেক বেশি ক্ষমতাশীল প্রতিপক্ষের দাবি, ও অনেক সময় ভয়-প্রদর্শনের মুখে—পুলিশের অত্যাচারে, দোর্দণ্ড-প্রতাপ বিচারকের জেরার মুখে, বা উকিলের পরামর্শে।[১]

এগুলি পড়তে গেলে, জবানবন্দি-সাহিত্যের সৃষ্টির নিজস্ব নিয়মকানুনগুলি স্মরণ রাখা দরকার। ঠিক যেমন লিখিত সাহিত্য তৈরি হয়েছে এক ব্যাপক পাঠক শ্রেণির বিভিন্ন অংশের নানা চাহিদার উদ্দেশ্যে, এবং সেই অনুযায়ী প্রচলিত ব্যাকরণের নিয়ম দ্বারা অনুশাসিত, জবানবন্দি সাহিত্যও তার পাঠক বা শ্রোতার প্রয়োজনের অনুশাসনে বিধিবদ্ধ। কারা এর মূল শ্রোতা ছিলেন? পুলিশ, উকিল, বিচারক। এঁদেরই জেরার মুখে এ সাহিত্য গড়ে ওঠে। এঁদেরই আরোপিত নিয়ম দ্বারা এ সাহিত্যের ব্যাকরণ ও ভাষা নির্ধারিত।

উনিশ শতকের বাংলাদেশের এই ঔপনিবেশিক আইন ব্যবস্থায়, শ্রমজীবী শ্রেণির এক বিশেষ সম্প্রদায়, অর্থাৎ দেহোপজীবিনীরা ক্রমশই অপরাধিনী রূপে গণ্য হতে থাকেন। নব্য-নির্মিত ফৌজদারি আইনের বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী তাঁরা ধৃত হয়ে পুলিশের কাছে এজাহার দিতেন ও বিচারকের সামনে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করতেন নানা উপায়ে।[২] এই সব এজাহার ও সাক্ষ্য নথিবদ্ধ হয়ে আছে, যা গবেষকদের কাছে এক বিরাট খনি, যা থেকে সে যুগের বারবনিতা সমাজের ইতিহাস রচনা করতে গেলে বহু রসদ জোগাড় করা যেতে পারে।

স্বাভাবিক যে বারবনিতাদের এই 'জবানবন্দি সাহিত্য' পড়তে গেলে যে-কোনো নিবিষ্ট গবেষক টের পাবেন, এর নেপথ্যে সদাবিরাজমান আইন ব্যবস্থার ভ্রূকুটি। অভিযোক্তা প্রশাসনকর্তাদের প্রশ্নের জবাবেই অভিযুক্ত বারবনিতাদের প্রতিবেদনের প্রত্যেকটি স্তর নির্মিত হয়েছিল। দুই অসমকক্ষ আলাপচারীর মধ্যে অবিরাম প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে এই জবানবন্দি তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই প্রশ্নোত্তরের স্তরগুলি বিনির্মাণ করে

প্রতিবেদনটি পড়বার চেষ্টা করলে, ঐ দেহোপজীবিনীদের মানসিকতার জগৎ পুনরাবিষ্কার করা যেতে পারে, ও তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের ইতিহাসের পুনর্নির্মাণও হয়তো সেভাবে সম্ভব। বারাঙ্গনারা অপরাধ জগৎকে কীভাবে দেখতেন, কেমন করে নিজেদের পেশা অনুসরণ করতে গিয়ে চুরি-জোচ্চুরি, খুনখারাবির মধ্যে জড়িয়ে পড়তেন, আইনব্যবস্থা ও পুলিশ প্রশাসন সম্বন্ধে তাঁরা কী ভাবতেন, বিচারালয় থেকে ন্যায় বিচার আশা করতেন কি না—এমন সব নানা প্রশ্ন যা আজকের গবেষকদের অনুসন্ধানযোগ্য, তার জবাব পাওয়া যেতে পারে এই সব এজাহারে। যে বিশেষ অপরাধের জন্য ধৃত হয়ে তাঁরা হয় স্বীকারোক্তি করেছেন, কিংবা নির্দোষ বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন, এর সীমা অতিক্রম করে এই জবানবন্দি সে-যুগের পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক বাতাবরণ ও নৈতিক মূল্যবোধের ছবি তুলে ধরে।

এই ধরনের জবানবন্দি থেকে অতীতের সামাজিক ইতিহাস রচনার মালমশলা সংগ্রহ করতে উৎসাহী গবেষকদের কাছে, উনিশ শতকের কলকাতায় খুনের অপরাধে ধৃত একটি বারবনিতার স্বীকারোক্তি-মূলক আত্মকথন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দৃষ্টান্ত বলে মনে হয়। তেমন একটি জবানবন্দির কিছু অংশ আমরা এই সঙ্গে পুনর্মুদ্রণ করছি। অভিযুক্ত মহিলাটি দ্বিগুণ অপরাধে সন্দেহভাজন হয়েছিলেন—এক, তিনি দেহোপজীবিনী (সুতরাং তাঁর পেশার সূত্রেই তিনি সমাজে ঘৃণ্য বলে বিবেচিত); দুই, তিনি খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। একে বেশ্যা তায় খুনে। লক্ষণীয় যে-পুলিশ দারোগাটি এই মহিলার অন্তিম জবানবন্দি অনুলেখন করেন, তিনি তার শিরোনাম দেন—পাহাড়ে মেয়ে! বলা বাহুল্য পাহাড়ে বিশেষণটি এখানে তার কদর্থে ভীষণ ভয়ানক অর্থে প্রয়োগ হচ্ছে।

অবশ্য, এই জবানবন্দির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সচরাচর যেসব জবানবন্দি পাওয়া যায়, তা হল দণ্ডাদেশের আগে, পুলিশের হেফাজতে অভিযুক্তের এজাহার বা বিচারালয়ে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রদত্ত সাক্ষ্য। কিন্তু এই বিশেষ জবানবন্দিটি অনুলিখিত হয়েছিল এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে। অভিযুক্ত বারবনিতাটির মৃত্যুদণ্ড আদেশ প্রাপ্তির পর, তাঁর কাছ থেকে এই স্বীকারোক্তিটি আদায় করা হয়।

২

১৮৮৪ সালের ৯ই আগস্ট, কলকাতার পাঁচু ধোবানীর গলির এক বেশ্যাপল্লীতে রাজকুমারী নামে একটি গণিকা খুন হয়। এই হত্যার অভিযোগে, ঐ পল্লীরই আর একটি গণিকা, ত্রৈলোক্যকে পুলিশে গ্রেফতার করে। বিচারপতি নরিস (Norris)-এর

আদালতে ফৌজদারি মোকদ্দমাটি উঠলে, 'জুরি'-র সংখ্যাগরিষ্ঠ সভ্যরা ত্রৈলোক্যকে খুনি বলে সাব্যস্ত করে। তাদের রায় মেনে নিয়ে বিচারপতি ঐ বছরেরই ৩রা সেপ্টেম্বর ত্রৈলোক্যকে ফাঁসির হুকুম দেন।[৩] ত্রৈলোক্যের বয়স তখন প্রায় পঁয়তাল্লিশ।

লক্ষণীয়, মামলা চলাকালীন ত্রৈলোক্য আগাগোড়া নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছিলেন। এমনকি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনেও, কাঠগড়াতে দাঁড়িয়ে অবিচলিত ত্রৈলোক্য বলেন যে তিনি খুন করেননি, এবং এর বেশি কিছু তাঁর বলার নেই। মামলার শুনানির বিষয়ে দুটো ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। প্রথম, ত্রৈলোক্যের পক্ষের উকিল জি. এল. ফাগান (G. L. Fagan) জুরির দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখান যে ত্রৈলোক্যের বিরুদ্ধে খুনের প্রমাণ মাত্র একজনের সাক্ষ্য—প্রিয় নামে আর-একটি বারবনিতা, যে-ও ত্রৈলোক্যের সঙ্গেই ধরা পড়েছিল খুনের সহযোগী হিসেবে। কিন্তু প্রিয়, শেষে সরকারের মার্জনার প্রতিশ্রুতি পাবার পর, রাজসাক্ষী হতে রাজি হয়ে ত্রৈলোক্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। তার সাক্ষ্য অনুযায়ী, ত্রৈলোক্য রাজকুমারীকে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে হত্যা করে, এবং সে যখন মৃতের অলঙ্কার নিয়ে তার ঘর থেকে বার হয়ে আসছিল, তখন প্রিয় তাকে দেখতে পায়। প্রিয়র প্রশ্নের উত্তরে ত্রৈলোক্য নাকি বলে যে সে রাজকুমারীকে হত্যা করেছে, এবং প্রিয়কে ভয় দেখায় এই বলে যে সে যদি এ কথা ফাঁস করে, তাহলে তার ভাগ্যেও অনুরূপ মৃত্যু ঘটবে। ত্রৈলোক্য আরও বলে যে আগেও সে এইভাবে অনেককে খুন করেছে। প্রিয়র এই সাক্ষ্যের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে ফাগান বলেন, একজন রাজসাক্ষীর স্বার্থপ্রণোদিত, এবং সেই হেতু পক্ষপাতদুষ্ট প্রতিবেদন, কী সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণীয়?

দ্বিতীয় প্রশ্ন তোলেন 'জুরি'-র তরফ থেকে একজন সভ্য। 'জুরি'-র অন্যান্য সব সভ্যরাই যখন ফাগান-এর বক্তব্য খারিজ করে সরকারি অভিশংসকের (public prosecutor) অভিযোগের যাথার্থ্য মেনে নিয়েছিলেন, তখন এই সভ্য, আবদুল হাই, তাঁদের সঙ্গে দ্বিমত হয়ে বলেন যে যতক্ষণ না খুনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী চাক্ষুষ প্রমাণ দাখিল করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত খুনের আসামির ওপর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেতে পারে না। আবদুল হাই-এর যুক্তি বিচারক নরিস বাতিল করে বলেন যে-সব হত্যাই প্রকাশ্যে ঘটে না, এবং তার সাক্ষীও থাকে না। সকলের অগোচরে কেউ খুন হলে কী করে অপরাধীকে শনাক্ত করা যায়? এক্ষেত্রে অভিশংসক প্রদত্ত যা কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ, তার ভিত্তিতেই 'জুরি'কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।[৪]

বলা বাহুল্য, এই ধরনের অসম্পূর্ণ ও অনেক সময়, পুলিশ নির্দেশিত, সাক্ষ্য-প্রমাণ—যার ওপর নির্ভর করে সে-যুগের 'জুরি' ও বিচারকেরা মৃত্যুদণ্ডের মতো

গুরুত্বপূর্ণ দণ্ডাদেশ দিতেন—হালকা অপরাধে অভিযুক্ত বহু মানুষকে, এবং কখনও হয়তো নিরপরাধী নাগরিককেও ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিত।

মোকদ্দমার নিষ্পত্তির পর, অর্থাৎ ত্রৈলোক্যের মৃত্যুদণ্ড আদেশ পাবার পর, ফাঁসি হবার কিছুদিন আগে, ত্রৈলোক্য এক দীর্ঘ স্বীকারোক্তি দেন যে পুলিশ কর্মচারী তাঁকে ধরেছিলেন, তাঁর কাছে।

এই স্বীকারোক্তিটি নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, এই এজাহারে ত্রৈলোক্য আগে বিচারালয়ে তাঁর প্রদত্ত সাক্ষ্য (যেখানে তিনি নিজেকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন)—তার থেকে পুরোপুরি সরে গিয়ে অকপটে স্বীকার করেন যে তিনি কেবলমাত্র রাজকুমারীকে হত্যা করেননি, এর আগে কমপক্ষে আরও পাঁচজনকে খুন করেছেন। মনে হয়, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, এটা জেনে ত্রৈলোক্য তাঁর অন্তিম স্বীকারোক্তি রেখে যাচ্ছিলেন—যাতে আর কিছু ঢাকবার দরকার নেই, তাঁর সারা জীবনের ভালো-মন্দ কাজের খতিয়ান হিসেবে যা বিবেচিত হবে বলে তিনি মনে করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, এই স্বীকারোক্তির অনুলেখক ছিলেন এক পুলিশ দারোগা, যিনি স্বয়ং ঐ খুনের মামলায় তদন্ত চালিয়ে ত্রৈলোক্যকে অবশেষে দোষী বলে প্রমাণিত করেছিলেন। মামলার নিষ্পত্তি ও চরম দণ্ডাদেশের পরেও, তিনি কোনো এক বিশেষ মানসিক তাড়নায় ত্রৈলোক্যের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন বোধ করেন। কারাগারে গিয়ে তিনি এই ফাঁসির আসামির সঙ্গে দেখা করেন ও তাঁর অন্তিম বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন।

এই সূত্রে, এই স্বীকারোক্তির তৃতীয় মাত্রাটি চোখে পড়ে। বোঝা যায়, তদন্তকারী দারোগাটি তাঁর অনুলিখনে নিজের রং চড়িয়ে ত্রৈলোক্যের আত্মকথন পরিবেশন করেছেন। ত্রৈলোক্যের আটপৌরে কথ্য বাংলাতে বিবৃত জবানবন্দি তিনি সাধু বাংলাতে ভাষান্তর করেছেন। তাঁর প্রকাশভঙ্গিতেও ধরা পড়ে তাঁর ফরিয়াদি মনোভাব—ত্রৈলোক্যের জীবনের অপরাধমূলক ঘটনার লোমহর্ষক উত্তেজনাপূর্ণ বর্ণনার প্রতি ঝোঁক, তাঁর অনুশোচনাসূচক মন্তব্যগুলিকে প্রায়শ্চিত্তের ইঙ্গিত বলে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা। এ অনুলিখন পড়তে-পড়তে অনেক সময় মনে হয় যেন দারোগামশাই তাঁর আগের তদন্তে উদ্‌ঘাটিত তথ্যের সত্যতা যাচাই করার তাগিদেই ত্রৈলোক্যের সঙ্গে শেষবারের মতো সাক্ষাৎকার করতে এসেছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের নেপথ্যে, হত্যাকারিণীর অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে কৌতূহল ছাড়াও, তদন্তকারী দারোগা তাঁর নিজের দায়িত্ব (অর্থাৎ ত্রৈলোক্যের ফাঁসির কারণ-স্বরূপ নিজেকে দায়ী করা) স্মরণ করে, আত্মপীড়নে ভুগেছিলেন বলে মনে হয়। তাই, তাঁর অনুলিখিত ত্রৈলোক্যের শেষ এজাহার এক বিচিত্র দলিল হয়ে উঠেছে। ত্রৈলোক্যের আত্মকথন ছাড়াও, অনুলেখকের নিজের মনের দুর্বলতা ও সংস্কার,

ত্রৈলোক্যের প্রতি মনোভাবে তাঁর সমবেদনা ও বিতৃষ্ণার দ্বন্দ্ব—এসব এসে পড়েছে তাঁর অনুলিখনে, বিশেষ করে 'সূচনা' ও 'উপসংহার' নামাঙ্কিত দুই পরিচ্ছেদে। ত্রৈলোক্যের জবানবন্দি তাই দু'জন মানুষের জবানবন্দি—শিকারি ও তার শিকারের মিলেমিশে আলাপ।

এ ক্ষেত্রে শিকারি ছিলেন, সে-যুগের কলকাতার পুলিশ দপ্তরের গোয়েন্দা কর্মচারী প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি উনিশ শতকের শেষার্ধে সফল দারোগা রূপে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রিয়নাথের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। নদীয়া জেলার জয়রামপুর গ্রামে এক সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৫৫ সালে তাঁর জন্ম হয়। ছোটোবেলা থেকেই গ্রামে ডাকাতি, নীলকর সাহেবদের অত্যাচার, এই ধরনের নানা অপরাধমূলক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বড়ো হয়ে ওঠেন। পরে কৃষ্ণনগর কলেজে প্রিয়নাথ পড়াশোনা করেন ও ১৮৭৮ সালে বাংলা সরকারের পুলিশ বিভাগে যোগ দেন, যেখানে তিনি তেত্রিশ বছর ধরে কাজ করেন। পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের দারোগা হিসেবে এই দীর্ঘকাল ধরে তিনি বহু খুন, জুয়াচুরি, এই সব অপরাধের অনুসন্ধান করতে গিয়ে নানা ধরনের মানুষের সংস্পর্শে আসেন ও বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ১৯১১ সালে প্রিয়নাথ পুলিশ বিভাগ থেকে অবসর নেবার পর, তাঁর বন্ধুরা তাঁকে অনুরোধ করেন তাঁর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার জন্য। তাই তিনি, 'দারোগার দপ্তর' নাম দিয়ে ধারাবাহিক কাহিনি প্রকাশ করতে থাকেন প্রতি মাসে—তাঁর পুলিশ জীবনে তাঁর দ্বারা তদন্তকৃত মোকদ্দমার কাহিনি। প্রিয়নাথের নিজের ভাষায়—''দীর্ঘকাল ডিটেকটিভ পুলিশে কার্য্য করিয়া, যে সকল মকর্দ্দমার কিনারা করিতে সমর্থ বা সময় সময় অকৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা আমি অনেক সময় দারোগার দপ্তর-এ প্রকাশ করিয়া থাকি...''[৫] স্বীকার করতে হবে, প্রিয়নাথ নিজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন তাই তাঁর সাফল্যের বিবরণীর পাশাপাশি, তিনি দারোগার দপ্তরে অনেক খুনের মামলায় তাঁর অনুসন্ধানের ব্যর্থতার কথাও সততার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। অবশ্য, এই ব্যর্থতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, ঐ সব অসফল তদন্তের বিবরণী দিতে গিয়ে, সে-যুগের বাংলাদেশের অপরাধ পরিমণ্ডলকে একটা অভেদ্য রহস্যময় জগৎ-রূপে বর্ণনা করার প্রবণতা দেখা যায় প্রিয়নাথের কিছু অনুকাহিনিতে। পরবর্তী যুগের বাঙালি গোয়েন্দা-কাহিনির কথা-সাহিত্যিকদের রচনাভঙ্গি ও ঘটনা-পরিকল্পনা অনেক সময়ই স্মরণ করিয়ে দেয় প্রিয়নাথের দারোগার দপ্তর-এর বর্ণনাভঙ্গি। এ বিষয়ে প্রয়াত স্বনামধন্য অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় তাঁর 'ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি'-তে কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছেন।

দারোগার দপ্তর-এর ধারাবাহিক বিবরণীর একটি কিস্তিতে (সপ্তম বৎসরের ৭৮তম সংখ্যাতে) প্রিয়নাথ বিবৃত করেন কীভাবে তিনি রাজকুমারীর হত্যার তদন্ত করতে গিয়ে ত্রৈলোক্যকে খুনি হিসেবে শনাক্ত করেন। এর অনেক পরে, *দারোগার দপ্তর*-এ দুই দফায় (১৪৬ ও ১৪৭ সংখ্যাতে), প্রিয়নাথ ত্রৈলোক্যের সঙ্গে যে শেষ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন, তার এক দীর্ঘ বিবরণী প্রকাশ করেন। 'পাহাড়ে মেয়ে'—এই শিরোনামে কাহিনিটি প্রকাশিত হয়।

রাজকুমারীর খুনের আগেও, ত্রৈলোক্যের নাম পুলিশের খাতায় উঠেছিল, ঐ সময়ে কলকাতায় ও আশেপাশে কিছু খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত হবার সন্দেহে। এবং এই সব ঘটনার তদন্তে প্রিয়নাথ-ই নিযুক্ত হয়েছিলেন। সুতরাং, ত্রৈলোক্য তাঁর কাছে বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। এ সত্ত্বেও, প্রিয়নাথের ভাষায়, "...ইহার জীবনচরিত বিশদরূপে জানিবার নিমিত্ত, চরমদণ্ডের আদেশের পর আমি এক দিবস কারাগারে গমন করি..." ফাঁসির আসামির ফাটকে ঢুকে, প্রিয়নাথ ত্রৈলোক্যকে বলেন—"...তোমার এই অন্তিম সময়ে দুইটি সবিশেষ কার্যবশতঃ আজ আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। প্রথমত, তুমি সবিশেষরূপে অবগত আছ যে, তোমার এই ভয়ানক দণ্ডের মূলীভূত কারণ সকলের অন্যতম কারণই আমি। কারণ, যে রূপ ভাবে আমি এই মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া, যদি আমি এই অনুসন্ধানে লিপ্ত না হইতাম, বা যেরূপ ভাবে আমি তোমাকে প্রতারিত করিয়াছিলাম, সেইরূপ ভাবে তুমি যদি আমা কর্তৃক প্রতারিত না হইতে, তাহা হইলে এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কথা সকল বোধ হয়, কিছুই প্রকাশিত হইয়া পড়িত না; সুতরাং তুমিও এই ভয়ানক দণ্ডে দণ্ডিত হইতে না।"

প্রিয়নাথ বোধহয় ভাবতে পারেননি যে তাঁর অনুসন্ধানের বিবরণীর ভিত্তিতে বিচারালয় ত্রৈলোক্যকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করবে। সেকালের ধর্মভীরু এই বাঙালি পুলিশ কর্মচারীটি নানা 'প্রতারণা' করে চোর-ডাকাত বা খুনিদের ধরলেও তাঁর তদন্তের ফলস্বরূপ যে একজন মানুষের মৃত্যু হবে, বিশেষ করে নারীহত্যার জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী বলে তিনি চিরকাল চিহ্নিত হয়ে থাকবেন—এই চিন্তাটা প্রিয়নাথকে অস্থির করে তুলেছিল বলে মনে হয়। তাই দেখি, ত্রৈলোক্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের শুরুতেই তিনি বলছেন—"দেখ ত্রৈলোক্য। তোমার উপর যেরূপ ভয়ানক রাজদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, সেরূপ দণ্ড এ দেশীয় অপর কোন হিন্দুরমণী যে আর কখন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমি অবগত নহি।..."

কিছুক্ষণ পরে, নিজেকে এই ভয়ানক পরিসমাপ্তির 'অন্যতম কারণ' বলে স্বীকার করে, প্রিয়নাথ ত্রৈলোক্যকে বলেন—"...তোমার জীবনের এই শেষ সময়ে তোমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার মানসে আজ আমি তোমার নিকট উপনীত হইয়াছি। আশা করি, যদি ইহাতে আমার কোনরূপ দোষ থাকে, তাহা হইলে তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে।" তারপর নিজের দোষস্খালনের চেষ্টা করতে গিয়ে, প্রিয়নাথ আত্ম-সমালোচনা করে, নিজের তদন্ত সম্বন্ধে বলেন—"...নিজ ইচ্ছার বশবর্ত্তী বা কোনরূপ লোভ পরতন্ত্র হইয়া আমি এরূপ জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই, তাহা তুমি বেশ অবগত আছ। কেবলমাত্র, আমার কর্ত্তব্যকর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি তোমার এইরূপ বীভৎস পরিণামের মূলীভূত কারণ সমূহের অন্যতম কারণ হইয়াছি।"

প্রিয়নাথ যে শব্দগুলি ব্যবহার করছেন, লক্ষণীয়। নিজের তদন্তকে বর্ণনা করছেন 'জঘন্য কার্য' বলে। বিচারালয় প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডকে বলছেন 'বীভৎস পরিণাম'। আর এই পরিণামের জন্য নিজেকে 'অন্যতম কারণ' বলে দোষী করছেন।

এ সব কি প্রিয়নাথের অপরাধের আন্তরিক স্বীকৃতি? না—অনেকেই হয়তো সন্দেহ করতে পারেন—ত্রৈলোক্যের সহানুভূতি আদায় করে তাঁর পুরো আত্মজীবনী ও কৃত হত্যাকাণ্ডের আসল কারণ আবিষ্কার করার তাগিদেই প্রিয়নাথ এ সব কথা বলেছিলেন। হতেও পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে দু'জনেই—প্রিয়নাথ ও ত্রৈলোক্য—পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছেন এমন এক মুহূর্তে যখন কারুরই কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ আর জড়িত নেই এই সাক্ষাৎকারে।

যাই হোক, এরপর প্রিয়নাথ ত্রৈলোক্যের কাছ থেকে জানতে চান তাঁর জীবনের ইতিকথা। তার উত্তরে ত্রৈলোক্য এক দীর্ঘ বিবরণী দেন। সে যুগে সচরাচর যা ঘটত, এঁর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। অর্থাৎ, খুব অল্প বয়সে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ দেওয়া হয় এক বৃদ্ধের সঙ্গে। বালবিধবা হয়ে তিনি তাঁর গ্রামের এক বৈষ্ণবী (তারা দিদি)-র সংস্পর্শে আসেন। এর পর ত্রৈলোক্যের জীবনালেখ্য কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম, উক্ত তারা দিদি (ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দর*-এর হীরা মালিনী, ও পরবর্তী যুগের ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নববিবি বিলাস*-এর কুটনীর ভূমিকা অবলম্বন করে) তাঁকে একটি 'নাগর'-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এর সঙ্গে ত্রৈলোক্য গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এসে হাজির হন। এর পর দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। ত্রৈলোক্য সোনাগাছিতে বারবনিতারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অনেক ধন উপার্জন করে বাড়ি-গাড়ি করেন। এই সময় তাঁর জীবনে কালীবাবু নামে একটি প্রেমিকের আগমন ঘটে, আর তৃতীয় পর্ব শুরু হয়। কালীবাবুর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে যৌবনোত্তীর্ণা ত্রৈলোক্য, কালীবাবুর ভরণ-

পোষণের ও তার পুত্র হরির লালন-পালনের পুরো দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিলেন। কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলল না। ত্রৈলোক্যের সঞ্চিত অর্থ ক্রমশই ফুরিয়ে আসছিল। কালীবাবুর সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের পর ত্রৈলোক্য আর দেহ বেচে অর্থ উপার্জন করছিলেন না। অথচ কালীবাবুও কোনো চাকরি-বাকরি করছিলেন না। ফলে, ত্রৈলোক্যকে তাঁর বিলাসবহুল জীবনের ধারা পরিত্যাগ করতে হল, আর ক্রমে ক্রমে গহনা বন্ধক দিয়ে সংসার চালাতে শুরু করলেন। এরপরই, কালীবাবুর পরামর্শে ত্রৈলোক্যের জীবন এক নতুন মোড় নিল। এবার লোক ঠকিয়ে পয়সা লুঠ করে সরাসরি অপরাধ জগতে প্রবেশ করে, চতুর্থ পর্ব শুরু হচ্ছে।

এই পর্বের বিবরণী এক বিচিত্র picaresque (পাজি বদমাশ সব লোকদের নিয়ে টুকরো-টুকরো নানা কাহিনি)। এক্ষেত্রে তা আবার দুষ্টুবুদ্ধির সাহায্যে জীবিকার্জনের ইতিহাস, যাতে আমরা খুঁজে পাই সেই সময়কার কলকাতার অন্ধকার-জগতের নানা ছল-চাতুরী, লোক-ঠকানোর নিত্য-নতুন উদ্ভাবনী কৌশল। মদের সঙ্গে চুরুটের ছাই মিশিয়ে, মদ্যপদের বেহুঁশ করে তাদের সর্বস্ব লুঠ করার কায়দা থেকে, আরও সুদূরপ্রসারী কৌশল অবলম্বন—দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে বোকা হবু বরদের প্রলোভিত করে কলকাতায় টেনে নিয়ে এসে এক বেশ্যা কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে টাকা-পয়সা আদায় করা।

কিন্তু জাল-জুয়াচুরি করে অর্থোপার্জনের পথও বন্ধ হয়ে এল। অপরাধ জগতে বেঁচে থাকার চূড়ান্ত উপায় অবলম্বন করতে হলো ত্রৈলোক্য-কালীবাবু দম্পতিকে। অর্থাৎ মানুষ খুন করা। এখান থেকেই ত্রৈলোক্যের জীবনের পঞ্চম বা শেষ পর্ব শুরু। এইরকম এক মানুষ খুনের মামলাতে কালীবাবুর ফাঁসি হয়ে যাবার পর, ত্রৈলোক্য একেবারে পথে বসেন। কালীবাবুর পুত্র হরি (যাকে তিনি প্রতিপালনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কালীবাবুর ফাঁসির প্রাক্কালে)-কে নিয়ে ত্রৈলোক্য শেষে এক খোলার ঘরে আশ্রয় নেন। এই অবস্থাতেও বেঁচে থাকার জন্য টাকার প্রয়োজন। কীভাবে সে টাকা আসবে? ত্রৈলোক্য তা অর্জন করার জন্য শেষ পর্যন্ত কালীবাবুর পন্থাই অবলম্বন করলেন—অর্থাৎ খুন। ভুলিয়ে-ভালিয়ে কমপক্ষে পাঁচটি মহিলাকে মানিকতলার সন্নিকটবর্তী নির্জন পুকুরে নিয়ে এসে ডুবিয়ে মেরে তাদের গহনা ও অর্থ আত্মসাৎ করে, ত্রৈলোক্য ক্রমে ক্রমে নিজের অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হলেন। একে-একে পাঁচজনকে, একই পন্থায় খুন করেও, কী করে তিনি পার পেয়ে গেলেন, এ অভাবনীয় কাণ্ডের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ত্রৈলোক্য পুলিশ বিভাগের অপদার্থতাকে দায়ী করছেন। পুলিশ ডাক্তারের তদন্ত ও সাক্ষ্য কীভাবে তাঁকে বাঁচিয়ে দেয় তার নমুনা দিচ্ছেন

ত্রৈলোক্য—"একটী একটী করিয়া ক্রমে পাঁচ পাঁচটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ সেই পুষ্করিণীতে পাওয়া গেল, এবং ডাক্তারের পরীক্ষায় সেই পাঁচটি স্ত্রীলোক-ই জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, ইহাই সাব্যস্ত হইয়া গেল।"

এমনকি একবার হাতে-হাতে ধরা পড়ার পরও ত্রৈলোক্য বেঁচে যান—আবার ঐ পুলিশি গাফিলতির দরুন। একবার, ঐ একইভাবে একজন মহিলাকে ভুলিয়ে এনে মানিকতলার ঐ বাগানের পুকুরে তাকে ডুবিয়ে খুন করার চেষ্টার সময় ত্রৈলোক্যকে একজন ধরে ফেলে ও থানায় হাজির করে। ঐ সময়ে থানার যে ভারপ্রাপ্ত জনৈক বৃদ্ধ কর্মচারী ছিলেন, তিনি ত্রৈলোক্যকে জেরা করে "কি ভাবিয়া আমার কথা বিশ্বাস করিলেন, এবং উহাদিগকে (অর্থাৎ যে মহিলাটিকে তিনি খুন করার চেষ্টা করেছিলেন এবং যে পুরুষটি ঐ অবস্থায় ত্রৈলোক্যকে ধরে ফেলেন) অভিযোগ না শুনিয়া সকলকেই থানা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।"

এর পরের ঘটনা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। মৃত্যু থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত মহিলাটি ত্রৈলোক্যকে ক্ষমা করতে রাজি ছিলেন না। তাই কিছুদিন পরে তিনি তাঁর এক আত্মীয়ের হাত দিয়ে দারোগা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে ঘটনার সমস্ত বিবরণী পেশ করেন। প্রিয়নাথ অনুসন্ধান করে, হত্যা করার চেষ্টার অপরাধে ত্রৈলোক্যকে গ্রেফতার করে বিচারার্থে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করেন। প্রিয়নাথের অনুসন্ধানে ফাঁস হয়ে যায় যে থানার সেই ভারপ্রাপ্ত 'বৃদ্ধ কর্মচারী'টি ত্রৈলোক্যের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের 'ডায়েরি' গ্রহণ না করে ত্রৈলোক্যকে ছেড়ে দেন। ফলে ঐ কর্মচারীটিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়, এবং তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে ওই মোকদ্দমাতে যদি ত্রৈলোক্যের অপরাধ প্রমাণিত হয় ও তাঁর দণ্ড হয়, তাহলে তাঁকেও তাঁর আগের গাফিলতির জন্য উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে। ত্রৈলোক্যের পক্ষে এটা শাপে বর হল। "কর্ম্মচারীর উপর এইরূপ আদেশ প্রচার আমার পক্ষে সবিশেষ রূপ মঙ্গলজনক হইয়া পড়িল। কারণ, সেই মোকদ্দমায় আমাকে কোনরূপ প্রতিকারের উদ্যোগ করিতে হইল না, বা আমার নিকট হইতে একটিমাত্র পয়সাও বাহির করিতে হইল না, সমস্ত ব্যয়ই কর্ম্মচারী মহাশয় নিজকোষ হইতে প্রদান করিলেন।" নিজেকে বাঁচাবার জন্য পুলিশ কর্মচারীটি ত্রৈলোক্যকেও নির্দোষ বলে প্রমাণিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই যখন ত্রৈলোক্যের মামলা দায়রায় উঠল, তখন "সেই স্থানে জুরির বিচারে, ইংরাজ আইনের গুণে ও সেই পুলিশ কর্ম্মচারীর ব্যয়ে আমি সে যাত্রা পরিত্রাণ পাইলাম।" দুর্বৃত্ত-পুলিশ যোগসাজশের (Criminal-police nexus) মুখে বিচারালয়ের অক্ষমতার যে অভিযোগ আজকাল হর্-ওয়াক্ৎ শোনা যায়, তার সূত্রপাত সেই 'ইংরাজ আইন'-এর রাজত্বকাল থেকেই।

সে-যাত্রায় পরিত্রাণ পেয়ে, ত্রৈলোক্য পুরোনো পাড়া ছেড়ে, পাঁচুধোবানির গলির মধ্যে একটি ঘর ভাড়া করে পোষ্যপুত্র হরির সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। এখান থেকেই তাঁর অন্তিম অভিযান—রাজকুমারীর হত্যা—'আমার জীবনের শেষ লীলা।'

প্রিয়নাথ অনুলিখিত এই হত্যাকারিণী বারবনিতার জবানবন্দির ভাঁজে-ভাঁজে দু'জন মানুষের বিচিত্র মানসিকতা ও মনোভঙ্গির হদিশ পাচ্ছি—এক অনুলেখক, দুই প্রতিবেদক। প্রথমে উপরিস্তরে, পাঠকেরা অনুলেখক দারোগার চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন প্রতিবেদক ত্রৈলোক্যের জীবনযাত্রার গতিপথ। তাঁর চরিত্রের মূল্যায়নও এই দারোগার ভাষাতেই পাঠকদের কাছে পরিবেশিত হচ্ছে। বারবনিতাটির মৃত্যুদণ্ডর জন্য নিজের দায়িত্ব স্মরণ করে এক ধরনের পাপবোধ থেকে ভুগেও কিন্তু প্রিয়নাথ শেষ পর্যন্ত দারোগা-সুলভ হুমকি দেওয়ার প্রবণতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। তাই দেখি, ত্রৈলোক্যের ফাঁসি অবধারিত জেনেও, তাঁর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ জোগাড় করার কোনো প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও, এই মহিলাটির জীবন সম্বন্ধে জানবার এক উদগ্র বাসনায় তাড়িত হয়ে যখন প্রিয়নাথ তাঁকে অনুরোধ করছেন, তখনও সে অনুরোধে পুলিশি জেরার ছায়া পড়ছে। হুমকির ভাষায়, দারোগা প্রিয়নাথ বলছেন—"ত্রৈলোক্য! এখন তুমি বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, তোমার মৃত্যু অতি নিকটবর্ত্তী।...আমার বিশ্বাস, এই অবস্থায় তুমি আর কোনরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া তোমার কলুষিত আত্মাকে আরও কলুষিত করিবে না।"

'কলুষিত'—এই অভিধাটি লক্ষণীয়। প্রিয়নাথের চোখে ত্রৈলোক্যর জীবন ও মন চিরকালের মতো নোংরা হয়ে গেছে। মহিলা দেহোপজীবনী, এবং তদোপরি খুনি। সুতরাং ভদ্রসমাজে অস্পৃশ্য। অথচ, তাঁর প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণও অনুভব করছেন এই ভদ্রসমাজের সুরক্ষার জন্য নিয়োজিত একজন বাঙালি দারোগা। বারবনিতা সম্প্রদায়ের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের এই দ্বন্দ্বে বাঙালি ভদ্রলোক সমাজ বহুকালাবধি নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় পীড়িত।[৬] প্রিয়নাথ কি ত্রৈলোক্যের অতীত সম্বন্ধে নিছক ব্যক্তিগত কৌতূহল থেকে এই জবানবন্দি (যা তাঁর চাকুরিতে, ও আইনের চোখে, একেবারেই অপ্রয়োজনীয় ছিল সেই মুহূর্তে) লিপিবদ্ধ করেছিলেন? এই এজাহার গ্রহণের বহু বছর পরে 'দারোগার দপ্তর'-এর কিস্তিতে যখন তিনি এই জবানবন্দিটি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিলেন, ততদিনে প্রকাশনা জগতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। গোয়েন্দা কাহিনি বাজারে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে—শুধু বটতলার কল্যাণে নয়, ভারতী-র মতো সম্ভ্রান্ত পত্রিকার পাতাতেও তা আদৃত (নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, প্রভৃতির গল্প দ্রষ্টব্য) হয়ে উঠেছিল। এই ধরনের রহস্য কাহিনির রচনাশৈলী দ্বারা

অনুপ্রাণিত হয়ে প্রিয়নাথ কি ত্রৈলোক্যের মূল জবানবন্দির মেজাজ ও ভাষাতে রং চড়িয়ে, তা প্রকাশ করেন 'পাহাড়ে মেয়ে' নামে? এই সব নানা সম্ভাবনা ও অনুমান উঁকি-ঝুঁকি মারে আজকের পাঠক-গবেষকদের মনে। কারণ, ত্রৈলোক্যের স্বীকারোক্তি এমন ভাষায় ও ভঙ্গিতে অনুলিখিত হয়েছে, যাতে অনেক সময় সন্দেহ হয়, প্রিয়নাথ আসলে ত্রৈলোক্যের মুখ দিয়ে, এক রোমাঞ্চকর কাহিনি বর্ণনা করার নিজস্ব বাসনা চরিতার্থ করতে চাইছেন। সঙ্গে সঙ্গে, এর মাধ্যমে নৈতিক উপদেশ দেবারও সুযোগ খুঁজছেন।

ত্রৈলোক্যের জবানবন্দির পরিচ্ছেদগুলির শিরোনাম লক্ষণীয় 'পাপের প্রথম সোপান' 'ষোলকলা পূর্ণ', 'সুখের ঢেউ', 'ভাঁটার টান', 'পৈশাচিক কাণ্ড', 'শেষ প্রায়শ্চিত্ত'। এগুলি সে সময়কার বটতলার জনপ্রিয় রহস্যোপন্যাসের অনুষঙ্গ বয়ে আনে। শেষের নামাঙ্কিত পরিচ্ছেদে ('শেষ প্রায়শ্চিত্ত') ত্রৈলোক্যের আত্মোপলব্ধি যে ভাবে বর্ণিত হচ্ছে, তা তো প্রায় এক ধর্মযাজকের বাণী-স্বরূপ—"এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি, আমার পক্ষে যে শাস্তির আদেশ হইয়াছে, উহা আমার প্রকৃত শাস্তি নহে। আরও বুঝিতে পারিতেছি, ইহজগতে আমার উপযুক্ত শাস্তি হইল না। ...পরজগতে গিয়া এই সকল পাপের শাস্তি আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে, হে জগদীশ্বর! এখন যেমন আমাকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিয়াছেন, পূর্ব্বে যদি তাহার কিছুমাত্র আমাকে অর্পণ করিতেন, তাহা হইলে আমার দ্বারা এরূপ ভয়ানক ভয়ানক কার্য্য সকল বোধহয়, কখনই সম্মত হইত না।"

এরপরে, প্রিয়নাথ স্বয়ং এসে হাজির হন 'উপসংহার' নামাঙ্কিত অধ্যায়ে। ত্রৈলোক্যের অনুশোচনার সুরকে আরও সপ্তকে চড়িয়ে, বাঙালি হিন্দু সমাজের ব্যাপক স্তরে তার জবানবন্দিকে হাজির করে, প্রিয়নাথ আক্ষেপ করছেন—"ত্রৈলোক্যের জীবনী কি ভয়ানক পাপাত্মিকা বিভীষিকায় পরিপূর্ণ! আর্য্যকুলের একমাত্র গৌরবস্থল—পবিত্র হিন্দু ললনার আদর্শ চরিত্র যে, এতদূর বিকৃত অবস্থায় পরিণত হইতে পারে, তাহা প্রকৃত ঘটনা হইলেও ত মনে স্থান দেওয়া যায় না।"

কিন্তু প্রিয়নাথের নিজস্ব রচনাশৈলীতে অনুলিখিত হলেও, এ জবানবন্দির মূল মাল-মশলা সবই ত্রৈলোক্যের জীবন্ত অভিজ্ঞতা। তার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন ত্রৈলোক্য তাঁর কোনো অন্তরতম হৃদয়াবেগ বর্ণনা করছেন, যেমন কালীবাবুর প্রতি তাঁর প্রেমানুরাগ, বা কালীবাবুর ছোটো ছেলে হরিকে কাছে পেয়ে তাঁর বাৎসল্য—"আমার সন্তান-সন্ততি জন্মে নাই, সন্তানের যে কি মোহিনী মায়া, তাহা আমি এত দিবস জানিতাম না; এতদিন পুত্র-স্নেহ আমার হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে নাই।

কিন্তু পরের পুত্রের নিমিত্ত এখন আর আমার তাহাও বাকী রহিল না; হরিকে আমি আমার পুত্রের ন্যায় দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে তাহাকে অতিশয় ভালবাসিতে লাগিলাম, তাহাকে খাওয়ালেই পরাইলে আমার মনে সুখবোধ হইত...''। ফাঁসির আগের মুহূর্তে, তাই প্রিয়নাথের কাছে ত্রৈলোক্যের শেষ অনুরোধ—''আমার হরি রহিল, অনুগ্রহ করিয়া সময় সময় তাহার এক একবার খোঁজখবর লইবেন, এবং দেখিবেন, সে যেন কোনরূপ কষ্ট না পায়।''

ত্রৈলোক্যের আর একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনাতে তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। সোনাগাছিতে প্রবেশ করে তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া—''দেখিলাম, সেই বাড়ীর ভিতর (যে বাড়িতে তাঁকে এনে হাজির করা হয়) উপরে ও নিম্নে ছোট বড় সতের আঠারখানি ঘর আছে।...সমস্ত ঘরগুলিই মনুষ্যের দ্বারা অধিকৃত।...বোধ হইল, প্রত্যেক ঘরই একটী একটী স্ত্রীলোকের আয়ত্তাধীন, এবং সেই সকল স্ত্রীলোক প্রত্যেকেই যেন স্বাধীনা, কেহ কাহারও কথার বশবর্ত্তিনী নহে। তাহাদিগের মধ্যে ছোট বড় বুঝিবার উপায় নাই। কারণ, কেহ কাহাকেও সম্মান করে না, এবং কেহই একান্নবর্ত্তিনী নহে।'' গ্রামের পারিবারিক শাসনে আবদ্ধ জীবনে অতিষ্ঠ কিশোরী ত্রৈলোক্যের মনে এই স্বচ্ছন্দভাবাপন্না নগরনটীদের প্রথম প্রভাবের একটি বাস্তব ছবি ফুটে ওঠে।

আসলে, এ জবানবন্দির শরীর থেকে যদি প্রিয়নাথের রচনাশৈলীর ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া যায়, তাহলে ত্রৈলোক্যের নিজস্ব তাগিদ-তাড়িত আবেগ-অনুভূতির একটা স্পষ্ট চেহারা বার হয়ে আসে। এ চেহারা কঙ্কালসার—উনিশ শতকের গ্রাম বাংলার ক্ষয়িষ্ণু সামাজিক কাঠামোর কঙ্কাল; তার অন্তরালে হিন্দু বাল-বিধবার জীবনধারার কঙ্কাল, ঔপনিবেশিক বাংলাদেশের রাজধানী কলকাতাতে এসে এমন একজন ব্রাহ্মণ কন্যার বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ, ও তার এই পেশার সূত্রে ক্রমান্বয়ে তার অনুভূতিগুলির কঙ্কালে পরিণতি; শেষে দারিদ্র্য-তাড়িত হয়ে অপরাধ জগতে প্রবেশ করে অন্যদের খুন করে তাদের কঙ্কালে পরিণত করা। এই Macabre বা করাল ইতিহাসের আড়ালে সে-যুগের কলকাতার অন্ধকার জগতে নয়া দুষ্কৃতকারীদের নিত্য-নতুন দুর্বৃত্তির উদ্ভাবন, এবং পুলিশ ও আইনব্যবস্থার সর্পিল যাত্রার এক বিচিত্র সত্যানুগ বিবরণ পাওয়া যায় 'পাহাড়ে মেয়ে'র জবানবন্দিতে।

টীকা

১. তুলনীয় : 'Not only do witnesses and those giving depositions characteristically tell lies that they hope will sound truthful, the judicial process itself limits what can be asked, what can be answered, what can be admitted as evidence, what can be considered in a verdict...Historians have long recognized that court cases generate evidence that has been polluted by authority...however, historians have not despaired, and many have reveled in the possibilities of new interpretations.' (Edward Muir and Guido Ruggiero. (ed.), pp. viii.-x)

২. এই ধরনের কিছু এজাহারের জন্য দ্রষ্টব্য—*The Weekly Reporter*, Vol. XII, 1869, 3 Vol. XVII. Criminal Proceedings.

৩. এই মামলার সংক্ষেপিত বিবরণীর জন্য দ্রষ্টব্য : *The Statesman* and *Friend of India*, Calcutta, 4th September, 1884।

৪. ঐ।

৫. দ্রষ্টব্য : প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

৬. Sumanta Banerjee, 1998.

'পাহাড়ে মেয়ে' লেখাটি *দারোগার দপ্তর*-এর ১৪৬, ১৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল—"ভূতপূর্ব ডিটেকটিভ পুলিশ শ্রী প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, কলিকাতা সিকদার বাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার হইতে শ্রী বাণীনাথ নন্দী কর্তৃক প্রকাশিত।" উল্লেখযোগ্য যে ইতিপূর্বে একই লেখক প্রণীত 'ডিটেকটিভ পুলিশ' নামে আর একটি সাময়িক পত্রেও 'পাহাড়ে মেয়ে' প্রকাশিত হয়। ডিটেকটিভ পুলিশ আর দারোগার দপ্তর-এ মুদ্রিত লেখা দুটিতে কিছু কিছু কমবেশি আছে।

অশ্লীলতা শব্দ মোরা আগে শুনি নাই
ঔপনিবেশিক বাংলায় 'অশ্লীলতা'র স্বরূপ নির্ণয়

১৮৭৪ সালের এপ্রিল মাসে, চৈত্র-সংক্রান্তির দিন, কলকাতার কাঁসারীপাড়া থেকে একটি সঙের মিছিল বার হয়; এই উপলক্ষে একটি গান গাওয়া হয়েছিল যা অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তার কিয়দংশ—

> শহরে এক নুতন হুজুক উঠেছে রে ভাই,
> অশ্লীলতা শব্দ মোরা আগে শুনি নাই,
> এর বিদ্যাসাগর জন্মদাতা
> বঙ্গদর্শন এর নেতা।[১]

এ গানটির কথাগুলি—ঠাট্টা-তামাশার ছলে হলেও—উনিশ শতকের পরিবর্তনশীল বাঙালি সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিতর্কের বিষয়—'অশ্লীলতা' কী? কোন মাপকাঠিতে তা বিচার্য? তার প্রকাশ্য প্রদর্শন কি সরকারি আদেশে নিষিদ্ধ, বা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষ, হওয়া উচিত? এ প্রশ্নগুলি আজও আমাদের আলোড়িত করে, এবং সদুত্তর এখনো মেলেনি।

এ-বিতর্ক আজ আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে যখন 'অশ্লীলতা'র সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিজড়িত করা হচ্ছে নানা উপলক্ষে—চিত্রকর হুসেনের বিবস্ত্রা সরস্বতী ও সীতার চিত্রায়ণের বিরুদ্ধে গোঁড়া হিন্দু রাজনৈতিক আক্রমণ যার একটা সাম্প্রতিক অভিব্যক্তি।

মনে রাখা দরকার, অশ্লীলতা-বিরোধী অভিযানের লক্ষ্যবস্তু মানবদেহের (বিশেষ করে তার বিবস্ত্র বা অর্ধনগ্ন অবস্থায়) কিছু প্রকাশ্য ভাবভঙ্গি, এবং শারীরিক (বিশেষ করে যৌনাত্মক) ক্রিয়ার বর্ণনা। 'অশ্লীলতা'—এই প্রত্যয়ের কেন্দ্রবিন্দু মানুষের শরীর।

শরীর : অতীত বাঙালি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আলোকে

কাঁসারীপাড়ার সঙের মিছিলে যাঁরা গেয়েছিলেন 'অশ্লীলতা শব্দ মোরা আগে শুনি নাই', তাঁরা সত্যিই তাঁদের নিরীহ ও স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধি থেকে কথাগুলি বলেছিলেন। তাঁদের চিন্তাধারায় ও বাঙালি লোকসংস্কৃতিতে—'অশ্লীলতা' নাম দিয়ে কোনোদিনও কোনো কিছুকে নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ করা হয়নি।

শুধু লোকসাহিত্য কেন—প্রাক্-ইংরেজ আমলে খোদ সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রেও 'অশ্লীলতা'র সংজ্ঞা যে ভাবে নিরূপিত হয়েছিল তার সঙ্গে পরবর্তী যুগের বাঙালি সমাজকর্তাদের নির্ধারিত 'অশ্লীলতা'র ব্যাখ্যার বিস্তর প্রভেদ দেখা যায়। পনেরো শতকের ওড়িশ্যা-নিবাসী বিখ্যাত সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্য-দর্পণ*-এ দেখতে পাই—

'অশ্লীলত্বং ব্রীড়াজুগুপ্সামঙ্গলব্যঞ্জকত্বা ত্রিবিধম্'

(অর্থাৎ লজ্জা, ঘৃণা ও অমঙ্গলের ব্যঞ্জনাভেদে, অশ্লীলতা তিন প্রকারের)

এর পরে, উদাহরণস্বরূপ লেখক একটি বাক্য উদ্ধৃত করেছেন—

'ভ্রমসার শনৈর্বায়ুর্বিনাশে তন্বী। তে তদা'[২]

(অর্থাৎ, হে তন্বী! তুমি চলিয়া যাইবার সময় ধীরে ধীরে বায়ু নিঃসৃত হইতেছিল) স্পষ্টতই, ইঙ্গিতটা মহিলার বাতকর্মের প্রতি! ব্যাপারটা লজ্জাজনক বলে 'অশ্লীল' রূপে বিবেচিত।

কিন্তু, এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে মহিলাদের রূপবর্ণনায় দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, বা প্রেমিক-প্রেমিকার রতিক্রিয়ার যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণী পাওয়া যায়, তা সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের কঠোর মানদণ্ডে কোনোদিন-ই 'অশ্লীল' বলে পরিগণিত হয়নি। বাংলা সাহিত্যে, এই বর্ণনাভঙ্গির ঐতিহ্যের ধারা বেয়েই আঠারো শতকে ভারতচন্দ্র *বিদ্যাসুন্দর* রচনা করেছিলেন। তারও আগে, আমাদের লোকসংস্কৃতিতে—গানে, কবিতায়, ছড়ায় ও লৌকিক উৎসবে—যৌনাত্মক-ব্যঞ্জনা ও বর্ণনা শৃঙ্গাররসকে জনস্বীকৃতির আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল, এবং কথ্য বাচনরীতিতে শারীরিক ক্রিয়াকলাপের অবাধ উল্লেখ সর্বসম্মত ছিল।

দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রথম, সাহিত্য থেকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর লেখা বলে অনুমিত (অনেকের মতে ষোলো শতকে) 'সেক্ শুভোদয়া'তে একটি

কামার্ত পতিহীনা রমণীর আকুল প্রার্থনার এক মর্মস্পর্শী বিবরণী পাওয়া যায়, যেটি পূর্ববঙ্গের জনপ্রিয় ভাটিয়ালি সুরে গীত বলে উল্লেখিত। মূল কথাগুলি—

রাত্রি হৈলে বহে অনল।
পীন পয়োধর বাঢ়ে আগ
প্রাণ না জায় গেল বহিঞা ভার।।
নয়াল বহিএগ পড়ে নীর নিতি
জীএ ন প্রাণী পলাএ ন ভীতি।[৩]

এর আধুনিক বাংলায় অনুবাদ হবে—রাত্রি হলে আগুন জ্বলে। পয়োধর পীনোন্নত হয় ও জ্বালা বাড়ে। (যৌবনের) ভার বয়ে দিন গেল, কিন্তু প্রাণ গেল না। নিত্য নয়নে অশ্রু ঝরে। প্রাণ জীবিত থাকতে চায় না, মন থেকে আশঙ্কা-ও দূর হয় না।

একাকিনী নারীর এই স্বাভাবিক রিরংসার প্রতিধ্বনি পাই উত্তরবঙ্গের রাজবংশী মেয়েদের একটি গানে, যা আজও গ্রামাঞ্চলে গীত হয় বৃষ্টির দেবতাকে আমন্ত্রণের জন্য। এ-গানটি একটা পুরোনো পুরুষ-বিবর্জিত লৌকিক আচারের সঙ্গে জড়িত। চৈত্র মাসে খরার সময়, অমাবস্যার এক রাতে গ্রামের মেয়েরা সমবেত হয় এক অনাবাদী জমিতে লাঙল আর বীজ নিয়ে। এখানে তারা নিজেদের সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে, এলোকেশী হয়ে, সারা রাত ধরে নাচে ও গান গায় বৃষ্টির দেবতা 'হুদুমা'র উদ্দেশে।[৪] গানের কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য—

হিল হিলাসে কোমরটা মোর
শির শিরাসে মোর গাও,
কোঠে কেনা গেলে এলা
হুদুমা দেখা পাও?
পাটনি খানি পরেসে খসিয়া
আওলা হয়েছে খোঁপাটা মোর
হুদুম দেখা দাও গো আসিয়া
আইসেক রে হুদুমা দেওয়া
রসিয়া রসিয়া
তোর পদে মই আসে রে বসিয়া,
দিংশালি দিংশালি কোমরটা
তাতেও নাই মোর ভাতারটা।
কারো কি মই কইবা কয়

কোঠে গেলা দেখা হয়
দেখা হলে দেহটা জুড়ায়।[৫]

বিশদ অনুবাদের প্রয়োজন নেই, কারণ অধিকাংশ শব্দই পরিচিত। মোটামুটি বক্তব্য—আমার কোমরটা দুলছে, শরীরটা কাঁপছে, হুদুমার জন্য। কোথায় তাকে পাব? আমার কাপড়খানি খসে গেছে শরীর থেকে, চুল এলো হয়ে গেছে; হুদুমা, এবার দেখা দাও, আর এসে আমাকে তোমার রসে সিক্ত করো। আমার ভাতার (স্বামী) এখানে নেই। কাকে বলব আমার কথা? কোথায় গেলে তোমার সঙ্গে দেখা হয়, ও দেখা হলে দেহটা জুড়ায়?[৬]

এই লৌকিক ঐতিহ্যের ধারা অনুযায়ীই পনেরো শতকে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের গান রচনা করেছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলীর আধ্যাত্মিক বাণী, নরনারীর আদিম দেহজ প্রেমের উৎসের সঙ্গে নিবিড় ভাবে সম্পর্কিত। মানবদেহ কীভাবে পূজার মন্দির হয়ে উঠতে পারে বিদ্যাপতি তার বর্ণনা দিয়েছেন—

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে
মঙ্গল যতঙ্গু করব নিজ দেহে।
কনয়া কুম্ভভরি কুচ যুগ রাখি
দরপনো ধরব কাজর দেয়ি আঁখি।
বেদি বানাবো হাম আপন অঙ্গমে
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে।
কদলি রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব
আম্র পল্লভ তাহে কিঙ্কিনি সুঝম্প।[৭]

বাংলা লোকসংস্কৃতিতে—বিশেষ করে মেয়েদের কথায়, প্রবাদে, ছড়ায়—শরীর-সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ উল্লেখ, বা ব্যঞ্জনাত্মক রূপক ও উপমার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। গ্রামীণ বাঙালি মেয়েদের ভাষায় কিছু শব্দ—যা এখনও প্রচলিত—পুরোপুরি শরীর সংক্রান্ত। যেমন, 'ডবকা' (হৃষ্টপুষ্ট সোমত্ত মেয়ে); 'ঢোক্কা' (যে মেয়ের শরীর ক্ষয়িষ্ণু); 'ঢুমশী' (মোটা মহিলা); 'আঁটকুড়ি' (বন্ধ্যা মহিলা)। কিছু প্রবাদ রেচন-সম্পর্কিত—মলত্যাগ, মূত্রত্যাগ, ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বিশেষ প্রসঙ্গে একটি পুরোনো মেয়েলি রসিকতা স্মরণীয়—

কপাল আমার বক্ত (মন্দভাগ্য)
শক্ত দেখে ভাতার নিলাম,
হাগে শুধু রক্ত।

এই জাতীয় scatological প্রবাদ সে-যুগে অনেক সময় সঙের মিছিলে রূপায়িত হত। ১৮২৫ সালে সরস্বতী পুজোয় প্রতিমা বিসর্জনের দিন একটি সঙের মিছিল বার হয়েছিল। সমসাময়িক এক সংবাদপত্রের ভাষ্য অনুযায়ী "তাহার ভাব এই একটা সাধারণ কথা আছে যে পথে হাগে আর চক্ষু রাঙ্গায়। এইভাবে একটা মনুষ্যাকার পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাকে বিবস্ত্র করিয়া সম্মুখে একটা জলপাত্র রাখিয়াছিলেন ইত্যাদি তাহার ভাবশুদ্ধ করিয়াছিলেন..."[৮]

জননেন্দ্রিয়-সম্পর্কিত রসিকতা বা হালকা গালিগালাজ অতীত বাংলা সংস্কৃতিতে 'খেউড়' নামে এক বিশেষ শিল্পশৈলী বা genre হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। নায়ক-নায়িকার দৈহিক প্রেমের গম্ভীর বর্ণনা যেমন শৃঙ্গার রসের ভাষায় সম্ভব ছিল, তার দেহজ উপাদান নিয়ে ঠাট্টা-তামাশার সুযোগ এনে দিয়েছিল 'খেউড়'। প্রতি যুগে, প্রতি দেশে দৈনন্দিন জীবনের জৈব সমস্যা নিয়ে বিয়োগান্ত tragedy-র সঙ্গে সঙ্গে হাস্যরসাত্মক comedy-ও রচিত হয়েছে। কার্ল মার্কসের কয়েকটি কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"বিশ্ব ইতিহাসের একটা পর্যায়ের অন্তিম স্তর comedy। গ্রীক দেবতারা Aeschylus-এর Prometheus Bound মৃত্যুমুখে পতিত হন বিষাদমগ্নতায়; এঁদেরই আবার দ্বিতীয়বার হাস্যকর পরিণাম ঘটে Lucian-এর Dialogue-এ..."[৯]

বাংলা লোকসংস্কৃতিতেও তেমনই রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের বিরহমিলনের ভাবপ্রবণতাপূর্ণ বর্ণনা পাই পদাবলী কীর্তনে, আবার তার পাশাপাশি তা নিয়ে আদিরসাত্মক রঙ্গ-তামাশা পাওয়া যায় 'খেউড়ে'। সে যুগে 'খেউড়' রাজসভাতেও আদরণীয় ছিল। ভারতচন্দ্রের নায়িকা, রাজকন্যা বিদ্যা, নায়ক সুন্দরকে বলছে—

নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাঠে খেঁড়ু শুনাইব।

নদীয়া অঞ্চলে 'খেউড়' বা 'খেড়ু' কী পরিমাণ জনপ্রিয় ছিল তা বোঝা যায় যখন শুনি নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র (১৭১০-৮২) তাঁর রাজসভাতে খেউড়ের প্রতিযোগিতায় সাধারণ প্রজাদের সঙ্গে তাঁর পুত্রদের আসরে নামাতেন। "...শারদীয় পূজার সময় নবমী কীর্তন উপলক্ষে নবমী পূজার দিন মহিষ বলিদানের পর কাদা খেউড়ের সময় স্বয়ং মহারাজ, যুবরাজ ও আর আর রাজকুমারদিগকে নিজে নিজে এক একটি সকার বকারের খেউড় রচনা করিয়া গাইতে হইত..."[১০]

এই 'কাদা খেউড়'-এর' ঐতিহ্য উনিশ শতকের শুরুতেও কলকাতায় চলে আসছিল। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে বলেছেন—"তখনকার দিনে নবমীতে পাঁঠা ও মোষ বলি করিয়া গায়ে রক্ত,

কাদা মাখিয়া মোষের মুণ্ডু মাথায় লইয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘোরা হইত। আর বৃদ্ধ পিতামহ তাহার সমবয়স্ক লোক, পুত্র পৌত্র লইয়া হাতে খাতা লইয়া কাদামাটির গান করিত...ইহাকে অপর কথায় খেউড় গান বলিত। তখনকার দিনে এ সবের প্রচলন ছিল এবং লোকে বিশেষ আপত্তি করিত না বরং আনন্দ অনুভব করিত।"[১১]

এ যুগের কৌতূহলী পাঠকদের কাছে ওই যুগের খেউড়ের কিছু নিদর্শন দিলে তাঁরা বুঝবেন যে খেউড় নিছক গালিগালাজ ছিল না; বরং এর সরস আদিরসাত্মক টিপ্পনীতে সাধারণ মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের পোষ্যপুত্র গ্রহণের সময় নিমন্ত্রিতদের সামান্য দক্ষিণা দিয়ে বিদায়ের প্রতি কটাক্ষ করে খেউড় রচিত হয়েছিল—

সোনাদান শোনা মাত্র, ব্যয়ামাত্র জানি, শুভক্ষণে পোষ্যপুত্র
নিয়েছিল রাণি।
অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় কল্লেন বেশ, বাঁশবেড়ের আদ্যাক্ষর
গুপ্তিপাড়ার শেষ।[১২]

বা, আর-একটা উদাহরণ নেওয়া যাক সে-যুগের কবির লড়াই থেকে। শোভাবাজারে নবকৃষ্ণ দেবের বাড়ির দুর্গাপূজার উৎসবের আসরে কবিয়াল রামপ্রসাদ ঠাকুর সে সময়কার আর এক বিখ্যাত কবিয়াল রাম বসুকে ঠাট্টা করে এক ছড়ায় গেয়েছিলেন—

নাই কো রামবোসের এখন সেকেলে পৌরোষ,
এখন দল করে হয়েছেন রাম বোস রাম কামারের অণ্ডকোষ।[১৩]

স্পষ্টতই, প্রাক্-ঔপনিবেশিক বাংলা লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যে, শরীরের বর্ণনা বা জননেন্দ্রিয় নিয়ে রসিকতার পিছনে সামাজিক অনুমোদন ছিল। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কাহিনিতে দেহভিত্তিক বর্ণনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরবর্তী যুগের একজন সমালোচক বলেছিলেন—

"...বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে আমরা আজকাল যে সকল অশ্লীল পদাবলী দেখিতে পাই, প্রাচীন কালের সহজ লোকেরা উহার সেই অশ্লীলতা অনুভব করিতে পারিত না...তখনকার কবিতায় গৃহীত সবই শরীর বর্ণনা ও শরীরজ বৃত্তিসমূহের বর্ণনা। তখনকার প্রেমের আদর্শ দেহজ প্রীতি..."[১৪]

'কাদা-খেউড়'-এর saturnalia-ও, চড়কের মতো,[১৫] বছরে একটা দিন বল্‌গাহীন উদ্দামতার সুযোগ এনে দিত সাধারণ মানুষের কাছে যাঁরা সারা বছর আষ্টেপৃষ্ঠে খাটুনির জালে বদ্ধ হয়ে থাকতেন। মধ্যযুগের ইউরোপে এই জাতীয় saturnalia-র অট্টহাসি ও হুল্লোড়ের আলোচনা করতে গিয়ে রুশ সমালোচক Mikhail Bakhtin বলেছেন—"হাস্যরস মানুষকে মুক্তি দেয় যে ভয় বহু হাজার বছর ধরে তার মনে

বাসা বেঁধেছে, তার থেকে:; সাত্ত্বিকতার ভয়, নিষেধাজ্ঞার ভয়, অতীতের ভয়, ক্ষমতার ভয়...'' Bakhtin এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন যে এই সব উৎসবে ব্যঙ্গ -বিদ্রূপ ও গালিগালাজে, শরীর এবং শরীরের উদ্ভট রূপ প্রধান অংশ জুড়ে থাকত।[১৬]

লক্ষণীয়, অতীতের বাঙালি সমাজে এই 'দেহজ প্রীতি'র সাহিত্যে ও আদিরসাত্মক লোকসংস্কৃতিতে উচ্চ-নীচ, সম্ভ্রান্ত-তথাকথিত 'ইতর'—উভয় শ্রেণির মানুষই রসগ্রহণে সমর্থ ছিলেন। এই যৌথ সংস্কৃতি-ই পরবর্তী যুগে, ইংরেজ ঔপনিবেশিক আমলে বর্জনীয় ও নিষিদ্ধ হল, এক নব্য-নির্মিত অশ্লীলতার সংজ্ঞার মাপকাঠিতে। বস্তুত, বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় ও সামাজিক তর্ক-বিতর্কে, 'অশ্লীলতা' একটা আক্রমণাত্মক উত্তেজনার খোরাক হয়ে আবির্ভূত হয়েছিল উনিশ শতকের শুরুতে। এই রোগগ্রস্ত প্রবণতার সূত্র বহুলাংশে নিহিত ছিল সে-যুগের ইংরেজি ঔপনিবেশিক চিন্তাধারায় যার অধিকাংশ জুড়ে ছিল মানবশরীর ও তার যৌন অভিব্যক্তিকে একটা বিধিবদ্ধ সংজ্ঞা ও আচরণবিধির খাঁচায় পিঞ্জরাবদ্ধ করার অভিপ্রায়। এর পরিণতি দেখা গিয়েছিল উনিশ শতকের বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের প্রণালীতে, শিক্ষিত বাঙালিদের উপর তার সাংস্কৃতিক প্রভাবে এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক বিধিনিষেধের আইনে।

শরীর : ঔপনিবেশিক চিন্তাধারার আলোকে

বিদেশি, বিশেষ করে ইংরেজ, নবাগত আগন্তুকদের চোখে এ দেশের লৌকিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান অদ্ভুত ও উদ্ভট লেগেছিল। কিন্তু তাঁদের সর্বপ্রথম মানসিক অভিঘাত বা cultural shock শুরু হয়েছিল এ দেশের নারী-পুরুষের দৈহিক আকার ও অনাবৃত শরীরের দর্শনে। জাহাজে করে কলকাতার কাছাকাছি পৌঁছুতেই আশেপাশের গ্রামের মানুষদের এবং নৌকোর মাঝি-মাল্লাদের সঙ্গে এঁদের প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় ঘটত। আঠারো-উনিশ শতক থেকে যত ইংরেজ পর্যটক বা সরকারি আমলা এদেশে এসেছেন, প্রায় প্রত্যেকেই লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁদের এই প্রাথমিক অভিজ্ঞতার কথা। প্রায় একই সুরে প্রত্যেকেই ঘৃণা-মিশ্রিত বিহ্বলতার সঙ্গে মন্তব্য করেছেন—বাঙালি মেয়ে-পুরুষেরা অধিকাংশই স্বল্প বসন ব্যবহারে অভ্যস্ত যার ফলে তাদের বস্তুত উলঙ্গ বলে পরিগণিত করা যায়।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটা কৌতূহলোদ্দীপক উদ্ধৃতি নেওয়া যেতে পারে। লক্ষণীয়, বাঙালি পুরুষদের শরীর ও তাদের স্বল্পবাস, বিশেষ করে ইংরেজ মহিলাদের মনোযোগ আকর্ষণ করত এবং এটা একটা obsession বা মানসিক ঘোরের পর্যায় গিয়ে পৌঁছেছিল।

আজকের আন্তর্জাতিক feminist ভগিনীসঙেঘর বাঙালি বিদূষীমণ্ডলী এদিকে নজর দিলে তাঁদের তাত্ত্বিক পর্যালোচনার অনেক উপাদান পেতে পারেন।

প্রথমে দেখা যাক ১৮১২ সালে Lady Maria Nugent-এর দিনলিপি। ভদ্রমহিলার স্বামী ছিলেন ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ। কলকাতার পথে সাগরদ্বীপের তীরে তাঁর জাহাজ পৌঁছোলে তিনি দেখতে পান এদেশের মাঝিদের যাদের "শরীর ছিল পাতলা, রং ছিল ঘন সবুজবর্ণ, প্রায় কালো, কিন্তু সুন্দর চেহারা...কাজ করার সময় তাদের কটিদেশে মাত্র একটি বস্ত্রখণ্ড থাকে...।" কলকাতাতে পৌঁছেও, ভদ্রমহিলার এই কটিবস্ত্রের ব্যাপারে কৌতূহল বরাবর সজাগ ছিল। শহরে বেড়াতে গিয়ে Black Hole-এর (যেখানে ১৭৫৬ সালে, সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের সময় ইংরেজ বন্দি-পরিবারের মেয়ে-পুরুষ শ্বাসরোধে মারা যায় বলে অভিযোগ করা হয়) সন্ধানে, তিনি এক স্থানীয় 'কালা আদমি'র সাহায্য নেন, "যার পরনে কিছুই ছিল না, একখণ্ড সুতোর বন্ধন ছাড়া।" কিছুদিন পরে, কলকাতায় চড়ক উৎসব দেখতে গিয়ে Lady Nugent লক্ষ করেন যে "পুরুষের দল, যাদের শরীরে খুব স্বল্প আবরণ ছিল, মাটিতে বসে প্রত্যেকেই হুঁকো টানছে..."[১৭]

তেইশ বছর পরে আর-একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলা, Emma Roberts ১৮৩৫ সালে কলকাতায় এসে লক্ষ করেন যে নিম্নস্তরের পালকি-বাহকদের অঙ্গে নিতান্ত অল্প বস্ত্র রয়েছে, এবং মন্তব্য করেন যে এই-জাতীয় চাকরেরা এই দেশে যদি (কোনো ইংরেজ) বৈঠকখানায় প্রবেশ করে বই-পত্তর সাফ করে, তা হলে এটা বিদেশি কোনো মহিলার চোখে খুব শোভনীয় দৃশ্য বলে বিবেচিত হবে না।[১৮]

উৎকলবাসী পালকি-বাহকদের স্বল্প আবরণের কথা বলতে গিয়ে ১৮১৯ সালে একজন ইংরেজ আমলার মন্তব্য—"...এরা উলঙ্গ, মাথা অনাবৃত এবং এরা নিঃশব্দে ছোটে।" কলকাতার বাঙালিদের সম্বন্ধে উক্ত আমলার মন্তব্য—"...এরা খর্বাকৃতি এরা কৃষ্ণকায় ও এদের অধিকাংশই উলঙ্গ হয়ে ঘোরাফেরা করে..."[১৯]

অবশ্য দুই-একজন ইংরেজ বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন কেন এদেশের লোক স্বল্পবাসে অভ্যস্ত। ১৭৯৩ সালে *Indian Observer* নামে একটি পত্রিকায় একজন লেখক ভারতীয়দের children of the sun, বা সূর্যের সন্তান বলে অভিহিত করে বলেন যে, উত্তপ্ত আবহাওয়ার তাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য তারা উপযোগী পোশাক অবলম্বন করেছে—বা অনেক সময় পোশাকের বাহুল্য বর্জন করেছে। তাঁর মতে, তাঁর স্বদেশবাসী ইংরেজরাই একমাত্র জাতি যারা সবরকম আবহাওয়াতেই, পৃথিবীর সর্বত্রই একই ধরনের পোশাক পরতে বদ্ধপরিকর।[২০]

এরও পরে, লন্ডন থেকে আগত এক ইংরেজ ধর্মযাজক, হাঁটু অবধি ধুতি পরিহিত এক বাঙালি 'বাবু'কে দেখে (যাকে তিনি 'nearly naked man' বলে বর্ণনা করেছেন) যারপরনাই বিরক্তিবোধ করলে-ও স্বীকার করেন—"স্বভাববশতই সে একাধিক পোশাক পরতে অভ্যস্ত নয়, এবং এই গরম আবহাওয়াতে বিনা পোশাকেই স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম বোধ করে।"[২১]

মজার কথা, বাঙালি পুরুষের ধুতির নীচে অনাবৃত পা দেখলে সে-যুগের ইংরেজদের শিষ্টাচারবোধে আঘাত লাগত। অথচ, ওদেরই স্বদেশে স্কটল্যান্ড-নিবাসী Highlander-রা যখন তাঁদের হাঁটু অবধি আলখাল্লা বা frock পরে bagpipe বাজাত, তখন তাদের অনাবৃত পা দেখে কোনো ইংরেজ রমণী চোখ বন্ধ করত না। উল্লেখনীয়, এই Highlander সৈন্যরা যখন ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহের সময় কলকাতাতে আসে, এবং শহরের রাস্তায় তাদের স্বদেশি পোশাক পরে কুচকাওয়াজ করত, তখন বাঙালিরা তাদের 'ন্যাঙটা গোরা' বলে অভিহিত করত।

স্পষ্টতই নগ্নতার সংজ্ঞা ও তার অনুমোদন culture-specific। কোনো এক দেশে তার বিশেষ জলবায়বীয় অবস্থায় ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন-জনিত পোশাক-আশাকের ব্যবহার, বিদেশি মানুষের চোখে অশোভনীয় বলে পরিগণিত হতে পারে। যেমন এদেশে আগন্তুক ইংরেজদের চোখে সাধারণ বাঙালিদের সাজসজ্জা অপ্রতুল বলে বিবেচিত হত, ঠিক তেমনই সমসাময়িক বাঙালি দর্শকদের দৃষ্টিতে ইংরেজদের নৈশভোজে মহিলাদের evening dress-এ অনাবৃত স্কন্ধ বা ballet-এ নর্তকীদের উন্মুক্ত দেহের প্রদর্শন, অশোভনীয় বলে বিবেচিত হতো। এ প্রসঙ্গে পরে আসব।

ইংরেজ আগন্তুকদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বাঙালিদের 'নগ্ন' বা 'অর্ধনগ্ন' আকৃতির সঙ্গে তাদের কালো রঙের সম্বন্ধ আবিষ্কার করে নিজেদের প্রাথমিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া অতিক্রম করতে চেষ্টা করতেন। যেমন, ধর্মযাজক Bishop Heber ১৮২৩ সালে কলকাতার সন্নিকটে পৌঁছে, জাহাজ থেকে এখানকার বাঙালি বাসিন্দাদের দেখে নিজের মনোভাবের বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসেন—"আমাদের চারিপাশে এই যে সব নগ্ন দেহ দেখছি এদের সঙ্গে কোনো অভব্যতার অনুষঙ্গ খুঁজে পাই না—যে অভব্যতা শ্বেতাঙ্গদের অনুরূপ আচরণে প্রযোজ্য—কারণ, এদের গায়ের রং আমাদের থেকে আলাদা।"[২২]

Heber-এর মন্তব্যটি বিশ্লেষণযোগ্য। সে-যুগে অনেক আদর্শবাদী ইংরেজ ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে ভারতবাসীরা অসভ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে তাদের শিক্ষিত করা অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হলেও তারা প্রকৃতির

আদিম সন্তানের মতো, পাপপুণ্য, সুরুচি-কুরুচির পার্থক্য বিচারে অনভিজ্ঞ—অনেকটা Rousseau-র noble savage-এর আদর্শ অনুযায়ী। তাই, Heber-এর যুক্তি—বাঙালি কালা আদমিরা যেহেতু পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকবর্জিত তারা স্বভাবতই উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াবে (যেমন সে-যুগে আফ্রিকাবাসীদের নিয়ে ইংরেজি ইতিহাসে একটা উলঙ্গ জংলি stereotype তৈরি করা হয়েছিল)! এবং যেহেতু Heber এদেশে পদার্পণ করেছেন বাঙালিদের তাঁর স্বধর্মে দীক্ষিত করে সভ্য করে তোলার মহৎ উদ্দেশ্যে—এবং তার সাধনের জন্য এই সব 'নগ্ন' Nativeদের মধ্যেই তাঁকে কাজ করতে হবে—তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কার্যক্রমকে কিছুটা সহনীয় করার প্রয়োজনে যুক্তি খুঁজেছেন এদের অনাবৃত দেহের উন্মুক্ত প্রদর্শনের ব্যাখ্যাকল্পে। লক্ষণীয়, Heber কিন্তু তাঁর স্বদেশি ইংরেজদের ক্ষেত্রে অনুরূপ দৈহিক নিরাবরণতা ক্ষমা করতে প্রস্তুত নন। তাঁর মতে, ইংরেজদের আচরণে এই ধরনের নগ্নতা-প্রদর্শন 'অভব্য।'

কিন্তু Heber-এর দেশ, খোদ ইংলন্ডে, তাঁর স্বদেশবাসীদের মধ্যে কি সবাই, সব সময় কঠোর অনুশাসনানুবর্তী হয়ে নিজেদের দেহ আষ্টেপৃষ্ঠে নিয়মমাফিক পোশাক-আশাকের খাঁচায় বেঁধে রাখত? অনেককে—বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে প্রকাশ্যে নিরাবরণ হতে দেখা গেছে সমসাময়িক বিবরণী অনুযায়ী। Heber-এর কিছু পরে, ইংলন্ডের একটি খবরের কাগজে তার সংবাদদাতা অত্যন্ত বিতৃষ্ণার সঙ্গে অভিযোগ করেছেন যে যদি কেউ কোনো এক "গরম দুপুরে লন্ডন থেকে বাষ্পীয় জাহাজে Better-sea bridge-এর উদ্দেশে যাত্রা করেন, তাহলে তিনি দেখবেন কিছুক্ষণ অন্তর এবং ঐ জাহাজের ডেকের পুরুষ ও নারী যাত্রীদের চক্ষুগোচরে—কমপক্ষে বারো, বা তার বেশি পুরুষ ও পূর্ণবয়স্ক ছোকরা উদম উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—কেউ নদীর তীরে, কেউ জলের মধ্যে কোমর ডুবিয়ে..."। সংবাদদাতা সন্দেহ করছেন যে এরা "মজা লুটছে নিজেদের শরীর প্রদর্শন করে জাহাজযাত্রীদের সামনে, যারা শয়ে শয়ে প্রতি মিনিট অন্তর চলাচল করছে।"[২৩]

দেহের নিবারণের সঙ্গে এই যে যৌনাত্মক সুড়সুড়ির সন্দেহের অনুষঙ্গ—এটা উনিশ শতকের শিক্ষিত ইংরেজ সমাজ ও ঔপনিবেশিক মানসিকতার একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, যা এদেশে 'অশ্লীলতা'র সংজ্ঞা নিরূপিত করেছিল, এবং যার সূত্র আবিষ্কার করতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে তৎকালীন ইংরেজ সমাজের নব্য-নির্মিত নৈতিক মানদণ্ড, ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের বিধিবদ্ধ নিয়ম ও নিষেধের দিকে।

শিল্পবিপ্লব ইংলন্ডে এক নতুন ব্যবসায়ী ধনিকশ্রেণির জন্ম দিয়েছিল। আর্থ-সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের নিম্নস্তরে অবস্থিত জনগণের (যাদের মধ্য থেকেও নব্যধনিক গোষ্ঠীর অনেকে উঠে আসতে সমর্থ হয়েছিল) কথ্য ভাষা ও আচার-আচরণ থেকে নিজেদের পৃথক করে স্বতন্ত্র শ্রেণি হিসেবে এরা আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। তাই সম্মানিত ভদ্রলোকরূপে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাবার উদ্দেশ্যে এরা নিজেদের গোষ্ঠীর জন্য এক অবশ্যপালনীয় আচরণবিধি তৈরি করেছিল। এ-বিধির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল শরীর, তার চলনভঙ্গি, তার অঙ্গবিশেষের আবৃতকরণ, শরীর-সম্বন্ধীয় কথা-বার্তার নিয়ন্ত্রণ, শারীরিক উচ্ছলতার সংবরণ। শারীরিক কার্যকলাপের মধ্যে বিশেষ করে যৌনকর্ম একটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু নোংরা ব্যাপার বলে বিবেচিত হত। এই আচরণবিধির ধর্মীয় ভিত্তি ছিল সমসাময়িক Evangelist খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়। অত্যন্ত গোঁড়া নীতিবাগীশ এই সম্প্রদায় চারিত্রিক শুদ্ধাচারের সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টান ধর্ম ও ইংলন্ডের শিল্প-পণ্যোৎপাদী সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে ব্যগ্র ছিল। নব্যধনী ইংরেজ 'বুর্জোয়া' শ্রেণির সঙ্গে Evangelist-দের আদর্শগত মৈত্রী উনিশ শতকের ইংলন্ডে, নৈতিক উৎকর্ষ বিচারের মানদণ্ড এবং 'অশ্লীলতা'র সংজ্ঞা নির্মিত করেছিল। এই মানদণ্ড অনুযায়ীই তৈরি হয়েছিল নানাবিধ আচরণবিধি—টেবিলে বসে কীভাবে খেতে হবে, রাস্তায় কীভাবে চলতে হবে, হাঁচি-কাশি-ঢেকুর চেপে রাখতে হবে, এমনকি উচ্চকণ্ঠে হাসিও চলবে না। শারীরিক আচরণ-নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ কথোপকথনে শরীরসংক্রান্ত শব্দের উল্লেখও নিষিদ্ধ ছিল। শুধু যৌনাত্মক শব্দ নয়, নিরীহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গর উল্লেখও নিন্দনীয় ছিল। টেবিল-চেয়ারের খুঁটি বর্ণনা করতে গিয়ে 'পা' শব্দের ব্যবহার 'অশ্লীল' বলে গণ্য হত।[২৪]

বস্তুতপক্ষে, এইসময় থেকেই দেখা যায় ইংরেজ সাধারণের মধ্যে প্রচলিত শরীর-সম্পর্কীয় শব্দ বা প্রবচন ও দৈহিক উচ্ছলতাপূর্ণ লোক-উৎসবকে 'অশ্লীল' বলে চিহ্নিত করে বর্জনীয় করা হচ্ছে। যদিও, এই ধরনের নীতিবাগীশতা ভিক্টোরীয় নৈতিকতা বলে উল্লেখিত হয়, আসলে এ-সব শুরু হয়েছিল রানী ভিক্টোরিয়ার জন্মের বহু আগে থেকেই। ১৮০২ সালে ইংলন্ডে Society for the Suppression of Vice নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর দমনমূলক নীতির লক্ষ্যবস্তু আসলে জনসাধারণের প্রকাশ্য উৎসব, নৃত্যগীত ইত্যাদি—এই সন্দেহ প্রকাশ করে সমকালীন এক পর্যবেক্ষক পরিহাস করে বলেন যে "এই সংস্থা তাদেরই অসচ্চরিত্রতা দমন করবে, যাদের বাৎসরিক আয় ৫০০ পাউন্ডের বেশি নয়!"[২৫]

এর কিছুকাল পরে, ১৮১৮ সালে (ভিক্টোরিয়ার জন্মের ঠিক এক বছর আগে) Dr. Thomas Bowdler শেকস্‌পিয়রের নাটক যাতে এই নব্যনৈতিক রীতিনীতিতে দীক্ষিত উনিশ শতকীয় ইংরেজ পরিবারে 'ভদ্র' পোশাকে পরিবেশিত করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে তাঁর নাটক থেকে শরীর-সম্বন্ধীয় 'অশ্লীল' শব্দ কেটে-ছেঁটে নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন! সেই থেকে সমালোচনা সাহিত্যে, 'Bowdlerized', এর আখ্যাটি মূল সাহিত্যকর্মের কর্তিত বা খণ্ডিত ('অশ্লীলতা' কারণে) সংস্করণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয়ে আসছে।

উল্লেখনীয় এ প্রসঙ্গে, Bowdler যখন লন্ডনে বসে শেক্‌সপিয়রের নাটক থেকে 'অশ্লীল' শব্দ কাটছিলেন প্রায় একই সময় কলকাতায় বসে এক বাঙালি পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার (১৭৭৫-১৮৪৪) ঠিক অনুরূপ কায়দায় কৃত্তিবাসী *রামায়ণ* ও কাশীদাসী *মহাভারত*-এর উপর কলম চালিয়ে, তাদের থেকে 'অশ্লীল' কথা বাদ দিয়ে তাদের বিশুদ্ধ সংস্করণ বার করেছিলেন।[২৬]

ব্যাপারটা কাকতালীয় ছিল না।

শরীর : ইংরেজ-অনুগত বাঙালি বুদ্ধিজীবীর মননের আলোকে

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজ (যা ১৮২৪ সালে কলিকাতা গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজ নামে পরিচিত ছিল)-এর অধ্যাপক। *রামায়ণ* ও *মহাভারত* bowdlerized করার যে প্রচেষ্টা তিনি করেছিলেন, এর কতটা স্বতঃপ্রবৃত ছিল, আর কতটা derivative, বা তাঁর ইংরেজ নিয়োগকর্তাদের নৈতিক মূল্যবোধের থেকে আহৃত ছিল?

বলা যেতে পারে, জয়গোপালের ক্ষেত্রে উভয় প্রবণতাই কাজ করেছিল। ঔপনিবেশিক বাংলাদেশে ইংরেজ-নিযুক্ত বাঙালি চাকুরে এবং ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের মানসিকতার উপর, ইংরেজ নৈতিক মানদণ্ড অনুযায়ী পালনীয় রীতিনীতির (যে বিষয় আগের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে) আদর্শ, বহুল পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেছিল। আবার, এই আদর্শের গোঁড়া নীতিবাগীশতার অনুরূপ অপরিমিত শুদ্ধাচারপ্রিয় শুচিবায়ুগ্রস্ততা আমাদের বাঙালি পণ্ডিত সমাজেরও কিছু অংশে (যা পূর্বোল্লিখিত বাঙালি লোকসংস্কৃতি থেকে দূরে অবস্থিত ছিল) বহুকালাবধি প্রভাবশালী ছিল। ফলে, উনিশ শতকের বাঙালি সংস্কৃতির কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইংরেজ-আরোপিত নৈতিক মানদণ্ডকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সমাজের বেগ পেতে হয়নি।

আসলে, বাঙালি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা অধিকাংশই বরাবর, জনসাধারণের মধ্যে চলতি বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। প্রাক্‌-ঔপনিবেশিক বাংলাদেশে,

পনেরো শতকে যখন গৌড়ের মুসলমান সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত-রচিত *রামায়ণ-মহাভারত* ও পুরাণাদি কথ্য বাংলা ভাষায় প্রথম অনূদিত হলো (কৃত্তিবাসের ও কাশীরাম দাসের তরজমা, যা আজ পর্যন্ত বাঙালির ঘরে ঘরে আদরণীয়, এই সময়েই প্রকাশিত হয়), তখন বাঙালি সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিত সমাজ দেখলেন যে তাঁদের একচেটিয়া অধিকার থেকে সংস্কৃত 'রামায়ণ-মহাভারত' ও পুরাণাদি বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে হস্তান্তরিত হচ্ছে। তাঁদের নিজস্ব সুবিধানুযায়ী এগুলির ব্যাখ্যার উপর যে মৌরসিপাট্টা এত যুগ ধরে তাঁরা দখল করে এসেছেন, তা পতনোন্মুখ। এঁরা প্রথমে সংস্কৃতে হুকুম জারি করলেন যে এই সব ধর্মগ্রন্থ যারা বাংলা বা দেশীয় ভাষায় শুনবে, তারা নরকে যাবে—

'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি
ভাষায়ং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।'[২৭]

এই ব্রাহ্মণ সমাজ, সে-যুগে বাঙালি জনসাধারণের *রামায়ণ-মহাভারত* পড়ে তাদের কাছাকাছি ঘেঁষার আস্পর্ধা দেখে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল—

'কৃত্তিবেশে কাশীদেসে আর বামুনঘেঁষে
এই তিন সর্বনেশে।'[২৮]

কলকাতায় উনিশ শতকের প্রারম্ভে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে যখন ব্যাপক হারে কৃত্তিবাসের *রামায়ণ*, কাশীরামের *মহাভারত* ও পুরাণের কাহিনি প্রকাশিত ও প্রচারিত হতে থাকে, (প্রথম দুই দশকের মধ্যেই প্রায় ষোলো হাজার বই ছাপা হয় বলে অনুমিত, যার অধিকাংশই ছিল পুরাণ-বিষয়ক[২৯]) তখন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সমাজ স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সমসাময়িক ইংরেজ শিক্ষাবিদ্ ও খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের অশ্লীলতাবিরোধী অভিযানের সঙ্গে এদের একজোট হতে তাই বিশেষ অসুবিধা হয়নি।

জয়নারায়ণ তর্কালঙ্কারের *রামায়ণ-মহাভারত* bowdlerized করার কিছু আগে থেকেই এ ব্যাপারে ইংরেজ শিক্ষাব্রতীরা কলকাতার পণ্ডিতদের সহযোগিতা লাভ করেন। ১৮১৭ সালে এই শিক্ষাব্রতীরা Calcutta School Book Society প্রতিষ্ঠা করেন, যার লক্ষ্য ছিল বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশ ও প্রচার। কিন্তু বটতলার *রামায়ণ*, *মহাভারত*, পৌরাণিক কাহিনি ও *বিদ্যাসুন্দর* জাতীয় প্রেমের উপাখ্যানের সস্তা সংস্করণের সঙ্গে পাল্লা দিতে School Book Society-র নীতিকথামূলক পাঠ্যপুস্তকের বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। ১৮২০ সালে, উক্ত Society-র সম্পাদক E.S. Montagu বটতলার সব চটি পুস্তিকার ওপর একটি স্মারকলিপি তৈরি করেন। এগুলি সম্বন্ধে এঁর মন্তব্য—"...এর অধিকাংশই সাধারণ শোভনতার রীতিনীতি লঙ্ঘন

করে, এবং এত লজ্জাকর যে এর বিষয়বস্তু জনসমক্ষে উপস্থিত করা যায় না।" হিন্দু পালা-পার্বণের মেলায় পৌরাণিক কাহিনির এই মুদ্রিত পুস্তিকাগুলির জনপ্রিয়তা লক্ষ করে Montagu আক্ষেপ করেন যে এদেশের মানুষের "মনোবৃত্তি কি পরিমাণ অধঃপতিত হতে পারে যাতে এই ধরনের বই থেকে তারা আনন্দ-রস উপভোগ করতে পারে!"[৩০]

বটতলার এই জনপ্রিয় বইগুলিকে 'অশ্লীল' বলে চিহ্নিত করে বাজার থেকে হটিয়ে দেবার জন্য Montagu তাঁর প্রচার অভিযানে, তাঁরই Book Society-তে তাঁর বেতনভুক অনুবাদক হিসেবে নিযুক্ত কিছু বাঙালি পণ্ডিতের সাহায্য প্রার্থনা করেন। উক্ত Society-র ১৮২০ সালের বাৎসরিক কার্যবিবরণী থেকে জানতে পাচ্ছি, তাঁর প্রার্থনায় রাজি হয়ে আঠারোজন ব্রাহ্মণ ও এগারোজন কায়স্থ সংস্কৃতজ্ঞ বিশেষজ্ঞ একটি বিবৃতি দেন, যার শুরুতে তাঁরা 'শ্রীশ্রীপরমেশ্বর জয়তি' বলে, ইংরেজ প্রবর্তিত মুদ্রাযন্ত্রের প্রশংসা করেন। তারপর, কলকাতার বাঙালি পুস্তক-প্রকাশকেরা কীভাবে এই মুদ্রাযন্ত্রের অপব্যবহার করছে, সেই অভিযোগ করে এঁরা বলেন—"এতদ্দেশীয়েরা তৎপথপ্রজ্ঞ (অর্থাৎ মুদ্রাযন্ত্রজ্ঞ) হইয়া কামসংবর্থ (র্দ্ধ)ক নানাবিধ রতিমঞ্জরী বিদ্যাসুন্দর কামশাস্ত্র প্রচার করিয়া বালকদিগের মনশ্চাঞ্চল্য করিয়া কুপথ-দৃষ্টিই বৃদ্ধি(দ্ধি) করিয়া ছিলেন।..."[৩১]

এর কিছু পরেই, তৎকালীন ইংরেজি সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাগুলি বাংলা লোকসাহিত্য ও লৌকিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা শুরু করে। এদের চক্ষুশূল ছিল ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দর*, কৃত্তিবাসের *রামায়ণ*, কাশীরাম দাসের *মহাভারত*, পৌরাণিক দেব-দেবীদের কাহিনি, যাত্রা, পাঁচালী এবং নানা জনপ্রিয় নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান। *বিদ্যাসুন্দর* সম্বন্ধে একজন লেখক মন্তব্য করেন যে বইটি "কামলালসাপূর্ণ নীতিবিগর্হিত প্রবণতাপূর্ণ" এবং বাঙালি মহিলারা এটি পড়লে তাদের মনের পক্ষে 'অত্যন্ত ক্ষতিকারক' হবে। কৃত্তিবাসের *রামায়ণ* সম্বন্ধে আর একটি অনুরূপ মন্তব্য—"মূল (রামায়ণ) থেকে এর কাহিনী আরও পাপপূর্ণ, এর ভাষা আরও কুরুচিপূর্ণ, এবং সমস্ত বইটাই পুরোদস্তুর ইতরামিতে দূষিত।"[৩২]

ঠিক একই সময়, শিক্ষা পরিষদের সভাপতি John Drinkwater Bethune (যাঁর নামে Bethune College বিখ্যাত) গৌরদাস বসাককে একটি চিঠিতে লেখেন—"আপনাদের দেশীয় সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যতটা জানি, তার থেকে বলতে পারি এর সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলি অশ্লীলতা ও কুরুচি কালিমালিপ্ত।"[৩৩]

এদেশের সংস্কৃতি (বিশেষ করে লোকসাহিত্য)-র বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রচার অভিযান যে নৈতিকতার নামে পরিচালিত হয়েছিল, তার প্রভাবে ইংরেজ শিক্ষিত

বাঙালি মধ্যবিত্ত এক ধরনের হীনম্মন্যতা থেকে ভুগতে শুরু করে। এই শিক্ষার আলোকে, তারা তাদের কিছু অতীতাশ্রয়ী ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান (যেমন সতীদাহ প্রথা, কুলীন বহুবিবাহ প্রথা ইত্যাদি)-এর অমানবিকতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে লজ্জাবোধ করে, এবং এগুলির অবসানের জন্য সামাজিক সংস্কার আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু তৎকালীন ইংরেজ liberal bourgeois humanitarian মূল্যবোধ প্রভাবান্বিত শিক্ষাপ্রচারের ফলে যেমন এই ধরনের হিন্দু রক্ষণশীলতা-বিরোধী সংস্কার আন্দোলন সম্ভব হয়েছিল, মনে রাখা দরকার যে ওই একই শিক্ষা-প্রণালীর ফলে এই বাঙালি সমাজ-সংস্কারকদের মধ্যে অনেকেই প্রভাবিত হয়েছিলেন তদানীন্তন ইংরেজ-অনুসৃত ও প্রচারিত যৌনসম্পর্কের আদর্শ দ্বারা—যে আদর্শ শ্বাসরোধকারী ছিল নরনারীর স্বাভাবিক সাহচর্য ও সংসর্গের ক্ষেত্রে। তাঁদের সমাজ-সংস্কারের কর্মসূচিতে এই নব্য শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা, বাংলা লোকসংস্কৃতিতে ও লোকাচারে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেন—যে সংস্কৃতিতে এতদিন ধরে পুরুষ-রমণীর দৈহিক প্রণয়ের অভিব্যক্তি সহজগ্রাহ্য ছিল।

উনিশ শতকের শুরু থেকে ইংরেজ খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকদের 'অশ্লীলতা'-বিরোধী অভিযান, ও তৎপরবর্তী ইংরেজি সংবাদপত্রের অনুরূপ প্রচার, ও ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে ওই শতকের মধ্যম দশকের ভিতরেই কলকাতায় একটা নব্যশিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল, যারা এই ঔপনিবেশিক শাসন ও সংস্কৃতি-নির্ধারিত 'অশ্লীলতা'র সংজ্ঞা পুরোপুরি অন্তঃস্থ করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

তাই উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে, ইংরেজ শিক্ষাব্রতী, খ্রিস্টান যাজকেরা বা প্রশাসকেরা আর তাঁদের অনুগত পুরোনো পণ্ডিতদের উপর নির্ভর করার প্রয়োজনবোধ করছিলেন না। তাঁরা তাঁদের 'অশ্লীলতা'-বিরোধী অভিযানে, সরাসরি এই নব্য-শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোক সমাজের নব-আধৃত, বিলেত থেকে আমদানি নীতিবোধের প্রতি আবেদন করতে শুরু করেন। এবং এই ভদ্রলোকেরা খুব সহজেই তাতে সাড়া দেন ও যোগ দেন।

লক্ষণীয় যে এই 'অশ্লীলতা' বিরোধী অভিযানে শরীর, শরীরের অনাবৃত প্রকাশ, এবং শরীর-সম্পর্কীয় (বিশেষ করে যৌনাত্মক) উল্লেখ, এই বাঙালি ভদ্রলোকশ্রেণির মূল আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। স্পষ্টতই, এই আক্রমণাত্মক মনোভাব পূর্বোল্লিখিত উনিশ শতকীয় ইংরেজ 'বুর্জোয়া' নীতিবাগীশতারই প্রভাব-প্রসূত।

তৎকালীন পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ-অধ্যুষিত বাঙালি সমাজে, বাঙালি রমণীদের দেহ ও দেহাবরণের বিচার বিশ্লেষণ, এই ধরনের শরীর-ভিত্তিক 'অশ্লীলতা'র নতুন সংজ্ঞা

নির্মাণে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাদের দৈনন্দিন পরিধেয় পাতলা শাড়ি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে সমসাময়িক এক বাংলা সংবাদপত্রে একটি পত্রলেখক অভিযোগ করেন—"এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের পরিধেয় অতিসূক্ষ্ম এক বস্ত্রই সাধারণ ব্যবহার্য ইহা অনেক দোষাভাষের ও ভিন্নদেশীয় লোকেরও ঘৃণার্হ...যেহেতুক বর্ত্তমান ব্যবহারে অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম সর্ব্বাঙ্গাভাদর্শক বস্ত্রে স্ত্রীলোকের তাদৃশ সম্ভ্রম না যাদৃশ উত্তরীয় তদুপরি সর্ব্বগাত্রাচ্ছাদন বসনে হয়।"

এর পরে, পত্রলেখক উপদেশ দেন "এতদ্দেশীয় বাবু-দের তাঁরা যেন তাঁদের 'কুলঙ্গনাদিগকে সর্ব্বঙ্গাচ্ছাদনার্থে লাঙ্গা উড়ানী ইত্যাদি বস্ত্র' ব্যবহার করতে অভ্যস্ত করান।"[৩৩]

এরও কিছু পরে আর-একটি বাংলা সংবাদপত্রে আর-একজন পত্রলেখকের চিঠিতে ঢাকা, চন্দ্রকোনা ও শান্তিপুর থেকে তৈরি সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহারের সমালোচনা করে বলা হয় "ঐ তিন স্থানীয় বস্ত্রেতেই বঙ্গদেশীয় পুরুষ পুরুষীগণ লম্পট-লম্পটী হইয়া উঠিয়াছেন।" পত্রলেখক পরে আমাদের জানাচ্ছেন যে:

"বর্দ্ধমানাধিশ্বর মহারাজা তাঁহার অধিকার হইতে সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার উঠাইয়া দিয়াছেন এবং ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহার অধিকারে কেহ সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতে পারিবেন না, যদি করেন তবে দণ্ডযোগ্য হইবেন..."[৩৪]

১৮৮৩ সালে একটি বাঙালি ভদ্রলোক ইংরেজিতে রচিত একটি পুস্তকে ঢাকানির্মিত শাড়ির পরিবর্তে বাঙালি মেয়েদের উপদেশ দেন তাঁরা যেন "Benares gold embroidered or French embossed gossamer sari, with gold lace borders and ends' ব্যবহার করেন যাতে এদেশে শোভনতা উন্নতি লাভ করে।"[৩৫]

আসলে সে-যুগে মেয়েদের পরিচ্ছদে সায়া-শেমিজ-ব্লাউজের প্রচলন ছিল না—আজও যেমন দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে অনেকের মধ্যেই নেই। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের আগে বাঙালি পুরুষদের চোখে এটা অশোভনীয় বলে মনে হতো না। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালি উনিশ শতকে তাঁদের নতুন ইংরেজ শিক্ষাদাতার দেওয়া চোখ দিয়ে রমণীদের শরীর দেখতে শুরু করলেন। এবং এ যাবৎ নারীদেহের যে-সব অনাবৃত অঙ্গ (কাঁধ, হাত, পায়ের পাতা, মাজা) কোনোদিন অশালীন প্রদর্শন বলে নিন্দিত হয়নি, বা যে স্বল্পায়তন অথচ পর্যাপ্ত পরিমাণ কার্যকর একটি মাত্র শাড়ি বরাবর সে-দেহকে আবৃত করে এসেছে—এ-সবের মধ্যে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি একটা যৌনাত্মক অনুষঙ্গ আবিষ্কার করে তাদের নৈতিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে বদ্ধপরিকর হয়।

এই যৌনাত্মক অনুষঙ্গ খুঁড়ে বার করার রোগগ্রস্ত মানসিকতা ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি সমাজকে পেয়ে বসেছিল উনিশ শতকে। শুধু মেয়েদের পোশাক নয়, তাদের

মধ্যে প্রচলিত ছড়া-প্রবাদ, জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (মেয়ে পাঁচালী, ইত্যাদি)—এ-সবই 'অশ্লীল' বলে নিষিদ্ধকরণের চেষ্টা হয়েছিল এই অজুহাতে যে এগুলিতে নরনারীর দৈহিক সম্পর্কের ব্যঞ্জনা, বা স্পষ্টাভিব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যায়।[৩৬]

'অশ্লীলতা' আবিষ্কারের নেশাগ্রস্ত হয়ে এই বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের অন্তঃপুরের মহিলাদের বেশভূষা এবং আচার-আচরণের সমালোচনায় শুধু মুখর হয়ে উঠলেন না, সমগ্র বাঙালি সমাজের লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক নৃত্যগীত, ইত্যাদি 'অশ্লীল' বলে কালিমালিপ্ত করতে শুরু করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'অশ্লীলতা'-র যে সংজ্ঞা দেন তা লক্ষণীয়—"যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থে বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্যভাবের অভিব্যক্তির জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা।" এটি একটি catch-all সংজ্ঞা!

'অশ্লীলতা' নামে, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন*-এ, এক বিশেষ প্রবন্ধে বলা হয়—"অশ্লীলতা, বঙ্গদেশীয়দিগের জাতীয় দোষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।" তারপর, তার উদাহরণ দিতে গিয়ে লেখক বলেন—"যাঁহারা ইহা অত্যুক্তি বিবেচনা করিবেন তাঁহারা বাঙ্গালির রহস্য, বাঙ্গালির গালি, নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের কোন্দল, এবং বাঙ্গালির যাত্রা পাঁচালী মনে ভাবিয়া দেখুন। মুহূর্ত জন্য বাঙ্গালি কৃষকের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া দেখুন—বাঙ্গালির প্রণীত যে সকল কাব্যগ্রন্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত তাহা পাঠ করিয়া দেখুন।"[৩৭]

ঔপনিবেশিক বাঙালি সমাজে, নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে তৎকালীন ইংরেজি নৈতিক মানদণ্ড নির্ধারিত 'অশ্লীলতা'র স্বীকৃতি-প্রাপ্তির জন্য যে ইংরেজ ভদ্রলোক আজীবন লড়ে গেছলেন, তিনি স্বনামধন্য Reverend James Long। ইনি দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ*-এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে সে-সময়ের ইংরেজ প্রশাসনের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, এবং যে কারণে তিনি এদেশের স্বদেশি ইতিহাসে আজও প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন।

কিন্তু তদানীন্তন বাংলা লোকসাহিত্য সম্বন্ধে James Long-এর ধ্যানধারণা ছিল অত্যন্ত বিদ্বেষপূর্ণ। ১৮৫৫ সালে Long কলকাতার বিভিন্ন ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত ১৪০০ বাংলা বই-এর একটি তালিকা প্রকাশ করেন। এই বইগুলির মধ্যে লোকগীতির সংকলনগুলিকে (দাশরথি রায়ের *পাঁচালী*, *কবিগান* ইত্যাদি) লঙ 'filthy and polluting' বা 'নোংরা ও পঙ্কিল' বলে অভিহিত করেন। শৃঙ্গার-রসাত্মক কিছু বই (*কামশাস্ত্র*, *রতিবিলাস*, *রসমঞ্জরী* ইত্যাদি)-এর বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে এগুলি "পাশবপ্রকৃতির এবং ফরাসি অশ্লীল সাহিত্যের নিকৃষ্টতম নমুনার সমতুল্য।"[৩৮]

লঙের এই তালিকা প্রকাশের কিছু পরেই, ইংরেজ প্রশাসন ১৮৫৬-এর জানুয়ারিতে একটি আইন বিধিবদ্ধ করে যার দ্বারা 'কুৎসিত ছবি ও শৃঙ্গাররস ঘটিত পুস্তক' প্রকাশ দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হল। উল্লেখযোগ্য, এর ঠিক একবছর পরেই খোদ ইংলন্ডে, সরকার Obscene Publications Act নামে অশ্লীলতা-নিবারক একটি আইন জারি করে।

১৮৫৬-এর আইনের প্রচলনের পর থেকে যাত্রা, পাঁচালী, কবির লড়াই, ঝুমুর ইত্যাদি লৌকিক নাচগানের অনুষ্ঠানের উপর পুলিশের কড়া নজর পড়ে। পরবর্তী যুগের একজন সঙ্গীত-সংগ্রাহক মেয়েদের তরজা ও ঝুমুর গান জোগাড় করতে গিয়ে দেখেন যে খুব অল্প মহিলা শিল্পী-ই এই দুটির চর্চায় নিরত। কারণ স্বরূপ, তিনি জানান—"পুলিশের আইনানুসারেও অনেক স্থলে উভয় দলের আকড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।"[৩৯] মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানাচ্ছেন যে উনিশ শতকের শেষাশেষি মেয়ে পাঁচালি অন্তর্হিত হয়ে গেছে কারণ "শিক্ষিত লোকেরা নিন্দা করিতে লাগিল—ও উঠিয়া গেল।"[৪০] শিবনাথ শাস্ত্রী ঠিক অনুরূপ কারণ দেখাচ্ছেন যাত্রা, কবির লড়াই ও হাফ-আখড়াই-এর অবলুপ্তির—"ইংরাজী শিক্ষা দেশমধ্যে যখন ব্যপ্ত হইতে লাগিল, তখন হইতে এই সকলের প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল।"[৪১]

ভদ্রসমাজ থেকে লোকসংস্কৃতির এই বিভিন্ন ধারাগুলির নির্বাসনের পর, অশ্লীলতা-বিরোধী প্রচারকদের নজর পড়ে বাংলা নাট্যমঞ্চের উপর। যেহেতু ওই সময় অভিনেত্রীদের অনেকেই বারবনিতা ছিলেন, তাঁদের পেশার সঙ্গে 'অশ্লীলতা'র অনুষঙ্গ টেনে এনে নাট্যজগৎ থেকে তাঁদের বিতাড়িত করার প্রচেষ্টা চলে। জাতীয় নাট্যসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সে-যুগের খ্যাতনামা কবি-গীতিকার-নাট্যকার মনোমোহন বসুর বক্তৃতা এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি স্বীকার করেন যে "স্ত্রী অভিনেত্রী সংগ্রহ করিতে গেলে কুলটা বেশ্যা পল্লী হইতেই আনিতে হইবে।" কিন্তু নাট্যমঞ্চে তাদের উপস্থিতি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পরক্ষণেই বলেন—"ভদ্রযুবকগণ আপনাদের মধ্যে বেশ্যাকে লইয়া আমোদ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে একত্র সাজিয়া রঙ্গভূমিতে রঙ্গ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে নৃত্য করিবেন ইহাও কি কর্ণে শুনা যায়? ইহাও কি সত্য হয়..." তারপর মনোমোহন একটা অর্থপূর্ণ মন্তব্য করেন—"চিরকাল স্বভাবের বিরোধী যাত্রাওয়ালারা জঘন্য অভিনয় প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত থাকে, সেও ভাল, তবু সে এমন দুষ্প্রবৃত্তি সাধক ধর্ম্মানীতিঘাতক ঘোর লজ্জাজনক প্রথাকে (অর্থাৎ বারবনিতাদের দিয়ে অভিনয়) আমাদিগের এই জাতীয় নাট্যসমাজ অথবা অন্যান্য অভিনেতা অবলম্বন না করেন।"[৪২]

স্পষ্টতই বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ, উনিশ শতকের শেষার্ধে, 'অশ্লীলতা'র সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রে নানা বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। এই

মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্যমের ও যুগের ৫০-এর দশক থেকে আধুনিক নাটকের গোড়াপত্তন, যার জয়গান গাইতে গিয়ে একজন সম্পাদক বলেছিলেন যে এর "প্রাদুর্ভাবে যাত্রা, কবি, খেঁউড়, প্রভৃতি দূষ্য উৎসবের দূরীকরণ ঘটে—ইহা কর্তৃক বঙ্গদেশে কুনীতির উৎসেজ ও নির্মলি ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব হয়—ইহাই আমাদের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়..."[৪৩]. অথচ সেই নাটকের অভিনয় ক্ষেত্রে, এই ভদ্রগোষ্ঠী আবার এক নতুন বিপদের সন্ধান পেলেন—বারবনিতাদের সঙ্গে তাঁদের ভদ্রসন্তানদের প্রকাশ্য নাট্যমঞ্চে সম্মিলন (যে-সংযোগ এতদিন পর্যন্ত বেশ্যালয়ের নিভৃতে ঘটত বলে তাঁদের সমাজে মার্জনীয় ছিল।) মনোমোহন বসুর স্বীকারোক্তি যে আগের যুগের যাত্রাওয়ালারা-ও (যাঁদের তাঁর পূর্বসূরীরা 'অশ্লীল' বলে ত্যাজ্য করেছিলেন) এ-যুগের 'কুলটা' অভিনেত্রীদের থেকে কম বিপজ্জনক, তাঁর সমসাময়িক বাঙালি ভদ্রলোক সমাজের একাংশের tragi-comic মানসিক অবস্থার পরিচায়ক। ইংরেজি শিক্ষা-নির্দেশিত নৈতিক মানদণ্ড অবলম্বন করে উনিশ শতকের শুরুতে যে বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ তৈরি হয়েছিল, তার সন্তানেরা ঐতিহ্যাশ্রয়ী বাংলা লোক-সংস্কৃতিকে 'অশ্লীল' বলে বর্জন করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নতুন, ইংরেজি শিক্ষা-প্রসূত নাটক-চর্চা করতে গিয়ে এই সন্তানেরা কিছুকাল পরে ওই একই 'অশ্লীলতা'র অভিযোগে আক্রান্ত হলেন—গিরিশ ঘোষ থেকে শুরু করে আমাদের যুগের শিশির ভাদুড়ী পর্যন্ত—যেহেতু তাঁরা বারবনিতাদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন!

লক্ষণীয়, উনিশ শতকের শেষের দিকে 'অশ্লীলতা'র সরকারি বা বিধিবদ্ধ সংজ্ঞা ক্রমশই একটা catch-all বা সর্বগ্রাসী অভিধা হিসেবে বাঙালি সমাজে আবির্ভূত হতে চলেছে। ঐ শতকের শুরু থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত, অশ্লীলতা-বিরোধী প্রচার মূলত শরীর-ভিত্তিক ছিল—দেহের বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রকাশ ও প্রদর্শন বা তৎসম্পর্কীয় উল্লেখ (কথ্য লোকসংস্কৃতিতে ও বটতলার বইতে) আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল। ক্রমেই, 'অশ্লীলতা'র সংজ্ঞার এক্তিয়ার সম্প্রসারিত করা হলো; 'দুশ্চরিত্রতা' (তৎকালীন মানদণ্ড অনুযায়ী) এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা হলো। ফলে, বাংলা নাট্যমঞ্চে বারবনিতাদের সঙ্গে অভিনেতাদের নাটক-প্রদর্শনও 'অশ্লীল' বলে গণ্য হতে শুরু করল।

এরও পরে, ১৮৭০-এর দশকের শেষে, ইংরেজ সরকার 'অশ্লীলতা' এই অভিধাকে একটা অপচ্ছায়া বা spectre হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল—বাঙালি উদীয়মান রাজনৈতিক-ইংরেজ-বিরোধী নাট্য আন্দোলনকে দমন করার প্রয়াসে। ১৮৭৬-এর মার্চ মাসে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' উপেন্দ্রনাথ দাশের 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটক মঞ্চস্থ করে। এই নাটকে দেখানো হল এক লম্পট ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট একটি বাঙালি মেয়েকে ধর্ষণের

চেষ্টা করছে। যখন নাটকটি অভিনীত হচ্ছিল তখন কলকাতার পুলিশ এসে উপেন্দ্রনাথ সহ নাট্যকার-অভিনেতা অমৃতলাল বসু এবং আরও ছ'জন অভিনেতাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। অভিযোগ—নাটকটি 'অশ্লীল' এবং সেইহেতু ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৯২ ও ২৯৪ ধারা অনুযায়ী অভিনেতারা দণ্ডনীয়। উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলালকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়, কিন্তু হাইকোর্টে আবেদনের ফলে ছাড়া পেয়ে যান। হাইকোর্টের বিচারপতিরা নাটকটির মধ্যে কোনো অশ্লীলতা খুঁজে পান না।

'অশ্লীলতা'র দোহাই দিয়ে ইতিপূর্বে সঙের মিছিলও বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল। আসল কারণ, 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' ও ঐ জাতীয় নাটকের (যুবরাজ এডওয়ার্ডকে ব্যঙ্গ করে 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' ও The Police of Pig and Sheep নামে প্রহসন দুটিও ওই একই সময় অভিনীত হয়) মতো, সঙের মিছিলেও ইংরেজ প্রশাসক ও তাদের অনুগত বাঙালি মোসাহেবদের বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করা হতো। স্বভাবতই এঁরা এঁদের নিয়ে প্রকাশ্য রাজপথে ঠাট্টা-ইয়ার্কির প্রদর্শন সুনজরে দেখতেন না।

এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়, শহরের এই সব গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরাই ১৮৭৩-এর ২০ সেপ্টেম্বর কলকাতা টাউন হলে এক সভা করে Society for the Suppression of Public Obscenity প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল—"জনসাধারণের নৈতিক শুদ্ধতা রক্ষাকল্পে ইংরেজ সরকারের বিধিবদ্ধ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন ও মুদ্রাযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের ধারাগুলির যথাযথ প্রয়োগে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করা।" এই সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেন। উনিশ শতকের মধ্যম দশকে অশ্লীলতা-বিরোধী অভিযানে খ্রিস্টান ধর্মযাজক James Long যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, ঐ শতকের ৭০-এর দশকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেই স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা *সুলভ সমাচার*-এ তিনিই প্রথম প্রস্তাব করেন—"সম্প্রতি বিলাতে সাধারণ দুর্নীতি নিবারণের জন্য একটি সভা হইয়াছে...কলিকাতা ও ভারতবর্ষের সর্বত্র এইরূপ সভা না হয় কেন? কত বদ লোক মন্দ পুস্তক ছাপায়, বিশ্রী গান করে কে তাহা নিবারণ করে?"[৪৪]

যাই হোক ১৮৭৩-এ কলকাতায় ওই অশ্লীলতা-বিরোধী সভা প্রতিষ্ঠার ঠিক পরেই, এর নেতাদের ব্যাপক প্রচার-অভিযানের চাপে কলকাতার পুলিশ বটতলার কিছু প্রকাশককে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়—ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দর* ছাপানো ও বিক্রির অভিযোগে।[৪৫] পরের বছর ১২৮১-এর চৈত্র সংক্রান্তিতে, ঐ সভার নেতৃবৃন্দের অনুরোধে, কাঁসারীপাড়ার বাৎসরিক সঙের মিছিল বন্ধ করতে তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার Hogg বিশেষভাবে সচেষ্ট হন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। কারণ, কলকাতার এই সবচেয়ে

জনপ্রিয় অনুষ্ঠানটির (যা বহুদিন পর্যন্ত টিকে ছিল অশ্লীলতা-বিরোধীদের আপত্তি সত্ত্বেও) পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন তদানীন্তন বাঙালি ভদ্রলোক সমাজের ক্ষমতাসীন ব্যক্তি—যেমন কাঁসারীপাড়ার তারক প্রামাণিক ও *Hindu Patriot*-এর সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল।

এ-প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে উনিশ শতকের শুরু থেকে প্রায় ষাটের দশক পর্যন্ত, ইংরেজ ঔপনিবেশিক শিক্ষা-প্রসূত সাংস্কৃতিক ছত্রচ্ছায়ায়, 'অশ্লীলতা'র যে-সংজ্ঞা সমগ্র বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ প্রায় একমত হয়ে মেনে নিয়েছিল, সত্তর-এর দশক থেকে এই সর্বসম্মতিতে ফাটল দেখা গেল।

'অশ্লীলতা'র সংজ্ঞা ও দণ্ডবিধি নিয়ে বিতর্কের শুরু

১৮৭৩-এ, Society for the Suppression of Public Obscenity প্রতিষ্ঠার সঙ্গে -সঙ্গেই কলকাতার বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহলে একটা বিতর্ক শুরু হয়। এ-বিতর্কে, কেবলমাত্র 'অশ্লীলতা'র এতাবৎ (ঔপনিবেশিক-শাসকগোষ্ঠী-নির্ধারিত) গৃহীত সংজ্ঞা সম্বন্ধেই আপত্তি তোলা হয় না, তার নিষিদ্ধকরণের জন্য সরকারি বিধিবদ্ধ আইনের যৌক্তিকতা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে, যেখানে 'অশ্লীলতা'র ভূত বারংবার পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষণের উদ্দেশ্যে, গত শতাব্দীর বাঙালি সমাজে এই বিতর্কিত ব্যাপারটা নিয়ে সে-যুগের কিছু বুদ্ধিজীবী যে-প্রশ্ন তুলেছিলেন—ও কখনো-কখনো সমাধানের ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছিলেন—তা আজও প্রাসঙ্গিক।

বস্তুতপক্ষে ১৮৮৫ সালেই যখন সরকার Public Decency Bill নামে একটি আইন প্রণয়নের কথা ভাবছিল 'কুৎসিত ছবি ও পুস্তক' প্রকাশনা বন্ধ করার জন্য (যা পরের বছর বিধিবদ্ধ করা হয়), তখন বাঙালি সম্পাদিত একটি সংবাদপত্র সন্দেহ প্রকাশ করেছিল যে বাংলা 'কবিগান' ব্যাপক জনসমাজে এত লোকপ্রিয় যে তার যে-সব পদ্যাংশ 'অশ্লীল' বলে বিবেচিত হতে পারে, সেগুলির প্রচার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা সম্ভব কি না। সম্পাদক মন্তব্য করেন যে এতে শেষ পর্যন্ত পুলিশেরাই লাভবান হবে কারণ কবিওয়ালারা তাদের ঘুস দিয়ে জরিমানা এড়াতে পারবে।[৪৬]

পরবর্তী যুগে বাঙালি ভদ্রলোক সমাজের একাংশ যখন ১৮৭৩ সালে Society for the Suppression of Public Obscenity স্থাপন করে, যখন তাদের আর এক অংশ শুধু এর কার্যকারিতা সম্বন্ধেই দ্বিধা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয়নি, 'অশ্লীলতা'র সংজ্ঞা নিয়ে মৌলিক প্রশ্ন তুলেছিল এবং এর নিয়ন্ত্রণের জন্য Censorship বা

বিবাচনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল। সমসাময়িক পত্রপত্রিকা থেকে বিতর্কের চেহারাটা স্পষ্ট হয়। 'অশ্লীলতা'র সংজ্ঞা যে দেশকাল-নির্ভরশীল ও আপেক্ষিক হতে বাধ্য, এটা ক্রমশই অনুভূত হচ্ছিল। একটি পত্রিকা মন্তব্য করে—"যেগুলিকে অশ্লীল অভিব্যক্তি বলে বর্ণিত করা হয় সেগুলি আসলে একটা বিশেষ সামাজিক অবস্থার বহির্প্রকাশ।"[৪৭] কৃষ্ণদাস পাল সম্পাদিত *Hindu Patriot*, শহরের ইংরেজ নাগরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে যে তারা যখন কলকাতার Opera House-এ বসে 'ব্যালে' নৃত্যপটীয়সীদের দেহের নানারকম অঙ্গভঙ্গি প্রত্যক্ষ করে, তখন কেউ কি তাদের দণ্ডবিধির আইনে অপরাধী গণ্য করে? তাহলে বাঙালি মেয়েদের (খেমটাওয়ালি বা বাঈজিদের) নাচের প্রকাশ্য প্রদর্শনে আপত্তি কেন? উক্ত সম্পাদকীয়তে আরও বলা হয়—যদি হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের কাহিনি 'অশ্লীল' বলে নিন্দিত হয়, তাহলে সেই মানদণ্ডে খ্রিস্টানদের ধর্মপুস্তক 'বাইবেল'-এ Solomon-এর Song of Songs অধ্যায়টি কি কিছু কম কামোদ্দীপক? শেষে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়—"...অপরাধের অভিযোগ এনে, সারাদেশব্যাপী অসচ্চরিত্রতা খুঁজে বার করার জন্য স্বয়ং নিযুক্ত গুপ্তচরদের ছড়িয়ে দিয়ে, জনসাধারণের প্রিয় আমোদ-প্রমোদের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ ঘোষণা করে, শুধু প্রতিরোধেরই জন্ম দেওয়া হয়।"[৪৮]

বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা তাঁদের সমাজ ও সংস্কৃতির কিছু কিছু 'অশ্লীল' বলে মনে করতেন, তাঁদের অনেকেও অশ্লীলতা-বিরোধী অভিযানের প্রবল বিদ্বেষপূর্ণ প্রবণতা সব সময় সুস্থ মনে মেনে নিতে পারেননি। মনোমোহন বসু, যিনি নাট্যমঞ্চে বারবনিতাদের অভিনয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন, তিনিও যখন দেখলেন "অশ্লীলতা নিবারক যোদ্ধৃমহাশয়দিগের কোপ প্রথমেই ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের উপর প্রপতিত হইয়াছে", তখন লিখতে বাধ্য হলেন—"...যদি বিদ্যাসুন্দর ত্যাজ্য হয়, তবে সেক্সপীয়ার, বাইরণ, ফিলডিং, সুইফ্‌ট, রেনাল্‌ড, কালিদাস, কাশীরাম দাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কাহারো গ্রন্থ পাঠ্য হইতে পারে না..." এ-সব বইগুলিকে bowdlerize করে প্রকাশের যে-প্রস্তাব কেউ কেউ দিতেন তখন, সে সম্বন্ধে মনোমোহনের মন্তব্য—"এরণ্ড তৈল বা শর্করা প্রভৃতি পদার্থের ন্যায় যে সমস্ত কাব্যকে 'রিফাইন' করিবার প্রক্রিয়া ও যন্ত্র অদ্যাপি প্রস্তুত হয় নাই..."[৪৯]

তবে এ বিষয়ে সে-সময় সবচেয়ে সুসমঞ্জস মত প্রকাশ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। আগেই বলেছি বঙ্কিম অশ্লীলতার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন। ১৮৭৩-এর অশ্লীলতা-নিবারণী সভাকে তিনি সাদরে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে তিনি অশ্লীলতা-বিরোধী অভিযানে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আবেদন করেন। এ

প্রসঙ্গে 'অশ্লীলতা' যে স্থান-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ নয়, এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন—"এমন লোক আমরা দেখিয়াছি যে তাঁহাদের কথোপকথন অশ্রাব্য, এবং চরিত্র অনুকরণীয় এবং পবিত্রতায় অতুল্য।...এমন অনেক কাব্য আছে যে তাহা অশ্লীলতা দোষযুক্ত হইলেও মনুষ্যবুদ্ধিসৃষ্ট রত্নের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া চিরকাল আদরে রক্ষণীয়। কোনো কোনো স্থানে, অশ্লীলতা, কাব্যের উৎকর্ষপক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে।"

দণ্ডবিধানে অশ্লীলতার দমনের প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে বঙ্কিম বলেন—"অশ্লীলতা কি? তাহা আইনে কোথাও পরিষ্কৃত হয় নাই। কি দণ্ডনীয়? এ বিষয়ে মতভেদ সর্ব্বদাই ঘটে।" এর কারণেই তিনি তাঁর সহযোগীদের সাবধান করে বলেন—"জঙ্গল কাটিতে উৎকৃষ্ট কাব্য-কুসুমলতা সকলের উচ্ছেদ না হয়।"[৫০]

উনিশ শতকের সত্তরের দশকে 'অশ্লীলতা' নিয়ে এই বিতর্ক তৎকালীন বাঙালি সমাজের নব্য উন্মেষিত রাজনৈতিক চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচ্য। উদীয়মান জাতীয়তাবোধের মোকাবিলা করতে গিয়ে ঔপনিবেশিক প্রশাসন এই দশকে পরপর একাধিক দমনমূলক আইন প্রবর্তিত করে। ১৮৭০-এ ভারতীয় দণ্ডবিধিতে একটি ধারা যুক্ত করা হয় (124-A) যা অনুযায়ী ইংরেজ সরকারের সমালোচনা, রাজ-বিরোধী কার্যকলাপ বা Sedition নামে চিহ্নিত দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণনার যোগ্য হল। ১৮৭৬ সালে (পূর্বোল্লেখিত *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী* নাটক অভিনয়ের পরেই) Dramatic Performances Control Act বিধিবদ্ধ করা হয় বাংলা নাট্যমঞ্চে সরকার-বিরোধী মতপ্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করার অভিপ্রায়ে। ঠিক একই উদ্দেশ্যে, ১৮৭৮ সালে Vernacular Press Act-এর প্রবর্তন করা হয় বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে।

এই রাজনৈতিক আবহাওয়াতে, ইংরেজ শাসকদের আদর্শগত প্ররোচনায় ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত Society for the Suppression of Public Obscenity, অনেক বাঙালি বুদ্ধিজীবীর চোখেই সন্দেহজনক বলে মনে হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। 'অশ্লীলতা'র দোহাই দিয়ে ইংরেজ সরকার স্বদেশি সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচরণ করছে—এই সন্দেহটা ক্রমশই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল।

উনিশ শতকের শুরু থেকে যে শিক্ষিত বাঙালি সমাজ ইংরেজি শিক্ষার আলোকে তাদের অতীত সংস্কৃতির অনেক কিছুই 'অশ্লীল' বলে বিবেচিত করে বর্জন করেছিল, ওই শতকের শেষে পৌঁছে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম সেই তথাকথিত 'অশ্লীল' সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিই কখনো-কখনো সমর্থন করতে বাধ্য হল এক নব্য-উন্মেষিত জাতীয়তাবোধের ঘোষণার প্রয়োজনে। তাই, দেখতে পাই যে বটতলার চটিবই-এর

বিক্রেতারা অতীতের ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালিদের চক্ষুশূল ছিল, তাদেরই জন্য পরবর্তীযুগের বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা অশ্রুপাত করছেন! ১৮৭৩ সালে যখন *বিদ্যাসুন্দর* বিক্রির অভিযোগে বটতলার কিছু বিক্রেতা গ্রেফতার হন ও মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েন, তখন তাঁদের সাহায্যের্থে এই শিক্ষিত সমাজ থেকেই অনেকে এগিয়ে আসেন। সমসাময়িক এক পত্রিকার ভাষ্য অনুসারে—''বিস্তর উচ্চ প্রকৃতির বাঙ্গালি সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র—যাঁহার অশ্লীলতাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অনেকেও ঐ দায়গ্রস্ত দোকানদারদিগের প্রতি দয়া ও আনুকূল্য বিতরণে কুণ্ঠিত হইতেছেন না।''[৫১] সঙের মিছিল যখন 'অশ্লীলতা'র অভিযোগে বন্ধ করার প্রচেষ্টা হয়, তখন ওই অনুষ্ঠানের সমর্থনে দেখতে পাই কৃষ্ণদাস পালকে এগিয়ে আসতে। (এ-সমর্থনের সঙ্গে জড়িত ছিল ইংরেজ পুলিশ কমিশনার Stuart Hogg-এর সঙ্গে কৃষ্ণদাসের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, অতীতের ইংরেজ-আরোপিত অনেক নিয়ম-কানুনের মতো, 'অশ্লীলতা'র সংজ্ঞাও উনিশ শতকের ৭০-এর দশকের বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা জেরা করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু এ-জিজ্ঞাসা বেশি দূর এগুতে সাহস করেনি। নিজেদের অতীতাশ্রয়ী সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক বাধানিষেধ ও ইংরেজি শিক্ষার নীতিবোধের কড়া বেষ্টনী এঁরা কোনোদিনই ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারেননি।

উপসংহার

তাই, 'অশ্লীলতা' নামক এই অন্ধবিশ্বাসের মুখোমুখি হয়ে তাকে বিচারবুদ্ধি দিয়ে পরাভূত করার প্রচেষ্টা এখনও সুদূরপরাহত। অতীতের অনেক ধর্মীয় কুসংস্কার ও উনিশ শতকের বহু ঔপনিবেশিক মূল্যবোধের মতো, 'অশ্লীলতা'-ও আমাদের সমাজ ও চিন্তাধারার কর্তৃত্ব বজায় রেখে চলেছে। মন্দিরগাত্রে খোদিত নগ্ন হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিকে 'অশ্লীল' ও কুরুচিপূর্ণ বলে ইংরেজ নীতিবাগীশেরা ঘোষণা করেছিল গত শতকে। এ-কুৎসা শিক্ষিত ভারতবাসী এত গভীরভাবে অন্তঃস্থ করেছিল, যে একসময় পুরীতে কংগ্রেস দলের সম্মেলন প্রস্তাবিত হলে, এক শুদ্ধাচারী হিন্দু শিল্পপতি পুরী ও কোনারকের 'অশ্লীল' মূর্তিগুলি নিজের খরচায় চুন-বালি দিয়ে বুজিয়ে ফেলতে প্রতিশ্রুতি দেন, যাতে সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের সুরুচি আঘাতপ্রাপ্ত না হয়! এ সর্বনাশা প্রস্তাবে গান্ধিজিও রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। নেহাত, তাঁর স্নেহধন্য নন্দলাল বসু হস্তক্ষেপ করেন—তাই ব্যাপারটা আর বেশিদূর এগোয়নি।[৫২]

হাসিও পায়, ও দুঃখ হয়, যখন দেখি স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষেও, 'হিন্দুত্বের' ধ্বজাধারী তথাকথিত স্বদেশভক্তেরা 'সমাজতন্ত্র', 'গণতন্ত্র', 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ইত্যাদি প্রত্যয়গুলি

বিজাতীয়, পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক চিন্তাধারা-আরোপিত বলে বর্জন করতে বদ্ধপরিকর; অথচ সেই একই ঔপনিবেশিক শিক্ষা-প্রদত্ত 'অশ্লীলতা'র সংজ্ঞা তারা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করে, এবং তাকে আঁকড়ে ধরে তার মাপকাঠিতে বিচার করে, আধুনিক শিল্পীর তুলিতে সরস্বতীর নগ্ন অবয়বের চিত্রায়ণ, 'হিন্দুধর্ম-বিরোধী' বলে ঘোষণা করছে।[৫৩]

এর থেকে অনেকগুলি প্রশ্ন বেরিয়ে আসছে যা এই নব-নির্মিত 'হিন্দুত্ব'র আদর্শের নেতৃবৃন্দের সামনে রাখা দরকার। অতীতের মন্দিরগাত্রে হিন্দু দেবদেবীর বিবস্ত্র রূপায়ণের তারা বিরোধী? তাহলে, কী যুক্তিতে তাদের এই বিরোধিতা? না কি, এই ধরনের রূপায়ণে কোনো মুসলমান বা অ-হিন্দু শিল্পীর অধিকার নেই? তাহলে প্রশ্ন—কোন হিন্দু শিল্পশাস্ত্রে এই অনধিকার বিধিবদ্ধ হয়েছে? সর্বোপরি, স্বাধীন ভারতবর্ষে, তাদের ধর্মীয় অনুভূতি প্রতিরক্ষাকল্পে, তারা কেন অতীতের ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র নির্ধারিত 'অশ্লীলতা'র সংজ্ঞা শরণাপন্ন হচ্ছে?

এই প্রশ্নগুলি নিয়ে এক ব্যাপক বিতর্কের অবতারণা করলে, হিন্দু ধর্মবিশ্বাস ও আচরণের সঙ্গে তথাকথিত 'অশ্লীলতা'র জটিল সম্পর্কের পাক খোলা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, ইংরেজ ঔপনিবেশিক মূল্যবোধ-নির্ধারিত 'অশ্লীলতা'র এতাবৎ সামাজিক আধিপত্যকেও, যুক্তিতর্কের সাহায্য তার মৌরসিপাট্টা থেকে উচ্ছেদ ও নির্মূলন সম্ভব বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।

টীকা

১. *বসন্তক*, ২য় পর্ব, দশম সংখ্যা, ১৮৭৪।

২. উদ্ধৃত : বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্য দর্পণ*।

৩. উদ্ধৃত : কাজী দীন মুহম্মদ।

৪. Abdus Sattar, p. 144

৫. Mustafa Zamain Abbasi, p. 41

৬. খরাক্রান্ত মাটির বৃষ্টির জন্য আকূতির সঙ্গে তৃষ্ণার্ত নারীর পুরুষসঙ্গ ও বীর্যর কামনার এই একত্রীকরণে, অতীতের fertility cult-এর ঐতিহ্যর সন্ধান পাই। এ-ঐতিহ্য এখনও চলমান—এবং এ শুধু উত্তরবঙ্গের নারী রাজবংশীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আমার এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি। ১৯৮২ সালে চৈত্র মাসে বিহারের গয়া-আউরাঙ্গাবাদের সীমান্তবর্তী একটি গ্রামে কোনো এক কার্যোপলক্ষে এক রাত কাটাতে হয়েছিল। সারা রাত ধরে শুনেছিলাম দূরাগত নারীকণ্ঠে গীত গান। পরের দিন সকালে, স্থানীয় বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করাতে তাঁরা বলেন যে খরার সময় এক অমবস্যার রাতে গ্রামের তিনটি মহিলা—একজন কুমারী, একজন সধবা, আর একজন বিধবা—একটি লাঙল

নিয়ে নিকটবর্তী জমিতে সমবেত হয়ে, সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়ে গান করেন বৃষ্টিদেবতার উদ্দেশে। ঐ রাতে, গ্রামের কোনো পুরুষের অধিকার নেই ঘরের বার হয়ে ওই জমিতে যাওয়ার। সম্পূর্ণ পুরুষ-বিবর্জিত এই অনুষ্ঠানে যদি কোনো পুরুষের দৃষ্টি পড়ে, তাহলে সে-বছর বৃষ্টি হবে না—এইটেই স্থানীয় বিশ্বাস!

৭. নিরঞ্জন চক্রবর্তী, পৃ. ২১১।

৮. *সমাচার দর্পণ*, ২৫ মাঘ, ১২৩১। পুনর্মুদ্রিত, ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১২৩।

৯. Karl Marx & Frederick Engels, Vol. I., pp. 381-82

১০. *বিশ্বকোষ*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩২৫-৩৫।

১১. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ৩০।

১২. প্রমথনাথ মল্লিক, মধ্যখণ্ড, পৃ. ১৩।

১৩. *বিশ্বকোষ*; তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩২৫-৩৫।

১৪. *সোমপ্রকাশ*, ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২।

১৫. দ্রষ্টব্য : সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উনিশ শতকের কলকাতার অন্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য', অনুষ্টুপ শারদীয় সংখ্যা, ১৯৯৭, পৃ. ১৮৫-১৯২।

১৬. Mikhail Bakhtin, p. 319.

১৭. P. Thankappan Nair. p. 110.

১৮. প্রাগুক্ত, p. 578.

১৯. প্রাগুক্ত, p. 204.

২০. *Indian Observer*, No. 14. December 10. 1793.

২১. প্রাগুক্ত, P. Thankappan Nair, p. 921

২২. প্রাগুক্ত, p. 337

২৩. *London Daily News*, November 6, 1867.

২৪. উনিশ শতকের ইংলন্ডে ভদ্রসমাজের রীতিনীতির ও নৈতিক মানদণ্ডের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—Michael Brander, Elizabeth Burton, এবং John Wildeblood and Peter Brinson দ্র.। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৮৮৮ সালে কলকাতা থেকে একটি বই প্রকাশ করেন ইংরেজ শিক্ষাব্রতী W. T. Webb-এর থেকে নমুনাস্বরূপ একটি উপদেশ উদ্ধৃত করছি—"When you are in society, remember that it is impolite...to break out in laughter."

২৫. *Edinburgh Review*, 1809.

২৬. সজনীকান্ত দাস, খণ্ড ১৫; পৃ. ৪১।

২৭. দীনেশচন্দ্র সেন, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫০০।

২৮. সুশীল দে, পৃ. ৫৪।

২৯. *Friend of India*. Vol. I. pp. 125-26.

৩০. Third Report of the Calcutta School Book Society. 1819-20. p. 47.

৩১. প্রাগুক্ত।

৩২. মন্তব্য দুটি *Calcutta Review*, Vol. XIII, 1850 থেকে উদ্ধৃত।

৩৩. ২০ জুলাই, ১৮৪৯। উদ্ধৃত : যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃ. ১৬০।

৩৪. প্রথম উদ্ধৃতিটি ১৮৩৫-এর ১লা আগস্টের *সমাচার দর্পণ* থেকে। দ্বিতীয়টি ১৮৫১-এর ১৬ই জুনের *সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়* থেকে। উদ্ধৃত : *ব্রজেন* বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭০-৭১ ও ৭৪৪।

স্ত্রী-বস্ত্র নিয়ে সে-যুগে শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রমহিলারাও চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন। ১২৭১-এর পৌষের *বামাবোধিনী পত্রিকার* এই মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য—"হায়! এ দেশস্থ স্ত্রীলোকদিগের জঘন্য পরিচ্ছদ যে কতকালে পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা বলা যায় না।"

৩৫. Shib Chunder Bose, p. 198.

৩৬. এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—'প্রাঙ্গণ-বিহারিণী রসবতী'; এই সংকলনে।

৩৭. *বঙ্গদর্শন*, পৌষ, ১২৮০।

৩৮. দ্রষ্টব্য : J. Long.

উদ্ধৃত : দীনেশচন্দ্র সেন, (নূতন সংস্করণ) পৃ. ৮২৭-২৮।

৩৯. দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ১০৪১।

৪০. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ২৯।

৪১. শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ২০২।

৪২. *মধ্যস্থ*, পৌষ, ১২৮০।

৪৩. *বিবিধার্থ সংগ্রহ*, ৫৮ খণ্ড, মাঘ ১৭৮০। (শকাব্দ, অর্থাৎ ১৮৫৮/৫৯ সাল।)

৪৪. *সুলভ সমাচার*, ৭ই ভাদ্র, ১২৭৮।

৪৫. *মধ্যস্থ*, ফাল্গুন, ১২৮০।

৪৬. *Hindoo Patriot*, August 9, 1855.

৪৭. *Bengalee*, September 27, 1873.

৪৮. *Hindoo Patriot*. September 29, 1873.

৪৯. *মধ্যস্থ*, ফাল্গুন, ১২৮০।

৫০. *বঙ্গদর্শন*, পৌষ, ১২৮০।

৫১. *মধ্যস্থ*, ফাল্গুন, ১২৮০।

৫২. দ্রষ্টব্য : *An Album of Nandalal Bose*, p. Twenty Nine.

৫৩. 'হিন্দুত্ব'র এই ধ্বজাধারীরা কি অবগত যে সরস্বতী পূজায় দেবীর ধ্যানে তাঁকে বর্ণনা করা হয় 'কুচভার নমিতাঙ্গী' রূপে?

সারজন্ থানাদার চৌকিদার

পুরোনো কলকাতা হারিয়ে গেছে বলে যাঁরা আক্ষেপ করেন, তাঁরা বোধ হয় তাকিয়ে দেখেন না এ শহরের একটি আদি, অকৃত্রিম প্রতিষ্ঠানের দিকে—কলকাতার পুলিশ-- যা এখনও নির্ভেজাল, অনড় রূপে বিরাজমান। আড়াইশো বছরের উপরে হয়ে গেল, তবু পুলিশের চরিত্র এক ইঞ্চিও পালটায়নি। উনিশ শতকের কলকাতার প্রবাদ ও লৌকিক ছড়ায়, সংবাদপত্রের খবরে, প্রহসনে ও নকশায় তদানীন্তন পুলিশ কর্মচারীদের যে আচার-আচরণের বর্ণনা পাওয়া যায়, তার হুবহু দৃষ্টান্ত মিলবে আজকের শহরের রাস্তায় ঘাটে, মাঠে ময়দানে। সেই একই উৎকোচ-গ্রহণ ও লাঠিবাজি, 'দুষ্টের পালন ও শিষ্টের দমন'। স্বীকারোক্তি আদায়ের তাগিদে থানা লক-আপে পিটিয়ে মানুষ মারা।

কলকাতা পুলিশের জন্ম ১৭০৪ সালে—শহরের গোড়াপত্তনের কিছুকালের মধ্যেই। কোর্ট-কাছারি, ইস্কুল-কলেজ-পৌরসভা, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার বহু আগেই পুলিশের দরকার হয়ে পড়েছিল ইংরেজ শাসকদের—স্থানীয় অধিবাসীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে কোম্পানির বসতি গড়ার জন্য। "একজন সরদার-পেয়াদা, পঁয়তাল্লিশ জন পেয়াদা, দুজন চোপদার (রাজদণ্ডবাহী সুসজ্জিত ভৃত্য) এবং বিশজন গোয়ালা" নিয়ে যে পুলিশ দলটি তৈরি হয়েছিল, ক্রমে ক্রমে বেড়ে তা এক পুরোদস্তুর বাহিনীতে পরিণত হয় আঠারো শতকের মাঝামাঝি গোবিন্দরাম মিত্রের তত্ত্বাবধানে। গোবিন্দরাম ছিলেন

কলকাতার ডেপুটি কালেক্টর Black Zamindar নামে পরিচিত। দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী ছিলেন। পাইক পাঠিয়ে, মারধর করে শহরের বাসিন্দাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে কোম্পানির রাজকোষ ভরেছিলেন। সুতানুটির তাঁতিরা সর্বস্বান্ত হয়ে শহর ছেড়ে পালিয়েছিলেন গোবিন্দরামের অত্যাচারে। পরবর্তী যুগের কলকাতার কুখ্যাত পুলিশ কমিশনারদের পুর্বসূরি বলা যেতে পারে গোবিন্দরাম মিত্রকে। সে-যুগের ছড়ায়, যে 'ছড়ি'র জন্য গোবিন্দরামের দুর্নাম রটেছিল (''বনমালী সরকারের বাড়ি, গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি'') তা আজ রাইফেল, স্টেনগান, এল.এম.জি. ইত্যাদি নানা পল্লবে বিভুষিত হয়ে স্বাধীন সরকারের রাজদণ্ড রূপে বিকশিত হয়েছে। সে-সময় কলকাতার থানায় দারোগার নীচে ছিল 'নাইব' (আজকের যুগে যাঁদের বলা হয় আই. ও. বা investigation officer,) 'নাইক' (আজকের হেড্-কনস্টেবল) ও 'পাইক' (কনস্টেবল)। পাইকেরা দিনে লাঠি ও রাত্রে বর্শা ব্যবহার করত। ঊর্ধ্বতন কর্মচারীরা কোমরে তরবারি এবং সশস্ত্র পাইক (আজকের আর্মড পুলিশ) বন্দুক ব্যবহার করত। গোড়ার দিকে এই সব পাইকদের সংগ্রহ করতে হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম ভারত, পাঞ্জাব ও ভোজপুর থেকে, কারণ স্থানীয় বাঙালি পুরোনো দেশীয় জমিদারের যারা পাইক ছিল, তারা কোম্পানি কর্তৃক জমিচ্যুত হয়ে আঠারো শতকের শেষ দিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কলকাতা পুলিশে অবাঙালি কর্মচারী আমদানির প্রথা বেশ অনেককাল ধরেই চলেছিল। পরে অবশ্য ইংরেজরা নব্য শিক্ষিত বাঙালি বাবুদের পুলিশ বিভাগের বিশেষ কাজে লাগিয়েছিল। ১৮৫৫ সালের কলকাতার পুলিশ রিপোর্টে বাঙালিদের সম্বন্ধে বলা হয় যে দৈহিক শক্তিতে অযোগ্য বলে এদের দিয়ে কনস্টেবলের কাজ হবে না, কিন্তু গোয়েন্দাগিরির জন্য বাঙালিরা সবচেয়ে উপযুক্ত। পরবর্তী যুগে বাঙালি বিপ্লবীদের ধরিয়ে দিয়ে পুলিশ বিভাগের এই সব বাঙালি টিকটিকিরা ইংরেজ প্রভুদের আশা পূরণ করে, প্রোমোশন পেয়ে রায়বাহাদুর খেতাব নিয়ে 'স্পেশাল ব্রাঞ্চ'-এর ইতিহাস 'সম্মান'-এর আসন পেয়েছে। উনিশ শতকের কলকাতার 'নিষিদ্ধ পল্লী'তে একটা কথা চালু ছিল—''মাছ খাবি তো ইলিশ; নাঙ্গ ধরবি তো পুলিশ''! পুলিশ যদি 'নাঙ্গ', অর্থাৎ উপপতি হয়, তাহলে বারবনিতার সুবিধা অনেক। প্রথমত, পুলিশের হেনস্তা (যেটা বারাঙ্গনাদের কপালে প্রায়ই জুটত) থামবে। দ্বিতীয়ত, পুলিশ 'নাঙ্গ', গুন্ডা-বদমায়েশের হাত থেকে তাকে রক্ষা করবে। তৃতীয়ত, পুলিশের উপরি পাওনা থেকে তার রক্ষিতারও দুটো ভালোমন্দ উপহার জুটবে।

সে-যুগে, বেশ্যাপল্লীতে পুলিশের প্রচণ্ড দাপট ছিল। সমসাময়িক পত্রিকা—*সম্বাদ ভাস্কর* (১৮৪৯, ৯ আগস্ট সংখ্যা) পুলিশের হাতে বেশ্যাদের লাঞ্ছনার বর্ণনা দিচ্ছে

এই ভাষায়—"...নগর মধ্যে যে সকল বেশ্যারা বসতি করে তাহারাও রাজার প্রজা, চৌকিদারেরা তাহারদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইয়া থানাতে ইনস্পেক্টরদিগের হস্তে দেয় কিনা, এবং ইনস্পেক্টরেরা সমস্ত রাত্রি রাখিয়া তাহারদিগের প্রতি অত্যাচার করে কিনা বেশ্যাদিগের মুখে ইহাও জানা আবশ্যক। এতভিন্ন ইন্‌স্পেক্টরদিগের মধ্যে অনেকে মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া বেশ্যালয়ে যাইয়া কতস্থলে কত অত্যাচার করিয়াছে বেশ্যারাই তাহা ব্যক্ত করিবে..." এর পরও কয়েক বছর পরে, শহরের মান্যগণ্য ভদ্রলোকরা যখন 'পিটিশন' করে ভদ্রপল্লী থেকে বেশ্যালয় উচ্ছেদের দাবি করেন, তখন পুলিশের ভয়ে বেশ্যাদের অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায় সমসাময়িক এক ঝুমুরওয়ালি ভবানীর গানে—

ভাল আইন কল্লো এবার
কোম্পানি রাজায়
বেশ্যারা সব শশব্যস্ত পালিয়ে যাবে
কে কোথায়
কেহ বা ত্যাজে সোনার ঘর
পারে গিয়ে পালিয়ে আছে হয়ে
আতান্তর
কেহ বা দেখে শুনে বেচে কিনে
শ্রীবৃন্দাবনে যেতে চায়...

কিন্তু পুলিশের আক্রোশের লক্ষ্যবস্তু ছিল গরিব বারবনিতারাই। তাদের একজনের চিঠি থেকে জানতে পারা যায়—"এক যাত্রায় পৃথক ফল ফলিল, যে কামিনী ঐশ্বর্যশালিনী ও স্বসহায়া ছিল সে অকাতরে ঘরে বসিয়া ভ্রূক্ষেপও করিল না।" এই 'পৃথক ফল'-এর কারণটা সহজেই অনুমেয়। 'ঐশ্বর্যশালিনী কামিনী'রা ছিলেন শহরের প্রতিষ্ঠাবান বাবুদের রক্ষিতা, যারা ঐশ্বর্যবলে পুলিশকে টাকা দিয়ে খোঁড়া করে দিতে পারতেন। সুতরাং, আজও যেমন, সে-যুগেও তেমন—পুলিশের নজর দুর্বল গরিবদের ওপরই। *হুতোম প্যাঁচার নকশা*-র একটা বর্ণনা মনে আছে? ভোরবেলার কলকাতার রাস্তা—"রাস্তার আলোর আর তত তেজ নেই। ফুরফুরে হাওয়া উঠেচে।" শহর জেগে উঠছে আর লোকজন চলতে শুরু করেছে। আর তারই মধ্যে—"পুলিশের সার্জ্জন (সার্জেন্ট), দারোগা, জমাদার, প্রভৃতি গরিবের যমেরা রোদ (রাউন্ড?) সেরে মসমস করে থানায় ফিরে যাচ্চেন; সকলেরই সিকি, আধুলি, পয়সা ও টাকায় ট্যাঁক ও পকেট পরিপূর্ণ—হুজুরদের কাছে চ্যালা কাঠখানা, তামাক ছিলিমটে ও পানের খিলিটে ফেরে

না, অনেকের মনের মত হয় নাই বলে সহরের উপর চটেছেন, রাগে গা গসগস কচ্চে, মনে মনে নতুন ফিকির আঁটতে আঁটতে চলেছেন, কাল সকালেই একজন নিরীহ ভদ্র সন্তানের প্রতি কার্দ্দানি ও ক্যারামত জাহির করবেন...'' এ অতি পরিচিত চিত্র। শুধু বলপ্রয়োগে আদায়কৃত জিনিসগুলি এখন নতুন—'তামাক ছিলিম' বা 'পানের খিলি'র বদলে সিগারেট কেস্ বা লাইটার, বা এক বোতল মদ!

সে-যুগে একটা প্রবাদ ছিল—''ছাগল ঘাস খায় না, আর পুলিশ ঘুষ খায় না—কে বিশ্বাস করবে?'' অবশ্য এই ঘুস অভিযানের লক্ষ্য সবসময় শহরের বাঙালি বাসিন্দারাই ছিল না, কখনো-কখনো কোনো দুর্ভাগা শ্বেতাঙ্গও এর বলি হয়ে পড়ত। সমসাময়িক এক ইংরেজি সংবাদপত্রের খবর (*Hindu Intelligencer*, 9 July, 1855) : ''জনৈক Mr. B. (শেতাঙ্গ কর্মচারী) কোন এক মেলা থেকে জিনিস-পত্র কিনে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে রাত হয়ে যাওয়াতে এক পুলিশ থানার কাছে, নিরাপদ ভেবে তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটান। পরের দিন সকালে উঠে দেখেন দুটি মালের বাক্স উধাও হয়ে গেছে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করলে দারোগাকে বলা হল তদন্ত করতে। দারোগা উক্ত সাহেবটির কাছে থেকে ১০০-র বদলে চোরাই মাল উদ্ধার করে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু সাহেব গররাজি হবার ফলে, দারোগা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ফিরে এসে জানাল ওরকম কোন চুরিই হয় নি!''

উৎকোচ ইত্যাদি থেকে দারোগাদের উপরি পাওনার একটা চমৎকার হিসেব পাওয়া যায় *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকার ১৮৩৬-এর ৩১ ডিসেম্বর সংখ্যা থেকে—

''দারোগার মাসিক বেতন ২৫ বৎসরে	৩০০
প্রথম থানাতে আসিলে চৌকিদার প্রতি	১
দোলের পার্ব্বনি ঐ	ঐ
দুর্গোৎসবে ঐ	ঐ
আড়াইশত চৌকিদার প্রতি গড়ে বৎসরে	৭৫০
এক স্থান হইতে অন্যত্র যাইতে প্রত্যেক প্রজা প্রতি ১ অবধি ৩	
বৎসরে এই রূপে দুই শত প্রজা প্রতি গড়ে	৪০০
জমিদারদের গোমস্তা ও ক্ষুদ্র ২ তালুকদারের ষান্মাসিক	
রিপোর্ট প্রতি অনিশ্চিত লাভে তালুক বুঝিয়া গড়ে	
প্রথম আসিলে তালুকদারের গোমস্তা ও ক্ষুদ্র ২	
তালুকদারের দত্ত নজর বৎসরে	২০০
মোট	২৪৫০

এখনকার মতো তখনও, কিছুদিন অন্তর অন্তরই পুলিশ-ব্যবস্থা সংস্কারের পরিকল্পনা ফাঁদতেন সরকারি কর্তা-ব্যক্তিরা। কিন্তু প্রত্যেকটি নতুন সংস্কারের পরই, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা কমার বদলে বেড়েই যেত। এমন-ই একটি নতুন আইনের ফলে কলকাতার বাসিন্দাদের দুরবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায় ১৮৩৬ এর ৬ই আগস্ট এর *সমাচার চন্দ্রিকা*-য়—

"যে অবধি পোলীসের নূতন বন্দোবস্ত মত কর্ম্ম হইতেছে তদবধি কলিকাতায় হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে চুরি না হয় এমত দিন নাই যে সকল গৃহস্থের বাটীতে পিপীলিকাদি কীট পতঙ্গ প্রবেশ করিতে পারে নাই যে সকল বাটীতে অনায়াসে সিঁধ দিয়া চুরি করিয়াছে...এমত প্রায় প্রতিদিন নগরমধ্যে দশ পনর স্থানের ঘটনার সম্বাদ পাওয়া যায় এ সকল সমাচার পোলীসে বড় রিপোর্ট হয় না যেহেতু...কাহারো বাটীতে চুরি হইয়াছে...বাটীর মধ্যে চোর ধরা পড়িয়াছে তথাপি পোলীসের আইন মতে তাহারা নিরপরাধী হইয়া খালাস পায়।..." এর কয়েক বছর পরে আবার এক নতুন আইন চালু হয়। তার ফলে নগরবাসীদের উপর পুলিশি অত্যাচারের নমুনা পাই ১৮৫০ সালের *সংবাদ প্রভাকর* (৬ই ফাল্গুন, ১২৫৬)-এ—"গবর্নমেন্ট পুলিশের নূতন নিয়ম করিয়া কি চমৎকার ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছেন, যাহারা রক্ষকের পদে নিযুক্ত আছে, তাহারাই সর্ব্বভক্ষক হইয়াছে, আমরা পুনঃ ২ সারজন, থানাদার, চৌকীদার প্রভৃতির অত্যাচারের বিষয় প্রমাণ লিখিতেছি, তথাচ কর্ত্তা মহাশয়েরা তাহাতে নেত্রপাত করেন না, কয়েক দিবস হইল একজন সারজন ও কয়েকজন চৌকীদার অন্যায়পূর্ব্বক চাঁপাতলার একজন ভদ্রলোকের ভবনে প্রবেশ করত অতিশয় অত্যাচার করে,...সারজনেরা মধ্যে ২ হাতটান দোষে ধৃত হয়েন, কত চৌকীদার চুরি করিয়া ধরা পড়িল, মধ্যে একজন মৃগশালায় (সে-যুগের কলকাতার জেলখানার নাম ছিল 'হরিণবাড়ি') মৃগয়া করিতে অনুমতি পাইয়াছে...রাজপুরুষেরা যদবধি কুনিয়ম সংশোধন-পূর্ব্বক সুনিয়ম সংস্থাপন না করিবেন, তদবধি এই পুলিশ কাণ্ড ফুলিশ কাণ্ড হইয়া থাকিবেক।"

উনিশ শতকে এ দেশে পুলিশি অত্যাচারের খবর বিলেতে গিয়ে পৌঁছোয় এবং ওখনকার পার্লামেন্টে দীর্ঘ আলোচনার ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অফ্ ডিরেক্টর্স ১৮৫৫ সালে একটি Torture Commission, বা পুলিশি নির্যাতন তদন্তের জন্য একটি 'কমিশন' এ দেশে পাঠাতে বাধ্য হয়। ঐ কমিশনের তদন্ত উপলক্ষে, ১৮৫৫-এর ২১ জুনের *Hindu Patriot* এক সম্পাদকীয়তে কলকাতার পুলিশ থানায় ধৃত ব্যক্তিদের উপর নির্যাতনের কিছু নমুনা দেয়। বর্তমান কলকাতার থানা লক-আপে পুলিশের মার-পিট ও তার ফলে বেশ কিছু লোকের মৃত্যুর বহুল-প্রচারিত খবরের

পরিপ্রেক্ষিতে, আজকের পাঠকেরা তুলনা করে দেখতে পারেন উনিশ শতকের কলকাতার পুলিশি আচার-আচরণ থেকে বিশ শতকের তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালি পুলিশ কর্মচারীদের ব্যবহারের পার্থক্য কোথায়? কিছুটা দীর্ঘ হলেও, *Hindu Patriot*-এর উক্ত সম্পাদকীয়র বিশেষ অংশটি পুরো তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারছি না—"Here (in Calcutta) under the very nose of the metropolitan Police, with its numerous staff of European Magistrates, Superintendents, Inspectors, (তখনকার দিনে পুলিশ বিভাগে এই সব উচ্চপদগুলি শ্বেতাঙ্গদের জন্যই সংরক্ষিত থাকত), an officer is discovered in the act of suspending a poor fellow by the hair of his head in a public Thana, an Anglo-Saxon Inspector between whiles administering to him a sound bastinado (বেতমারা) with a stout ruler, the unfortunate sufferer screaming with pain. In another apartment of the same premises, a young lad is undergoing similar treatment and in the agony of the infliction making a false confession of theft. The parties complain to the Magistrate, a Presidency Surgeon deposes to the serious nature of the assault committed upon them, the change is clearly established, and the over-powering punishment of a mulct of twenty rupees is imposed on the erring official. We are consoled for this lamentable result by the assurance that the Inspector has been recommended for dismissal. Glorious effort of justice!" পুরোনো কলকাতার অনেক কিছুই হয়তো হারিয়ে গেছে। কিন্তু সে-যুগের 'সার্জন, থানাদার, চৌকিদার'-এর ঐতিহ্য এখনও বহমান। তার একান্ত বিশ্বস্ত ধারাবাহক কলকাতার থানার বড়োবাবু ও তার কনস্টেবল বাহিনী।

বাঁকাউল্লার প্রত্যাবর্তন

১

বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির ইতিহাসে, বাঁকাউল্লা একটি রহস্যময় ও হেঁয়ালিপূর্ণ চরিত্র। উনিশ শতকের বাংলাদেশের পুলিশ দপ্তরে বাঁকাউল্লা নামে কোনো দারোগা আদৌ ছিলেন কিনা, এবং থাকলেও তাঁর আত্মকাহিনি নামে যা প্রচারিত হয়ে এসেছে, তা সত্যিই তাঁর লেখা না অন্য কারুর রচিত—এ-সব নিয়ে গত একশো বছর ধরে নানা জল্পনা-কল্পনা চলে এসেছে।

এ-যুগের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বাঁকাউল্লাকে উপস্থিত করেন প্রয়াত সুকুমার সেন মহাশয় ১৯৮২ সালে *বাঁকাউল্লার দপ্তর* নামে একটি বইয়ের নতুন সংস্করণ প্রকাশ করে।[১] বইটি প্রথম বার হয়েছিল—যতদূর জানা যায়—১৮৯৬ সালের ১৪ই জুলাই, কলকাতার ১৭নং ঈশ্বর মিল লেন থেকে।[২] এর কিছুকাল পরে, ১৯০৫ সাল নাগাদ, জনৈক সমালোচক বইটিকে 'শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়' দ্বারা রচিত বলে অভিমত প্রকাশ করেন। এ যুগের অনেক গবেষকেরাই এই অভিমতটি মেনে নিয়েছেন এবং গ্রন্থকর্তা হিসেবে বাঁকাউল্লার পরিচিতি, বা এমনকি বাঁকাউল্লার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই প্রশ্ন তুলেছেন।[৩]

সুকুমার সেনও, তাঁর নতুন সংস্করণের ভূমিকাতে আসল পরিচয় সম্বন্ধে কিছুটা দ্বিধাজড়িত সুরে বলেছেন—"বাঁকাউল্লার দপ্তরের গোড়ার প্রস্তাবে দারোগা মহাশয়ের আত্মকথা রয়েছে। এ কথা কতটা সত্য তা নির্দ্ধারণ করবার উপায় নেই।" অবশ্য, অন্য একটি সূত্র উদ্ধৃত করে সুকুমার সেন প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে বাঁকাউল্লার সরকারি নাম ছিল 'বরকৎউল্লা'। ওই নামের এক 'কোম্পানি নিযুক্ত কোতোয়ালের' তিনি উল্লেখ পেয়েছেন উনিশ শতকের একটি বাঙালি মুসলমান লেখক মহম্মদ মিরণ রচিত 'বাহারদানেস' নামে একটি গ্রন্থে। সুকুমারবাবু আরও অনুমান করেছেন যে যদিও বরকৎউল্লা (ওরফে বাঁকাউল্লা) ঐতিহাসিক চরিত্র, কিন্তু *বাঁকাউল্লার দপ্তর* তাঁর লেখা নয়, কোনো-এক অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার এর রচয়িতা—এবং এ রচয়িতা হয়তো সে-যুগের নামকরা দারোগা ও জনপ্রিয় গোয়েন্দা কাহিনিকার প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (যাঁর *দারোগার দপ্তর* ঐ সময় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত)।[৪]

১৮৯৬ সালে যখন বইটি প্রথম বার হয় বলে অনুমিত হয়, এবং তার কিছুকাল পরেও, সমসাময়িক পর্যবেক্ষকেরা অবশ্য বাঁকাউল্লার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। প্রথম সংস্করণের পর, একজন সমালোচক মন্তব্য করেন—"(বইটিতে বর্ণিত) ঘটনাগুলির অনুসন্ধান করেন তদানীন্তন পুলিশ দপ্তরের এক সুদক্ষ কর্মচারী যাঁর নাম বাঁকাউল্লা...।" এর পরে, ১৯০৫ সালে, আর একজন সমালোচকের মতে—"বাঁকাউল্লা নামক তদানীন্তন একজন সুদক্ষ দারোগা এই সকল ঘটনার তদন্ত করিয়া "আস্কারা" (সন্ধানলাভ) করেন। এই জন্যই পুস্তকটির নাম "বাঁকাউল্লার দপ্তর" রাখা হইয়াছে।[৫]

উল্লেখযোগ্য যে উভয় মন্তব্যদাতাই বাঁকাউল্লাকে ১৮৩০-এর দশকের 'ঠগী' দমন অভিযানের সমকালীন বলে ধার্য করেছেন। প্রথমজন বইটির বিষয়বস্তুর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন—"বারোটি চিত্তাকর্ষক গোয়েন্দা কাহিনী, সত্যঘটনামূলক, যেগুলি ঠগী কমিশনের সময়কালীন..." দ্বিতীয়জনের মতানুসারে "...প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে যে ঠগী কমিশন বসে, তাঁহাদের রিপোর্ট হইতে দ্বাদশটি ঘটনার সঙ্কলন..." করা হয়েছে।

অবশ্য 'ঠগী কমিশন'-এর সূত্রেই যে বাঁকাউল্লা পুলিশের চাকরি পান, এ বইটির শুরুতে 'পূর্বাভায—আত্মকথা' নামাঙ্কিত পরিচ্ছেদে লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন—"বেন্টিক বাহাদুরের আমলেই...ঠগী কমিস্যনর দেশে দেশে নগরে নগরে—এমনকি প্রতি পল্লীর মাদ্রাসা পাঠশালায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; লোকের মুখে অনুসন্ধান লইতেছেন, একটু বনেদী বড়লোকের চালাক ছেলে পাইলেই,—কমিস্যনর বাহাদুর তাহাদিগকে দারগাগিরি দিবেন।" তারপর স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে বাঁকাউল্লা

বলেছেন—'জেলার যিনি মীর মুন্সী, সেই মুন্সী সাহেবের একটা মাদ্রাসা ছিল; সকালে বিকালে সাহেব পাঠ দিতেন, দশ বারোটি ছাত্র আমরা মুন্সী সাহেবের নিকট পাঠ লইতাম।... বেশ মনে পড়ে, মাঘ মাস, —খুব শীত; রৌদ্রে বসিয়া ছাত্রদলে বকামী করিতেছি, মুন্সী সাহেব হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলেন, "তুমি দারগা হইবে?"...এ হেন চাকরীর প্রস্তাবে পরম আনন্দিত হইয়া কহিলাম, "মেহেরবাণী হয় ত করিব।" মুন্সী সাহেব বলিলেন, "এক বাজে (বেলা একটার সময়) কমিসনের সাহেবের সহিত মোলাকাৎ করিও..." দেখা করিলাম, মনোনীত হইলাম...পদ পাইলাম গোয়েন্দা পুলিশের দারগাগিরি...'[৬]

'বেন্টিঙ্ক বাহাদুর' অর্থাৎ গভর্নর জেনারেল উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক-এর আমল ১৮২৮ থেকে ১৮৩৫ সাল, যখন উইলিয়ম স্লিম্যানের নেতৃত্বে ঠগীদের নির্মূল করা হয়। বাঁকাউল্লা লিখছেন, উনি যখন মীর মুন্সীর মাদ্রাসায় ছাত্র, তখন ওঁর বয়স 'একুশ বাইশ'। আর *বাঁকাউল্লার দপ্তর*-এর যে প্রকাশিত সংস্করণের প্রথম নিদর্শন এখনও পর্যন্ত গবেষকদের হাতে এসেছে, তার প্রকাশকাল ১৮৯৬—অর্থাৎ ঐ সময় যদি বাঁকাউল্লা বইটি লিখতেন, তাহলে তাঁর বয়স আশির শেষ কোঠায় গিয়ে ঠেকেছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য, সুকুমার সেন বইটির সম্পাদকীয় ভূমিকাতে বলছেন—"এরও আগে বইটির প্রকাশ অসম্ভাবিত নয়।" মনে হয়, উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত বাঁকাউল্লার দীর্ঘ চাকুরি জীবন।

কিন্তু লক্ষণীয়, যদিও বাঁকাউল্লা বলছেন যে 'ঠগী কমিসনের সাহেব' তাঁকে দারোগার পদে নিযুক্ত করেন, তাঁর বারোটি কাহিনিতে কিন্তু 'ঠগী' নামধেয় অপরাধের মাত্র দুটি বিবরণী পাওয়া যায়—সে দুটি তিনি 'জলপন্থী ঠগী'র কার্যকলাপ বলে বর্ণনা করছেন। একজন 'ঠগী' নদীর জলে লুকিয়ে থেকে স্নানরতা মহিলাদের টেনে নিয়ে গহনা চুরি করত, আর একজন জলের নীচে চুরি করা সিন্দুক লুকিয়ে রেখে, অবসর মতো তুলে আনত। এদের কোনোটিই প্রচলিত 'ঠগী' শ্রেণি (অর্থাৎ গলায় ফাঁস লাগিয়ে যারা মানুষ হত্যা করে সর্বস্ব লুণ্ঠন করত)-র অন্তর্ভুক্ত নয়। বাঁকাউল্লার বাকি কাহিনিগুলি তৎকালীন বাংলাদেশের পরিচিত দস্যু, খুনে, ডাকাত, চোর-জোচ্চোর প্রভৃতি নিয়ে।

এ প্রসঙ্গে এটাও স্মর্তব্য—ও-যুগে ইংরেজ ঔপনিবেশিক প্রশাসন যে-শ্রেণির পেশাদারি অপরাধীদের 'ঠগী' বলে চিহ্নিত করেছিল, তারা মূলত মধ্য ও উত্তর-ভারতেই সক্রিয় ছিল। সরকারি নথিপত্র থেকে জানা যায় যে তাদের সাংগঠনিক জটাজাল বহুধাবিস্তৃত ছিল। শোনা যায় যে, আমাদের এই বাংলাদেশেও রামলোচন সেন নামে একজন 'ঠগী' ছিল।[৭] তবে, ওই সময় বাংলাদেশে 'ঠগী'র থেকেও যারা

অনেক বেশি পরাক্রমশালী ছিল, তারা ডাকাতদল আর ঠ্যাঙাড়ের দল। ডাকাতেরা দল বেঁধে গ্রামের ধনীদের বাড়িতে হানা দিত। এদের মধ্যে দুই 'বিশে ডাকাত' সুপরিচিত—একজন নদীয়ার বিশ্বনাথ বাগদী, আর একজন রিষড়ার বিশ্বনাথ ডোম—যাদের নিয়ে 'রবিনহুড' জাতীয় লোককাহিনি তৈরি হয়েছে এবং যারা হব্‌সবম-এর তত্ত্বানুযায়ী social bandit (অর্থাৎ ব্যক্তিগত অর্থলিপ্সার পরিবর্তে গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক তাগিদে যারা ডাকাতি করে লুণ্ঠিত অর্থ সাধারণে বিভাজিত করত)। ঠ্যাঙাড়েরা রাজপথে বা গ্রামের রাস্তায় পথিকের মাথায় লাঠি মেরে লুঠ করত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কল্যাণে 'ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়' সর্বজনবিদিত।

তাই 'বাঁকাউল্লার দপ্তর'-এ বর্ণিত ঘটনাগুলি 'ঠগী কমিশনের রিপোর্ট' থেকে সংকলিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। উত্তর ও মধ্য-ভারতে বিদ্যমান 'ঠগী' উপদ্রবের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই পাওয়া যায় না। বাঁকাউল্লা নিজেও বইয়ের শুরুতে তাঁর আত্মকথায় কোথাও দাবি করেননি যে তিনি 'ঠগী কমিশনের রিপোর্ট' থেকে এগুলি সংকলিত করেছেন, বা ঠগীদের ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে এগুলি জোগাড় করেছেন। বরং, এ কাহিনিগুলি সমকালীন 'ডেকয়টি কমিশন' (যেটি ইংরেজ সরকার উনিশ শতকে সামরিক কর্মচারীদের নিয়ে গঠন করে এদেশে ব্যাপক ডাকাতি ও দস্যুবৃত্তি রোধকল্পে)-এর এক্তিয়ারের মধ্যেই পড়ে বলে মনে হয়।

তাহলে মূল প্রশ্নগুলি থেকেই যাচ্ছে—বাঁকাউল্লা কে ছিলেন? তাঁর আসল নাম কি 'বরকৎউল্লা'? 'বাঁকাউল্লার দপ্তর'-এর লেখক কি স্বয়ং বাঁকাউল্লা, না অন্য কেউ? বইটির কাহিনিগুলি কি কল্পনাপ্রসূত, না সত্য ঘটনা? শুরুতেই বলে রাখি—এ প্রশ্নগুলির সঠিক জবাব এ প্রবন্ধে মিলবে না। তাহলে এ আলোচনার অবতারণা কেন?

২

উনিশ শতকের বাংলাদেশের অপরাধ-জগতের খোঁজখবর নিতে গিয়ে, কিছুদিন আগে দিল্লির জাতীয় মহাফেজখানাতে পুরোনো নথিপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম—'বাঁকাউল্লা' নামে জনৈক গোয়েন্দা বিভাগের একজন দারোগা ও-যুগে চোর-ডাকাত ধরে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তখনকার পুলিশ দপ্তরের বিবরণীতে বর্ণিত তাঁর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যদি বাঁকাউল্লার দপ্তরের কাহিনিগুলি মিলিয়ে পড়া যায়, তাহলে কিছু কিছু সাদৃশ্য চোখে পড়বে। আমাদের পূর্ব পরিচিত বাঁকাউল্লাই কি ইংরেজি নথিতে Bakaoollah বানানে রূপান্তরিত হয়েছে? বাংলা নামে ইংরেজি বানানে বিকৃতির ব্যাপারে ইংরেজ আমলারা তো সিদ্ধহস্ত ছিল।

'বাঁকাউল্লা' বা 'বাকাউল্লা' নামটি বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ে বহুল-ব্যবহৃত হতে শুনিনি। উনিশ শতকের বাংলা পুলিশ দপ্তরের গোয়েন্দা বিভাগে একই সময় একাধিক বাঁকাউল্লা থাকা সম্ভব নয় বলে মনে হয়। দ্বিতীয়ত, *বাঁকাউল্লার দপ্তর*-এর বর্ণনভঙ্গিতে অনেক সময়ই যে-ধরনের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তা তৎকালীন 'মুসলমানী বাঙলা' বলে পরিচিত ছিল—অর্থাৎ উর্দু-ফরাসি-আরবি শব্দের আধিক্য সমন্বিত। কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (অনেকেই মনে করেছেন এঁরাই এই বইটির ছদ্ম-লেখক)-এর স্বনামে রচিত বইগুলির রচনাশৈলীর থেকে *বাঁকাউল্লার দপ্তর*-এর লেখার ভঙ্গির আস্‌মান্‌-জমিন্‌ ফারাক।

শুরুতেই যা কবুল করেছি, তার সূত্র ধরে বলি—সরকারি নথিপত্রে যে Bakaoolah-র উল্লেখ পাচ্ছি, তিনিই এই বইটির রচয়িতা/নায়ক কিনা, এ প্রশ্নের মীমাংসা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। যাঁরা এর মীমাংসার সন্ধানে গবেষণারত, তাঁদের সাহায্যার্থেই আমি জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত উপরোল্লিখিত নথিপত্রের উল্লেখ করছি। আসলে, আমার নিজস্ব গবেষণার সূত্রে, সমকালীন সরকারি ও বেসরকারি বিবরণী পড়তে গিয়ে বাঁকাউল্লাকে নতুন চোখে দেখছি। তিনি Bakaoolah-ই হোন, বা বাঁকাউল্লা-ই হোন, একজন বা দুই ভিন্ন ব্যক্তিই হোন, তাঁর তদন্তের কাহিনিগুলি থেকে এক নতুন জগতের সন্ধান পাচ্ছি। এ এক বিচিত্র অপরাধ জগৎ—যেখানে নিত্য-নতুন দুর্বৃত্তি উদ্ভাবিত হচ্ছে। এক নতুন প্রজন্মের অপরাধীদের সৃজনশীলতার সঙ্গে, সদ্য প্রতিষ্ঠিত পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের বাঙালি দারোগাদের রহস্যভেদের স্পৃহার এক আজব পাঞ্জা-লড়াই চলছে।

এ-যুগের অপরাধ-বিজ্ঞানী, অপরাধ-জগতের ঐতিহাসিক ও গোয়েন্দা কাহিনি লেখক—এঁদের সবার কাছেই তাই বাঁকাউল্লা এক চিত্তাকর্ষী চরিত্র। তাঁকে ঘিরে রয়েছে অভূতপূর্ব সব ঘটনা, অভিনব অপরাধ কৌশলের উদ্ভাবন, এমন ধরনের চৌর্যবৃত্তি ও জালিয়াতি যা নতুনত্ব দাবি করত সে-যুগে, এমন চরিত্রের অপরাধী যাদের মনস্তত্ত্ব, আধুনিক মনঃসমীক্ষণের যথাযোগ্য বিষয়বস্তু হতে পারে।

এই সব চমকপ্রদ, তাজ্জব চুরি-ডাকাতি, খুন-রাহাজানি, ইত্যাদির তদন্ত ও অপরাধীদের ধরে শাস্তি বিধানের প্রয়াসে, বাংলাদেশে 'স্পেশাল ডিটেকটিভ ফোর্স' নামে একটি স্বতন্ত্র পুলিশ প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছিল ১৮৬৩-৬৪ সালে।[৮] এর কিছুকাল পরে, ১৮৬৭ সালে, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর, বাংলাদেশের পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগকে ঢেলে সাজাবার সিদ্ধান্ত নেয়। একজন শ্বেতাঙ্গ 'স্পেশাল ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনরল'-এর অধীনে চারজন বাঙালি 'একস্ট্রা এসিস্ট্যান্ট সুপরিন্টেন্ডেন্ট' এবং তাদের অধীনে

আবার দশ-বারোজন দেশীয় 'হেড্‌কনস্টেবল' নিযুক্ত করা হয়। এই বাঙালি দারোগাদের মধ্যে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেন তদানীন্তন ইংরেজ পুলিশ কর্তাদের চোখে, তাঁরা হলেন—নবকৃষ্ণ ঘোষ, বৈদ্যনাথ মুখার্জি ও মুনশী বাকাউল্লা (বাঁকাউল্লা?)[৯] এবং এঁদের শ্বেতাঙ্গ কর্তা, অর্থাৎ 'স্পেশাল ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনরল' ছিলেন J.H. Reily। এই 'রাইলি সাহেবের' আমলে, ডাকাত ধরার জন্য পুলিশ গোয়েন্দাগিরি কী ধরনের চেহারা নিয়েছিল, তার এক কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণী দিয়েছেন পরবর্তী যুগের এক বাঙালি ঐতিহাসিক।[১০]

১৮৬৭ সালের এই নব্য-প্রবর্তিত গোয়েন্দা বিভাগের কার্যকলাপের 'রিপোর্ট' পেশ করতে গিয়ে, তদানীন্তন বাংলাদেশের পুলিশ 'ইনস্পেক্টর জেনরল' বারংবার বাঁকাউল্লার বাহাদুরির উল্লেখ করছেন এবং তাঁর একটি তদন্তকর্মের সূত্রে বাঁকাউল্লার সাফল্যের তারিফ করে সুপারিশ করছেন—'যে আগ্রহ ও বুদ্ধির পরিচয় তিনি দিয়েছেন তার জন্য অতিরিক্ত সহকারী মুনশি বাঁকাউল্লার প্রাপ্য বিরাট কৃতিত্বের স্বীকৃতি।' (ইংরেজি থেকে অনুবাদ)[১১]

৩

যে ঘটনার তদন্ত উপলক্ষে বাঁকাউল্লার এই প্রশংসাপ্রাপ্তি তা অনুধাবন করতে গেলে তদানীন্তন চুরি-ডাকাতির বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। তদন্তের উদ্দেশ্য ছিল এক ডাকাতের দঙ্গলকে সাবাড় করা। এই দলটি রানীগঞ্জ থেকে গয়া পর্যন্ত যে রাজপথ ছিল, তাতে চলাফেরা করত আর পথিকদের ধন-সম্পত্তি লুঠ করত। কিন্তু অতীতের highway robber—তথা যাত্রীসড়কে ডাকাতদের মতো শারীরিক উৎপীড়ন বা হিংসাত্মক উপায়ে তারা তাদের কাজ হাসিল করত না। 'বেন্টিক বাহাদুর'-এর আমলের কড়াকড়ির ফলে রাজপথে ঠগী ও ঠ্যাঙাড়েদের মতো সহিংস ডাকাতদলের অবসান ঘটেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু চৌর্যবৃত্তি তো থামতে পারে না! তাই রানীগঞ্জ-গয়া রাজপথে সক্রিয় এই ডাকাত দলটি এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করে। গয়াগামী তীর্থযাত্রীদের দলে তারা ঢুকে পড়ত সঙ্গী হিসেবে। তারপর বিত্তবান কোনো যাত্রীর আস্থাভাজন হয়ে, পথে কোনো চটিতে তার জন্য আহার প্রস্তুতের ছুতোয় খাবারে ধুতুরার বিষ মিশিয়ে তাকে অজ্ঞান করে, তার যাবতীয় ধন-সম্পত্তি নিয়ে, তারা অন্তর্ধান করত।

এই দলটি সবসুদ্ধু ছিল সতেরোজনের। এদের নেতৃত্বে ছিল ইসলাম, রফি ও শফি নামে দুই ভাই। হিন্দু-মুসলমান মিলে তৈরি হয়েছিল দলটি। অন্যান্যদের মধ্যে ছিল রূপচাঁদ, পূরণ, ছমরু, মংরু প্রভৃতি নানা নামধেয় ব্যক্তি। তিন-চারজনের উপদলে

বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, পথিকদের খাবারে বিষপ্রয়োগ করে তাদের অজ্ঞান করে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করত। এই ধুতুরা বিষের প্রয়োগ এরা ইসলামের কাছ থেকে শেখে। মুনশী বাঁকাউল্লা যখন এদের পাকড়াও করেন তখন এদের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় যে ইসলাম একদা মরিশস্ দ্বীপপুঞ্জে কুলির কাজে নিযুক্ত ছিল। সেখানেই ধুতুরা বিষ খাইয়ে মানুষকে অজ্ঞান করে তার টাকাকড়ি নিয়ে পালানোর পেশায় সে সিদ্ধহস্ত হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, এই সময় (১৮৫৫/৫৯ সাল নাগাদ) এ দেশের প্রধান সড়কগুলিতে এই বিশেষ ধরনের ডাকাতদলের উদ্ভব হয়, যারা বিষ বা মাদকদ্রব্য প্রয়োগ করে লোকেদের সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে যেত। এবং ধরা পড়ার পর তাদের অধিকাংশর স্বীকারোক্তিতেই তারা বলে যে এই বিশিষ্ট কায়দাটি নাকি মরিশস্-ফেরত ভারতীয় কুলিদের কাছ থেকে তারা আয়ত্ত করেছিল। এর সত্যতা যাচাই করার অক্ষমতা প্রকাশ করে সমকালীন এক ইংরেজ পুলিশ কর্মচারী বলেন—"এ বিবৃতিতে কী সত্য জানি না। বলতে পারি দলের অনেকেরই এ বিষয়ে এক কথা।"[১২]

মজার কথা, বাঁকাউল্লা সাহেব নিজেও একদা এই ধরনের বিষ প্রয়োগের শিকার হয়ে নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন। *বাঁকাউল্লার দপ্তর*-এ দেখি হরিদাস নামে এক ডাকাতদলের সর্দারের অনুসরণ করতে গিয়ে কীভাবে তারই পাল্লায় পড়ে তিনি নাকাল হন। 'কৃষ্ণদাস' নাম নিয়ে, বৈষ্ণব গোস্বামীর ভেখধারী এই হরিদাস, বাঁকাউল্লা ও তার দুই পুলিশ অনুচরদের, নবদ্বীপে তার নিজের এক *ঠেকে* নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। তারপরের বিবরণী—"অনুচরেরা দধি চিড়া ফলাহার করিল, আমি অন্নই খাইলাম। সেই দাওয়াতেই বিছানা। —একদিকে আমি, অন্যদিকে কৃষ্ণদাস ও অনুচর দুজন, তাহারা প্রহরে প্রহরে বদলী হইয়া কৃষ্ণদাসকে পাহারা দিবে। এই সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া শয়ন করিলাম; —তৎক্ষণাৎ সুনিদ্রা।" তার পরের ঘটনা—"উঠিয়াই দেখি, আমি বালির শয্যায়, —সম্মুখে দেখি গঙ্গা, দূরে দেখি বন-ঝাউ গাছের ঘন বনের সারি। নিকটে জন-প্রাণীও নাই।"[১৩] হরিদাস উধাও।

বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণ, এই সব ডাকাতদের খুব একটা সাধারণ কৌশল ছিল। পূর্বোক্ত রানীগঞ্জ-গয়া রাজপথে সক্রিয় ডাকাতদলের নেতা ইসলাম, একবার সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে মুদির দোকানের সামনে এক বটগাছের নীচে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে থাকে সারাদিন ধরে, আর ওর শাগরেদরা কয়েকজন পথিককে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঐ দোকানে নিয়ে গিয়ে, তাদের চিরাচরিত কায়দায় ধুতুরা মিশ্রিত খাবার খাইয়ে অজ্ঞান করে ফেলে। তারপর সবাই মিলে তাদের টাকা-পয়সা, গয়নাগাটি হাতিয়ে

উধাও হয়ে যায়। কিছুকাল পরে, বাঁকাউল্লার তদন্তের সূত্রে ইসলামের দলবল ধরা পড়ে। কিন্তু প্রতারিত পথিকেরা অন্য শাগরেদদের চিনতে পেরে তাদের শনাক্ত করতে সক্ষম হলেও, তাদের সর্দার ইসলামকে চিনতে পারে না—যেহেতু ঘটনাস্থলের দূরে থেকে সন্ন্যাসী বেশে সে সবকিছু তদারক করছিল। ফলে তার তিনটি শনাক্ত শাগরেদ এই মামলায় অভিযুক্ত হয়ে সাত বছরের মেয়াদে দ্বীপান্তরিত হয়, কিন্তু নাটের গুরু ইসলাম পার পেয়ে যায়![১৪]

ইসলাম নামক এই ডাকাত সর্দারটির জীবনকাহিনি যেটুকু জানা যায়—সে-যুগের এক 'টিপিকল্' picaroon বা ঠগ-জুয়াচোর জাতীয় চরিত্রের অপরাধজীবন বলে মনে হয়। অল্পবয়সে, সে মরশিস্-এ কুলি হয়ে চালান হয়। সেখানে, নানাবিধ দুষ্ট বুদ্ধিকৌশল দ্বারা জীবিকার্জনের পথ আবিষ্কার করে, এ দেশে ফিরে আসে।[১৫] ধুতুরা বিষ খাইয়ে লোকেদের অজ্ঞান করে জিনিসপত্র চুরি করে সরে পড়াই তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে, এর ফলে দু'তিন জন ভুক্তভোগীর মৃত্যু ঘটে। ইসলাম ও তার দলের লোকেরা এর পরে খুনের অপরাধে অভিযুক্ত হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করা হয়।

ধুতুরা খাইয়ে ডাকাতির অভিযানে ইসলামের প্রথম সঙ্গী ছিল রূপচাঁদ দুশাদ নামে এক নিম্নবর্গীয় বিহারবাসী হিন্দু। এইরকম এক ডাকাতির একটা ঘটনা উপলক্ষে ইসলাম ও রূপচাঁদ দু'জনেই ধরা পড়ে। কিন্তু স্থানীয় থানার দারোগাকে ঘুস দিয়ে ইসলাম পালিয়ে যায় ও দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থাকে। শেষে বাঁকাউল্লা সাহেব আদাজল খেয়ে, তার পিছু পিছু ঘুরে তাকে ধরে ফেলেন ও নানা সাক্ষী-সাবুদ জোগাড় করে তাকে আদালতে হাজির করেন। তাঁরই অধ্যবসায়ের দরুন ইসলামের পুরো দলটিই ধরা পড়ে। কিন্তু আদালতের বিচারে ইসলামের দুই সহকর্মী রফি ও শফির মৃত্যুদণ্ড হয়। খুনের অভিযোগে আর একজন সহযোগীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়—অথচ ইসলামের দশ বছরের কারাবাস মেয়াদ হয়।[১৬] জেল খেটে কী ইসলাম ফিরে আসে, না দ্বীপান্তরেই তার মৃত্যু ঘটে? সে-যুগের পুলিশ বিভাগের জেল দপ্তরের নথিপত্রের জঙ্গল ঘাঁটলে হয়তো হদিশ পাওয়া যাবে কী পরিণতি ঘটেছিল এই কূটবুদ্ধি চৌর্যবিশারদের ভাগ্যে। কিন্তু তা ঘাঁটতে গেলে, আধুনিক গবেষকদের আয়ত্ত করতে হবে বাঁকাউল্লার গোয়েন্দা-বুদ্ধি ও অধ্যবসায়। আমাদের কজনের সে ক্ষমতা আছে?

তবে ওই নথিপত্রে বিবৃত বাঁকাউল্লার আরও দু'একটি কৃতিত্ব থেকে জানতে পারা যায় সে সময়কার বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের ডাকাতদলের কর্মপদ্ধতি ও ব্যাপক

জটাজাল বিস্তারের কৌশলের কথা। সঙ্গে সঙ্গে জানা যায় এই নতুন ধরনের ডাকাতির সমকালীন আর্থ-সামাজিক অনুষঙ্গ। ১৮৬৬-৬৭ সালে গ্রামাঞ্চলে মন্বন্তরের ফলে চুরি-ডাকাতি বেড়ে যায়। বর্ধমান বিভাগ (যার অন্তর্ভুক্ত ছিল হুগলি জেলা)-এর 'কমিশনর', বাংলাদেশের তদানীন্তন পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনরলকে, ১৮৫৯-এর ১০ই এপ্রিল তারিখে লেখা এক চিঠিতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন—"...ডাকাতির অপরাধ দমনের জন্য অতিরিক্ত কোনো খবরদারি ব্যবস্থা ব্যবহার করা উচিত। প্রধানত দুর্ভিক্ষের কারণেই হুগলি জেলায় ডাকাতির প্রকোপ বেড়েছে।" (ইংরেজি থেকে অনুবাদ)। তারপর তাঁর জেলাতে এই ডাকাতির প্রাদুর্ভাবের রোধকল্পে তিনি সাহায্য চেয়েছিলেন তদানীন্তন গোয়েন্দা দপ্তরের পূর্বোক্ত শ্বেতাঙ্গ কর্তা রাইলি ও তাঁর বাঙালি কর্মচারী (Nobokisto Ghosh)-এর—কারণ তাঁর মতে 'such aid would be of the very greatest service' বিপজ্জনক পরিস্থিতি বোঝাবার জন্য কমিশন সাহেব যে পরিসংখ্যান দাখিল করেছিলেন তা অনুযায়ী—হুগলি জেলাতে ১৮৬৪ সালে এগারোটি ডাকাতি ঘটে। বাড়তে বাড়তে তা ১৮৬৫-এ পৌঁছোয় চব্বিশে, ১৮৬৬-এ চৌষট্টিতে এবং ১৮৬৭-এর প্রথম তিন মাসেই কমপক্ষে যোলোটি এইরকম ডাকাতি হয়েছে। লুণ্ঠিত জিনিসপত্রের মূল্য ১০৬৮ টাকা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় যোলো হাজার টাকায়।[১৭]

Nobokisto Ghosh, অর্থাৎ নবকৃষ্ণ ঘোষ অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকার দরুন, হুগলির ডাকাতদের ধরার জন্য মুনশী বাঁকাউল্লাকে পাঠানো হয়। খোঁজখবর নিয়ে বাঁকাউল্লা জানতে পারেন যে ডাকাতের দলটি বেশ সুসংবদ্ধ এবং শুধু হুগলি নয়, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলাতেও তারা সক্রিয়। সবসুদ্ধ পঁয়ষট্টি জন মিলে দলটি গড়ে উঠেছে এবং তারা এই তিনটি জেলারই অধিবাসী। এরা ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে ডাকাতি করে। এছাড়া এই তিন জেলার গ্রামে-গঞ্জে এদের সহায়তা করার জন্য পঁয়ত্রিশ জন সহযোগী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এরা চোরাইমালের জিম্মাদার বা 'থলেদার' নামে পরিচিত। লুণ্ঠিত মালের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরে বণ্টনের কাজ ছাড়াও এদের আরও একটা দায়িত্ব আছে। দলের কেউ ধরা পড়লে, তাদের মামলা-মোকদ্দমা লড়াই করার সমস্ত দায় বহন করতে হবে এদেরকে—'হাইকোর্ট' পর্যন্ত। এবং অভিযুক্ত ডাকাতদের ছাড়িয়ে না আনতে পারলে, তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্বও এই 'থলেদার'দের—অবশ্যই গচ্ছিত চোরাই মাল বেচে।

এই ডাকাতদলের কয়েকজন চেলা-চামুণ্ডা ধরা পড়ার পরই, দলটিকে ভেঙে দেওয়া সম্ভব হয়। বাঁকাউল্লা দীর্ঘকাল ধরে এই সব ধৃত শাগরেদদের জেরা করে ও প্রলোভন দিয়ে অনেককে রাজসাক্ষীতে রূপান্তরিত করে (তাদের উপরে যে শারীরিক নিপীড়ন

ছিল এক অবশ্যম্ভাবী ঘটনা, তার কোনো উল্লেখ স্বভাবতই এই সব সরকারি নথিপত্রে নেই।) শেষ পর্যন্ত সক্ষম হন তাদের চোরাইমালের কোষাগারে পৌঁছুতে। 'থলেদার'দের বাড়িতে হানা দেবার আগে, এই সব বন্দিদের রাত্রে ডুলির মধ্যে বন্ধ করে তাদের অকুস্থলে নিয়ে গিয়েছিলেন বাঁকাউল্লা, যাতে তারা নিজেরা আত্মগোপনে থেকে, ডুলির আড়াল থেকে ওই 'থলেদার'দের পুলিশের কাছে চিহ্নিত করতে পারে।[১৮]

বাঁকাউল্লার তৎপরতার ফলে যখন দলের অধিকাংশ ডাকাত ধরা পড়ে, তখন এদের নাম ও পদবি থেকে যে ধর্ম, জাতি ও শ্রেণিবিন্যাসের ছবি বার হয়ে আসে, তার থেকে দেখা যায় যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে, এক বহুবর্ণ বিচিত্র ডাকাতগোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল ও-যুগে। বাঁকাউল্লা-ধৃত এই ডাকাতদলের নামগুলি উল্লেখযোগ্য—পীতাম্বর নাগ, কৈলাশ চক্রবর্তী, নফর নন্দী, হরি মান্না, শিবু ব্যানার্জি, আর্জান মির্দা, করিম মির্দা, এতুন দালাল, ত্রৈলোক্য মুখার্জি, গুরুচরণ মণ্ডল, মধু সিং। উচ্চ হিন্দুবর্গের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ থেকে শুরু করে নিম্নবর্গের হিন্দু ও মুসলমান,সবাই মিলে এই ডাকাতদলটি তৈরি করে। এরা কারা? দরিদ্র-নিপীড়িত, মন্বন্তর-নিষ্পেষিত ওই সময়কার হুগলি-মেদিনীপুর-বাঁকুড়া অঞ্চলের গ্রামীণ মানুষ? লক্ষণীয়, এই ডাকাত দলটির অধিকাংশ শিকারই ছিল গ্রামের সমৃদ্ধ বাসিন্দা এবং তাদের সোনা-রুপার গহনা ও বাসনপত্তর। পুলিশ নথিতে অপহৃত অভিযোগীদের নামের তালিকাতে দেখছি—'Chunder Seekur Bhattacharjee (চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য) a respectable Brahmin ; ...Sreenath Keranee, a respectable man' যিনি মেদিনীপুর মেসার্স ওয়াটসন অ্যান্ড কোম্পানির নায়েব ছিলেন, রাধামণি বোষ্টমী নামে এক বিধবা, যিনি তাঁর সম্পত্তি আগলাবার জন্য দুটি দারোয়ান নিযুক্ত করেছিলেন (আসলে এই-সব সম্পত্তি বন্ধকরূপে গচ্ছিত রাখা হত মহিলাটির কাছে।)[১৯]

গোয়েন্দাগিরির সূত্রে বাঁকাউল্লাকে বাংলাদেশের বাইরেও যেতে হত। এইরকম এক অভিযানে হাজারিবাগে তিনি মাধব সিং, নিনু সিং, ঘিনু সিং-এর নেতৃত্বে পরিচালিত এক দস্যুদলকে ১৮৬৭ সালে নির্মূল করতে সক্ষম হন। দুর্ধর্ষ এই দস্যুদলটি ঘোড়ায় চেপে ডাকাতি করতে যেত—তরোয়াল, বন্দুক ও মশাল হাতে বাড়িতে হানা দিয়ে অর্থ, সোনা-রুপা, গয়নাগাটি লুঠ করত। বিচারে এদের কারাদণ্ড হয়।

রানীগঞ্জ-গয়া যাত্রীসড়কে ইসলাম-পরিচালিত ধুতুরা বিষধর ডাকাতের দল, বা হুগলি-বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের বহু সম্প্রদায়ভুক্ত লুটেরার গোষ্ঠী বা হাজারিবাগের অশ্বারোহী সশস্ত্র দস্যুর দঙ্গল—যাদের বাঁকাউল্লা খতম করেছিলেন এবং যার ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে সরকারি দলিলে—এই ধরনের নানা বিচিত্র রকমের অপরাধীদেরই আরও অন্তরঙ্গ

ও আমলাতান্ত্রিক পরিভাষা-বিবর্জিত ঢঙে, বাঁকাউল্লা উপস্থাপিত করেছেন তাঁর *বাঁকাউল্লার দপ্তর*-এ। আমরা দেখতে পাই 'হাতকাটা হরিশ'কে (দুটি পুরুষ্ট হাত থাকা সত্ত্বেও যে নুলোর ভান করে থাকত), যে নবদ্বীপ ও কালনাতে তিন-তিনটে খুন করেও, নানা ছদ্মবেশে তদন্তকারীদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে; কাটোয়ার ডাকাত হরিদাসকে, যে গারদ ভেঙে বার হয়ে আসে তার প্রেমিকা প্রেমদার সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্য, ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে বৈষ্ণব তীর্থযাত্রীর ভেখ ধরে খুনখারাপি চালিয়ে যেত; বা 'বহুরূপী' গোপালকে, যার সঙ্গীদের ধরবার জন্য বাঁকাউল্লা মুর্শিদাবাদ থেকে কাশী পর্যন্ত ধাওয়া করেও বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন।

এই সব ফেরারি চোর-ডাকাত-খুনে ও তাদের পশ্চাদ্ধাবনকারী গোয়েন্দা বাঁকাউল্লার পারস্পরিক সম্পর্কটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। সরকারি দলিল-দস্তাবেজ আর *বাঁকাউল্লার দপ্তর*-এর স্মৃতিচারণ—দুই সূত্র থেকেই দেখা যাচ্ছে অনেক সময়ই, ডাকাতের সর্দার ও পুলিশের দারোগা, উভয়ই একই ধরনের কৌশল অবলম্বন করছে তাদের নিজ-নিজ উদ্দেশ্য সাধনে। ছদ্মবেশ ধারণ, লোক ঠকানো, অভিনয়—এ-সবের দক্ষ প্রয়োগে উভয়ই উচ্চাঙ্গের শিল্পীসুলভ পারদর্শিতার স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল। একদিকে যেমন ডাকাত-সর্দার ইসলাম তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে রানীগঞ্জ-গয়া রাজপথের পথিকদের প্রতারণা করে তাদের সম্পত্তি লুঠ করছে, অন্যদিকে বাঁকাউল্লার নেতৃত্বে পুলিশ গোয়েন্দারা হুগলি জেলায়, পথিক সেজে ডুলিতে বন্দি রাজসাক্ষীদের বন্ধ করে নিয়ে যাচ্ছে ডাকাতদলের চোরাইমালের জিম্মেদারদের ঘর শনাক্ত করার জন্য। 'হাতকাটা হরিশ'-এর ছদ্মবেশে—"সর্বাঙ্গ তুলা ভরা অঙ্গরাখায় ঢাকা, পায়ে লোমশ বিনামা (জুতো), হস্তে প্রকাণ্ড যষ্টি, বছর ত্রিশ বয়সের এক গৌরাঙ্গ ব্রাহ্মণ...অতি সদালাপী, অতি অমায়িক, অতি মিষ্টভাষী...দুঃখের বিষয়, দক্ষিণ হস্তখানি নাই। —একেবারেই নাই। কুর্তার শূন্যগর্ভ হস্ত পাশে ঝুলিতেছে।..." এই চেহারা দেখে অভিভূত হয়েছিলেন বাঁকাউল্লা সাহেব—যিনি কিন্তু নিজে তখন অন্য এক ছদ্মবেশ ধারণ করে এক অপরাধীর অন্বেষণে নবদ্বীপে এসে হাজির হয়েছেন। তাঁর নিজের ছদ্মবেশের কথা বলতে গিয়ে লিখছেন—'...এমন অনেক সত্য-মিথ্যার ব্যবহার আছে, পুলিশ বিভাগে যাহা "হিকমতি" নামে সমাদৃত। নবদ্বীপে গিয়াই জাতি ভাঁড়াইলাম...'[২০] মুসলমান-সন্তান বাঁকাউল্লা তাঁর 'হিকমতি'র গুণে, এমনভাবে সেজে-গুজে 'গৌরাঙ্গ-ভক্ত' বলে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করতে সক্ষম হলেন যে নবদ্বীপের সেরা 'শ্রীগৌরাঙ্গ দাস বাবাজীর আখড়া'য় তিনি বাসা পেয়ে গেলেন। এবং এই আখড়া থেকেই শুরু হয় দুই ছদ্মবেশী প্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াই—একদিকে 'হাতকাটা হরিশ', আর একদিকে দারোগা বাঁকাউল্লা। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ! উভয়ই লোক ঠকানোর কেরামতিতে নিপুণ শিল্পী।

বাঁকাউল্লার মতো পুলিশের গোয়েন্দাদের আয়ত্ত করতে হয়েছিল এমন 'হিকমতি', অর্থাৎ কর্মকুশলতা, যা তাদের অন্বিষ্ট অপরাধীদের দক্ষতার লাগসই হতে পারত। সে-যুগের বাংলাদেশের এই সব অপরাধীরাও এমন সব ফন্দি-ফিকির আবিষ্কার করেছিল, যা এক আজব শিল্পকৌশলের পরিচায়ক। ন্যায়ভ্রষ্ট, বিপথগামী ও স্বেচ্ছাচারী বলে ধিকৃত হলেও এক বিচিত্র সৃজনশীল প্রতিভার শৃঙ্খলাবোধ দেখতে পাই এদের সাধনপ্রক্রিয়ায়। চার্লি চ্যাপলিনের একটি মন্তব্য স্মরণীয় এ প্রসঙ্গে—''অপরাধী ও শিল্পী, মানসিকতার দিক থেকে, দুজনেই সমগোত্রীয়। উভয়েরই মধ্যে রয়েছে অদম্য প্রেরণার জ্বলন্ত অগ্নিশিখা, প্রবল কল্পনাশক্তি ও সবরকম নিয়ম ভেঙে এগিয়ে যাবার অপরিমেয় বাসনা।''[২১]

টীকা

১. সুকুমার সেন সম্পা., ১৩৮৯।
২. অশোক উপাধ্যায়, 'কালীপ্রসন্ন ও বাঁকাউল্লা', *এক্ষণ*, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯৪।
৩. ঐ, তুলনীয়— '''বাঁকাউল্লার দপ্তর'' কাল্পনিক গল্পের সংকলন, সত্যি ঘটনা নয়...' ('সুমিতা চক্রবর্তী, রহস্য গল্প, ভৌতিক গল্প, গোয়েন্দা গল্প এবং সরস গল্পের শিল্পী সুকুমার সেন'। *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*। ১-৪ সংখ্যা। ১০৬ বর্ষ।
৪. প্রাগুক্ত, সুকুমার সেন।
৫. প্রাগুক্ত, অশোক উপাধ্যায়।
৬. প্রাগুক্ত, সুকুমার সেন, পৃ. ২-৩।
৭. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, পৃ. ১৪৪৩।
৮. C. E. Buckland, Vol. I, p. 283.
৯. *Police, Home Dept. Proceedings, Feb. 20, 1869.* 'Report on the Working of the Detective Police Department in Bengal. 1868' (Report)
১০. সুধীরচন্দ্র মিত্র, পৃ. ৩১১।
১১. প্রাগুক্ত, *Report.*
১২. ঐ, মরিশস্ দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় 'কুলি'-চালান হতো ওখানকার ইংরেজ মালিকাধীন চা-বাগানে তাদের খাটাবার জন্য। তাদের উপর অসহনীয় অত্যাচারের কিছু ঘটনা প্রকাশিত হয়ে যাবার পরে, উদারনৈতিক কিছু ইংরেজ-এর প্রতিবাদের মুখে, ইংরেজ সরকার ১৮৫৬ সালে এ দেশ থেকে মরিশসে ভারতীয় 'কুলি' চালান সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখে। যদিও, চোরাপথে চালান থাকে অনেকদিন পর্যন্ত। আইন অনুযায়ী এই সব ভারতীয় 'কুলি' বা শ্রমিকেরা পাঁচ বছরের চুক্তিতে নিয়োজিত হতো—কিছু আইনের ফাঁকে পড়ে তারা অনেক সময়ই সারা জীবন ওদেশে কাটিয়ে দিতে বাধ্য হতো। এদেরই বংশধরেরা আজ

মরিশসের শাসকগোষ্ঠী। উনিশ শতকে মরিশসে ভারতীয় শ্রমজীবীদের প্রেরণ ও তাদের দুরবস্থার ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য—High Tinker.

১৩. প্রাগুক্ত, সুকুমার সেন সম্পা., পৃ. ৭১।

১৪. প্রাগুক্ত, *Report.*

১৫. মনে হয়, ইসলাম মরিশসে তার পাঁচ বছরের কাজের মেয়াদ শেষ করে এ-দেশে ফিরে আসে ১৮৬০-এর দশকে।

১৬. প্রাগুক্ত, *Report.*

১৭. ঐ

১৮. এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—১৯৭০-এর দশকে নকশাল-বিরোধী অভিযানে, অনুরূপ কায়দায় পুলিশ গোয়েন্দারা ধৃত নকশালপন্থী বন্দিদের বোরখা পরিয়ে নিয়ে যেত বিশেষ বিশেষ স্থানে, যাতে তাঁরা আড়ালে থেকে তাঁদের আত্মগোপনকারী সহকর্মীদের শনাক্ত করে দেন।

১৯. প্রাগুক্ত, *Report.*

২০. প্রাগুক্ত, সুকুমার সেন।

২১. উদ্ধৃত, Robert Payne, p. 253.

যুবরাজের কলিকাতায় আগমন

"২২শে ডিসেম্বর কলিকাতায় মহাধুম পড়িয়াছিল, লোকে লোকারণ্য, রাস্তায় চলা ভার, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ, যেখানে যত রাজা ছিল মায় পুরীর রাজা অবধি হাজির। যখন স্কুল মাস্টার নাম ডাকিলেন, একটিও এবসেন্ট ছিলেন না; কাহারো বাটীতে কোন কাজ ছিল না; কাহার বাটীতে অন্নপ্রাশন, দিদির বিয়ে, কর্ণদেবের (ভেদের) ওজর নাই, কাহার কোন পীড়া নাই, এমন কী কয়েক দিবসের জন্য রামরাজ্য হইয়া পড়িল।"[১]

উপরোক্ত মজার বর্ণনাটি ১৮৭৬ সালের একটি বাংলা মাসিক পত্র থেকে উদ্ধৃত। উপলক্ষ্য—তদানীন্তন ইংরেজসম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া-তনয় যুবরাজ এডওয়ার্ড-এর কলকাতায় পদার্পণ। ঘটনাটা একটা ছোটোখাটো আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল—শুধু কলকাতায় নয়, লন্ডনেও। উভয় শহরের পরিবর্তনশীল সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমিকায় একটা বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মনোভাবের যে বিচিত্র অভিব্যক্তি, তার থেকে সে-যুগের সামাজিক বিবর্তনের গতি-নির্দেশের একটা হদিশ পাওয়া যায়। বিশেষ করে উনিশ শতকের সপ্তম দশকে যখন এডওয়ার্ড কলকাতায় এসে উপস্থিত হন, তখন এ শহরের বাঙালি সমাজের বিভিন্ন স্তর একটা সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে। ঐ শতকের প্রথমার্ধে, অতীতের সমাজ কাঠামোর উপর ঔপনিবেশিক প্রভাবের ফলে যে ভাঙন দেখা গিয়েছিল, তা অনেকটা সামলে উঠে বিভিন্ন দলের গোষ্ঠীপতিরা আপোশ-

মীমাংসার মাধ্যমে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের এক নতুন নিয়ম বিধিবদ্ধ করে ফেলেছেন, যার আওতাতে এক সঙ্গতিপন্ন নব্য 'ভদ্রলোক' সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত এই শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণের দাবিতে সোচ্চার, দাবি আদায়ের জন্য ব্যাপক প্রচার ও সংগঠন তৈরিতে ব্যস্ত, কিন্তু ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে কতটা প্রত্যক্ষ আন্দোলনে শামিল হবেন তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। অন্য দিকে শহরের নিচু তলায়, কারিগর, মিস্ত্রি শ্রেণির মানুষেরা ক্রমশই তাঁদের ঐতিহ্যাশ্রয়ী পেশা থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন—যন্ত্র-শিল্পের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হচ্ছেন মহানগরীর শোভা বিস্তারের প্রয়োজনে ও নিত্যনতুন প্রাসাদোপম অট্টালিকার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। অতীতের মনিবদের সঙ্গে পৃষ্ঠপোষক-পোষ্যবর্গ (patron-client)-এর যে চিরাচরিত সম্পর্ক ছিল, তা ভেঙে চুক্তিবদ্ধ ব্যবস্থা বা contractual সম্পর্কে পরিণত হচ্ছে এবং খেটে-খাওয়া মানুষদের আর্থিক অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিচ্ছে। 'ভদ্রলোক'দের মতো এঁরা এখনও সংঘবদ্ধ হতে পারেননি নিজেদের দাবি আদায়ের প্রয়োজনে।

কিন্তু তৎকালীন কলকাতার বাঙালি সমাজের বিভিন্ন স্তরের নাগরিকদের অবস্থানের বিস্তৃত আলোচনার আগে, অন্যদিকে একটু নজর দেওয়া দরকার। যেখান থেকে ১৮৭৫-এর ডিসেম্বরের 'মহাধুম'-এর সূত্রপাত, অর্থাৎ যুবরাজ এডওয়ার্ড খোদ স্বদেশভূমি, তাঁর ভারত-পরিভ্রমণের প্রাক্কালে সেখানকার অবস্থা কী ছিল? এবং এই ভ্রমণ উপলক্ষে, ইংরেজ সমাজের প্রতিক্রিয়াই বা কী রূপ নিয়েছিল? বর্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে এ প্রসঙ্গটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

লন্ডন ১৮৭৫-৭৬

ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের মধ্যবর্তী পর্যায়ে, ইংলন্ডে শিল্পোৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের যে ক্রমোন্নতি, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজে অর্থনৈতিক সুস্থিতি ও আত্মপ্রসাদের বনিয়াদ তৈরি করেছিল, উনিশ শতকের অষ্টম দশকে তাতে ভাঁটা পড়ে। ১৮৭৩-এ সারা ইউরোপের অর্থনীতিতে যে মন্দা দেখা যায়, তার ধাক্কা কয়েক বছর পরে ইংলন্ডের বাজারেও এসে লাগে। ১৮৭৫-এ যখন যুবরাজ এডওয়ার্ড ভারত যাত্রার পরিকল্পনা করছেন, তখন তদানীন্তন ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলির প্রথম প্রশ্ন ছিল—'Where is the money to come from?' (টাকা আসবে কোথা থেকে?)[২] রাজকোষের অবস্থা এমনই শোচনীয় ছিল।

আড়ম্বরপূর্ণ ভারত ভ্রমণের জন্য যত অর্থের প্রয়োজন, তা কোথা থেকে আসবে এ নিয়ে এডওয়ার্ডের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। মায়ের আদুরে দুলাল রূপে বড়ো হয়ে যুবরাজ যেভাবে জীবনযাপন করতেন, তা অনেকটা কলকাতার উনিশ শতকের গোড়ার দিকের ধনী সন্তানদের জীবনধারারই এক বৃহত্তর সংস্করণ ছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নববাবু বিলাস*-এর নায়ক, বা তার পরবর্তী *আলালের ঘরের দুলাল*-এর মতিলালেরই অনুগামী ছিলেন এডওয়ার্ড। অন্তঃপুরে স্ত্রী Alexandra-কে মায়ের তত্ত্বাবধানে রেখে, যুবরাজ তাঁর ইয়ার-বক্‌শিদের নিয়ে ফূর্তি করতে বেরোতেন দেশে-বিদেশে। Royal Playboy বা রাজবংশীয় নাগর রূপে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপীয় অভিজাত মহলে।[৩]

ইতিহাসে ভিক্টোরিয়ার যুগ গোঁড়া নৈতিকতার জন্য সুনাম অর্জন করলেও (আজও Victorian morality বলতে আমরা নীতিবাগীশতার পরাকাষ্ঠা মনে করি) এ সমাজের আড়ালে-আবডালে বিবাহ-বহির্ভূত প্রণয়ঘটিত ব্যাপারের এন্তার সুযোগ ছিল। লন্ডনের অলস অভিজাত মহলে দৈনন্দিন খোশগল্পের খোরাক জোটাত এডওয়ার্ড ও তার ইয়ারদের নিত্য-নতুন প্রণয়-কাহিনি, ও এইসব কাহিনির নায়িকারা ছিলেন Lily Langtry, অভিনেত্রী Sarah Bernhardt, ফরাসি রাজপরিবারের Princess de Sagan, Lady Dudley—যাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ তথাকথিত blue-blooded, বা বনেদি পরিবার-উদ্ভূত, আবার কেউ অজ্ঞাতকুলশীল থেকে উঠে এসে লন্ডনের উচ্চ সমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন নিজগুণে। স্পষ্টতই ইংরেজ অভিজাত সমাজে প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে ভিক্টোরীয় যুগের প্রারম্ভিক সংস্কারগুলো ভেঙে যাচ্ছিল। স্বশ্রেণি বহির্ভূত মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু কিছু নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ হল। "যখনই এডওয়ার্ড তাঁর প্রণয়লীলা শুরু করলেন সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা ও অভিনেত্রীদের সঙ্গে তখন থেকেই কিছু নির্দেশনামা নিয়মবদ্ধ হল—শুধু যুবরাজের জন্য নয়, তাঁর অনুচরবর্গের জন্যও।"[৪] মূল নির্দেশ ছিল একটাই। "প্রত্যেকেই মেনে নিয়েছিল যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাত্রেই রক্ষিতা রাখবেন, অথবা গণিকালয়ে যাবেন; কিন্তু একটাই শর্ত ছিল—একটু সাবধানে যেন এসব কিছু করা হয়।"[৫] অর্থাৎ ভিক্টোরীয় ভণ্ডামি বজায় রেখে ফূর্তি করার স্বচ্ছন্দ অধিকার। কারণ রাজভক্ত, নীতিবাগীশ মধ্যবিত্ত ইংরাজ সমাজের চোখে, রাজপরিবার ও অভিজাত সমাজের যেন কোনো পদস্খলন ধরা না পড়ে। মহারানী ভিক্টোরিয়া তাই তাঁর আদুরে গোপাল পুত্রকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন কোনোরকম বেহায়াপনা করলেই মধ্যবিত্তদের চোখে তার ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত হবে।[৬] বলা বাহুল্য, যুবরাজ সব সময় এই উপদেশ মেনে চলতেন না,

এবং সে-যুগের ইংরেজি খবরের কাগজে তাঁর কেচ্ছা-কাহিনি সবিস্তারে বর্ণিত হত, যার ফলে ইংরেজ মধ্যবিত্ত শ্রেণি ক্রমশই রাজপরিবার ও তাদের পার্শ্বচরদের সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি তদানীন্তন ইংরেজ সমাজে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত; নিজস্ব নৈতিক ধ্যান-ধারণার নির্মম আলোকে সব কিছু বিচার করতে তারা বদ্ধপরিকর। যুবরাজের দুই-এক বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে যে অন্তরঙ্গ মহল গড়ে উঠেছিল তার বাইরে ছিল কঠোর, অনমনীয় মধ্যবিত্ত ইংলন্ড, যেখানে গোঁড়া নীতিপরায়ণ আচরণবিধি কড়া হয়ে গেড়ে বসেছিল। অবশ্য (অভিজাত ও মধ্যবিত্তদের) এই জগতে খেটে-খাওয়া, ক্ষুধার্ত শ্রমজীবীর কোনো স্থানই ছিল না। তারা শুধু পেটের চিন্তাতেই দিন যাপন করত।[৭]

ভিক্টোরীয় ইংলন্ডের মধ্যবিত্ত সমৃদ্ধি ও অভিজাতদের হই-হুল্লোড়ের আড়ালে আর একটা জীবনধারা সমাজের নিচুতলায় প্রবাহিত হচ্ছিল। ১৮৭১-এর আদমসুমারির হিসাব অনুযায়ী লন্ডনের জনসংখ্যা ছিল ৩২ লক্ষের কিছু উপরে। এর প্রায় এক-চতুর্থাংশ দরিদ্র এবং এক-দশমাংশ সর্বদাই প্রায় অনাহারে জীবনযাপন করত।[৮] এই দরিদ্র মানুষেরা বসবাস করতেন শহরের বিভিন্ন বস্তিতে বা খোলা রাস্তায়। সে-যুগের (বা এ যুগের-ও) কলকাতার মতো, লন্ডনের রাস্তাঘাটের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি ও অন্যান্য নগর পরিকল্পনার কার্যক্রমের মুখে এঁরা প্রায়শই স্থানচ্যুত হতেন। মধ্য লন্ডনে রেল লাইন বিস্তারের প্রয়োজনে প্রায় ১২০,০০০ বস্তিবাসীকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। ১৮৭৫-এ এক বিশেষ আইনের বলে ২২ লক্ষ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করা হয় clearance scheme বা শহর পরিষ্কার করার নামে। এঁদের কপালে কোনো বিকল্প বাসস্থান জোটেনি।[৯] ইংলন্ড পরিভ্রমণকারী, সমসাময়িক ফরাসি চিত্রকর Gustave Dore (১৮৩৩-৮৩)-এর খোদাই চিত্র থেকে বেরিয়ে আসে সে-যুগের লন্ডনের গরিব জনগণের মর্মান্তিক জীবনযাত্রার ছবি।[১০]

চল্লিশের দশকের 'চার্টিস্ট' আন্দোলনের প্রশমনের পর, দীর্ঘ অবসাদ কাটিয়ে উঠে ইংরেজ শ্রমিকশ্রেণি সত্তরের দশকে আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বেতন কাটার বিরুদ্ধে ও নয় ঘণ্টা কাজের দাবিতে লৌহ শিল্প ও কয়লাখনিতে একাধিক ধর্মঘট, শ্রমিক আন্দোলনের নতুন জোয়ারের সাক্ষর। এর চূড়ান্ত পরিণতি ১৮৮৬-তে যখন লন্ডনে ও ইংলন্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিক বিক্ষোভ ফেটে পড়ে।

এই সামাজিক প্রেক্ষাপটে যুবরাজের ভারত ভ্রমণের ঘোষণা, লন্ডনে একটা প্রচণ্ড বিতর্কের সূত্র হয়ে দাঁড়াল। ভ্রমণের জন্য যুবরাজের টাকার অঙ্কের প্রয়োজন নিতান্ত কম ছিল না। তাঁর দৈনন্দিন আমোদ-আহ্লাদের সহযোগী—গোটা-আঠারো ধনীর দুলাল

(Lord Carrington, Duke of Sutherland, Lord Aylesford, প্রভৃতি)—সরকারি পরিষদবর্গ ছাড়াও, তাঁর প্রিয় ফরাসি কুকুরছানা এবং কয়েকটি ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য যুবরাজ আবদার করেছিলেন—এবং ডিজরেলির সঙ্গে অনেক ধস্তাধস্তি করে এই পুরো লটবহর শেষ পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে যেতে সক্ষমও হয়েছিলেন।[১১]

যুবরাজ ও তাঁর এই-সব সাঙ্গোপাঙ্গদের যাতায়াতের জন্য রাজকোষ থেকে প্রথম দফায় ৫২,০০০ পাউন্ড অনুমোদিত হয়। কিন্তু তার পর প্রশ্ন ওঠে—যুবরাজ ভারতবর্ষে গিয়ে খরচ করবেন; বিশেষ করে ভারতীয় রাজা-রাজড়াদের জন্য উপহার না নিলে ইংরেজ রাজপুত্রের মান থাকে না। সুতরাং আরো ৬০,৫০০ পাউন্ড মঞ্জুর হল। অপ্রয়োজনীয় পরিভ্রমণে অর্থ অপচয়ের অভিযোগ এনে তৎকালীন প্রগতিপন্থী ইংরেজ সংবাদপত্র *Reynold's Newspaper* মন্তব্য করে যে খেটে-খাওয়া মানুষদের লুঠ করে যুবরাজের প্রমোদ-ভ্রমণের আয়োজন করা হচ্ছে।[১২]

খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ছাড়িয়ে প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে লন্ডনের রাস্তায়। হাইড পার্কে ৬০,০০০ মানুষের এক জনসভায় সে-যুগের বিখ্যাত নিরীশ্বরবাদী সমাজ-সংস্কারক Charles Bradlaugh (যিনি Annie Besant-এর সহকর্মী ছিলেন) ঠাট্টা করে বলেন—যুবরাজের ভারতযাত্রার বিরুদ্ধে ইংলন্ডের জনসাধারণের কোনোই আপত্তি নেই; এমনকি তাঁরা চান যুবরাজ আরো দীর্ঘদিন ইংলন্ডের বাইরেই কাটান। কিন্তু এর পিছনে নিজেদের ট্যাঁক থেকে পয়সা খরচ করতে জনগণ রাজি নয়। বিভিন্ন অঞ্চলে অনুরূপ জনসভায় বক্তারা প্রশ্ন তোলেন—ভারতের রাজা-রাজড়াদের উপহার দেবার জন্য এডওয়ার্ডের যে খরচ হবে, তা ইংরেজ জনসাধারণকে কেন বহন করতে হবে? এইসব প্রতিবাদ-সম্বলিত 'প্ল্যাকার্ড' ও নিশান নিয়ে বিক্ষুব্ধ মানুষ, এডওয়ার্ডের যাত্রার প্রাক্কালে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে।[১৩]

খুব ব্যাপক না হলেও এই ধরনের প্রতিবাদ মিছিলে, আসন্ন ভবিষ্যতের পূর্ব লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। ইংলন্ডের প্রজামণ্ডলীর যে ঐতিহ্যাশ্রয়ী রাজভক্তি এবং বিশেষ করে ভিক্টোরিয়ার প্রতি আনুগত্য, তাতে চিড় ধরছিল সাতের দশকে। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং অভাব-অভিযোগের ফলে সাধারণ মানুষের মনে যে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছিল, তারই প্রারম্ভিক প্রকাশ এডওয়ার্ডের ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষে—এবং চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ১৮৮৬-র নভেম্বরে লন্ডনের ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে জনসভায়, শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষে।

স্বদেশের এই অমঙ্গলজনক ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া পিছনে ফেলে রেখে, যুবরাজ এডওয়ার্ড তাঁর অনুচরবর্গের বিরাট বাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন প্রাচ্যের অনাস্বাদিত আমোদের উদ্দেশে। ১৮৭৫-এর ৮ নভেম্বর বোম্বাই পৌঁছে তার পর পুনা, বরোদা ও মাদ্রাজ হয়ে কলকাতায় এসে হাজির হলেন ডিসেম্বরের শেষে।

কলকাতা, ১৮৭৫-৭৬

১৮৭৬-এর আদমসুমারি থেকে কলকাতার অর্থনৈতিক কাঠামো আর সামাজিক জীবনযাত্রার একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। চার লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ বাঙালি এবং তাঁদের বৃহদংশই বাস করতেন 'কালা শহর'-এ Black Town-এ (উত্তর কলকাতা, যেখানে আঠারো শতক থেকেই বাঙালি ব্যবসাদার ও মুৎসুদ্দিরা বসবাস শুরু করেন)। এঁদের মধ্যে যাঁরা সঙ্গতিপন্ন তাঁদের অধিকাংশ সরকারি চাকুরে, আইনজীবী, শিক্ষক, সংবাদপত্রের সম্পাদক, ব্যবসাদার। বাকিদের বলা যেতে পারে নিম্নবর্গের মানুষ। গৃহকর্মে নিযুক্ত ভৃত্য, নাপিত, ধোবা, ভিস্তিওয়ালা, গাড়োয়ান, পালকি-বেহারা, কুলি, জেলে, কামার, কুমোর, রাজমিস্ত্রি, বই বিক্রেতা, ছাপাখানার কর্মী, দরজি, দোকানদার, প্রভৃতি নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা শহরের জনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ছিলেন।

'কালা শহর'-এর চৌহদ্দির মধ্যে বসবাস করলেও সঙ্গতিপন্ন ও নিম্নশ্রেণির মানুষদের জীবনযাপনের ধারা ছিল ভিন্নধর্মী। প্রায় ১৭ হাজার পাকা বাড়ির (যার মধ্যে অনেকগুলিই চার-পাঁচ তলা) অধিবাসীদের বৃহদংশই ছিলেন বাঙালি সম্ভ্রান্ত ও সচ্ছল পরিবার। খোলার চাল দেওয়া কুঁড়েঘরের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৩ হাজার। এগুলি নিয়েই সে-যুগের কলকাতার বস্তি ও বিভিন্ন কারিগর ও ছোটোখাটো পেশায় নিযুক্ত মানুষদের বসতি গড়ে উঠেছিল। যেমন দরজিপাড়া, জেলেপাড়া, কাঁসারীপাড়া, ইত্যাদি। ১৮৭৬-এর আদমসুমারির কর্তা H. Beverley লক্ষ করেছিলেন যে কারিগর শ্রেণির মানুষের সংখ্যা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। নিম্নশ্রেণির এইসব মানুষেরা প্রায়ই তাঁদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ হতেন শহরের রাস্তাঘাটের বিস্তৃতি ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে। Beverley-র মন্তব্য—"যে কোনো রাস্তার প্রসারণ, যে কোনো নতুন উন্মুক্ত স্থানের (Square) উদ্বোধন মানেই বেশ কিছু লোকের স্থানচ্যুতি। এবং যেহেতু শহরের সীমা নির্ধারিত, এই উৎপাটিত মানুষের অনেকেই নিঃসন্দেহে শহরের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়।" কুমারটুলি, শ্যামপুকুর, বড়তলা, সুকিয়া স্ট্রিট, প্রভৃতি অঞ্চলের বিস্তৃত বস্তিগুলিতে এক একটি খোলার ঘরে অনেক সময় প্রায় আট-দশটি পরিবার বাস করত। এদের অন্ধকার, ঘিঞ্জি, স্যাঁতসেঁতে পরিবেশের প্রতি তৎকালীন কলকাতা পুরসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে Beverley বলেছিলেন—"এই সব ভিড়ে গাদা বস্তিগুলিতেই জল নিষ্কাষণ ও আবর্জনা দূরীকরণের ব্যবস্থা সব চেয়ে প্রয়োজনীয়।"[১৪]

যদিও শহরের মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণির মানুষেরা—কোঠাবাড়ির মালিক ও বাসিন্দারা—জলের কল, গ্যাসের বাতি, হাওড়া পুল, টেলিগ্রাফ—ইত্যাদি নিত্য-নতুন নাগরিক সুখ-সুবিধার প্রবর্তনে উল্লসিত এবং রাজার জাত ইংরেজদের বাহাদুরিতে চমৎকৃত হচ্ছিলেন, গরিব মানুষেরা কিন্তু এগুলিকে অন্য চোখে দেখতেন। Gustave Dore-র মতো সংবেদনশীল কোনো চিত্রকর সে-যুগের কলকাতার দরিদ্র শ্রেণির দুঃখ-কষ্টের দলিল রেখে গেছেন বলে জানি না। কিন্তু সহস্র গানে ও কবিতায় তা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

১৮৭০ সালে, কেশব সেন পরিচালিত *সুলভ সমাচার* ঐ বছর থেকে শতকরা পাঁচ টাকা করে জলের ট্যাক্স দেবার নিয়মকে অভিনন্দিত করে লেখে—"বিজ্ঞানের বলে কত অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইয়া গেল...(জল) যত পার তত লও, বারণ নাই। লোকে হাস্যবদনে ইহার ট্যাক্স দিতেছে, কাহাকেও মুখ ভার করিতে দেখা যায় না।"[১৫]

কিন্তু এর ফলে সাধারণ নাগরিকের দুরবস্থার ছবি পাওয়া যায় একটি মজার কবিতাতে। 'কলিকাতার সুখ' নামে অজ্ঞাতনামা কোনো কবির রচিত এই কবিতাটি জলের কল, নর্দমা ইত্যাদি সুখ-সুবিধার তালিকা দিয়ে, তার পর অনুযোগ করে—

এত সুখ কিন্তু যখন
    টেক্স দিতে হয়
এত সুখের শহর তখন
    মাতার উপর রয়।
তখন জঙ্গলময় জলহীন
    অজ পল্লীগ্রাম
আমার মনে বোধ হয়
    যেন স্বর্গ ধাম।
সুখের চেয়ে অস্বস্তি ভাল,
    কি বলিব আর
ওরে ছেড়ে দে রে কেঁদে বাঁচি
    সৈতে নারি আর।[১৬]

ঐ সময়ই, এক পল্লীকবি কলকাতা বেড়াতে এসে সাধারণ লোকের অর্থকষ্ট দেখে মহারানী ভিক্টোরিয়াকে সম্বোধন করে লেখেন—

পেটভরে পাই না খেতে
    কাজ কি পথে,

কলের জলে, কাজ কি গ্যাসে?
করভার মুক্ত কর সয় না আর।
ভারতের এই মহাক্লেশে
চাই না মা তারের খবর।
দুদিনের পর
কার খবর কে করবে দেশে?[১৭]

এই দরিদ্র শ্রেণির মধ্য থেকে অনেকেই, আধুনিক শিল্পোন্নয়নের এ দেশে প্রথম প্রচেষ্টা—পাটকলে চাকুরিজীবী ছিলেন। কিন্তু শিল্পপণ্যোৎপাদী শ্রমজীবীদের এই প্রথম প্রজন্ম, বা ঐতিহ্যাশ্রয়ী পেশাবলম্বী কারিগর বা ছোটো ব্যবসা-সংক্রান্ত বিষয়ে লিপ্ত সম্প্রদায় (তেলি শুঁড়ি ইত্যাদি)—এঁদের কেউই আধুনিক অর্থে সংগঠনবদ্ধ ছিলেন না। জাতিভিত্তিক একটা গোষ্ঠীবদ্ধতার মধ্যে তখনও এঁরা আটকে আছেন। সম্মিলিত ভাবে দাবি আদায়ের চিন্তা তখনও সুদূরপরাহত। যদিও মাঝেমধ্যে এঁদেরই কেউ কেউ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদের পথে নেমেছেন। যেমন ১৮৭৩ সালে খবর পাওয়া যায়, কলকাতায় গাড়োয়ানদের ধর্মঘটের। এক দুর্ঘটনায় ছোটোলাটের গাড়িতে ধাক্কা লাগার পর, পুলিশ গাড়োয়ানদের উপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। অনেক গাড়োয়ানকে অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করা হয় ও জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। শোনা যায় এঁদের মধ্যে কয়েকজনের দাড়ি গোঁফ কেটে দেওয়া হয়। মুসলমান ধর্মাবলম্বী এই গাড়োয়ানরা এটাকে তাঁদের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ বলে মনে করেন এবং গড়ের মাঠে জমায়েত হয়ে এর প্রতিবাদ করেন। তার পর তিন-চার দিন কলকাতার রাস্তায় আর ঠিকাগাড়ি চলেনি।[১৮]

এর বেশ কিছুকাল পরে আর একটি বিচিত্র ধরনের প্রতিবাদের খবর পাওয়া যায়। তখনকার দিনে বাবুদের বাড়িতে নিযুক্ত ভৃত্যদের গোঁফ রাখার অধিকার ছিল না। ভৃত্য মনিবের সামনে গোঁফ নেড়ে কথা বললে নাকি মনিবের অপমান হত। মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানাচ্ছেন—"...চাকরেরা এক সভা করিল এবং এক দরখাস্ত জারী করিল যে চাকরেরা গোঁফ রাখিতে পারিবে না কেন? কিন্তু তাহাদের সেই দরখাস্ত কেহ মঞ্জুর করিল না।"[১৯]

গোঁফদাড়ির রকমফের সে-যুগে সামাজিক পদমর্যাদার পরিচায়ক ছিল। বনেদি ও নব্য-শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণিও বিভিন্ন সময় নানা ঢং-এর গোঁফ-দাড়ি-চুলের কেতা করতেন। তবে বনেদি-বাড়ির পাইক-বরকন্দাজ বা সম্পন্ন উচ্চমধ্যবিত্ত বাড়ির ভোজপুরি দারোয়ানরা, তাঁদের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী চুল বা দাড়ি সুবিন্যস্ত করতেন। অন্য দিকে নব্য-শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকদের কেশবিন্যাস বা দাড়ির কেতা, প্রায়

অবিসংবাদী ভাবেই ইংরেজদের অনুকরণে পরিবর্তিত হতো। উদাহরণ দেওয়া যাক। আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের শুরুতে, সমসাময়িক বর্ণনা থেকে মনে হয় বাঙালি সম্রান্ত পরিবারের লোকেরা অতীত প্রথানুযায়ী বাবরি চুল ও পাকানো গোঁফ রাখতেন। রামমোহন বা দ্বারকানাথ ঠাকুর—কারুরই দাড়ি ছিল না। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বাঙালি বাবুদের কেশবিন্যাসে কিন্তু সমসাময়িক হাল ফ্যাশনের ইংরেজি কেতার প্রভাব স্পষ্ট। 'হুতোম'-এর বর্ণনায় দেখতে পাচ্ছি কলকাতার বাবুদের 'আলবার্ট ফ্যাশনে চুল ফেরানো'। ভিক্টোরিয়ার স্বামী আলবার্টের চুল আঁচড়ানোর কায়দা এটা; বাঁয়ে সিঁথি কেটে দু'পাশে সামান্য একটু ফাঁপিয়ে তোলা। উনিশ শতকের সত্তর দশকে চাপদাড়ির প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। আলবার্টের বিদায়ের পর, ইংলন্ডের পুরুষমণ্ডলীর আদর্শ যুবরাজ এডওয়ার্ড। তাঁর দেখাদেখি সবাই চাপদাড়ি রাখতে শুরু করেন। দাড়ির ঢেউ এসে লাগে কলকাতার মধ্যবিত্ত ঘরেও। সমসাময়িক একজন লোককবি ঠাট্টা করে ছড়া বেঁধেছিলেন।

> চাঁপদাড়ি রাখা, চোকে চশমা ঢাকা
> ভয়ানক ঢং লেগেছে বাংলাতে।
>
> . . .
>
> দেশজুড়ে উঠেছে দাড়ি রাখা ঢেউ
> বাড়ী বাড়ী দাড়ি বাকি নেইকো কেউ।

তার পর বাঙালিদের মধ্যে ইংরেজ-অনুকরণস্পৃহার প্রতি কটাক্ষ করে কবি বলেছেন,

> না বুঝে অনেকে নিগূঢ় কৌশল
> অনুকরণেতে অম্নি হন পাগল,
> সাধ করে কেবল সাজা রামছাগল[২০]

কলকাতায় পদার্পণ করে এডওয়ার্ড তাঁর কৃষ্ণাঙ্গ অনুকারীদের দেখে নিশ্চয়ই উৎফুল্ল বোধ করেছিলেন।

অবশ্য অনুকরণপ্রিয়, ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি সমাজেও সাতের দশকে অনেক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল। সমাজের পুরোনো দলপতি—বনেদি জমিদার মুৎসুদ্দি বংশোদ্ভূত জমির মালিক (শোভাবাজারের দেব, পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর প্রভৃতি পরিবার) ক্রমশই নেতৃত্বের স্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন নব্য উদ্ভূত আইনজীবী, সরকারি আমলা, শিক্ষক—এই-সব চাকুরিজীবীদের হাতে। এই নতুন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সম্প্রদায় কেবল নিজেদের স্ব-স্ব পেশায় উন্নতির সুযোগ-সুবিধা নিয়েই ক্ষান্ত থাকতে চাইছেন না। শাসন পরিচালনায

কিছুটা জায়গা আদায় করে, আরো সাফল্যের নিত্যনতুন রাস্তা আবিষ্কারে এবং বাঙালি সমাজে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় এঁরা উৎসাহী।

উনিশ শতকের ষাট দশকের মধ্যেই, সামাজিক ক্ষেত্রে এঁরা ইংরেজ সভ্যতার ও শিক্ষার কিছু প্রয়োজনীয় রীতিনীতি অবলম্বন করে এবং অতীতের হিন্দু সমাজের কিছু আচার-অনুষ্ঠান ও আচরণ-পদ্ধতি পরিমিত ও বিধিবদ্ধ করে, 'ভদ্রলোক' শ্রেণি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উনিশ শতকের শুরুতে যে বিতর্ক কলকাতার বাঙালি সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করেছিল— পাশ্চাত্য শিক্ষা বনাম ঐতিহ্যাশ্রয়ী হিন্দু আচার-বিচার—তার সমন্বয় সাধন হয় আপোশের মাধ্যমে। আধুনিক ইতিহাসবিদের ভাষায় এটা সম্ভব হয়েছিল "...(জেম্‌স) মিল্ ও মনুর মিলন স্থাপনে; অবশ্য শেষোক্ত ব্যক্তিটির পুরোহিত-মার্কা ও পিতৃশাসনতান্ত্রিক বাড়াবাড়িগুলোকে খারিজ করে। ...ইংরেজ Utilitarian (উপযোগবাদী James Mill) জুগিয়েছিলেন বুদ্ধিগত বিশ্লেষণের হাতিয়ার, আর হিন্দু মহাজ্ঞানীটি (উনিশ শতকের দ্বিধাবিভক্ত বাঙালি হিন্দু) সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার চাবিকাঠি দিয়েছিলেন।"[২১] এই আপোশের, বা সমন্বয় সাধনের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব নিহিত ছিল, সেটা বাঙালি 'ভদ্রলোক' সমাজকে চিরকালের মতো পঙ্গু করে দিয়েছে এবং বারংবার বিড়ম্বিত, হাস্যাস্পদ সম্প্রদায় রূপে বহির্জগতের কাছে প্রতিপন্ন করেছে। যুবরাজ এডওয়ার্ডের কলকাতায় আগমন উপলক্ষে 'ভদ্রলোক' সমাজের প্রতিক্রিয়া এই মর্মন্তুদ অন্তর্দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন।

জেমস মিল থেকে আহৃত intellectual analysis বা যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণের হাতিয়ার ধরে উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোক কিছুদূর এগিয়েছিলেন।[২২] পাশ্চাত্যের তদানীন্তন রাজনৈতিক দর্শন ও ইংলন্ডের রাষ্ট্রশাসন বিজ্ঞানে শিক্ষিত এই ভদ্রলোক শ্রেণি, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রক্ষমতা মেনে নিয়েই দেশের শাসনব্যবস্থায় কিছুটা স্থান অধিকারের দাবিতে সংগঠিত হচ্ছিলেন সত্তর দশকে। 'হিন্দু মেলা' (১৮৬৭), 'ইন্ডিয়ান লীগ' (১৮৭৫), 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৬) প্রভৃতি সংগঠন এই প্রচেষ্টারই ক্রমন্বয় পদক্ষেপ। অতীতের জমিদার-প্রভাবান্বিত 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫২)-এর বদলে, নব্যশিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণি-নিয়ন্ত্রিত 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'ই ক্রমশ ইংরেজ শাসকশ্রেণির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা আপোশ-মীমাংসায় অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছিল। সমসাময়িক ভিক্টোরীয় নীতিবোধে প্রভাবান্বিত এই ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায় স্ব-সমাজের বাঙালি নিচু শ্রেণি ও তাদের লোকসংস্কৃতি থেকে দূরত্ব বজায় রেখে নিজেদের এক স্বতন্ত্র, উন্নত গোষ্ঠী রূপে প্রতিপন্ন করার জন্য উদ্‌গ্রীব। তাই দেখি, ১৮৭৩-এ এঁরাই ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সহায়তায় কলকাতা শহরে Society for the

Suppression of Public Obscenity স্থাপন করে নিম্নবর্গের আমোদ-প্রমোদ বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। ইতিমধ্যে বিলেতি থিয়েটারের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত বাংলা রঙ্গমঞ্চ শিক্ষিত বাঙালির চিত্তবিনোদনের নতুন পথ খুলে দিয়েছে। প্রারম্ভিক পর্যায়ের জমিদার পৃষ্ঠপোষকদের (মাইকেলের আমলে পাইকপাড়া ও পাথুরিয়াঘাটার রাজারা) পরিবর্তে চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নাটকের রচয়িতা ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আসরে অবতীর্ণ হয়েছে সত্তর দশকের শুরুতেই। গিরিশ ঘোষ, অর্ধেন্দু মুস্তাফিরা যে নাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, তার আওতাতে ইংরেজ শাসনের সমালোচনা করে বেশ কিছু নাটক রচিত ও অভিনীত হয়। যেমন বরোদার গায়কোয়াড়ের বিরুদ্ধে ইংরেজদের ষড়যন্ত্র নিয়ে রচিত *গুইকোয়াড নাটক* (১৮৭৫) ও অমৃতলাল বসুর *হীরকচূর্ণ* (১৮৭৫) বা ইংরেজ চা-বাগান মালিকদের অত্যাচারের প্রতিবাদে রচিত দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের *চা-কর দর্পণ* (১৮৭৪)। যুবরাজ এডওয়ার্ডের ভারত-যাত্রার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই ইংরেজ সরকার এইসব নাটক বন্ধ করার জন্য ১৮৭৫-এর আগস্ট মাসেই Dramatic Performances Act. 1875 নামে একটি খসড়া আইন তৈরি করে। ভারত পরিভ্রমণ কালে এডওয়ার্ডের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ভারপ্রাপ্ত পুলিশের কর্তা Major Edward Bradford কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন ইংরেজ-বিরোধী কোনো প্রদর্শন বা প্রকাশনা যেন কঠোর হাতে দমন করা হয়।[২৩]

নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের লড়াই ও মাঝেমধ্যে ইংরেজ শাসনের অমিতাচারের প্রচ্ছন্ন সমালোচনার পাশাপাশি, এই ভদ্রলোক শ্রেণি অতীতাশ্রয়ী হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছিল। সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মিল-এর 'যুক্তিবাদ' অপেক্ষা মনুর নিয়ম-কানুনগুলিই অধিক মাত্রায় প্রভাবশালী ছিল। কোষ্ঠী বিচার করে, জাতগোত্র মিলিয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, মন্ত্রপাঠ (সে হিন্দু মতেই হোক বা ব্রাহ্ম মতেই হোক) করে বিবাহ, ব্রাহ্মণ-ভোজন, পরিবারের মধ্যে মেয়েদের অধিকারের সীমা নির্ধারণ—ইত্যাদি আচরণ-পদ্ধতির ব্যতিক্রম 'ভদ্রলোক' সমাজ কোনোমতেই বরদাস্ত করত না। প্রচলিত বিধি-বহির্ভূত জীবনযাপনের জন্য, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মতো পণ্ডিত ব্যক্তিও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিন্দার পাত্র হয়েছিলেন এবং শেষ জীবনে তাঁকে প্রায় সামাজিক উপেক্ষায় কাটাতে হয়েছিল। বাঙালি ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের এই রক্ষণশীল মনোভাবের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে ১৮৯১ সালে যখন Age of Consent আইনে বিবাহোপযোগ্য মেয়েদের বয়স বাড়িয়ে দেওয়া হয় ১০ থেকে ১২-তে। এর প্রতিবাদে কলকাতার ভদ্রলোকেরা গড়ের মাঠে বিরাট সমাবেশ করে মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাছে আবেদন জানান আইন রদের জন্য।

পারিবারিক ক্ষেত্রে, সনাতনী হিন্দু প্রথার উপর সরকারি হস্তক্ষেপ, স্বজাতি দ্বারা হিন্দু আচরণবিধির লঙ্ঘন, বাঙালি ভদ্রলোক সমাজ অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য করত। উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে, সীমাবদ্ধ ও মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত বাঙালির উৎসাহপ্রসূত হলেও, সনাতনী হিন্দু সমাজের সংস্কারের যে প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল, সত্তরের দশকে তা নির্বাপিত। বরং, রাজনৈতিক দাবি আদায়ের আন্দোলনে শিক্ষিত ভদ্রলোক সম্প্রদায় অতীতাশ্রয়ী সংস্কার ও রীতিনীতিগুলিকে জাতীয়তাবোধের প্রতীক হিসেবে দাঁড় করাতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল।

সরকারি আয়োজন ও কলকাতা প্রতিক্রিয়া

যদিও যুবরাজের যাতায়াত ও খরচপত্রের জন্য লন্ডন রাজকোষ থেকে এক লক্ষ পাউন্ডের উপর অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছিল, ভারত সরকার তার উপর আরো এক লক্ষ পাউন্ড এই উপলক্ষে খরচ করার সিদ্ধান্ত নেয়।[২৪] কলকাতার বাঙালি শিক্ষিত শ্রেণিভুক্ত সমালোচকেরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। *অমৃতবাজার পত্রিকা*-য় প্রকাশিত একটি চিঠি থেকে জানতে পারা যায় যে 'স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদা'র নামে জোর করে টাকা আদায় করা হচ্ছে কলকাতা ও আশেপাশের অঞ্চলের গরিব মানুষদের কাছ থেকে। যুবরাজ তখনও কলকাতায় এসে পৌঁছোননি। তাই পত্রলেখক আশা প্রকাশ করেছেন যে যদি এই অত্যাচারের কথা যুবরাজের কর্ণগোচর করা যায়, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর নামে ভারতীয় দরিদ্রশ্রেণির উপর এই বলপ্রয়োগের প্রতিবাদস্বরূপ, গরিব-দুঃখীদের প্রতি বদান্যতাবশত, তাঁর এই ভারত-যাত্রা থেকে বিরত হবেন।[২৫] লক্ষণীয়, প্রতিবাদ জানাতে গিয়েও 'ভদ্রলোক' পত্রলেখক মহারানীর পুত্রের বিরুদ্ধে কিছু বলতে নারাজ। বরং তাঁর দয়া-মমতার প্রতি আবেদন জানাতেই বেশি উৎসাহী।

লন্ডনের চার্লস্ ব্র্যাডল-র জনসভার খবর কলকাতায় এসে পৌঁছেছিল। *অমৃতবাজার পত্রিকা* ব্র্যাডল-র সমালোচনার কথা উল্লেখ করে লেখে, ''যদি এ দেশে এমন কথা কেহ বলে তাহা হইলে গবর্নমেন্ট তদ্দণ্ডে তাহাকে রাজদ্রোহী বলিয়া ধরিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন।''[২৬]

এডওয়ার্ডের আগমন উপলক্ষে কলকাতার পুরোনো জমিদার রাজা-রাজড়া ও ব্যবসাদার শ্রেণি বিরাট অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেছিল। বিখ্যাত মতিলাল শীল (যিনি উনিশ শতকের শুরুতে বোতল ও কর্কের ব্যবসা করে ক্রোড়পতি হয়েছিলেন)-এর পুত্র হীরালাল শীল তাঁর বসতবাড়ির এলাকা কলুটোলা স্ট্রিট দেশীয় প্রথায় রংমশাল, ন্যাকড়ার মশাল, ও নারকেল-শাঁসের মশালের আলোকশ্রেণিতে সজ্জিত করেন (এই

হীরালাল শীল 'হিন্দু মেলা'র একজন বড়ো পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পিতৃদত্ত সম্পত্তি ছাড়াও নিজে প্রচুর ধন-সম্পত্তি করেছিলেন মহিষাদলের রাজ-পরিবারের বিষয়াদি দখল করে)।[২৭] অন্যান্য ব্যবসায়ীরা লালদিঘির চার দিকে প্রচুর টাকা খরচ করে উজ্জ্বল আলো দিয়ে সাজিয়ে তোলেন। এত আলোর বাহুল্য দেখে একজন সমসাময়িক পর্যবেক্ষক মন্তব্য করেন—"যুবরাজ...আলোয় এলেন, আলোয় গেলেন, অন্ধকার কাহারে বলে তাহার ভাবও তাঁহার মনে একবার উদয় হইল না। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে বড় বড় লোকেরা দুঃখের বিষয়, কি কষ্টের বিষয় কিছুই জানিতে পারেন না।"[২৮]

উপরোক্ত মন্তব্য থেকে আঁচ করা যায় কলকাতার সাধারণ নাগরিক এই রাজকীয় উৎসব কী চোখে দেখেছিলেন। ছাপোষা মানুষের দৃষ্টিশক্তি বার হয়ে আসে একজন দর্শকের ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা থেকে :

'২৩শে ডিসেম্বর যুবরাজ আসিয়া পৌছিয়াছিলেন, একটা না বাজিতে সমস্ত কলিকাতা ঝেঁটাইয়া গড়ের মাঠে উপস্থিত। আর বাকি যে কয়েকজন অন্ধ বৃদ্ধ, খঞ্জ গরিব তাহারাও পার পায় নাই।...গরিব গুর্ব্ব ভিখারীরা চাঁদার টাকায় গোলদীঘি, বাদাম দীঘি সালকের মাঠে বসিয়া বসিয়া বার তের দিবস পেট টালিল।...পৃন্সেপের ঘাটে হগ্ সাহেব (তদানীন্তন কলকাতার পুলিশ কমিশনার) কাহাকেও নির্দ্ধারিত আসন দেন নাই, যিনি যেখানে ইচ্ছা বসিলেন; যত নিমন্ত্রিত লোকেরা বসিল, অনিমন্ত্রিত লোকেরা রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিল;...লাট সাহেব আসিয়া সিরাপিশে (Serapis নামে যে জাহাজে করে এডওয়ার্ড ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন) গেলেন, ২১ তোপ...যুবরাজের কলিকা(তা)য় পদার্পণ। রণতরী হইতে একুশ একুশ করিয়া তোপ, দুর্গ হইতে একুশ তোপ। হগ সাহেব এড্রেস পড়িতে লাগিলেন—এদিকে লোকেরা রোদে হা কোরে একটা অবধি দাঁড়াইয়া আছে, কয়েকজন হিন্দুস্তানী আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে তাহাদের মধ্যে একজন কহিল, "দেখ ভাই রাম, আব্বি গাগুারি (আকের টিকলি) আয়ে তো সব উঠ যায়।"...আমারও মনে হলো, কথাটা মন্দ বলে নি। গলা শুকাইয়া কাঠ। এমত সময় গোল উঠলো "আশ্চেন আশ্চেন"। অশ্বারোহীরা চলিল, কামান চলিল, ছোট কর্ত্তা চলিলেন, তাহার পর একখানি গাড়ি, অশ্ব মাতিল, তার পর যুবরাজ। হুরে, হুরে! গড় গড় কোরে চলে গেলেন। মস্তকে একটা শাদা পালক বিশিষ্ট সোলার টুপী, তাহার নিম্নে কিঞ্চিৎ লাল শ্মশ্রু।...আমার পার্শ্বস্থ হিন্দুস্থানীটি কহিল, "কোন্ আদমি রাজা, ও সব তো এক" নাক সিটকাইয়া চলিয়া গেল। আমারও ঐ প্রকার বোধ হইল...'[২৯]

কলকাতায় থাকাকালীন, বাঙালিদের মধ্যে যুবরাজকে যাঁরা আতিথ্য প্রদর্শন করেছিলেন, তাঁরা মূলত ছিলেন পুরোনো জমিদারবর্গ ও ব্যবসাদার শ্রেণি, 'ব্রিটিশ

ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন'-এর হর্তাকর্তারা। ২৮ ডিসেম্বর পাইকপাড়ার রাজারা তাঁদের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে (যেটা আদতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সম্পত্তি ছিল, পরে পাইকপাড়ার রাজারা কিনে নেন) এডওয়ার্ডের জন্য বিরাট ভোজসভার আয়োজন করেন। এই সভার উদ্যোক্তাদের সামাজিক অবস্থানের একটা চমৎকার বিশ্লেষণ পাওয়া যায় সমসাময়িক এক বিদ্রূপাত্মক বর্ণনা থেকে : "(বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ির) দ্বারদেশে রিসেপসন কমিটি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, কমিটিটি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।"

হিন্দু

ব্রাহ্মণ, ঠাকুর গোষ্ঠী (জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটার)
কায়স্থ, শোভাবাজারের দেবেরা।
নবশাখ ও তেলি তাম্বুলি ইত্যাদি বাবু
কৃষ্ণদাস পাল (ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক)

মুশলমান

আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর
আর একজন ঢাকাই নেড়ে।
পাড়াগেয়ে জমিদার
রাজা প্রমথনাথ (রায়—দীঘাপতিয়ার রাজা)

বৃদ্ধ

রাজা রমানাথ ঠাকুর (দ্বারকানাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা)

অর্ধবৃদ্ধ

বাবু দিগম্বর মিত্র (নীল ও রেশমের ব্যবসাদার ও
কলকাতার প্রথম বাঙালি শেরিফ)
ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র (প্রত্নতত্ত্ববিদ ও লেখক)

নবসম্প্রদায়

রাজা যতীন্দ্রমোহন (ঠাকুর) বাহাদুর (পাথুরিয়াঘাটার)

বালক

পাইকপাড়ার (রাজবাড়ির) কুমারেরা...[৩০]

বাঙালি এইসব রাজা-রাজড়া, মুৎসুদ্দির দল বনেদি হলেও, ছিল ইংরেজ রাজত্বের সৃষ্টি। তাদের অর্থগৌরব ও যশের সূত্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজদের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগ। রাজা, মহারাজা, রায়বাহাদুর, খান বাহাদুর খেতাব ইংরেজদেরই দেওয়া। প্রাগ্ ইংরেজ যুগের মুসলমান সামন্ততান্ত্রিক নবাবগোষ্ঠীর মধ্যে কেউ কেউ তখন কলকাতানিবাসী—যেমন টিপু সুলতানের বংশধর। তবে এঁদের মধ্যে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ছিলেন অযোধ্যার সিংহাসনচ্যুত নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্। ১৮৭৫-এ যখন এডওয়ার্ড কলকাতায় আসেন তখন ওয়াজেদ আলি শাহ্ এই শহরের দক্ষিণ প্রান্তে মেটেবুরুজে নির্বাসিতের জীবনযাপন করছেন। অযোধ্যায় রাজত্বকালে তার কয়েক শত বেগম ও উপপত্নী পরিপূর্ণ হারেম ও বাঈজী সমভিব্যহারে নাচ-গানের কাহিনি বহু পল্লবিত হয়ে বিলেতে গিয়েও পৌঁছেছিল। ১৮৫৬ সালে যখন ইংরেজ তাঁকে রাজ্যচ্যুত করে, তখন তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগের মধ্যে একটা ছিল তাঁর 'অসচ্চরিত্র জীবনধারা।' স্বভাবতই যুবরাজ এডওয়ার্ড এ-সব কাহিনি শুনে, হয়তো তাঁরই মানসিক জুড়িদার এ-দেশে খুঁজে পেয়েছেন ভেবে, নবাবের সঙ্গে দেখা করার উৎসাহ প্রকাশ করেন। যখন ওয়াজেদ আলিকে এ কথা জানানো হয়, তখন তিনি এডওয়ার্ডের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে ব্যাজস্তুতি-গোছের একটা বাণী পাঠান, "আপনি যদি আমাকে রাজা বলে স্বীকার করেন, তাহলে আপনি যেহেতু যুবরাজ, আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখা করাটা আমার পদমর্যাদার উপযুক্ত হবে না। কিন্তু যদি আপনার চোখে আমি বাস্তুহারা ভিখারি, তাহলে কি সাহসে আমি আপনার সামনে হাজির হব?"[৩১]

সর্বস্ব খুইয়ে, ইংরেজের পেনশনের উপর নির্ভরশীল হয়েও, ওয়াজেদ আলি কিছুটা স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। ইংরেজের তৈরি বাঙালি হিন্দু রাজা-মহারাজ, বা চাকুরিজীবী শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণির মতো ওয়াজেদ আলির পদোন্নতির অভিলাষ ছিল না। তাঁর আর কিছু হারাবারও ছিল না, অতীতের রাজ্য ফিরে পাবার সম্ভাবনা ছিল না বলে সে আশাও ছিল না। ফলে, পুরোনো দিনের আর্থিক সামর্থ্য না থাকলেও, সামন্ততান্ত্রিক রাজদরবারে অনুশীলিত মার্জিত অহংকার প্রকাশের যে সামর্থ্য তখনও বজায় ছিল, তারই জোরে ওয়াজেদ আলি কিছুটা নিজের ব্যক্তিত্ব ঘোষণা করতে পেরেছিলেন।

বাঙালি পুরোনো জমিদার-রাজা-মহারাজ-মুৎসুদ্দি শ্রেণি থেকে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনোভাব ছিল স্বতন্ত্র। তাঁরা এতদিনে সুনিশ্চিত হতে পেরেছিলেন যে বাঙালি সমাজে ঐ পুরোনো শ্রেণির আধিপত্য বিলীয়মান। ইংরেজদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়, দর-কষাকষিতে অভিজ্ঞ, এই চাকুরিজীবী ভদ্রলোকেরা সাতের দশকে বেশ

সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন', সুরেন বাঁড়ুজ্যের মতো বাগ্মী, আনন্দমোহন বসুর মতো শিক্ষাবিদ্ ও আইনজীবী এবং শিশির কুমার ঘোষের মতো সাংবাদিক এর মাধ্যমে, মহারানীর রাজদরবারে তাঁদের অভাব-অভিযোগ পেশ করতে পারলেই সব কিছুর সুরাহা হবে।[৩২]

বাঙালি ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের এই আত্মপ্রত্যয় হঠাৎ ধাক্কা খেল যখন, তাঁদের সম্প্রদায়ভুক্ত একজন ভদ্রসন্তান যুবরাজ এডওয়ার্ডের সংবর্ধনা উপলক্ষে এমন একটা কাজ করে বসলেন যা শুধু বাঙালি রাজা-মহারাজদের উপর টেক্কা মারল না, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সযত্নপালিত সামাজিক ভাবমূর্তিতেও—তাঁদের চোখে চুনকালি পড়ল।

জগদানন্দ থেকে 'গজদানন্দ'

কলকাতায় পদার্পণ করে এডওয়ার্ড নাকি বাঙালি সম্ভ্রান্ত ঘরের অন্দরমহল দেখার বাসনা প্রকাশ করেন। তাঁর কলকাতা ত্যাগের প্রাক্কালে, হাইকোর্টের সরকারি উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৮২১-৯২) যুবরাজ ও তাঁর সঙ্গীদের ১৮৭৬-এর ৩ জানুয়ারি, ভবানীপুরে তাঁর নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ করেন এবং পরিবারের মহিলারা এডওয়ার্ডকে অভ্যর্থনা ও বরণ করেন। এর ফলে কলকাতায় হুলস্থুল পড়ে গেল। ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েদের পরপুরুষ এবং তাও আবার বিদেশির সামনে হাজির করাটা বাঙালি ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের নীতিবোধের বিরোধী বলে বিবেচিত হয়েছিল। অবশ্য ১৮৬০-এর দশকে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সিভিলিয়ন' হয়ে বিলেত থেকে ফিরে এসে নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সকলের চোখের সামনে দিয়ে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল থেকে রাস্তায় নেমেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের পরিমণ্ডলের বিলেতি সাহেব-মেমসাহেবরা বাঙালি ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছেন ইতিমধ্যে। তাই এডওয়ার্ডের সামনে অন্দর-মহলের মহিলাদের পর্দা উন্মোচন একটা অভাবনীয় ঘটনা ছিল না। কিন্তু কলকাতার বাঙালি সমাজ ক্ষুব্ধ হয়েছিল জগদানন্দের বেহায়াপনায়; যুবরাজকে খুশি করবার জন্য সবকিছু উন্মুক্ত করে দেওয়ার আগ্রহাতিশয্যটা বড়ো চোখে লেগেছিল। এই নির্লজ্জ খোশামুদির প্রতিবাদ করতে গিয়ে কিন্তু ভদ্রলোকেরা ক্রমেই পর্দানশিন প্রথার স্বপক্ষে ঝুঁকতে শুরু করলেন। সমসাময়িক বিলেতি পত্রপত্রিকা থেকে হয়তো শিক্ষিত বাঙালিরা এডওয়ার্ডের নারীঘটিত কীর্তিকলাপের কথা আঁচ করতে পেরেছিলেন। এইরকম খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তির সামনে ঘরের মেয়েদের উপস্থিত করার ইঙ্গিত কী, তা হয়তো সে যুগের অনেক ওয়াকিবহাল বাঙালিই বুঝতে পেরেছিলেন, যদিও মুখ ফুটে বলার সাহস হয়নি কারও, রাজরোষের ভয়ে। সুতরাং প্রতিবাদ করতে গিয়ে তাঁরা

হিন্দু স্ত্রীদের অবরোধ প্রথার সীমা লঙঘনের অনুযোগটাই বড়ো করে তুললেন; ধর্মে আঘাতের জিগির তুলে জনমত গঠনের প্রয়াসী হলেন। ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে বাঙালি সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সম্পর্কের ইতিহাসে, জাতীয়তাবাদের উন্মেষের এই প্রাথমিক স্তরে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রশ্নটি প্রথম বলি হয়েছিল বলে মনে হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রশ্নে বাঙালি শিক্ষিত সমাজে যে তর্ক-বিতর্ক, পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ ছিল, তা এ শতকের শেষার্ধে ক্রমশই পিছু হটে যাচ্ছিল।

জগদানন্দের সংবর্ধনা উৎসবের পর, সে-যুগের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্ররূপে খ্যাত *অমৃতবাজার পত্রিকা* বাঙালি ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের মনের কথাটা প্রকাশ করে এই ভাষায়: "হিন্দু সমাজ সকল নিষ্পীড়নই সহ্য করিতে পারে, কিন্তু হিন্দু পরিবারের উপর কোনরূপ আঘাত হইলে উহা সহ্য করিতে পারে না। আমরা সর্বস্বচ্যুত হইয়াছি...আমাদের থাকিবার মধ্যে হিন্দু পরিবার আছে, আমাদের গৌরবস্থান এই পরিবার। এই পরিবারে যাহাতে কলঙ্ক হয় এরূপ কার্য যিনি করেন তিনি হিন্দু জাতির পরম শত্রু, হিন্দু সমাজের কলঙ্ক।..."[৩৩]

পিতৃতান্ত্রিক হিন্দু পরিবার সনাতনী শুদ্ধতা বাঙালি জাতীয়তাবোধের একটা প্রতীক হিসাবে জাহির করা হল। এই পারিবারিক ঐতিহ্যকে অপবিত্র করার অপরাধে দোষী জগদানন্দ এবং এ দোষের অংশভাগী তাঁর পরিবারস্থ মহিলারাও। সুতরাং সমাজের দণ্ড তাঁদেরও প্রাপ্য। "...আমাদের বিবেচনায় তিনি (জগদানন্দ) যে গর্হিত কার্য করিয়াছেন তাহাতে যদি হিন্দু সমাজ বলেন যে, তুমি হিন্দু সমাজ হইতে স্থগিত হইলে, যে কুলকামিনীরা যুবরাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাদের স্বামীগণ যদি তাহাদিগকে বলেন যে—তোমাদিগকে আমরা আর গৃহে লইতে পারি না তাহা হইলে হিন্দু সমাজ কি কামিনীগণের স্বামীদের প্রতি, কেহ কোন দোষারোপ করিত পারেন না।..."[৩৪]

লক্ষণীয়, যে স্ত্রীদের পরিত্যাগ করার যুক্তি খাড়া করে, লেখক কিন্তু এই সমস্ত ঘটনার নায়ক বা নাটের গুরু, যুবরাজ এডওয়ার্ড সম্বন্ধে অদ্ভুতরকম ক্ষমাশীল। "যুবরাজ আমাদের শিরোধার্য, তাঁহাকে আমরা ধন, প্রাণ সর্বস্ব দিয়া অর্চনা করিতে পারি, কিন্তু হিন্দু জাতির নিকট পরিবারের তুল্য কিছুই নাহি..."।[৩৫] এ সেই চিরাচরিত বাঙালি বাবুদের স্বভাব—বাইরে অপমানিত হয়ে ঘরে ফিরে এসে বৌ-এর উপর চোটপাট।

এডওয়ার্ডের কলকাতা ত্যাগের পরও জগদানন্দ-পর্বের জের বেশ কিছুদিন চলেছিল। জগদানন্দ ছিলেন উকিল। সুতরাং কলকাতা হাইকোর্টের বাঙালি উকিলমহল তাঁর উপর একহাত নিতে বদ্ধপরিকর হলেন। জগদানন্দের সহকর্মী, সরকারি উকিল অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আচারনিষ্ঠ হিন্দু। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও (১৮৩৮-

১৯০৩) তখন ওকালতি করছেন। অন্নদাপ্রসাদ হেমচন্দ্রকে বলেন, "হেম, তুই এই নিয়ে একটা কিছু লেখ না।" এই অনুরোধ ও উত্তেজনার ফলে হেমচন্দ্র 'বাজিমাৎ' নামে একটি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন, যেটি ১৮৭৬-এর ২০ জানুয়ারির *অমৃতবাজার পত্রিকা*-য় বেনামে ছাপা হয়।[৩৬]

'বাজিমাৎ'-এর উপলক্ষ জগদানন্দ হলেও, কবিতাটির সুদীর্ঘ ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনায় বিদ্রূপবাণের মূল লক্ষ্য, জগদানন্দের অন্দরমহলের মহিলারা, এবং বঙ্গীয় মহিলা সমাজ। অন্তঃপুরের মহিলাদের সম্বোধন করে বলা হচ্ছে,

আর কেন লো ঘোমটা খোল, কবির কথা রাখো,
'লাইট' পেয়ে 'রাইট' হয়ে পার হও লো সাঁকো।
ভয় কি ততে লজ্জা কি তায়, কাল বদনখানি
দেখবে খালি চক্ষে চেয়ে যুবা নৃপমণি।
কব্জা তুলে দেখবে বাজু, দেখবে কানের দুল,
দেখবে কণ্ঠি, কণ্ঠহার পিঠের ঝাঁপা ফুল।

তার পর, সারা বাংলাদেশের গৃহিণীরা তাঁদের স্বামীদের উত্ত্যক্ত করছেন—জগদানন্দের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারার জন্য,

জজের গৃহিণী কন 'ভ্যালা জজিয়তি'
নামে শুধু অনারেব্‌ল পদ বিলায়তি?
কুঠি নিলে বাড়ি ছেড়ে সাহেব পাড়ায়—
তোমার কোর্টের উকিল তোমাকে হারায়।
....
পোনা, পুঁটি, খয়রা, চেলা গিন্নী আর যত
পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়ান সে কত।[৩৭]

উল্লেখযোগ্য, এই হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ই ১৮৮৭-তে ভিক্টোরিয়ার 'জুবিলি' উৎসব উপলক্ষে 'ভারতেশ্বরী মহারানী' কবিতা রচনা করে লেখেন—

এ মহা উৎসবে হে ভুবনেশ্বরী
কি দিয়ে পূজিব আর,
দিনু অর্ঘ্য, লহ ভক্তিবিমিশ্রিত
চির কৃতজ্ঞতা হার!
আজি কি আনন্দবাসর।[৩৮]

তিন বছর পরে হেমচন্দ্র প্রধান সরকারি উকিল নিযুক্ত হন।

'বাজিমাৎ' প্রকাশের কিছু পরেই, ১৮৭৬-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি, 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার', বর্তমান 'মিনার্ভা' থিয়েটার যেখানে, ঐখানে *গজনানন্দ* ও *যুবরাজ* নামে একটি প্রহসন মঞ্চস্থ করে। তাতে জগদানন্দর সংবর্ধনা উৎসবের হাস্যকর অনুকরণ করে সমস্ত ঘটনাটিকে ব্যঙ্গ করা হয়। এ নাটকেও, যুবরাজকে ররণরতা মহিলাদের মুখে একটি গান দেওয়া হয়েছিল; তার অংশবিশেষ,

ওলো ঘুরতে পারি নে আর ধরে গিয়েছে পা
কেন গায়ে পড়িস ঢলে ওলো সরে যা
হাতে নিয়ে ঝাড়ি চলতে কি পারি
একটু থেমে চল্ ওলো ঘেমে গিয়েছে গা।[৩৯]

এই প্রহসনের দ্বিতীয় অভিনয় হবার সময়—ফেব্রুয়ারি ২৩ পুলিশ বন্ধ করে দেয়। তিন দিন পরে (ফেব্রুয়ারি ২৬) প্রহসনটি নাম পালটে, *হনুমান চরিত্র* নামে অভিনীত হয়। প্রহসনটির আসল লিখিত প্রতিলিপি এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে, সমসাময়িক বিবরণী থেকে জানা যায় যে এডওয়ার্ডকে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পুত্র ও জগদানন্দকে হনুমানরূপে দেখানো হয়েছিল। যাই হোক, এই দ্বিতীয় অভিনয়ও পুলিশে বন্ধ করে দেয়, এবং এর কিছুদিন পরে— ২৯ ফেব্রুয়ারি বড়োলাট নর্থব্রুক এক ordinance জারি করে 'কুৎসাপূর্ণ, মানহানিকর, সরকার-বিরোধী, অশ্লীল বা জনস্বার্থপরিপন্থী' নাটক বন্ধ করার ক্ষমতা ঘোষণা করলেন। 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' এর জবাবে *The Police of Pig and Sheep* (তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার স্টুয়ার্ট হগ্ ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট ল্যাম-এর নামের ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণে) প্রহসনটি মঞ্চস্থ করে। ৪ মার্চ, ১৮৭৬-এ যখন উপেন্দ্রনাথ দাশের *সুরেন্দ্র বিনোদিনী*-র সঙ্গে প্রহসনটি অভিনীত হচ্ছিল, তখন পুলিশ এসে উপেন্দ্রনাথ-সহ নাট্যকার অভিনেতা অমৃতলাল বসু ও আরো ছয়জন অভিনেতাকে ধরে নিয়ে যায়। হাইকোর্টে আপিলে অবশ্য এঁরা সবাই ছাড়া পান এবং *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী*-র বিরুদ্ধে পুলিশের অশ্লীলতার অভিযোগ বাতিল হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে, উপেন্দ্রনাথ দাশ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। সে-যুগের নামকরা উকিল শ্রীনাথ দাশের জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনাথ ছিলেন নব্যউন্মেষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ঘোরতর জঙ্গি মনোভাবাপন্ন এবং অতীতের 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর সমাজ-সংস্কারের ঐতিহ্যের ধারাবাহক। নিজে বিধবা বিবাহ করে এবং অভিনেত্রী গোলাপের সঙ্গে সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক বঙ্গ-সন্তানের বিবাহ দিয়ে, তিনি সমসাময়িক 'ভদ্রলোক' সমাজের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। আবার তাঁর *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী* নাটকে কেবল লম্পট ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হননি; তাঁর নায়ককে দিয়ে শ্বেতাঙ্গ

আমলাকে প্রহারের দৃশ্যের অবতারণা করে উপেন্দ্রনাথ ইংরেজ শাসকবর্গের চক্ষুশূল এবং অতি-সাবধানী বাঙালি ভদ্রলোক সমাজের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও দাবি আদায়ের অভিযানে আগ্রহী হলেও, ভদ্রলোক সমাজ তাকে মারামারির পর্যায়ে নিয়ে যেতে রাজি ছিলেন না।

যাই হোক, এর পরেই সরকারের তরফ থেকে একটি নাট্য-নিয়ন্ত্রণ বিল আইন সংসদে উত্থাপিত হয় এবং কয়েক মাস বিতর্কের পর Dramatic Performances Control Act of 1876 আইন রূপে পাস হয়।

নর্থব্রুকের ordinance এবং প্রস্তাবিত নাট্য-নিয়ন্ত্রণ বিলটি নিয়ে তখনকার দিনের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ও জনসভায় যে-সব আলোচনা হয়, তাতে এডওয়ার্ডের কলকাতা ভ্রমণ, জগদানন্দের সংবর্ধনা, *গজদানন্দ* প্রহসন ও ইংরেজ সরকার—এই-সব প্রসঙ্গে কলকাতার বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের নরম-গরম প্রতিক্রিয়ার একটা বিচিত্র ছবি বেরিয়ে আসে।

বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকেই *জগদানন্দ* প্রহসনটি ভালো চোখে দেখেননি। *ভারত-সংস্কারক* পত্রিকা এ বিষয়ে কড়া মন্তব্য করে বলে, "এখন ইংরাজ রাজ্যে বাস করিয়া অভিনয়স্থলে ইংরাজ রাজত্বের বিরুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করা হইবে, যুবরাজকে জঘন্যভাবে প্রদর্শন করা হইবে, গভর্নমেন্টের কথা দূরে থাকুক, ভদ্ররুচিসম্পন্ন কোন ব্যক্তিরই ইহা সহ্য হইতে পারে না...।"[৪০] পরে প্রহসনটির অভিনয় পুলিশে বন্ধ করে দিলে ঐ পত্রিকাটিই আবার লেখে, "(গ্রেট) ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্য জগদানন্দ এবং যুবরাজ নামক যে ইতর রুচির নাটক প্রস্তুত হয়, পুলিশের রক্তচক্ষু দেখিয়া নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ তাহা অভিনয় করিতে ক্ষান্ত হন।"[৪১]

নাট্য-নিয়ন্ত্রণ অর্ডিনান্স-এর ঘোষণার পর, তার প্রতিবাদে কলকাতার বাঙালি ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের যে জনসভা ১৮৭৬-এর ৪ এপ্রিল বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের ভবানীপুরের বাড়িতে হয়, তাতে যদিও প্রস্তাবিত আইনটির বিরোধিতা করা হয়, *জগদানন্দ* প্রহসনটি সম্বন্ধে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় 'a single farce condemned by the general sense of the community' (সারা সম্প্রদায়ের সাধারণ বিচারে নিন্দিত একটি প্রহসন)।[৪২]

বাঙালি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই ব্যগ্র ছিলেন সরকারকে সুনিশ্চিত করতে যে প্রহসনটিতে জগদানন্দকে ব্যঙ্গ করলেও, যুবরাজের প্রতি কোনো অশালীন উক্তি করা হয়নি। সে-যুগের জাতীয়তাবাদী পত্রিকা *Mokerjee's Magazine*-এ প্রাণনাথ পণ্ডিত (শম্ভুনাথ পণ্ডিতের পুত্র ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) লেখেন—"...লক্ষ্য করা যেতে পারে

যে অভিযুক্ত ব্যক্তি ঘোর কৃষ্ণবর্ণে প্রহসনটি অঙ্কিত করলেও মহামান্য ওয়েল্‌সের যুবরাজের প্রতি অসম্মানজনক কোনো উক্তি বা ঐ ধরনের কোনো অভিপ্রায় এ নাটকে পাওয়া যায় না। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে আমাদের অতিথিকে অকারণ অসম্মান দেখনোর কোনো উদ্দেশ্য এতে একেবারেই ছিল না।"[৪৩]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইনটির বিরুদ্ধে কলকাতার জমিদার শ্রেণি নিয়ন্ত্রিত 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন' পর্যন্ত প্রতিবাদমুখর হয়েছিল। একটি সুদীর্ঘ স্মারকপত্রে তারা বলে যে প্রচলিত আইনের সাহায্যেই মানহানিকর বা সরকার-বিরোধী অপবাদের মোকাবিলা করা যায়; আলাদা করে নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োজন নেই। বরং এই ধরনের নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন পাস হলে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি ক্ষুণ্ণ হবে।[৪৪]

সচরাচর ইংরেজ সরকারের প্রতি অনুগত 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন'-এর এই ধরনের বিরূপ সমালোচনার একটা কারণ অনুমান করা যায়। মনে রাখা দরকার, উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা থিয়েটারের জন্মলগ্নে, এই নতুন শিল্পমাধ্যমের পৃষ্ঠপোষকেরা ছিলেন পাইকপাড়ার সিংহ, পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-পরিবার ও সিমলের দে পরিবারের মতো কলকাতার প্রাচীন জমিদার-মুৎসুদ্দি-বেনিয়ান সম্প্রদায়। সুতরাং নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইনকে তাঁরা তাঁদের সযত্নপালিত আমোদ-প্রমোদের উপর আঘাত বলে মনে করেছিলেন। উনিশ শতকের সপ্তম ও অষ্টম দশকে নাটকের রঙ্গমঞ্চ মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীরা এসে অধিকার করে নিলেও এই পুরোনো অভিজাতবর্গ তখনও নাট্যাভিনয়ের ব্যাপারে সমান উৎসাহী। মধ্যবিত্তদের 'ন্যাশনাল থিয়েটার', এবং (পরে তা ভেঙে) 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর পাশাপাশি, 'বেঙ্গল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত করেন সিমলের আশুতোষ দে-র দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ। স্ত্রী ভূমিকায় অভিনেত্রী নিয়ে সর্বপ্রথম নাটক মঞ্চস্থ করার দাবি করে 'বেঙ্গল থিয়েটার' ১৮৭৩-এ মাইকেলের *শর্মিষ্ঠা* নামিয়ে। (যদিও এর অনেক আগে ১৮৩১ সালে নবীনচন্দ্র বসুর তত্ত্বাবধানে *বিদ্যাসুন্দর* নাটকে অভিনেত্রী নিয়ে নাটক করা হয়েছিল; কিন্তু সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রচণ্ড বিরূপ সমালোচনার পর পুনর্বার আর চেষ্টা করা হয়নি)। শরৎচন্দ্র ঘোষের 'বেঙ্গল থিয়েটার' ইংরেজ শাসকবর্গের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রাখতে উন্মুখ ছিল। ১৮৭৮-এর ২১ জানুয়ারি তাদনীন্তন ভাইসরয় লর্ড লিটন ও তাঁর স্ত্রী 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এর *শকুন্তলা* নাটক দেখতে আসেন। পরবর্তী যুগে, রাজভক্তির নিদর্শনস্বরূপ এই নাটকের দলটি নিজেদের 'রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার' নামে নতুন নামকরণ করে।

যুবরাজ এডওয়ার্ডের কলকাতা ভ্রমণ যেমন বাঙালি সমাজকে আলোড়িত করেছিল, সে-যুগের কলকাতানিবাসী ইংরেজ সমাজের মধ্যেও তর্ক-বিতর্কের ধূম্রজাল সৃষ্টি করেছিল। এডওয়ার্ডের স্বভাবসিদ্ধ হই-হুল্লোড়ের প্রবণতা অনেক সময়ই ইংরেজ সরকার বড়ো একটা মাথা ঘামায়নি; কারণ সেটা ছিল 'নেটিভ'দের ঘরোয়া ব্যাপার। কিন্তু কলকাতার ইংরেজ সমাজে এডওয়ার্ডের আচরণবিধি তদানীন্তন কঠোর ভিক্টোরীয় নীতিবোধের মাপকাঠিতে বিচার হয়েছিল। কলকাতার যুবরাজের জন্য বিরাট ভোজসভার আয়োজন করেন লেডি ক্লার্ক, যাতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন শহরের হোমরাচোমরা ইংরেজরা। এই সরকারি নিয়মনিষ্ঠ ভোজসভায় হঠাৎ এডওয়ার্ড নিমন্ত্রিত করলেন একটি অভিনেত্রীকে—Lizzie Mathews—যিনি ঐ সময় তাঁর স্বামী Charles Mathews-এর সঙ্গে কলকাতার ইংরেজি পাড়ায় *My Awful Dad* নামে এক প্রহসনে অভিনয় করছিলেন। নৈশভোজের পর যুবরাজ Lizzie-কে নিয়ে বারান্দায় বসে "ভোর দুটো পর্যন্ত ধূমপান ও ঠাট্টা-তামাসায় সময় কাটালেন—আর ততক্ষণ ধরে নিমন্ত্রিত সরকারি অতিথিরা অধৈর্য হয়ে ঈর্ষান্বিত ক্ষিপ্তাবস্থায় অপেক্ষা করতে লাগলেন; যুবরাজের বিদায় গ্রহণের আগে তাঁরা কেউ যদি বিদায় নেন সেটা অসম্মানজনক হতে পারে এই ভেবে। কলকাতার ইংরেজ সমাজ এ ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল।"[৪৫]

যুবরাজের কলকাতা ত্যাগের পর *জগদানন্দ* প্রহসন অভিনয়ের ব্যাপারে কিন্তু সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কলকাতার ইংরেজরা একযোগে মারমুখী হয়ে ওঠে। এডওয়ার্ডের আগমনের আগে থেকেই কলকাতার রঙ্গমঞ্চে যে-ধরনের ইংরেজ-বিরোধী নাটক (*চা-কর দর্পণ* বা গায়েকোয়াড়ের সিংহাসনচ্যুতি বিষয়ক নাটক) অভিনীত হচ্ছিল এবং যে নব্য-উন্মেষিত জাতীয়তাবোধের পটভূমিকায় এই ধরনের নাটকগুলি রচিত হচ্ছিল, সে বিষয়ে ইংরেজ সরকার গোড়া থেকে সতর্ক ছিল। ১৮৭৫-এ প্রস্তাবিত নাট্য-নিয়ন্ত্রণ বিল তার নিদর্শন।

জগদানন্দ প্রহসন ইংরেজ সরকারকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায় এবং নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইনটি অবশেষে পাস হয়। (উল্লেখযোগ্য যে, একটা সামান্য প্রহসনকে কেন্দ্র করে যে আইনের সূত্রপাত, তা স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষেও বলবৎ থেকেছে)। এই ধরনের নাটকের ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সে সম্বন্ধে তদানীন্তন বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর রিচার্ড টেম্পল্ বেশ একটা সাদামাঠা মূল্যায়ন দেন, "এ কথা বলা যেতে পারে যে কলকাতা এবং বঙ্গভূমিতে এ ধরনের বইয়ের রাজনৈতিক প্রভাব খুবই কম আর এর প্রভাবে কোন রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে সে-কথা আমি বলি না। এত লঘু কারণে ভয়ের উদ্রেক ঠিক নয়, আর এ ধরনের প্রকাশনার সঙ্গে

ভয়কে যুক্ত করলে তা বাড়াবাড়ি না হয়ে যায় না। অন্য দিকে রসগ্রাহী, সংবেদনশীল ও দ্রুত ভাব গ্রহণে সমর্থ বাঙালি দর্শক-সমাজকে রাতের পর রাত ব্রিটিশের নিন্দা অপবাদ শুনতে দেওয়া সুবুদ্ধির কাজ হবে না। সমাজে বয়স্ক ব্যক্তিরা হয়তো কুশক্তির প্রভাবে সহজে বিচলিত হন না, কিন্তু উঠতি বয়সের তরুণদের মধ্যে এর বদ প্রভাব সহজেই দাগ কাটে।...বাংলায় এ ধরনের বদ নজির একবার দানা বাঁধলে থামানো মুশকিল হবে। হয়তো এ ঝঞ্ঝাট ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়ে বড় ধরনের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া শুরু হতে পারে।''[৪৬]

নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করেও এ 'প্রতিক্রিয়া' ঠেকানো যায়নি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই, জাতীয় আন্দোলনে, বাঙালি ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের 'উঠতি বয়সের তরুণ' বিপ্লবীরা সশস্ত্র উপায়ে ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের পরিকল্পনায় পা বাড়িয়েছিলেন।

উপসংহার

অবশ্য ১৮৭৫-৭৬ সালে, ইংরেজ যুবরাজের ভারত পরিভ্রমণে, অর্থ অপচয়ের সমালোচনা করে কলকাতায় যে বাঙালি ভদ্রলোকেরা খবরের কাগজে লেখালেখি করেছিলেন, বা জগদানন্দের বেহায়াপনা নিয়ে রঙ্গমঞ্চে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেছিলেন, তাঁরা তখনও ভাবতে পারেননি তাঁদের এই-সব কাজকর্মের ফল কোথায় গিয়ে গড়াবে। ইংরেজের মৃদু সমালোচনা যেন তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়— এইটেই ঐ সময় তাঁদের কাছে ছিল মূল চিন্তা। এই বিষয়ে স্থির নিশ্চিত হবার জন্যই প্রায় প্রতি পদক্ষেপে ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে আশ্বস্ত করতে তাঁরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। প্রচলিত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই তাঁদের শ্রেণিস্বার্থের অগ্রগতি হবে, এই বিশ্বাসে স্থির ছিলেন বলেই, তাঁরা ইংরেজ রাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ সমালোচনা থেকে বিরত ছিলেন খুব সচেতনভাবেই।

সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রতিযোগিতায়, ইংরেজ সরকারের প্রশংসাপত্র বা পুরস্কার এঁদের প্রয়োজনীয় ছিল। তাই ইংরেজের অমিতাচারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েও মন্ত্রপাঠের মতো যোগ করতে হত, মহারানী বা মহামান্য যুবরাজের কর্ণগোচর হলে নিশ্চয়ই এ অমিতাচার বন্ধ হবে। ফলে, সরকারি উকিলের বা বিচারপতির পদে পদোন্নতি বা রায়বাহাদুর খেতাব গ্রহণে এঁদের কোনোদিনই কোনো অসুবিধা হয়নি। স্মরণীয়, *নীলদর্পণ* নিয়ে অত হইচই-এর পরও দীনবন্ধু মিত্র রায়বাহাদুর হয়েছিলেন। ১৮৭৬-তে *বাজিমাৎ* লিখেও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি উকিলের পদে উন্নতিলাভ করেছিলেন পরবর্তী জীবনে।

আর, যুবরাজের কলকাতা ভ্রমণ উপলক্ষে যাঁরা জঙ্গি জাতীয়তাবাদী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই পরে চুপ করে যান। *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী*-র নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাশ, নাট্য-নিয়ন্ত্রণ বিল পাস হবার পর বিলেত চলে যান। প্রায় বারো বছর পরে দেশে ফিরে এসে তিনি আবার নাটক লেখেন। তিনি তখনও প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারে অটল বিশ্বাসী। কিন্তু তাঁর *দাদা ও আমি* (১৮৮৮) নাটকে স্ত্রী-স্বাধীনতার স্বপক্ষে সদর্প প্রচার, তখনকার মধ্যবিত্ত বাঙালি দর্শক-সমাজ সুস্থ মনে মেনে নিতে পারেনি। ফলে, সে নাটক চলেনি। 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর আর একজন মধ্যমণি অমৃতলাল বসু, *গজদানন্দ* নিয়ে বিভ্রাটের পর, কলকাতা ছেড়ে চলে যান পোর্ট-ব্লেয়ারে—পুলিশের চাকরি নিয়ে। পরে অবশ্য ফিরে এসে অমৃতলাল আবার অভিনয়-জগতে ঢোকেন। কিন্তু এবার অনেক সাবধান হয়ে নাটক নামান। বঙ্কিমচন্দ্রের *চন্দ্রশেখর* মঞ্চস্থ করতে গিয়ে পুলিশ কমিশনারের কাছে গিয়ে অমৃতলাল তাঁকে বোঝান যে ফস্টারকে অত্যাচারী রূপে দেখানো হচ্ছে না; বরং শৈবলিনীই গোপনে পত্র দিয়ে ফস্টারের দ্বারা নিজেকে হরণ করাচ্ছে। ফস্টারের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নাটকে তোলা হবে না। এত সত্ত্বেও অবশ্য *চন্দ্রশেখর* অভিনয়ের অনুমতি মেলেনি।[৪৭] তবে এঁদের মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক পরিবর্তন, *অমৃতবাজার পত্রিকা*-র দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী সম্পাদক শিশির কুমার ঘোষের। রাজনীতির আসর ছেড়ে তিনি একেবারে ধর্মের কোলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। ইংরেজ সরকারের অবিচার প্রতিরোধের সংকল্পে যে অদম্য উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, সেই একই উৎসাহ পুরোপুরি ঢেলে দিলেন বৈষ্ণব ধর্মের ধ্যানে ও প্রচারে।

টীকা

১. *বসন্তক*, ১৮৭৬, পৃ. ৯৪
২. Christopher Hibbert, p. 125.
৩. দ্রষ্টব্য ঐ।
৪. Anita Leslie, p. 14.
৫. Michael Brander, p. 119.
৬. Anita Leslie, p. 66.
৭. ঐ p. 67.
৮. দ্রষ্টব্য—Charles Booth.
৯. দ্রষ্টব্য—Donald Read.

১০. দ্রষ্টব্য—Gillian Avery.
১১. Christopher Hibbert, p. 126.
১২. ঐ, p. 127.
১৩. ঐ,
১৪. ১৮৭৬-এর কলকাতার আদমসুমারি।
১৫. *সুলভ সমাচার*, ৮ই অগ্রহায়ণ ১২৭৭।
১৬. *বসন্তক*, ১৮৭৫।
১৭. বরদাপ্রসাদ রায়, 'কোথা মা ভিক্টোরিয়া?', ফরিদপুরের আড়কান্দি-নিবাসী কুমুদরঞ্জন রায়ের *দিনলিপি* (অপ্রকাশিত) থেকে সংগৃহীত।
১৮. *মধ্যস্থ*, কার্তিক। ১২৮০।
১৯. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ৮৬।
২০. প্যারীমোহন কবিরত্ন, 'বিশ্বসঙ্গীত', (বৈষ্ণবচরণ বসাক), পৃ. ৪৬২-৬৩।
২১. Pradip Sinha, p. 109.
২২. এর ফলস্বরূপ, বাংলাদেশের জটিল ভূমি-ব্যবস্থা উদ্ভূত মামলা-মোকদ্দমার সুযোগ নিয়ে শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণির মোক্তার, উকিল, ব্যারিস্টার সে-যুগের বাঙালি সমাজে প্রবল প্রতাপশালী হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এঁরাই পরবর্তী যুগে রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।
২৩. Christopher Hibbert, p. 127.
২৪. ঐ, উল্লেখ করা দরকার এর আগের বছরে ১৮৭৩-৭৪ বাংলা-বিহার, অযোধ্যার ব্যাপক দুর্ভিক্ষে লক্ষাধিক মানুষ মারা যায়।
২৫. *অমৃতবাজার পত্রিকা*, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫।
২৬. ঐ। ৪ঠা ভাদ্র, ১২৮২।
২৭. *সংবাদ প্রভাকর*, ১১ই ভাদ্র, ১২৬১। বিনয় ঘোষ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৮১।
২৮. *প্রিন্স অফ ওয়েল্‌সের ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত*, গুপ্ত প্রেশ, পৃ. ৫৪। জয়ন্ত গোস্বামী, পৃ. ১২১৫-১৬।

ঐ সময় যুবরাজের ভ্রমণ-বিষয়ক বহু পুস্তিকা বটতলা থেকে ছাপা হয়েছিল। কমপক্ষে দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা—খুব সম্ভবত ঐ বিশেষ উপলক্ষে দু-এক সপ্তাহের জন্য বার হয়েছিল। প্রথম, 'যুবরাজের ভ্রমণ বিবরণ, ৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৮২'; দ্বিতীয়, 'ভাবী সম্রাটের ভারত ভ্রমণ।' ১০ই ডিসেম্বর, ১৮৭৫। প্রথম পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন আহিরীটোলার রাধামাধব হালদার; সরকারি গেজেটের বাংলা অনুবাদ ছাপাতেন। দ্বিতীয় জন ছিলেন গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'যৌবনে যোগিনী' রচয়িতা। উভয় পত্রিকারই উদ্দেশ্য ছিল রাজভক্তির প্রচার অবশ্য, কলকাতার এই আলোকসজ্জা নিয়ে সাধারণ মানুষের ঠাট্টা মশকরামূলক গানেরও সন্ধান পাওয়া যায়। বসন্তক পত্রিকায় (১৮৭৬) প্রকাশিত বাউল সুরে গীত একটি গানের কিছু অংশ,

আলো করে এলেন যুবরাজ এ কলকাতায়
সে শোভা আমি কহিব কায়।

দেখ আলো হলো কত, এল রাজা যত,
তবু তো (প্রজার) মনের আঁধার না যায়।
দেখ যদি হতো পতি, প্রজাদের মতি,
পরম প্রফুল্ল হতো ধরায়।
বলি তাই সুনিশ্চয়, এ ত পতি নয়,
এরে উপপতি বলছে সবায়।

২৯. *বসন্তক*, ১৮৭৬, পৃ. ৯৫-৯৬।
৩০. ঐ, পৃ. ১০১।
৩১. The Uncrowned King of Matiabruj in Muslim Institute Review, July-September 1905'
৩২. এই উদ্দেশ্যেই ১৮৭৯ সালে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নামজাদা ব্যারিস্টার লালমোহন ঘোষকে ইংলন্ডে পাঠান।
৩৩. *অমৃতবাজার পত্রিকা*, ২৩শে পৌষ ১২৮২।
৩৪. ঐ।
৩৫. ঐ।
৩৬. মন্মথনাথ ঘোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪-২৮।
৩৭. *হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৬-৩৭।
৩৮. ঐ, পৃ. ১০২। হেমচন্দ্রের ভিক্টোরিয়া প্রশস্তির পাশাপাশি, একটি পল্লীকবির চোখে 'জুবিলি'র চেহারা কী ভাবে দেখা দিয়েছিল তার নিদর্শন,

সবে মিলি শুন বলি জুবিলীর কথা
সে যে কি অধর্ম শুনে মর্ম পাবে মর্মব্যথা।
কলির তো বিচার ভারী বলিহারি শুন সে কাহিনী,
এবার পঞ্চাশ বর্ষ ভারতবর্ষ পাললেন মহারাণী।
ভারতে ঘটাভারী মহামারী।

...

গরিবের এত দুঃখের অন্ন মুখের বুকের রক্তের কড়ি
এনে গানেরই দল হলো কেবল আমোদ ছড়াছড়ি।

(তারাপ্রসন্ন রায়। ফরিদপুরের আড়াকান্দি-নিবাসী কুমুদবন্ধু রায়ের অপ্রকাশিত *দিনলিপি* থেকে সংগৃহীত)

৩৯. গানটির রচয়িতা নাট্যকার গিরিশ ঘোষ বলে শোনা যায়। উদ্ধৃত : প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য, পৃ. ৩৪১০।

৪০. *ভারত সংস্কারক*—১৮ই পৌষ, ১২৮১। এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন সমাজ-সংস্কারক ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রবক্তা উমেশচন্দ্র দত্ত, যিনি পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহ-সম্পাদক হয়েছিলেন। উমেশচন্দ্র শিক্ষিত বাঙালি নারী সমাজের জন্য প্রকাশিত *বামাবোধিনী* পত্রিকারও সম্পাদনা করতেন।

৪১. *ঐ*, মার্চ ৩, ১৮৭৬

৪২. *Hindu Patriot*; April 10, 1876

৪৩. The Dramatic Performances Bill, দ্রষ্টব্য, *Mookerjee's Magazine* Vol 5, Nos 36 to 40. January to June, 1876. Alok Ray, p. 221। মধ্য ভারতের কোনো এক সাংবাদিক ঐ সময় যুবরাজ এডওয়ার্ড-এর ভারত পরিভ্রমণ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছিলেন, জোঁকের মতো ভারতবর্ষের রক্ত শুষবার জন্য তিনি এদেশে এসেছেন। প্রাণনাথ পণ্ডিত তাঁর উক্ত প্রবন্ধে এর প্রতিবাদ করে বলেন ঐ সাংবাদিক 'better qualified to suffer the birch'; অর্থাৎ প্রহারের উপযুক্ত। পূর্বোক্ত, pp. 212-13.

৪৪. প্রতিভা বিশ্বাস, পৃ. ১৯১-৯২।

৪৫. Christopher Hibbert, p. 133.

৪৬. প্রতিভা বিশ্বাস, পৃ. ১৩৩ উদ্ধৃতি অনূদিত।

৪৭. অরুণকুমার মিত্র, পৃ. ১৭৫-৭৬।

মানুষ চলে কলের বলে
বাঙালি জনচেতনায় রেলগাড়ির আবির্ভাব

সূচনা

ঔপনিবেশিক আমলে, ভারতবর্ষে রেলপথ নির্মাণ ও রেলগাড়ি চালুর ইতিহাস নিয়ে বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ধারা বেয়ে এক বৃহদায়তন তথ্য ও তত্ত্বের ধনভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। আমরা জানতে পেরেছি, রেলপথ নির্মাণ—অর্থাৎ রেললাইন পাততে গিয়ে পুরোনো আমলের জলপথ ব্যবস্থা কীভাবে বিনষ্ট হয়, ও তার ফলে ম্যালেরিয়া মহামারী রূপে এ-দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ-ও জানতে পারি, বীরভূম অঞ্চলে রেলপথ স্থাপনের সময় রেলওয়ের ইংরেজ কনট্রাক্টর ও ইন্‌স্পেকটারদের অত্যাচার কীভাবে সাঁওতাল বিদ্রোহের ইন্ধন জোগায়। পাশাপাশি রেলপথ বিস্তারের ফলে এ-দেশের দূরদূরান্তের মানুষের মধ্যে সহজ যোগাযোগ স্থাপনকে অভিনন্দন জানিয়ে অসংখ্য রচনা বের হয়েছিল তৎকালীন বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লেখকদের হাত থেকে।

এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় কার্ল মার্কসের সেই বিখ্যাত ভবিষ্যদ্‌বাণী, ভারতবর্ষে রেলওয়ের প্রবর্তন উপলক্ষে—"আমি জানি, ইংরেজ শিল্পপতিরা ভারতবর্ষকে রেলওয়ে ব্যবস্থা দ্বারা সমৃদ্ধ করতে চাইছে, নিজেদের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্পাস তুলা ও অন্যান্য কাঁচা মাল সস্তা দরে ও-দেশ থেকে নিয়ে আসার একমাত্র উদ্দেশ্যে..."।[১] কিন্তু, এই আশু উদ্দেশ্য-পূরণের ঊর্ধ্বে রেলওয়ে যে এক ব্যাপক শিল্পায়নের হাতিয়ার

রূপে ভারতবর্ষে উদ্ভুত হচ্ছে, তা মার্কস ধরতে পেরেছিলেন যখন লিখেছিলেন—"রেলওয়ে ব্যবস্থা তাই ভারতবর্ষে যথার্থ রূপেই আধুনিক শিল্পসংস্থার অগ্রদূত বলে পরিগণিত হবে।" রেলওয়ে-ব্যবস্থা ভারতবর্ষে বিভিন্ন উৎপাদন-শিল্পের সূত্রপাত ও বিকাশে যে সাহায্য করবে তার পূর্বাভাস দিয়ে মার্কস পরে তাঁর স্বপ্নের কথা বলেছিলেন, "রেলওয়ে ব্যবস্থা থেকে প্রসূত আধুনিক শিল্পায়ন, বংশগত শ্রমবিভাগ যার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের জাতি-ভেদ প্রথা দাঁড়িয়ে আছে, এবং যা ভারতবাসীর প্রগতি ও ক্ষমতার পথে চূড়ান্ত বাধাস্বরূপ, তাকে ভেঙে ফেলবে।" (The Future Results of British Rule in the India'—*New York Daily Tribune,* August 8, 1853)

মার্কসের ভবিষ্যদ্‌বাণীর প্রথম অংশ—অর্থাৎ আধুনিক শিল্পায়নে রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিঃসন্দেহে সার্থক হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়াংশ—অর্থাৎ এ-দেশে জাতিভেদ প্রথার অবসান—আজও সুদূরপরাহত। এ-বিফলতার কারণ বহু জটিল ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জটাজালে নিহিত, যার অনুসন্ধানে ও বিশ্লেষণে বিদেশি ও এদেশি চিন্তাবিদেরা হাজার চুল ছেঁড়াছেঁড়ি করেও আজও কোনো সঠিক ব্যাখ্যা বের করতে সক্ষম হননি। সুতরাং এ-তর্কে প্রবেশের সাহস নেই আমার।

এ-প্রবন্ধে আমার অভিপ্রায় খুব সাদামাঠা। রেলগাড়ি চালু হওয়ার পরপর, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ, এই নতুন যন্ত্রযানকে কী চোখে দেখেছিলেন, তার কিছু সাহিত্যিক নিদর্শন উদ্ধৃত করে আলোচনা করা। এ-আলোচনা থেকে তৎকালীন বাঙালি জনমানসের নানা পরিবর্তনশীল অবয়বের ছবি পাওয়া যায়—ঐতিহ্যাশ্রয়ী সমাজে পাশ্চাত্য যন্ত্রযুগের আবির্ভাবের ফলে লৌকিক ভাবনা-চিন্তায় কৌতূহল, ভীতি, সন্দেহ, অভিনন্দন, প্রশংসা, এইসব নানা টানাপোড়েনের দ্যোতনা; রেলগাড়ির বিস্তারের প্রভাবে গ্রামীণ সমাজের মানুষদের, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে চিন্তাধারার পরিবর্তন, লোকসংস্কৃতিতে পুরোনো ধর্মীয় দেবদেবীর প্রতি ভক্তির সঙ্গে এই নতুন যন্ত্রযানের অসীম শক্তির কাছে আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তার সমন্বয়সাধনের চেষ্টা। এসবের প্রকাশ দেখা যায় লৌকিক গান ও কবিতা থেকে শুরু করে 'বটতলা' সাহিত্যে সমসাময়িক সংবাদপত্র থেকে শুরু করে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের বিবরণীতে। এগুলি আলোচনা করলে বোঝা যায় technology বা প্রযুক্তিবিদ্যা কীভাবে আস্তে আস্তে মানবসমাজের ব্যাবহারিক জীবন ও সংস্কৃতির, প্রায় প্রত্যঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়, ও নতুন ভাষা ও চিন্তার জন্ম দেয়। বারংবার ব্যবহারের ফলে, রেলযান ও তার চালচলন, নিয়মকানুন, যাত্রীসাধারণ অন্তঃস্থ করে নিয়েছিলেন, এবং তাঁদের কবি-গায়কেরা একে কেন্দ্র করে এমন এক বিশেষ সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন, যাকে বলা যেতে পারে 'রেলওয়ে সংস্কৃতি'।

বাংলাদেশে রেলগাড়ির আবির্ভাবের প্রথম দিন বাঙালি জনসাধারণ একে কীভাবে দেখেছিলেন তার বিবরণী পাওয়া যায় সমসাময়িক ইংরেজি ও বাংলা পত্রপত্রিকা থেকে। ১৮৫৪ সালের ১৫ আগস্ট, হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত যেদিন প্রথম রেলগাড়ির যাত্রার উদ্‌বোধন হয়, সেদিন হাওড়া দর্শকদের ভিড়ে ভরে গিয়েছিল, এবং *Bengal Hurkaru* পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী "রেলগাড়ির এঞ্জিন যখন বায়ু-তাড়িত হয়ে ধোঁয়া ছাড়তে শুরু ক'রল, মফঃস্বলের দুর্বলচিত্ত মানুষদের তাক্ লাগিয়ে দিল তার ভোঁস ভোঁস আওয়াজ, সিটির শব্দ ও ক্ষিপ্র গতিবেগ দিয়ে"। কথা ছিল তদানীন্তন বড়োলাট ডালহৌসি এই রেলযাত্রার উদ্‌বোধন করবেন স্বয়ং রেলগাড়ি চড়ে। কিন্তু কোনো বিশেষ কারণে তা সম্ভব হয়নি। শেষে তাঁর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও গাড়ি যাত্রা শুরু করে রেলওয়ের বড়োকর্তা, সাহেবসুবাদের নিয়ে। সকালে রওনা হয়ে, হাওড়ায় ফিরে আসার কথা ছিল বেলা একটায়। কিন্তু দুপুর তিনটে গড়িয়ে যাওয়ার পরও যখন গাড়ির প্রত্যাবর্তনের কোনো চিহ্ন দেখা গেল না, তখন হাওড়ায় অপেক্ষমাণ জনতা নানা সন্দেহে ও দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছিল—পথের মধ্যে হয়তো রেলগাড়ি থেকে গেছে, কিংবা কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে, আদৌ কি ফিরতে পারবে? কিন্তু এদের মধ্য থেকে এক জন, ওই পত্রিকার বিবরণী অনুযায়ী, সকল সন্দেহের নিরসন করে দেন একটা কথা বলেই—"আগুনের রথের সাহেব লোকেরা পেট-পূজা করছেন বলে দেরি হচ্ছে!" পরে জানা গিয়েছিল, সত্যিই বিলম্বের কারণ তাই![২]

এর পরের বছর, তেসরা ফেব্রুয়ারি যখন বড়োলাট হাওড়া থেকে রানীগঞ্জ পর্যন্ত নতুন রেললাইন উদ্‌বোধন করতে এলেন, তখন *সংবাদ প্রভাকর*-এর সংবাদদাতা বর্ণনা করেন কীভাবে "বেলা অষ্ট ঘটিকাবধি ১।।০ ঘটিকা পর্য্যন্ত কলিকাতার সম্মুখস্থ গঙ্গার উভয়তীরে মহা সমারোহ হইয়াছিল।...স্থানে স্থানে গেট ও নানা বর্ণের পতাকা উড্ডীয়মান হওয়াতে যে রমণীয় শোভার উদ্দিপন হয় তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না।"

সরকার ও রেলওয়ের সাহেবদের আয়োজিত এইসব সংবর্ধনা ও সমারোহ উৎসব দেখতে বাঙালি জনসাধারণ ভিড় করলেও, এদের মনের আনাচে-কানাচে ভয়মিশ্রিত কৌতূহল ও বিস্ময়মিশ্রিত সম্ভ্রম সহাবস্থান করত রেলজীবনের এই শৈশবের দিনগুলিতে। সমসাময়িক বিবরণী থেকে শুনতে পাই, অনেকসময় গ্রামের মানুষ কাছাকাছি কোনো রেলগাড়ি থামলে, ইঞ্জিনের উপর তিলক বুলিয়ে দিতেন, রেললাইনের দু-পাশে ফুল ও খাবার সাজিয়ে রাখতেন—পূজার নৈবেদ্য হিসেবে। রেলগাড়ি এক নতুন দেবতা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। এই মনোভাবের ভূরি-ভূরি নিদর্শন মিলবে তৎকালীন লোকগীতি ও বটতলাসাহিত্য থেকে—যা নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্ক ও সন্দেহও বিরাজ করত জনচেতনায়। রেলপথের পার্শ্ববর্তী গ্রাম ও মফস্সলের মানুষেরা দূর থেকে দেখে এই যন্ত্রযানকে ভয়-ভক্তি করতে শিখেছিলেন।[৩] কিন্তু কলকাতার মতো শহরাঞ্চলের ভদ্রলোকেদের মধ্যে সাহসী কেউ কেউ যখন রেলগাড়ি চড়তে আরম্ভ করেছিলেন, তখন এই যন্ত্রযানে যাতায়াতের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁদের গোড়ায় গোড়ায় ভীতিবিহ্বল করে তুলত। দুটো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। একটি ইংরেজি সংবাদপত্র থেকে।

১৮৫৪-র তেইশ আগস্টের *Bengal Hurkaru* থেকে জানতে পারছি, একজন শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকের রেলযাত্রা শুরু করার আগে থেকে পরবর্তী অভিজ্ঞতার কথা। উক্ত ভদ্রলোক পাঁজি দেখে দিনক্ষণ স্থির করে, সদ্যপ্রতিষ্ঠিত রেলপথে যাত্রার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন—তিনবার গঙ্গাস্নান করে, কয়েক সহস্রবার ভগবানের নাম স্মরণ করে। কিন্তু, রেলগাড়িতে হুগলি পর্যন্ত পৌঁছে, ভদ্রলোক আর রেলে চড়ে কলকাতায় ফিরে যেতে রাজি হলেন না। কারণস্বরূপ তিনি বলেছিলেন, "...আগুনের রথে বেশিক্ষণ যাতায়াত মানবজীবনের আয়ুষ্কাল খর্ব করবে। কারণ, দেখা যাচ্ছে এই রথে (অর্থাৎ রেলগাড়ি) কাল ও স্থান সম্পূর্ণ বিলোপ করছে এবং প্রত্যেক যাত্রারই সময়কাল সংক্ষিপ্ত করছে। সুতরাং মানবজীবনের যাত্রাকালেও কি এইভাবে এই আগুনের রথ সংকুচিত করবে না?"[৪]

রেলযাত্রীটির এই প্রশ্ন তৎকালীন বাঙালি জনচেতনায় এক সংকটকালের সন্ধান দিচ্ছে। রেল-পূর্ব গ্রামীণ বাংলায় স্থানের দূরত্ব যেমন 'ডালভাঙ্গা ক্রোশ' সময়ের অগ্রগতি তেমনই 'আঠারো মাসে বছর' হিসেবে মাপা হত। হঠাৎ রেলগাড়ি এসে এই চিরাচরিত মাপকাঠি ও ধ্যানধারণা একেবারে ধূলিসাৎ করে দিল। ছ-দিনের পথ (হেঁটে, বা পালকিতে বা ঘোড়ার পিঠে চড়ে অতিক্রমের সময় ধরলে) ছ-ঘণ্টায় পেরোনো যাচ্ছে—সময়ের এই অসম্ভব সংক্ষেপণ যে-যন্ত্রযানের দ্বারা সম্ভব হচ্ছে, তার মধ্যে ঢুকে যাত্রা শুরু করলে যাত্রীর আয়ুষ্কালও যে ঐভাবে সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে না, তার নিশ্চয়তা কী? অর্থাৎ, যাঁর ছেষট্টি বছর পর্যন্ত আয়ু (কুষ্ঠি ও জ্যোতিষীর গণনা মেনে যিনি চলতেন), এই রেলগাড়ির হস্তক্ষেপে তিনি হয়তো ছত্রিশ বছর বয়সেই ইহজগৎ ত্যাগ করতে বাধ্য হবেন।

আজকে বসে, অতীতের এইসব ভয়-ভাবনা শুনে আমরা ঠাট্টাতামাশা করছি। কিন্তু মনে রাখা দরকার, সেদিনের রেলযাত্রীরা সর্বপ্রথম এই ধরনের দ্রুতগামী যন্ত্রযানের সংস্পর্শে আসছিলেন। যান্ত্রিক গতিবেগের সঙ্গে এই প্রথম তাঁদের প্রত্যক্ষ মুখোমুখি পরিচয়। এর আগে, নিরাপদ দূরত্ব থেকে পৌরাণিক নায়কদের আকাশবিহারী রথ, বা

হনুমানের গগনচুম্বী উল্লম্ফন ও দূরত্ব উল্লঙঘনের গল্প তাঁরা শুনে এসেছিলেন। কিন্তু যন্ত্রযুগ যখন তাঁদের সামনে স্থানকালের দূরত্ব অতিক্রম করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এই পরিবহণ হাজির করল, তখন তাঁদের ধরাছোঁওয়ার জগতের মাঝখানে এই যন্ত্র-ত্বরান্বিত 'আগুনের রথ'-এর আবির্ভাব, স্বভাবতই তাঁদের সামনে নানা প্রশ্ন তুলে ধরেছিল। পুরাণের দেবতাদের রথ ইহজগতে মানুষে কী সাহসে নির্মাণ ও পরিচালনা করছে? এতে চড়লে নশ্বর মানবদেহ কি ঐ দেবতাদের অভিশাপে ভস্মীভূত হবে এই রথের আগুনে? না, এ-পরিবহণ ওই পৌরাণিক রথেরই আধুনিক সংস্করণ, যা অতীতের দেবতাদের আশীর্বাদে ইংরেজ শাসকেরা এ-দেশে প্রবর্তিত করেছে?

এইসব নানা রকমের জল্পনা-কল্পনা, আশা-আশঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে, প্রথম প্রজন্মের রেলযাত্রীদের যা বিড়ম্বিত করত, তা হল দৈনিক যন্ত্রণাভোগ—অনেকটা প্রথম জাহাজযাত্রায় সমুদ্রপীড়া, বা উড়োজাহাজে প্রথম চড়ে বমনোদ্রেক হওয়ার মতো। একজন এইরকম রেলযাত্রী তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে রেলগাড়ি চলতে শুরু করলে তাঁর মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। এবং চলন্ত রেলকামরা থেকে নীচে তাকাতে গিয়ে তাঁর মাথা ঘুরতে আরম্ভ করে। প্রত্যেক স্টেশনে ট্রেন থামলে, যথেষ্ট পরিমাণে আরামপ্রদায়ক ব্যবস্থার সাহায্যে নিজেকে চাঙ্গা করে তুলবার চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রমশই তাঁর মাথার যন্ত্রণা বাড়তে থাকে। শেষে যখন হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছালেন, ভদ্রলোকের আর দাঁড়াবার মতো অবস্থা ছিল না। তাঁর বন্ধুরা এক পালকি নিয়ে এসে তাঁকে রেলগাড়ি থেকে নামিয়ে বাড়ি নিয়ে যান।[৫]

এইরকম শারীরিক বিড়ম্বনা ভোগ করা ছাড়াও, রেলযাত্রায় দুর্ঘটনা সে-যুগের যাত্রীসাধারণকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। এই একটা ব্যাপারে ভারতীয় রেলওয়ে ব্যবস্থা, শুরু থেকে আজ পর্যন্ত দুর্ঘটনাপ্রসূত প্রাণহানির 'রেকর্ড' স্থাপনের ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছে। একটা উদাহরণ দিই। ১৮৬৯-৭০ সালের সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানতে পারছি, ওই সময় রেল দুর্ঘটনার মূল কারণ ছিল—বিপরীতগামী দুই ট্রেনের সংঘাত; ট্রেনের রেললাইনচ্যুত হওয়া; এবং বর্ষার প্লাবনে রেলওয়ে-সেতুর ডুবে যাওয়া।[৬] ঔপনিবেশিক যুগের রেল দুর্ঘটনার এই তিনটি কারণ আজও বর্তমান। স্বাধীন ভারতে, রেলযাত্রায় ক্রমবর্ধমান প্রাণহানিকর দুর্ঘটনার হেতু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরও অনেক কারণ জুড়ে দেওয়া হচ্ছে—রেল লাইনগুলির রক্ষণাবেক্ষণে অব্যবস্থা ও অবহেলা, human error বা মানবিক ভুলভ্রান্তি নামক এক নতুন সংজ্ঞার আড়ালে রেলকর্মচারীদের অমার্জনীয় দায়িত্বজ্ঞানহীনতার মৃদু সমালোচনা ও অতি সম্প্রতিকালে, আতঙ্কবাদীদের অন্তর্ঘাত কার্যকলাপ বলে সন্দেহ প্রকাশ।[৭]

রেল দুর্ঘটনার প্রাদুর্ভাব থেকেই, বাঙালি জনচেতনায় এ-ব্যাপারে সতর্কীকরণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। ১৮৫৪ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশে রেল-যাতায়াতের প্রবর্তনের পর-পরই সে-যুগের স্বনামখ্যাত যুক্তিবাদী চিন্তাবিদ অক্ষয়কুমার দত্ত সাধারণ রেলযাত্রীদের জন্য লিখেছিলেন *বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ*—১৮ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা। কলকাতার 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র যন্ত্রালয় থেকে এটি মুদ্রিত হয়েছিল '১৭৭৬ শকাব্দ মাঘ মাসে'—অর্থাৎ আনুমানিক ইংরেজি ১৮৫৫ সালের শুরুতে। বইটির নামপত্রে, শিরোনামের পর, অন্তর্গত বিষয়বস্তুর বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছিল, "যাঁহারা কলের গাড়ী আরোহণ করিয়া গমন করেন, তাঁহাদের তৎ-সংক্রান্ত বিঘ্ন নিবারণের উপায় প্রদর্শন।"

অক্ষয় দত্তের এই চটিবইটি একটি মূল্যবান দলিল। সে-যুগের রেলযাত্রীদের মনোভাবের পরিচয়, যাত্রীসাধারণের শ্রেণিবিন্যাস, রেলযাত্রায় দুর্ঘটনা দূরত্ব অতিক্রমণের সময়, রেলভাড়া ইত্যাদি নানা বিষয়ের এক অনবদ্য বিবরণ পাওয়া যায়। প্রথমে, অক্ষয় দত্ত তাঁর সমসাময়িক আধুনিক শিক্ষায় জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত বাঙালিদের মতো, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এই প্রাযুক্তিক উদ্ভাবনকে সংবর্ধনা জানিয়েও, এর বিপদ সম্বন্ধেও স্বদেশবাসীকে সতর্ক করিয়ে দেন এই বলে, "কিন্তু নরলোকে নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণকর পদার্থ অতীব দুর্লভ। শুভাশুভ একত্র এতাদৃশ মিলিত হইয়া রহিয়াছে, যে তাহাদিগকে পরস্পর পৃথক্ করা অসাধ্য বলিয়া বোধ হয়।...অশেষ-শুভ-সাধক বাষ্পীয় রথেও মধ্যে মধ্যে বিঘ্ন ঘটিয়া অনেক ব্যক্তি হত ও আহত হইয়া থাকে...।" তার পর রেল দুর্ঘটনার কারণ দুই শ্রেণিতে ভাগ করে বলছেন, "...অর্দ্ধাংশ রথারূঢ় ব্যক্তিদিগের স্বকীয় দোষে উৎপন্ন হয়", আর অর্দ্ধাংশ রথসংক্রান্ত কর্ম্মচারীদিগের "অনবধানতা দোষে ও অন্যান্য কারণে উৎপাদিত হইয়া থাকে।..." যেহেতু, রেলকর্মচারীদের 'অনবধানতা ও অন্যান্য কারণ' 'নিরাকরণ' করা লেখকের পক্ষে সম্ভব ছিল না, অক্ষয় দত্ত তাই রেলযাত্রীদের পালনের জন্য তেরোটি নিয়মের এক তালিকা প্রস্তুত করেন। চলন্ত গাড়ি থেকে অবতরণের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিতে গিয়ে তিনি এক সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করেন, যার থেকে তৎকালীন রেলযাত্রীদের আতঙ্কগ্রস্ত মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। "...নূন্যাধিক তিন মাস হইল, বেলুড় ও শ্রীরামপুরের নিকট কয়েকখান গাড়ী পথ হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া পড়ে। তন্মধ্যে শ্রীরামপুরের নিকটে কতিপয় ব্যক্তি ভয়ে গাড়ী হইতে লম্ফ দিয়া ভূমিতলে পতিত হওয়াতে, শরীরে অত্যন্ত আঘাত পায়।"

দুই রেলগাড়ির সংঘাতের এক উদাহরণ দিতে গিয়ে অক্ষয় দত্ত লিখছেন, "গত ২০ এ পৌষে বৌঁচি গ্রামের আড্ডায় (অর্থাৎ স্টেশনে) উক্তরূপ এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া

গিয়াছে। সে দিবস ঐ স্থানে বাষ্পীয় রথের পথে এক খান গাড়ী দণ্ডায়মান ছিল, এমন সময়ে এক রথ-শ্রেণী রানীগঞ্জ হইতে কলিকাতাভিমুখে আগমন করিতে করিতে উক্ত আড্ডায় উপস্থিত হইয়া, ঐ গাড়ীতে লাগিয়া, বিলক্ষণ আঘাত পায়। ভাগ্যক্রমে রথারোহীদিগের মধ্যে কাহারও অঙ্গ-পীড়া ও প্রাণ-বধ হয় নাই, কিন্তু তাঁহাদিগকে অতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা বৈঁচি হইতে পেঁড়ো পর্য্যন্ত পদব্রজে আগমন করেন, তথা হইতে অন্য রথে আরোহণ করিয়া হাওড়ায় আসিয়া উপনীত হন।"

যাত্রীদের প্রাণহানির আরও একটা কারণ হিসেবে অক্ষয় দত্ত বলছেন, "কোন কোন স্থানে বাষ্পীয় রথের ছাদের উপর বসিবার আসন থাকে। সে সকল আসনে উপবেশন করাতে, অনেকে অনেক প্রকার আহত ও হত হইয়াছে।"[৮]

অক্ষয় দত্তের এই পুস্তিকার শেষে পাচ্ছি সে-সময়ে রেলগাড়ির গতিবেগের হিসেব ও যাত্রীদের শ্রেণিবিভাজনের একটা ধারণা। যেমন, হাওড়া থেকে সকাল সাড়ে দশটায় ছেড়ে একটি ট্রেন রানীগঞ্জে পৌছোত বিকেল সাড়ে চারটেয়—পাক্কা ছ-ঘণ্টার যাত্রা! ভাড়ার নিয়মের তালিকাতে দেখছি, 'কেবল গমনের ভাড়া' এই শিরোনামাতে, প্রথম শ্রেণির যাত্রীদের জন্য বরাদ্দ (অর্থাৎ বারো আনা) থেকে ১৫ (অর্থাৎ পনেরো টাকা, দুই আনা)। দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য (পাঁচ আনা) থেকে ৫।। (পাঁচ টাকা দশ আনা), ও তৃতীয় শ্রেণির জন্য পঞ্চাশ পয়সা থেকে এক টাকা চোদ্দো আনা।

এ-দেশে ভ্রমণকারী যাত্রীদের মধ্যে এই ধরনের সুপরিকল্পিত শ্রেণিবিন্যাস এই প্রথম। এই সরকারি শ্রেণিবিভাজনের সূত্রপাত ঔপনিবেশিক আমলে যন্ত্রযানের আবির্ভাবের পর থেকেই। এর আগে, ভ্রমণকারীদের মধ্যে শ্রেণিবৈষম্য নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তা কখনোই একটিমাত্র পরিবহণের শ্বাসরোধকারী পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। অতীতে, এক-এক শ্রেণির মানুষের যাতায়াতের জন্য এক-একরকম ব্যবস্থা ছিল। গরিব মানুষ পায়ে হেঁটে, মধ্যবিত্তের গো-শকটে, অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ও ধনীরা নিজেদের পালকিতে চড়ে, এবং ইংরেজ ও অন্যান্য সরকারি কর্মচারীরা ঘোড়ার চেপে স্থলপথ অতিক্রম করতেন। জলপথেও তেমনই, গ্রামের দরিদ্র মানুষ খেয়ানৌকা, ও সচ্ছল এবং জমিদারশ্রেণির মানুষেরা বজরা-জাতীয় আরও আরামদায়ক নৌযানে যাতায়াত করতেন। Public transport বা সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য এক সর্বজনীন, কিন্তু শ্রেণিভিত্তিক পরিবহণ ব্যবস্থার ধারণা ও পরিকল্পনা গড়ে ওঠেনি প্রাক্-ঔপনিবেশিক বাংলা দেশে।

এ পরিকল্পনা প্রয়োজন হয়েছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসনের নিজস্ব স্বার্থে—এ-দেশের এক কোণ থেকে আর-এক কোণে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও পণ্যদ্রব্যের সুগম পরিবহণ, সৈন্যদের দ্রুত যাতায়াত, ও এইসব কাজে নিয়োজিত খেটে-খাওয়া নাগরিকদের কর্মক্ষেত্রে ঠিক সময়ে হাজিরা নিশ্চিত করা। বস্তুত এই শেষোক্ত শ্রেণির মানুষেরাই সেকালের রেলযাত্রীদের তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত ছিলেন—আজ যাঁরা 'ডেলি প্যাসেঞ্জার' নামে পরিচিত। ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও ব্যবসা জগতের কেন্দ্রস্থল কলকাতাতে, নানা ধরনের পেশা ও চাকুরি টেনে আনত আশে-পাশের মফস্‌সলের মানুষদের। রেলগাড়ির প্রচলন এঁদের পক্ষেই সবচেয়ে সুবিধাজনক হয়েছিল। প্রারম্ভিক সন্দেহ ও ভয় কাটিয়ে এঁরা এই নতুন যন্ত্রযান ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন এক বছরের মধ্যেই।

১৮৫৫ সালের রেলওয়ে-যাত্রীদের চলাচলের সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে প্রতি সপ্তাহে গড়ে প্রথম শ্রেণিতে ৪৬৭, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ১১৮৪ এবং তৃতীয় শ্রেণিতে ৫৮৬৪ যাত্রী যাতায়াত করেছেন।[৯] এর বছর সাতেকের মধ্যেই, তৃতিয় শ্রেণীর যাত্রীসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬,৪৭৭,০৫৫-তে। সে তুলনায়, প্রথম শ্রেণির যাত্রীসংখ্যা ছিল মাত্র ৬১,৮১৭ ও দ্বিতীয় শ্রেণির ২৯৯,৮২০।[১০]

কী প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে এই তৃতীয় শ্রেণির যাত্রীদের যাতায়াত করতে হত তার বিবরণী পাওয়া যায় সমসাময়িক *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকা থেকে। দীর্ঘ হলেও, উদ্ধৃতিটি তুলে দিচ্ছি আজকের তৃতীয় শ্রেণির রেলযাত্রীদের অভিজ্ঞতার তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার্থে:

> আহা যাহারা তৃতীয় শ্রেণীর শকটারোহণে গমনাগমন করে তাহাদিগের দুঃখ বর্ণনা করা যায় না, কোন ব্যক্তি হাবড়াতে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিতে গেলে কি সাহেব কি সামান্য চাপরাসি সকলেই তাহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠে, ধাক্কা দেয়, ঠেলা মারে, সময়ে সময়ে বেত্রাঘাতও করিয়া থাকে, ঐ ব্যক্তি এই সমস্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়া যদ্যপি টিকিট প্রদানের গর্ত্তের সম্মুখে গিয়া তিন আনার একখানি টিকিট চাহে তবে বিক্রেতা রৌপ্য মুদ্রা চাহেন। ক্রেতা মূল্যের রৌপ্য মুদ্রা কোথায় পাইবে, অতএব যদ্যপি টাকা কিম্বা আধুলি দিয়া অবশিষ্ট পয়সা চায় তাহা গোলযোগে প্রায় প্রাপ্ত হয় না...।

এর পরে, উক্ত সংবাদপ্রেরক বর্ণনা করছেন তৃতীয় শ্রেণির কামরায় প্রবেশকারী আরোহীদের দুর্ভোগের কথা :

> ...সে গাড়িতে উঠিবার স্থানে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে তথাকার প্রহরিরা তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেয়, এই সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া গাড়ি আরোহণ করিলেও তাহার নিস্তার নাই, সাহেব ও চাপরাসিগণ গাড়িতে অধিক লোক পুরিবার নিমিত্ত ঘুসা ও ধাক্কা মারিতে থাকেন।

এইরূপ পরিপূর্ণ হইলে এবং সকলের অঙ্গ প্রসারণের শক্তি অবরোধ হইলেও যদ্যপি কোন ব্যক্তি টিকিট লইয়া উপস্থিত থাকে তবে তাহাকে জানোয়ারের গাড়িতে তুলিয়া লয়েন...

তৃতীয় শ্রেণির রেলযাত্রীদের এই দুরবস্থার বিবরণী দিয়ে, সংবাদদাতা এবার একটা ন্যায়সংগত প্রশ্ন তুলছেন :

...রেইলওয়ে কোম্পানিদিগের যে হিসাব প্রকাশ হইয়াছে (অর্থাৎ, আজকে যাকে বলা হয় 'রেলওয়ে বাজেট), তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ির অপেক্ষা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি হইতে অধিক টাকা উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব যাহাদিগের নিকট হইতে অধিক আয় তাহারদিগের প্রতি অত্যাচার ও প্রহারাদি করা ও বস্ত্রাদি ছিঁড়িয়া দেওয়া কি সামান্য অন্যায়?

এই ধরনের ঠাসাঠাসি করে রেলযাত্রার ফলে হিন্দুসমাজের গোঁড়া মাতব্বরেরা অনেকসময়ই রুষ্ট হতেন—ছোঁয়াছুঁয়ির ফলে জাত যাওয়ার আশঙ্কায়। কিন্তু তাঁদের আপত্তি ধোপে টেকেনি। ইংরেজ কর্তৃপক্ষও তাঁদের আমল দেয়নি, নিজেদের সমাজের লোকেরাও তাঁদের হুকুম মেনে চলেনি। এইরকম এক জন হিন্দু সমাজপতির আপত্তির জবাবে ১৮৫৪ সালে, মাদ্রাজ রেলওয়ের চিফ ইঞ্জিনিয়ার পষ্টাপষ্টি ঘোষণা করে দেন যে ''জাতপাত, ধর্মবিশ্বাস, এইসব মেনে চলার দায়িত্ব রেলওয়ে প্রশাসনের নয়, এবং তাই ব্রাহ্মণের জন্য এক কামরা, ও তাদের চোখে যারা অস্পৃশ্য, তাদের জন্য অন্য কামরার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।'' এই ইংরেজ আমলাটি এর পরে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য জুড়ে দেন : 'একটা মাত্র পার্থক্যই আমরা মানতে রাজি—যা শুধু অর্থ দিয়ে নির্ধারিত হয়।'[১২]

এই ইংরেজ আমলাটি আরও একটা কথা জুড়ে দিতে ভুলে গিয়েছিলেন—বা স্বভাবজাত ভণ্ডামির জন্য চেপে গিয়েছিলেন। বলা উচিত ছিল—''আমাদের রাজত্বে অর্থ দিয়ে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গের বিভেদ দূর করা যায় না। তাই, রেলওয়ে-যাত্রায় হিন্দুসমাজের জাতপাত না মানলেও, সাদা চামড়া ও কালো চামড়ার তফাতটা আমরা পুরোপুরি মানি।'' সে-যুগে, রেলওয়ের প্রথম শ্রেণির কামরায় কোনো ইংরেজ যাত্রী থাকলে, তাতে ওই উচ্চশ্রেণির টিকিট কিনেও কোনো ভারতীয় যাত্রী উঠলে, তাঁকে কী ধরনের হেনস্থা সহ্য করতে হত, তার ভূরি-ভূরি নিদর্শন, শুধু আমাদের কথ্য ও কথাসাহিত্যে নথিভুক্ত হয়ে নেই, সমকালীন প্রশাসনিক দলিলপত্রেও তার খোঁজ পাওয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকাতে, রেলকামরা থেকে শ্বেতাঙ্গ দ্বারা গান্ধিকে গলাধাক্কা দিয়ে বিতাড়নের ঐতিহাসিক ঘটনার অনেক আগেই, এ-দেশে অনুরূপ অভিজ্ঞতা জুটেছিল ভারতীয় রেলযাত্রীর ভাগ্যে। ১৮৬৫ সালে এক সরকারি সূত্র থেকে খোঁজ পাচ্ছি একটি চিঠির,

যেটি লিখেছিলেন তৎকালীন 'পাবলিক ওয়র্কস্ ডিপার্টমেন্ট'-এর এক জন অবর সচিব, বাংলাদেশের রেলওয়ে বিভাগকে উদ্দেশ্য করে, একটা বিশেষ ঘটনার প্রতি ছোটোলাটের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। ঘটনাটি এইভাবে বর্ণিত হচ্ছে তাঁর চিঠিতে: "...ভাগলপুরের নিকটবর্তী এক স্টেশনে, একজন ভারতীয় ভদ্রলোককে ট্রেনের কামরা থেকে জোর-পূর্বক বহিষ্কৃত করা হয়। তাঁর জিনিস-পত্র ও তাঁকে কামরা থেকে বার করতে দেওয়া হয় নি। সেগুলি বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল, এবং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থেকেছিল..."[১৩]

তাই শ্রেণিবৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণবৈষম্যও এ-দেশে রেলওয়ে ব্যবস্থায় সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। এ সত্ত্বেও কিন্তু বাঙালি যাত্রীসাধারণের মননে এই বাষ্পীয় 'অগ্নিরথ' স্থান ও সময়ের দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল। এ-পরিবর্তিত চিন্তনের ছবি পাওয়া যায় সে-যুগের লৌকিক কাব্যে ও গানে, বটতলার সাহিত্যে।

রচনা

লৌকিক সাহিত্যে, বটতলা-প্রকাশিত প্রহসন, কাব্যগ্রন্থ, চুটকি, এই-জাতীয় রচনা, সমকালীন জনমানসের দর্পণ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। কারণ এইসব লেখাতে দেখতে পাওয়া যায়, সেই সময়কার নিত্যনতুন ঘটনার প্রতিক্রিয়া রূপে, রাস্তায়-ঘাটে, হাটে-বাজারে সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনা তাদের নিজস্ব বাগ্‌ভঙ্গিতে বের হয়ে আসছে। মহানগরী কলকাতা তখন নানা ধরনের ঘটনার কেন্দ্রস্থল—উত্তেজনাপূর্ণ কোনো খুনের ঘটনা থেকে গঙ্গাবক্ষে সেতুনির্মাণ, রোমাঞ্চকর কোনো চুরির ব্যাপার থেকে রেলগাড়ির প্রচলন।[১৪]

রেলগাড়ি নিয়ে রচিত, বটতলা থেকে প্রকাশিত একটি নাটকধর্মী প্রহসন, এ-প্রসঙ্গে আলোচনা করলে তৎকালীন জন-মানসিকতার এক বৈচিত্র্যপূর্ণ ছবি বের হয়ে আসবে। বইটির নাম—*কি মজার কলের গাড়ি*। লেখক শ্রীমুন্সী আজিমদ্দীন। বের হয়েছিল আনুমানিক ১৮৬৩ সালে।[১৫]

শুরু হচ্ছে একটি গান দিয়ে এইভাবে—দুই স্টেশনের উল্লেখ করে :

রাগিণী হাবড়ার ঘাট।   তাল শিয়ালদহের মাঠ।

তার পর পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশ্য করে গীত হচ্ছে :

বানিয়েছে রেল রোডের গাড়ি ধন্য সাহেব কারিকর
এখন বিশ্বকর্ম্মার পূজা ছেড়ে ঐ সাহেবকে পূজা কর।

এর পর নাটক আরম্ভ হচ্ছে নবীনা কিছু বউয়ের সঙ্গে প্রাচীনা কিছু মহিলার মতবিনিময় দিয়ে। 'আই বুড়ী' নামে এক প্রবীণার প্রবেশের পর নিম্নলিখিত কথোপকথন হচ্ছে :

বয়েরা (অর্থাৎ বউ-এরা) : প্রণাম আই আশীর্ব্বাদ করো।

আই বুড়ী : আশীর্ব্বাদ আর কি করবো লো, এখন তোদের অদৃষ্টক্রমে ইংরাজ বাহাদুরেরা কল বানিয়েছেন, সেই কলেতেই সকল কল চল্‌ছে।

বয়েরা : হাঁ গা আই, সকল কল চল্‌ছে কি গা, আরো কি কল আছে।

আই (হাস্যরূপে) : সে কি লো, তাও কি আর বুঝতে পারিস নি নিত্তি ২ তোদের কত্তা বাড়ীতে আসছে, এর চেয়ে কি আর সুখ আছে।

বয়েরা : ওরে বুড়ী বড় রসিক এক বল্‌তে আর এক বলে বসে, তোমার কি আর কত্তা বাড়ীতে আসতো না।

বুড়ী : তা তো আসতো, কিন্তু ঐ ন মাসে ছ মাসে তা আবার পথ চল্‌তেই ছেলের বয়েশ যেতো, তখন বারো বৎসর অন্তর একটী ছেলে হওয়া ভার হতো, এখন কলিকালে বৎসর ফিরতে দেয় নি, একটী করে সন্তান বাড়ে, তোমাদের তো এখন বৎসর ফাঁক যায় না।

প্রায় দেড়শো বছর আগে প্রকাশিত এই প্রহসনে কলকাতার নিকটবর্তী মফস্‌সল ও গ্রামাঞ্চলে, রেল-যোগাযোগের ফলে চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তদের পরিবারে জন্মহারবৃদ্ধির এই যে ইঙ্গিত, এটা গবেষণাযোগ্য। জানি না, রেলওয়ের প্রবর্তনের আগে ও পরে বাংলাদেশের এইসব অঞ্চলে জন্মহারের কোনো তুলনামূলক আলোচনা হয়েছে কি না। তবে ব্যাপারটা অনুধাবনীয়। বাঙালি গেরস্তঘরে, ঘন ঘন পোয়াতি মহিলাদের প্রতি 'বছর-বিওনি', এই অভিধাটির বহুল প্রচলন কি রেলগাড়ির ঘন ঘন যাতায়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট?

যাই হোক, নাটকটিতে ফিরে আসা যাক। এবার দেখি, গ্রাম-মফস্‌সলের এইসব বউদের-স্বামীদের ছবি। শহরে চাকুরিরত এঁরা সপ্তাহান্তে ছুটিতে কেনাকাটা করে ট্রেন ধরছেন—

ভাল মতে পরনেতে কালা পেড়ে ধুতি
জামা গায় শোভা পায় পদে মোজা-জুতি।
লন হস্তে অতি ব্যস্তে ব্যগ লয়ে যান
ব্যগের বাজার চীনে বাজার বাড়িল দোকান।।

*

মিছরি কিনে মিঠাই আনে কেহ কেহ বেন্ধে

চিনি সর্কর কিনে আতর না হয় সে নিন্দে।
গিন্নিদের ব্যবহারের কারণ যাহা চাই
শীঘ্র করে কিনে দরে দর করেন নাই।...

*

কেহে কেনে দেখে শুনে মাজন মিসি ভাল
এই ভাবে বাটী যাইবে সকল দ্রব্য নিল।

ওদিকে গ্রামে, গৃহিণীরা ট্রেনের শব্দ শুনে যেমন স্বামীদের আগমনের প্রতীক্ষায় আনন্দিত, অনেক গৃহিণী আবার আশঙ্কায় চিন্তিত। এঁরা কারা? লেখক, 'উপপতি অসতী ধনীদের বিলাস'—এই শিরোনামাতে একটি মজার কথোপকথন জুড়ে দিয়েছেন:

যুবতী। ওহে প্রাণনাথ। বলি এখন বাড়ী যাও হোথা মাথা খেয়েছে যে, গাড়ী আসচে কি জানি সে মুকপোড়া যদি এসে পড়ে।

উপপতি। কি কি প্রাণ প্রিয়ে এমন নিষ্ঠুর উক্তি ব্যক্ত কি প্রকার কল্লো হে।

তখন যুবতী এই গানটি গেয়ে ওঠেন:

যাও যাও হে প্রাণনাথ ঐ এলো এলো গাড়ি
কি জানি সে সর্ব্বনেশে পড়ে যদি এসে বাড়ী।
টাইম ছেড়ে অটাইমে, বসো হে অধনীর ধামে,
টাইম গেলে, তুমি এলে, সমর্পিব মধুর হাঁড়ি।

লক্ষণীয় 'টাইম' বা সময়ের সংজ্ঞা কীভাবে পালটে গেছে এই দ্বিচারিণী যুবতীটির চিন্তায়। সময় বেঁধে দিচ্ছে রেলগাড়ির টাইমটেবিল। এর আগমন ও প্রস্থানের উপর নির্ভর করছে এই মহিলার সময়সূচি। উপপতির সঙ্গে 'অসতী'র প্রেমালাপের সুযোগ মেলে একমাত্র 'অটাইমে'—অর্থাৎ রেলগাড়ি নির্ধারিত বাঁধা সময়সারণির বাইরে।

সময়কে বন্দি করে তাকে নিয়ন্ত্রিত করার রেলগাড়ির এই যে ক্ষমতা, তা সে-যুগের জনপ্রিয় কবিদেরও চমৎকৃত করেছিল। যেমন এক জন কবি রেলওয়ের প্রশংসা করতে গিয়ে লেখেন :

পুরাণ পুরাণ মতে, বীর চাপি রণরথে,
স্বর্গ মর্ত্ত স্বেচ্ছামত করিতেন বিচরণ।

*

সে যুগের অন্তর্ভাব, নবভাব আবির্ভাব,
তুরী বাজী গজ হতে প্রভাবে বাষ্প এখন।
বাষ্পযান দ্রুতগতি, হেরি হয় চিত মতি,
ঘণ্টায় দিনের পথ নিত্য করিছে গমন।[১৬]

রেলগাড়ির প্রসারণ ও যাতায়াতের জন্য তার ব্যাপক ব্যবহারের ফলে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে ও ভাবনাচিন্তায় এই যন্ত্রযান এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দূরদূরান্তের গ্রামেও, যেখানে রেললাইন পৌঁছায়নি, সেখানকার মানুষেও এই অদ্ভুত 'অগ্নিরথ'-এর কথা শুনে গান বেঁধেছিলেন। জনমানস নতুন প্রযুক্তিকে যে নিজের মধ্যে অন্তঃস্থিত করতে সক্ষম হয়েছে, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ মেলে জনসংস্কৃতিতে। পাশ্চাত্যের এক আধুনিক কবির একটি মন্তব্য এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

"...কবিতা যতক্ষণ পর্যন্ত না যন্ত্রকে আত্মভূত করতে পারছে, অর্থাৎ গাছ-পালা, জন্তু-জানোয়ার, তরি-তরণী, দুর্গ-প্রাসাদের মত অতীতের সব রকম মানবিক অনুষঙ্গ কে যেমন সে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়েছে, ঠিক তেমনি ভাবেই একে নিয়ে আত্মস্থ হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কবিতা তার পুরো সমকালীন দায়িত্ব পালনে অক্ষম থেকে যাবে।"[১৭]

বাংলা লোককবিদের মধ্যে সবচেয়ে সার্থকভাবে যাঁরা এই রেলযানকে তাঁদের কবিকল্পনার অভ্যন্তরীণ করতে পেরেছিলেন, তাঁরা ছিলেন সে-যুগের দেহতত্ত্বের কবি ও বাউলেরা। মানবদেহের নতুন রূপকালঙ্কার তাঁরা খুঁজে পেলেন এই নতুন বাষ্পীয় রথের চালকযন্ত্রে। রেলগাড়ি, তার আচার-আচরণে, তার গমন-নিষ্ক্রমণে, যেন মানবদেহ ও মানবজীবনেরই এক প্রসারণ হয়ে উঠল এঁদের গান ও কবিতায়। দু-একটা নমুনা আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

পিলু রাগে ও খেমটা তালে রচিত এই বাউলগানটির কথাগুলি ঐতিহ্যাশ্রয়ী দেহতত্ত্ব ও তন্ত্রশাস্ত্রের সাধনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তিযন্ত্রের গতিবিজ্ঞান বা dynamics-এর এক চমৎকার সমন্বয় সাধন করেছে :

দেহ মন কলের গাড়ি
ব্যাপার কি বা পরিপাটি
মূল হতে লাইন খুলে
সাত ষ্টেষন ঘাঁটি ঘাঁটি
সাঙ্কেতিক দণ্ডমূলে,
কুণ্ডলিনী মুখ তুলে...[১৮]

তন্ত্রশাস্ত্রে অভিজ্ঞ যে-কোনো মানুষের কাছেই উপমাটা স্পষ্ট হবে। উৎসস্থল স্টেশন থেকে রেললাইন ধরে যেমন রেলগাড়ি নানা স্টেশন ছুঁয়ে গন্তব্যস্থল পৌঁছায়, মানবদেহের মধ্যে তেমনই কুণ্ডলিনী শক্তি 'মুখ তুলে' চলছেন, শরীরে মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র

পর্যন্ত। এই চলার পথ ষট্‌চক্র ধরে—সুষুম্নানাড়িতে অবস্থিত পদ্মাকার ছটি চক্র, মূলাধার থেকে শুরু করে স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও শেষে আজ্ঞা নামে চক্র। 'ষট্' শব্দটি কথ্য বাংলায় 'সাত' হয়ে গেছে কি এই বাউলগানে? না, সচরাচর আমরা 'নানা', এই অর্থে যেমন 'সাত' শব্দ ব্যবহার করি ('সাতখুন মাপ', 'সাতঘাটের জল' ইত্যাদি), সেই অনুসারে 'সাত ষ্টেশন' শব্দদুটি ব্যবহৃত হয়েছে? ছটি চক্র ধরে যেমন কুণ্ডলিনী শক্তি এগোন, নানা স্টেশন ধরে তেমনই রেলগাড়ি এগোয়—অন্তিম গন্তব্যস্থল পৌঁছোবার উদ্দেশ্যে। তাই গানটির পরের অংশে শুনতে পাই :

সুষুম্নাতে রেল বসেছে,
তার দুপাশে তার চলেছে
ইড়া পিঙ্গলা এই দুটি।
কৃপাবাষ্প দিয়া ছাড়ি,
শ্রীগুরু চালান গাড়ি,
হংসঃ হংসঃ রব ছাড়ি
চলে গাড়ি ছুটোছুটি।
শান্তিনিকেতন যেতে
জীবাত্মা চড়েন তাতে,
চলে যান আনন্দেতে
তাজে ভবের খাটাখাটি।

তন্ত্রশাস্ত্র নির্ধারিত anatomy বা শরীরস্থানের তুল্য সমান্তরাল রেখা, রেলওয়ে-পথে আবিষ্কারের প্রচেষ্টা দেখতে পাই। মূল নাড়ি সুষুম্নার মতো, রেলপথের 'মেইন লাইন' চলেছে। দু-পাশে টেলিগ্রাফের 'তার', বাঁয়ে ইড়া ও ডাইনে পিঙ্গলা এই দুই নাড়ির মতো বিরাজমান। আবার রেলইঞ্জিনের, 'হংসঃ হংসঃ' রবের উল্লেখে, তন্ত্রশাস্ত্রের অজপা মন্ত্রের 'হংস' শব্দের উচ্চারণের ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়।

শাক্ত তন্ত্রশাস্ত্র-প্রভাবান্বিত এই উপমার পরেই, এই বাউল-কবি বৈষ্ণব সাধনার সুরে 'গুরু-কৃপা'র উপর সবকিছু ছেড়ে দিতে চাইছেন। রেলগাড়ির কর্ণধার, অর্থাৎ ইঞ্জিন-চালক, এই মানবজীবনের যাত্রাপথের নির্দেশক গুরুর মতোই কাণ্ডারি। এই 'শ্রীগুরুই তার 'কৃপাবাষ্প' দিয়ে চালাচ্ছেন মানবজীবনের রথ।

আর-একটি বাউলগানে বৈষ্ণব সাধনমার্গের সঙ্গে রেলগাড়ির সরাসরি তুলনা পাচ্ছি :

যাচ্ছি গৌর প্রেম রেলের গাড়ী।
তোরা দেখসে (প্রেমের প্রেমিক যত) তোরা দেখসে,

আয় তাড়াতাড়ি।
উদ্ধারের আছে যত কল, সকল কলের শেরা এ কল
অগ্নিকলে দিচ্ছে তুলে জল—উড়ছে ধোঙা,
ঘুরছে বোমা (আবার) হচ্ছে কলের হুড়োহুড়ি...
গার্ড হোয়েছেন নিতাই আমার,
শ্রীঅদ্বৈত এঞ্জিনিয়ার, এবার ভবে
ভাবনা কি রে আর,—মুখে হরি হরি,
গৌরহরি, কোচ্ছেন টিকিট মাষ্টারি—[১৯]

সে-যুগের দেহতত্ত্বের সঙ্গীত-সাহিত্যে রেলগাড়ি এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিল। কখনো রেলযান মানবদেহের প্রতীক, কখনো বা মানবদেহই এই যন্ত্রের অনুরূপ হয়ে দেখা দেয়। তৎকালীন জনপ্রিয় কবি ও সংগীত রচয়িতা রূপচাঁদ পক্ষী তাই লিখেছিলেন :

মানুষ চলে, কলের বলে।
পঞ্চভূত, বড়ই মজবুত, ঘেরেছে সহস্রদলে।
(ওরে ভাই)
এই দেহ মেসিন, ইহা ভাই, বড়ই প্রবীণ,
ইংরাজ, চীন ফ্রেঞ্চ মারকিন, সবাই হার মানিলে,
মরি কি শিল্পবিদ্যা, করেছেন মহাবিদ্যা...[২০]

তার পর, রেলইঞ্জিনের বয়লারের অনুষঙ্গ এনে মানবদেহের বর্ণনা করছেন:

"কলটি সাড়ে তিন হাত, এতে হয় ত্রিজগৎ মাৎ, মন পবন বচে দিন রাত, জঠর অনলে, জীবাত্মা মহাপ্রাণী, এ কলের দুটো চিম্নি, ব্রহ্মা বিষ্ণু, শূলপাণি, নাড়ে নড়ে পল বিপলে।"

অবশ্য, রেলগাড়ি নিয়ে এই ধরনের দেহতাত্ত্বিক রচনা ছাড়াও, সহজ হাসির বর্ণনাও পাওয়া যায় তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে। কালীপ্রসন্ন সিংহের *হুতোম প্যাঁচার নকশা*-তে এই রকমের একটি বর্ণনা বাঙালি পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে। দুই বৈষ্ণব বাবাজী, প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দকে হাওড়ায় ট্রেন ধরবার জন্য কলকাতা থেকে গঙ্গা পার হওয়ার উদ্দেশ্যে, স্টিমার-ঘাটে থার্ড ক্লাস বুকিং অফিসে টিকিট কিনতে গিয়ে যে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছিল, তার কৌতুকাবহ বিবরণীর আড়াল থেকে কিন্তু তৃতীয় শ্রেণির দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত যাত্রীদের বিড়ম্বনার ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

"...থার্ডক্লাস বুকিং অফিসে লোকের ঠেল মেরেচে, রেলওয়ের চাপরাশীরা সপাসপ্ বেত মাচ্চে, ধাক্কা দিচ্চে, ও গুঁতো লাগাচ্চে, তথাপি নিবৃত্তি নাই। "মশাই শ্রীরামপুর!" "বালি বালি!" "বর্দ্ধমান মশাই! আমার বর্দ্ধমানেরটা দিন্ না" শব্দ উঠছে চারিদিকে

কাটের ব্যাড়াঘেরা বুকিং ক্লার্ক সন্ধ্যা পূজার অবসরমত ঝোপ্ বুঝে কোপ্ ফেল্‌চেন। কারো টাকা নিয়ে চার আনার টিকিট ও দুই দোওানি দেওয়া হচ্চে, বাকি চাবা মাত্র চোপ রও ও নিকালো, কারো শ্রীরামপুরের দাম নিয়ে বালির টিকিট্ বেরুচ্চে...যদি চীৎকার করে ক্লার্ক বাবুর চিত্তাকর্ষণ কত্তে চেষ্টা করে, তখনি রেলওয়ে পুলিশের পাহারাওয়ালা ও জমাদারেরা গলা টিপে তাড়িয়ে দেবে...''[২১]

হুতোম এ-কথাগুলি লিখেছিলেন উনিশ শতকের ষাটের দশকে। এর এক দশক আগে, ১৮৫৫ সালে (অর্থাৎ এ-দেশে রেলগাড়ি প্রবর্তনের বছরখানেক পরেই) *সংবাদ প্রভাকর*, তৃতীয় শ্রেণির রেলযাত্রীদের দুর্ভোগের যে-বর্ণনা দিয়েছিল, তার থেকে এ-বিবরণীর খুব-একটা পার্থক্য নেই।[২২]

হুতোমের এই লেখার বছর তিরিশ পরেও যে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৯৮ সালে লেখা একটি প্রহসনধর্মী বাংলা উপন্যাস থেকে। বইটির সন্ধান দিয়েছেন বন্ধুবর সিদ্ধার্থ ঘোষ। নাম *রেলওয়ে চরিত*; লেখক 'কোন বহুদর্শী রেলওয়ে কর্মচারী'। যাত্রীদের ঘাড় ভেঙে, রেল-কর্মচারীদের উপরি রোজগারের বিভিন্ন পদ্ধতির বর্ণনা পাওয়া যায় বইটিতে।[২৩]

কিন্তু এ-দুর্ভোগ ও দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও বিশ শতকের শুরু থেকেই দেখতে পাই বাঙালি যাত্রীসাধারণ নিজেদের সুবিধার্থে রেলগাড়িকে শুধু গ্রহণীয় নয়, আদরণীয় করে তুলেছিলেন। তাই বাংলা সাহিত্যে, সন্দেহ, আশঙ্কা, সংকট ইত্যাদির বর্ণনার বদলে বরং জোর দেওয়া হয়েছে আরামদায়ক যাত্রার খোশগল্পের উপর। জনমানসে রেলওয়ে এত দিনে বন্ধু-ইয়ারে পরিবর্তিত হয়েছে। এই মানসিকতারই ছাপ মেলে পরশুরাম, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পে, যেখানে রেলকামরা এক স্বতন্ত্র ঘটনাস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে—আর পাঁচটা সাহিত্যিক দৃশ্যপটে যেমন দেখা যায় বৈঠকখানা বা শয়নকক্ষ, বাগান বা জঙ্গল, বাজার বা খেতখামার। ঠিক একইভাবে রেলকামরার চৌহদ্দির মধ্যে ঘটনা ঘটে যায়। একমাত্র তফাত এ স্থির দৃশ্যপট নয়; সদাচলমান। এই গতি, কাহিনির বর্ণনাকে জঙ্গম করে তোলে। শুধু গল্পে নয়, আধুনিক বাংলা কাব্যেও, রেলগাড়ি আর নিছক কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনার বিষয় নয়, বাইরে থেকে সশঙ্কিত বা সশ্রদ্ধ দর্শকের উপাস্য দেবতা হয়ে থাকল না। কবি স্বয়ং যাত্রী হয়ে, নিশ্চিন্ত অন্তর্দর্শন, বা সহযাত্রীদের পর্যবেক্ষণ করে নানা জল্পনা-কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়ার স্বচ্ছন্দ সুযোগ পেলেন কয়েক ঘণ্টা, বা কয়েক দিনের দীর্ঘ যাত্রাপথে। রেলকামরাতে বসেই রবীন্দ্রনাথের নায়ক, তার 'হঠাৎ দেখা' প্রেমিকার প্রশ্নের জবাবে বলতে পারে—'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।' পড়তে পড়তে হঠাৎ চমকে উঠি। মনে পড়ে, প্রিয় পুত্রের মৃত্যুশোকে মর্মাহত রবীন্দ্রনাথ এই ট্রেনে করেই যখন

ঘরে ফিরছিলেন এক রাত্রে, রেলকামরার জানলা থেকে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনা আহরণ করেছিলেন এই ভেবে যে মৃত্যুজনিত ব্যক্তিগত শোকেই সবকিছু শেষ হয় না; নিখিল সৃষ্টি একইভাবে সদা বিরাজমান। ক্ষিপ্রগামী রেলযানে বসে, দ্রুতবিলীয়মান পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যের থেকে চোখ তুলে আকাশে তাকালে অনন্তের শান্ত স্থিতিশীলতার যে-স্তব্ধতা আমাদের বিস্ময়াভিভূত করে তোলে, রবীন্দ্রনাথ তাই দেখেই নিজের মনোবেদনা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন।

তাই দেখা যায়, রেলগাড়ির আবির্ভাবের ফলে, বাঙালি জনচেতনা নানা পর্যায়ে ও প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকে পরিবর্তিত হচ্ছিল। প্রারম্ভিক ভীতি ও সন্দেহ কাটিয়ে কৌতূহল ও শ্রদ্ধা সহকারে মানুষ দেখতে শুরু করেছিলেন এই যন্ত্রযানকে। এবং ক্রমে ক্রমে রেলগাড়ি বাঙালির সমগ্র অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। রেললাইনের উপর গাড়ির চাকার ঘর্ষণের শব্দের তালের মধ্যে যাত্রীরা আবিষ্কার করতে শুরু করলেন নিজেদের কল্পনামাফিক কথার ছন্দ—নানা মাত্রায় সাজানো অনুরূপ ধ্বনি-সদৃশ বাক্য। সপ্তাহান্তে ঘরফেরতা কেরানি হয়তো এই চাকার শব্দে শুনতে পেতেন 'শনিবার-রবিবার! শনিবার-রবিবার!' বৎসরান্তে বাপের বাড়ি প্রত্যাগমনে উন্মুখ কোনো বাঙালি বধূ হয়তো শুনতে পেতেন তাঁর গ্রামের নাম।

বাঙালি জনচেতনার এই যাত্রাপথ আসলে যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রবর্তনের অনুগামী বিশ্ব-মানবসভ্যতার বিঘ্নসংকুল দুর্গম অভিযানেরই এক অনুচ্ছেদ। শিল্পবিপ্লবের সূচনায়, পাশ্চাত্যের সাধারণ মানুষের মধ্যেও যন্ত্রকৌশলের সঙ্গে তাঁদের প্রথম পরিচয় বা অপ্রত্যাশিত মুখোমুখি নানা জটিল মনোভাবের জন্ম দিয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল ভয় ও সন্দেহ-মিশ্রিত বিরোধিতা। এই বিরোধিতাবশত অষ্টাদশ শতকের শেষে ইংল্যান্ডের জনগণের মধ্যে যন্ত্রবিধ্বংসী Luddite আন্দোলন ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। কিন্তু এ-প্রতিবাদ ছিল এক অপস্রিয়মাণ সমাজব্যবস্থার শ্রমজীবীদের, যাঁরা নতুন ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থায় যন্ত্র-প্রযুক্তির প্রসারণকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। উনিশ শতকে রেলওয়ের আবির্ভাবও পাশ্চাত্য জনসাধারণের মনে ভয়মিশ্রিত কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু, যাতায়াতে অভ্যস্ত হয়ে যেতে যেতে তাঁরা রেলগাড়িকে ক্রমশই নিজেদের অন্তরঙ্গ করে তোলেন। বাংলা দেশে, বাউল-কবি রেলওয়ে নিয়ে যেমন দেহতত্ত্বের গান বেঁধেছিলেন, ইংল্যান্ডে ঠিক তেমনই ধর্মীয় প্রচারকেরা ধর্মসঙ্গীত রচনা করতেন রেলযাত্রার সঙ্গে মানবজীবনের তীর্থযাত্রার তুলনা করে। ১৮৫৭ সালে রচিত এইরকম একটি গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি :

O! What a deal we hear and read
About Railways and railways speed.

*

Allow me, as an old Divine,
To point to you another line,
Which does from earth to heaven extend,
Where real pleasures never end.

*

Of truth divine the rails are made,
And on the Rock of Ages laid;
The rails are fix'ed in chairs of love,
Firm as the throne of God above.

*

Jesus is the first engineer,
He does the gospel engine steer;
We've guards who ride, while others stand
Close by the way with flag in hand.[২৪]

আসলে, শিল্পবিপ্লব যেমন পাশ্চাত্য মানুষের চিন্তাচেতনায় আমূল পরিবর্তন এনেছিল, আমাদের দেশেও উনিশ শতকে ইংরেজ প্রবর্তিত অভিনব যন্ত্রকৌশল মানুষের চিন্তাধারাকে নতুন পথে পরিচালিত করে। নিজেদের জীবনধারা, অন্তর্জগৎ, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, ধর্ম, সমাজ—সবকিছুকেই নতুন চোখে দেখতে শুরু করেন বাঙালি জনগণ। যন্ত্রের জটিল কলকব্জা ও তার নিয়মমাফিক গীতশীলতার ছাঁচে শুধু মানবদেহ ও মানবজীবনকে দেখার প্রবণতা নয়, এর আদর্শে নিজেদের জীবনযাপন প্রণালিকেও পুনর্গঠন করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেল। এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই এক জন আধুনিক সমালোচক mechanical philosophy of nature বলে বর্ণনা করেছেন।[২৫] আর অতীতের বাঙালি কবি, এই যন্ত্রভিত্তিক দর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছিলেন :

মানুষ চলে কলের বলে...
...এ কলের কি কৌশল, কল থেকে জন্মাচ্চে কল

তার পরে, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, স্টিমার ইত্যাদি নানা 'কলের' প্রশংসার পর, কবি কিন্তু স্মরণ করিয়ে দেন :

মানুষ কল সব কলের বাপ,
চৈতন্য রয়েছে মূলে।[২৬]

টীকা

১. কাঁচামাল আমদানিই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না ইংরেজ প্রশাসনের। যুদ্ধরত সৈন্যদের যাতায়াতের সুবিধার্থেও রেলপথের প্রয়োজন ছিল। ১৮৫৫ সালে ঠিক এই কারণে স্থাপিত হয় East Bengal Railway। বর্মার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত আগ্রাসী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয়

সৈন্যদের সেখানে লড়াই করার জন্য বঙ্গোপসাগর পার করিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যোগী হলে, উচ্চবর্ণের হিন্দু সিপাইরা প্রতিবাদ করে—কারণ, 'কালাপানি' পার হলে তাদের জাত যাবে! ফলে, ঢাকা থেকে বর্মা পর্যন্ত রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা হয়, এবং তখন দেখা যায় কলকাতার সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগব্যবস্থা নিতান্তই দুর্বল। এই ত্রুটি সংশোধনকল্পে, কলকাতার শিয়ালদহ থেকে রেললাইন বসানো হয়, হুগলির পূর্ব তীর ধরে, কুষ্টিয়া হয়ে গোয়ালন্দ পর্যন্ত। (দ্রষ্টব্য—J.N. Westwood)। গোয়ালন্দ পর্যন্ত পুরো রেলপথ অবশ্য সম্পূর্ণ হতে লেগেছিল প্রায় বিশ বছর। ১৮৭১ সালের পয়লা জানুয়ারি তদানীন্তন বড়োলাট লর্ড মেয়ো এর উদ্‌ঘাটন করেন। এ-উপলক্ষে, ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *এডুকেশন গেজেট*-এর মন্তব্য উল্লেখ্য :

'ইহাতে অমাদের পূর্ব বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশের সুহৃদবর্গের বহুতর উপকার সাধিত হইয়াছে, এবং গতিবিধির সুবিধাহেতু ভবিষ্যতে তাঁহাদের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিবে ভাবিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি।" (৯ বৈশাখ, সন ১২৭৮)

২. J.N. Westwood. p. 19-20.

৩. সমসাময়িক বিবরণীর জন্য দ্রষ্টব্য—Michael Satow and Ray Desmond.

৪. *Bengal Hurkaru*, August 23, 1854। উদ্ধৃত : *Railways of the Raj.* pp. 39-40

৫. দ্রষ্টব্য ঐ।

৬. দ্রষ্টব্য : J.N. Westwood, p. 139.

৭. ভারতীয় রেলওয়ের দুর্ঘটনার ইতিহাস প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শুধুমাত্র মানুষের প্রাণহানি নয়, জন্তুজানোয়ারও এর শিকার হত প্রায়শই—যেমন আজও হয়। সম্প্রতি (২০০২-এর শুরুতে), দিল্লি থেকে দেরাদুনগামী 'শতাব্দী এক্সপ্রেস' জঙ্গলাকীর্ণ যাত্রাপথে এক হস্তীশাবককে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলে একদিন। ফলস্বরূপ, জঙ্গলের পুরো হাতির দল অকুস্থলে এসে জড়ো হয় শিশুটির মৃতদেহ উদ্ধার করতে। এই গজযূথ থেকে ঐ রেলপথ মুক্ত করতে পুরো ৪৮ ঘণ্টা লেগেছিল। অবাক লাগে—অতীতেও ভারতবর্ষের এই হস্তীকুলই রেলইঞ্জিনের অভিযান-পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৬৯-এ, ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের এক মালগাড়ি যখন একদিন গভীর রাত্রে হন্তদন্ত হয়ে শব্দভেদী হুঙ্কার ও রক্তবর্ণ আলোকরশ্মি নিয়ে ছুটছিল, তখন হঠাৎ এক হাতির দল রাস্তা পার হতে গিয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাদের যূথপতি, এই অভূতপূর্ব শত্রুর পথ রোধ করতে এগিয়ে আসে। এই সম্মুখসমরে, যদিও সে নিজে নিহত হয়, সঙ্গে সঙ্গে, রেলওয়ে-ইঞ্জিনের ড্রাইভারও হত হয় এই দুর্ঘটনায়, এবং রেলগাড়িটি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে থাকে। (এই ঘটনাটির বিবরণীর জন্য, J.N. Westwood, p. 139)

৮. অক্ষয়কুমার দত্তের উদ্ধৃত মন্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য—DIRECTIONS FOR A RAIL-WAY-TRAVELLER *বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ*।... কলিকাতা। ১৭৭৬ শকাব্দ মাঘ মাস।

৯. উদ্ধৃত : *সংবাদ প্রভাকর*, ১৫ আষাঢ় ১২৬২।

১০. দ্রষ্টব্য : *Railways of the Raj.*

১১. পূর্বোদ্ধৃত—*সংবাদ প্রভাকর।*
১২. পূর্বোদ্ধৃত—*Railways of the Raj.* p. 39.
১৩. পূর্বোদ্ধৃত—J.N. Westwood.
১৪. এ-প্রসঙ্গে বটতলার লেখক ও প্রকাশকদের প্রচার-উপযোগী ঘটনা নির্বাচনের বাহাদুরির দু'একটা নিদর্শন দিচ্ছি। সে সময়কার চাঞ্চল্যকর কেচ্ছা ও খুনের ঘটনা ছিল তারকেশ্বরের মোহান্ত দ্বারা গৃহবধূ এলোকেশীর ফুসলানো, তার স্বামী নবীন দ্বারা এলোকেশীর হত্যা ও কলকাতার বিচারালয়ে এর বিচার। বিচার চলাকালীন ও বিচারের পর, বটতলা থেকে অজস্র চটি পুস্তিকা বের হয় এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে। এর বিস্তৃত বিবরণ ও আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—শ্রীপান্থ-রচিত *এলোকেশী মোহান্ত সম্বাদ।* ঠিক অনুরূপ, ঐ যুগে কয়েকটি রহস্যজনক ঘটনা নিয়ে বটতলা থেকে বহু প্রহসন বের হয়েছিল—যেমন কলকাতায় কালীমন্দির থেকে গহনা চুরি, বাগবাজারে মদনমোহনের মন্দিরের ছাদভাঙা, ও পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অংশবিশেষ ধসে পড়া। এই ধরনের ঘটনার মতো, নব্যপ্রবর্তিত পাশ্চাত্য যন্ত্রসভ্যতার প্রযুক্তিকেও বটতলার লেখক ও প্রকাশকেরা কৌতূহল উদ্দীপক বলে দেখতেন। গঙ্গাবক্ষে সদ্যনির্মিত পুল, বা বাষ্পতাড়িত রেলগাড়ির আবির্ভাবে জনগণের অনুসন্ধিৎসু ও ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার মনোভাব ধরবার চেষ্টা করেছিলেন এঁরা।
১৫. দ্রষ্টব্য : *কি মজার কলের গাড়ি।*
১৬. রাধানাথ মিত্র। উদ্ধৃত : শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক (সংকলিত), পৃ. ৪৫৪।
১৭. Hart Crane, p. 261
১৮. হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পা., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৩৯৫।
১৯. ঐ, পৃ. ১৩৯৭।
২০. ঐ, পৃ. ১৩০২-০৩।
২১. অরুণ নাগ সম্পা., পৃ. ২৭৩-৭৪।
২২. দ্রষ্টব্য: এ-প্রবন্ধের 'সূচনা'তে *সংবাদ প্রভাকর* থেকে উদ্ধৃতি।
২৩. সিদ্ধার্থ ঘোষ, পৃ. ৮৬-৮৭।
২৪. Humphrey Jennings, p. 277.
২৫. Arnold Pacey, p. 133.
২৬. পূর্বোদ্ধৃত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পা., পৃ. ১৩০২)০৩।

স্বপ্নরাজ্যের সন্ধানে : প্রান্তিক সমাজের ব্রাত্য ধর্ম ও রাজনীতি

আমার বন্ধু নিত্য সেন নদিয়া জেলার দাদুপুর গ্রামের বাসিন্দা। ছোটো কৃষক পরিবারের সন্তান। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ১৯৭৫ সালে, বর্ধমান জেলে। আমরা দু'জনাই একই 'সেলে' বন্দি ছিলাম 'নকশাল' আসামি রূপে। নিত্য বয়সে আমার থেকে ছোটো হলেও রাজনীতির দীক্ষায় ও শিক্ষায় আমার থেকে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল। ও আমার বহু আগে থেকেই কারাবন্দি, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের কয়েদি হয়ে। চব্বিশ ঘণ্টা ডান্ডাবেড়ির শেকলে শৃঙ্খলিত হয়েও ও গান গাইত দরাজ গলায়—আমাদের বিপ্লবী গান থেকে শুরু করে বাউল-ভাটিয়ালি—হাতে বাঁধা লোহার বেড়ি বাজাতে বাজাতে।

নিত্য প্রায়ই বলত—'সুমন্তদা, আমাদের মতো মানুষেরা আসলে আউল-বাউল। আমরা নকশালরা রাজনৈতিক বাউল।'

এখন ভেবে দেখি কথাটার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত সত্য আছে। বাউল, ফকির, কর্তাভজা, সাহেবধনী—এই যে বিভিন্ন সম্প্রদায় বাংলার গ্রামীণ কৃষিজীবী ও অন্যান্য মেহনতি মানুষদের লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতিতে আজও জনপ্রিয়, এদেরই রাজনৈতিক প্রতিরূপ যেন দেখতে পাই নকশালবাদী গোষ্ঠীগুলিতে। ইতিবাচক ও নেতিবাচক—উভয় অর্থেই এই দুই আপাত ভিন্ন ভাবাদর্শ ও জীবনধারায় একটা মিল আছে। আমার এই বক্তব্য শুনে অনেকেই ঘোরতর আপত্তি করে বলতে পারেন—'কি করে সম্ভব? বাউল-ফকিরেরা অহিংস লোকাচার ও ক্রিয়াকর্মে ব্রতী, আর নকশালরা তো সহিংস রাজনীতিতে বিশ্বাসী ও সক্রিয়।'

আচার-আচরণ ও পন্থা-নির্বাচনে অবশ্যই আকাশ-পাতাল ফারাক। কিন্তু একটু তলিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে বাংলার এই লোকধর্ম ও তার সংস্কৃতির ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভাবাদর্শের উৎস থেকেই জন্ম নিয়েছে পরবর্তী যুগের নকশাল রাজনীতি ও তার গণসঙ্গীত। অতীতের

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে, এই লৌকিক ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি তৈরি হয়েছিল বাংলার নিম্নশ্রেণির হিন্দু ও গরিব মুসলমান খেটে-খাওয়া মানুষদের মধ্যে, যাঁরা সমাজের প্রান্তিক অংশে বাস করতেন। আর্থ-সামাজিক শোষণ ও বৈষম্যমূলক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এঁরা ওই সমাজের প্রতিষ্ঠিত রীতি-নীতি বর্জন করে, তার আওতা থেকে বার হন, নিজেদের স্বতন্ত্র তল্লাট তৈরি করেছিলেন গ্রামীণ সংস্কৃতিতে। প্রচলিত বিধি বহির্ভূত ধর্মবিশ্বাস ও জীবনধারণের জন্য এঁরা চিরকাল গোঁড়া হিন্দু কর্তৃত্ব ও মুসলমান মোল্লাতন্ত্র দ্বারা ধিকৃত হয়ে এসেছেন। এইসব দূরীকৃত প্রতিবাদী সম্প্রদায়গুলি কিন্তু আজও সাধারণ গ্রামবাসীর কাছে আদরণীয়। ভরঘুরে বাউল বা ফকির গ্রামে এলে ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-বুড়ি জড়ো হয় গান শোনার জন্য। ওঁদের ওই গানে একটা স্বপ্নরাজ্যের আকৃতি আছে, একটা চিরকালীন Rural Utopia-র কল্পনা ভেসে বেড়ায়।

আমার মনে আছে ১৯৭৮ সাল বা ওর কিছু পরে হবে। 'এমার্জেন্সি' অর্থাৎ আপৎকালীন অবস্থার অবসানের পর, আমি আর নিত্য, আমরা দু'জনেই আরও অন্যান্য সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি। আমি নিত্যর দাদুপুর গ্রামে গেছি ওর সঙ্গে কয়েকদিন কাটানোর জন্য। একদিন সকালে ঘুম ভেঙে গেল একটা গান শুনে। গানের কথাগুলো মনে আছে—

এখনো সেই বৃন্দাবনে বাঁশি বাজে রে, বাঁশি বাজে।
বাঁশির সুরে, তালে তালে, মন নাচে রে।
এখনো সেই ব্রজবালা বাঁশির সুরে হয় উতলা...
এখনো সেই গাভীগুলি গোচারণে উড়ায় ধূলি,...
সেই সখ-সখীর কোলাকুলি... আছে রে, আছে রে!

এ যেন কৃষক আত্মার স্বপ্ন, এক কাল্পনিক সুখের দেশে বাস করার সম্ভাবনাময় প্রত্যয়, সবাইকে আশ্বাস প্রদান যে সে জগৎ আছে এবং একদিন সেখানে সবাই পৌঁছুবে। কৃষিজীবী সমাজের আবহমান এই Millenarian dream বা আগামী এক স্বর্ণযুগের প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গে তার নাগাল পেতে গিয়ে যে ভাবে এরা আকুল হয়ে ওঠে, তার হতাশাব্যঞ্জক আক্ষেপ শুনলাম গানটির শেষ চরণে—

বড়ো আশা ছিল মনে, যাব মধুর বৃন্দাবনে
ভবা পাগলা কহে মনের কথা মায়ের কাছে রে!

গানটা গাইছিল ওই গ্রামেরই একটি ছেলে। হয়তো রোজকার মতো নিজের মনেই গাইছিল, একটা স্বপ্নরাজ্যে ডুবে যেতে। কিন্তু হঠাৎ আমার কানে ওই কথাগুলো একটা অতিপরিচিত কল্পনাবিলাসের কথা মনে করিয়ে দিল। সেদিন সকালে দাদুপুর গ্রামে আমি—এক পরাজিত আন্দোলনের ক্লান্ত কর্মী কিন্তু অক্লান্ত স্বপ্নান্বেষী—ভবা পাগলার ওই কল্পিত বৃন্দাবনের সঙ্গে আমাদের নিজেদের বিপ্লবের স্বপ্নরাজ্যের অদ্ভুত একটা সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছিলাম। মনে পড়ল -নকশাল আন্দোলনের শরিকেরা তো এই গ্রামের গরিব কৃষক ও ভূমিহীন চাষিদের

প্রান্তিক সমাজ থেকেই বার হয়ে এসেছিলেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন এক 'মধুর বৃন্দাবন'-এর—এক শোষণমুক্ত স্বদেশভূমি। মনে হচ্ছিল—গায়ক যেন আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আমাদের স্বপ্ন ও আশাভঙ্গের কথা। আমরা যখন নকশাল আন্দোলন করেছি, তখন এইভাবেই গাইতাম—

মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি
সেদিন সুদূর নয় আর...
লাল সূর্যের আলোক ধারায়
করবে মাতৃভূমি মুক্তিস্নান,
উঠবে গেয়ে মুক্তির গান
যুগ যুগ নিপীড়িত মজুর কিষাণ।

দেহতত্ত্বের শ্রেণি উৎস

একটা ব্যাপার লক্ষণীয় এ প্রসঙ্গে। লৌকিক ধর্মে (বাউল, ফকির, কর্তাভজা, সাহেবধনী প্রভৃতি গোষ্ঠী) ও নকশাল রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে যেমন যথাক্রমে এই ভবিষ্যৎ আনন্দকানন (বৃন্দাবন) ও স্বপ্নরাজ্য (সমাজতন্ত্র)-র কথা বারবার উচ্চারিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান বাস্তবের রূঢ় অস্তিত্ব ও তার কঠিন সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপদ্ধতিও নির্দেশিত হয়। আদর্শবাদী হয়েও উভয় চিন্তাধারাই বাস্তবধর্মী ও অনুশীলনকারীরা ব্যবহারিক জগতের কার্যকারণের ব্যাখ্যায় সদা-সজাগ।

প্রথমে, লৌকিক ধর্মের তত্ত্ব ও অনুশীলনের কয়েকটা দিক নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। বাউল গানই হোক, বা ফকির অথবা কর্তাভজাদের গানই হোক—দেহতত্ত্ব এদের একটা মূল বৈশিষ্ট্য। মানব দেহ, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার স্বাভাবিক ক্রিয়া—এগুলি রূপক হিসেবে বারংবার ব্যবহৃত হয় এঁদের গানে। এইসব গানের আড়ালে যে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব ও বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়, তার জটিল আলোচনায় যাবার মতো আমার বিদ্যা নেই এবং বর্তমান প্রবন্ধে তার অবকাশও নেই। আমি কেবল কিছু প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ছুঁয়ে যাচ্ছি। দেহের উপর এই যে গুরুত্ব আরোপ, এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমার বন্ধুবর, লৌকিক ধর্মের বিখ্যাত গবেষক সুধীর চক্রবর্তী যা বলেছেন, আমার মনে হয় সেটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—'দেহতত্ত্বের গান যাঁরা লিখেছেন সেই অত্যন্ত দরিদ্র শোষিত মানুষের (শোষণ দ্বিস্তরের—উচ্চবর্ণের ও সামাজিক অর্থনীতির) দেহ ছাড়া আর কীই বা নিজের ছিল? তাঁদের জীবন ছিল অনিশ্চিত, শস্য সম্ভাবনায় অনিশ্চিত, জমি ও বাস্তুও অনিশ্চিত। দেহই ছিল তাঁদের নিজের একতম সম্পদ। তাই দেহের উপমাতেই তাঁরা জীবনকে বুঝেছেন এবং অন্যাকে বুঝিয়েছেন।' ('বাংলা দেহতত্ত্বের গান', ১৯৯০, পুস্তক বিপণি)

এই দেহকেন্দ্রিক চিন্তার অনুরূপ প্রতিধ্বনি শুনতে পেতাম নকশাল রাজনীতির আলোচনাতে যখন নেতা ও কর্মীরা জোর দিতেন মেহনতি ভূমিহীন ও গরিব কৃষকদের কায়িক শ্রমের অভিজ্ঞতার উপর। যুক্তিটা ছিল এইরকম—যেহেতু এই দরিদ্রতম কৃষক শ্রেণিই

নিজেদের দৈহিক শ্রম দিয়ে উৎপাদন করছেন (ধনী ও মধ্যকৃষকেরা সচরাচর নিজেরা জমিতে প্রত্যক্ষভাবে চাষ-আবাদ করেন না; ক্ষেতমজুর, ভূমিহীন ও ছোটো কৃষক বা বর্গাদার দিয়ে করান)—সেইজন্য এই শ্রেণিই বিপ্লবের কর্ণধার হবার উপযুক্ত। (সিপিআই-এমএল-এর রাজনৈতিক প্রস্তাব, ১৯৬৯)। এই গতর খাটা মানুষেরা (যাদের 'দেহ ছাড়া কিই বা নিজেদের' আছে?) —চিরকাল বঞ্চিত হয়ে এসেছেন তাঁদের মালিকদের দ্বারা। আজ তাঁদের জেগে উঠে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার দিন এসেছে।

গরিব শ্রমজীবী কৃষকের মানসিকতায় যে আর্থ-সামাজিক বঞ্চনাবোধ সদা জাগ্রত ও দেহতত্ত্বের mystic বা মরমি কবিদের (বাউল, ফকির প্রভৃতি) গানে যে দেহভিত্তিক রূপক ও উপমা সদা-ব্যবহৃত হয়, এই উভয়ের মধ্যে একটা আশ্চর্য সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছিলাম একজনার সাথে। ১৯৭৬-এ বর্ধমান জেলে রয়েছি। মাঝেমধ্যে পুলিশে বিনা টিকিটে রেলযাত্রীদের ধরে এনে পুরে দিত হাজতে দু-একদিনের সাজা হিসেবে। হঠাৎ এইরকম একজনা এসে হাজির হল একদিন। এক বাউল। বর্ধমান লাইনে ট্রেনে গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়। আপৎকালীন অবস্থার কড়াকড়ির ফলে, বিনা টিকিটে ভ্রমণের অপরাধে এতদিনের সুপ্ত আইনের শিকার হয়েছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমাদের একটা গান গেয়ে শোনাল—

আমি সেই ঘরের মালিক নই।
পরের জমিন পরের জায়গা
ঘর বানাইয়া আমি রই
আমি সেই ঘরের মালিক নই
ঘরখানা কার জমিদারি
আমি পাই না জমিদারের দেখা
মনের দুঃখ কারে কই
জমিদারের ইচ্ছামতো দেও না জমি চাষ
তাইতে ফসল ফলে না রে
দুঃখ বারোমাস।
আমি খাজনাপাতি সবই দিলেম, ভোলামন
তবু আমার জমি হয়গো নিলেম
আমি চলি যে তার মন জুগাইয়া
দেখিলে মেলে না...

গানটা শুনে, আমরা শহুরে মধ্যবিত্ত নকশাল বন্দিরা লাফিয়ে উঠলাম—'আরে! এতো একটা রাজনৈতিক গান! আমাদের রাজনীতির কথা বলছে!'

পিছন থেকে বন্ধু নিত্য সেন আমার হাত টেনে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল—'সুমন্তদা, এটা আসলে দেহতত্ত্বের গান।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম—'তার মানে?'

ও ব্যাখ্যা করে বলল—'ঘর, জমিন—এ সবের মানে আপনার দেহ, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এ সবের মালিক তো আপনি নন। কবে হাতছাড়া হয়ে যাবে তা কি আপনি জানেন? এই দেহের জমিদার তো সেই ওপরওয়ালা—যার হুকুম মাফিক আপনি এ দেহ পেয়েছেন; তাঁরই ইচ্ছামতো দেহ পাওয়া যায়। কোন দেহ ভালো ফসল দেয়, কোন দেহ দেয় না। আর সেই ওপরওয়ালা মালিকের ইচ্ছামতো একদিন আপনার দেহ নিলেম হয়ে যাবে।'

আমার মনে পড়ল রামপ্রসাদের গানের কথাগুলো—

মন রে কৃষিকাজ জানো না।
এমন মানবজমিন রৈলো পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা।

আসলে দেহতত্ত্ব মানে নিছক দৈহিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি নয়। এর পিছনে মনের বা অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগূঢ় প্রেরণা রয়েছে। দেহকে নির্বাচন করা হয়েছে উপমা হিসেবে এক সুদূরপ্রসারী জীবনাদর্শকে তুলে ধরার জন্য। মনে রাখা দরকার, আপাতদৃষ্টিতে এই মতবাদকে মরমি বা অতীন্দ্রয়বাদী বলে মনে হলেও এর আড়ালে শুনতে পাই জ্ঞানমার্গের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক সংশয়বাদের প্রশ্ন। গোঁড়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আরোপিত চিন্তা-ভাবনা, নিয়ম-কানুনকে 'চ্যালেঞ্জ' করার সাহস। সে সাহসে লালন সাঁই হাসতে হাসতে গাইতে পারেন—

ছুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান
নারীর তবে কি হয় বিধান?
বামন চিনি পৈতেয় প্রমাণ
বামনী চিনি কি প্রকারে?

নিম্নবর্গের এইসব ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির এই সদাজিজ্ঞাসু মনোভাব ও প্রচলিত রীতিবহির্ভূত জীবনধারা পালন আসলে সেই অতীতের জ্ঞানযোগের ঐতিহ্যের লৌকিক প্রতিরূপ। চার্বাক দর্শনের উত্তরাধিকারী এঁরা। জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের চৌমাথাতে এঁদের জন্ম। দুই পথের টানাপোড়েন এঁদের গানে এক আশ্চর্য অস্থিরতার জগৎ সৃষ্টি করেছে।

আউল-বাউল-ফকিরের উৎপত্তি

জ্ঞান মার্গ-ভক্তি মার্গের এই দ্বন্দ্বের আলোচনা করার আগে, বাউল ধর্ম (ও অনুরূপ লৌকিক ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি)-এর উৎপত্তির একটা লৌকিক ব্যাখ্যার উল্লেখ করা যেতে পারে এ প্রসঙ্গে। এটা মোটামুটি সর্ববিদিত যে শ্রীচৈতন্য যে বর্ণাশ্রমবিরোধী ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন নবদ্বীপে ষোড়শ শতাব্দীতে, তাঁর মৃত্যুর পর তার নেতৃত্বে তাঁর ব্রাহ্মণ ও উচ্চজাতের শিষ্যদের হাতে গিয়ে পড়ে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামে পরিচিত এই নেতৃত্বের নানাবিধ বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য, চৈতন্যের নিম্নবর্গীয় (হিন্দু জাতের শ্রেণিবিভাগে অধস্তন

সম্প্রদায়ভুক্ত—হাড়ি, ডোম প্রভৃতি) শিষ্যেরা, প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবীপ্রধান ধারা (mainstream) থেকে বার হয়ে স্বতন্ত্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যান। এইভাবেই তৈরি হয়েছিল বলরাম হড়ি সম্প্রদায়, সাহেবধনী, কর্তাভজা প্রভৃতি ব্যক্তি-গুরু-কেন্দ্রিক গোষ্ঠীগুলি। (এ বিষয়ে বিস্তারিত, সুলিখিত এবং সুগবেষিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—রমাকান্ত চক্রবর্তীর 'চৈতন্যের ধর্মান্দোলন' ('বারোমাস' পত্রিকা, এপ্রিল, ১৯৮৬), অক্ষয় কুমার দত্তর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১৮৭০)।

এর পাশাপাশি এক ধরনের যাযাবর দল বার হয়ে এসেছিল বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠানের থেকে। এঁরা প্রশ্ন করেছিলেন উচ্চবর্ণের গোস্বামী নেতৃত্বের ভক্তিমার্গের বিরুদ্ধে। এই বিতর্কের একটা চমৎকার বিবরণী পাই 'শ্রীপ্রেমবিলাস'-এ, যেটি রচনা করেছিলেন নিত্যানন্দ দাস ১৬০০ সালে। শ্রীচৈতন্যের শিষ্য অদ্বৈত তাঁর বাণী প্রচার করতে গিয়ে ভক্তিবাদের উপরেই জোর দেন—

সর্বশিষ্যে অদ্বৈত ভক্তিবাদ প্রচারিল
জ্ঞানবাদ ছাড়ি সবে ভক্তি আচরিল।।
কামদেব নাগর আর আগল পাগল
না ছাড়িল জ্ঞানবাদ, আর শঙ্কর।।
শঙ্কর বোলে—মোরা হই জ্ঞানবাদী।
জ্ঞানবাদ বিনে কেহ না পাইবে সিদ্ধি।
অদ্বৈত বোলে—তোমরা জ্ঞানবাদ ছাড়।
শঙ্কর বোলে—বিচারে পরাজিত কর।
অদ্বৈত বোলে—শঙ্কর তুমি হইলে বাউল।
তোর মতে লোক হইবে আউল
ক্রোধ করি অদ্বৈত তাদের ত্যাগ কৈল
ত্যাগী হয়া তারা দেশান্তরে গেল।।

বাউল ও অন্যান্য অনুরূপ উপদলের মতো, ঐস্লামিক মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফকির সম্প্রদায় ও মোল্লাতন্ত্রের গোঁড়া বিশ্বাস ও আচার-আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সুফি চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে এঁরা শরিয়তকে খোলাখুলি 'চ্যালেঞ্জ' করেন এঁদের গানে ও দৈনিক জীবনযাপন ধারায়। লক্ষণীয় বাউল, কর্তাভজা, ফকির, লালনশাহী, বলরামী—এইসব সম্প্রদায়ের মানুষেরাও প্রধান ধর্মগুলিকে চ্যালেঞ্জ করেছে।

এর থেকে অনুমান করা যায় যে 'জ্ঞানবাদী'রা অদ্বৈত-দ্বারা আরোপিত 'ভক্তিবাদ' (অর্থাৎ বিনা প্রশ্নে, বিনা 'বিচার' ও বিতর্কে, কর্তৃত্বর আদেশ পালন করা)-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। যুক্তি দ্বারা তাঁরা সব কিছুই যাচাই করতে চেয়েছিলেন। তাই যখন 'জ্ঞানবাদ ছাড়ি সবে ভক্তি আচরিল', মুষ্টিমেয় কিছু যুক্তিবাদী ('কামদেব, নাগর... আর শঙ্কর) জ্ঞানবাদের পথে অবিচল

থেকেছিলেন এবং ফলস্বরূপ বৈষ্ণব mainstream থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। ভক্তিবাদী প্রাধান্যের স্তববাণী ছিল—'বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।'

বৈষ্ণব মূলধারা থেকে বহিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানবাদী ধারা টিকে রইল। টিকে রইল চৈতন্যের ধর্মান্দোলনের নিম্নবর্গীয় অনুগামীদের মধ্যে। এঁদের নেতারা কর্তৃত্ব আরোপিত বিধি-নিষেধ ইত্যাদিকে প্রশ্ন করতে শুরু করেন সহজ সাদামাটা ভঙ্গিতে। বিবদমান ধর্মীয় তত্ত্বকথার থেকেও বড়ো মনুষ্যসমাজের সাধারণ্য—এই মূল কথাটা প্রতিধ্বনিত হয় তাঁদের গানে—

> করিম-রহিম রাধা-কালী এ বুল সে বুল যতই বলি
> শব্দভেদে ঠেলাঠেলি হইতেছে সংসারে
> মানবদেহে থেকে স্বয়ং একই শক্তি ধরে।

বা

> শিয়াল কুকুর পশু যারা একজাতি এক গোত্র তারা
> মানুষ শুধু জাতির ভারা মরে বইয়ে।

বৈষ্ণব মোহান্ত অধ্যুষিত প্রতিষ্ঠান থেকে ছিটকে বার হয়ে আসা বাউল ও অন্যান্য অনুরূপ উপদলের মতো, ঐস্লামিক মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফকির সম্প্রদায় ও মোল্লাতন্ত্রের গোঁড়া বিশ্বাস ও আচার-আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সুফি চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে এঁরা শরিয়তকে খোলাখুলি 'চ্যালেঞ্জ' করেন এঁদের গানে ও দৈনিক জীবনযাপন ধারায়। লক্ষণীয় বাউল, কর্তাভজা, ফকির, লালনশাহী ও বলরামী—এই সবক'টি লোকধার্মিক গোষ্ঠীগুলি বর্ণাশ্রমপ্রথা বিরোধী, লিঙ্গ-বৈষম্য বিরোধী, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিরোধী। দেখা যাচ্ছে, উচ্চবর্গের কর্তৃত্ব আরোপিত সামাজিক বাধা-নিষেধ ও ধর্মীয় বিবাদ—এ সবের প্রতিবাদে এঁরা সরব ও আপোশ করতে নারাজ। আজও পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে এঁরা এঁদের এই বিদ্রোহী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন ও তার জন্য মূল্য দিতে হচ্ছে। হিন্দু ও মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের গোঁড়া মৌলবাদী ধর্মীয় হর্তা-কর্তা (ও রাজনৈতিক নেতা) এঁদের একঘরে করে রেখেছে, জমি থেকে উচ্ছেদ করেছে ও নানারকম অত্যাচারে জর্জরিত করেছে। এই হয়রানি থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে নদিয়া-মুর্শিদাবাদের বাউল-ফকিরেরা স্বনামধন্য শক্তিনাথ ঝা-এর নেতৃত্বে ১৯৮৩ সালে গড়ে তোলেন বাউল-ফকির সঙ্ঘ। নিয়মিত সম্মেলনে মিলিত হয়ে এঁরা নিজেদের নির্যাতনের অভিজ্ঞতার কথা বলেন এবং কীভাবে তার মোকাবিলা করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করেন। (দ্রষ্টব্য, সুরজিৎ সেন, 'ফকিরনামা', গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৯)

বলা যেতে পারে ইতিহাসের পরিহাস—যে বামপন্থীরা জাতিভেদ, লিঙ্গ-বৈষম্য ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বরাবর লড়াই করে এসেছে, আজ তাদেরই শাসিত রাজ্যে ওই লড়াই যারা করছে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে, তাদের রক্ষা করা তো দূরের কথা, বরং অনেক স্থানীয় বামপন্থী নেতা প্রশাসনের সাহায্যে তাদের অবদমিত করতে ব্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী নেতৃত্বের এই

অধঃপতন আশ্চর্যজনক নয়। আদর্শকে জলাঞ্জলি দেওয়ার স্বভাব বাঙালি উচ্চবর্ণ ও উচ্চবর্গের স্বভাবজাত।

স্মরণীয়, প্রায় পাঁচশো বছর আগে, চৈতন্যের ব্রাহ্মণ শিষ্য ও সহযোগিতা তাদের গুরুর প্রারম্ভিক সার্বজনীন আদর্শ ও পরিকল্পনাকে ভেঙেচুরে, নিজেদের শ্রেণিস্বার্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদের পত্তন করেন। নিম্নবর্গের মানুষ—যাঁরা চৈতন্যের ধর্মান্দোলনের মূল ভিত্তি ছিলেন—তাঁরা ক্রমে ক্রমে প্রান্তস্থিত ও শেষে বিতাড়িত হলেন 'আউল-বাউল' নামে।

আশ্চর্য! এক অনুরূপ marginalization বা দরিদ্রতম মানুষের প্রতিবাদী ভূমিকাকে দূরে ঠেলে ফেলে দেওয়ার প্রবণতা, পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী নেতৃত্বের (যাঁরা মূলত বাঙালি উচ্চবর্গ ও উচ্চবর্ণ বংশ-উদ্ভূত) ভাবধারা ও কর্মপন্থাতে প্রকট। ১৯৬০ সালের শুরুতে, ষোড়শ শতকের চৈতন্যের মতো, সিপিআই (এম)-এর নেতারা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু চৈতন্যের ব্রাহ্মণ শিষ্য ও সহযোগীরা অচিরেই যেমন তাঁদের আদি ভিত্তি, দরিদ্র নিম্নবর্গকে ভুলে গিয়ে ব্রাহ্মণ্যের পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন, সিপিআই (এম)-ও কয়েক বছরের মধ্যেই বুর্জোয়া রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে থেকে সরকার পরিচালনার তাগিদে সেই অতীতের শাসন ব্যবস্থাই ফিরিয়ে আনল। ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ির কৃষক বিদ্রোহ দমন থেকেই প্রতীপ গতির সূত্রপাত এবং আজ তা চূড়ান্ত অধঃপতনে পৌঁছেছে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে।

বিপরীত দিকে, চৈতন্যপরবর্তী যুগে যেমন নিম্নবর্গের বাউল, প্রভৃতি গোষ্ঠীরা বৈষ্ণব গোঁসাইদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে, অতীত ধর্মান্দোলনের সার্বজনিক মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, ষাটের দশকে নকশাল আন্দোলনের আওতায় গরিব ও ভূমিহীন কৃষক, সিপিআই (এম)-এর নেতাদের প্রতারণার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে অতীতের বৈপ্লবিক ভাবাদর্শের পুনরাধিষ্ঠান করেন। লক্ষণীয় যে, লৌকিক ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠীরা আজও যেমন গ্রামীণ বাংলার নিম্নসমাজের সাংস্কৃতিক প্রতিমূর্তি, রাজনীতির ক্ষেত্রে নকশাল গোষ্ঠীরা আজ এই শ্রেণির মানুষের দাবি আদায়ের আন্দোলনের প্রতিভূ রূপে বিরাজমান—সে পশ্চিমবাংলার লালগড়ই হোক, বা ছত্তিশগড়ের বঞ্চিত আদিবাসীদের মধ্যেই হোক। উভয় গোষ্ঠীর এই ঐতিহাসিক প্রবহমানতার মূল সূত্র একই—প্রান্তিক সমাজের দরিদ্র মানুষের সুখ-দুঃখের অংশভাগী হওয়া। বাউল-ফকিরেরা যেমন উচ্চবর্গ ও বর্ণের সমাজকর্তাদের দৌরাত্ম্যের শিকার, নকশালবাদীরাও ঠিক একই ভাবে রাষ্ট্রশক্তির হিংস্র নির্যাতনের বলি হয়েছে। বাউল-ফকিরদের ধর্ম যেমন এক সার্বজনীন মানবতাবাদের উৎস থেকে জন্ম নিয়েছে, নকশাল রাজনীতিও অনুরূপ সর্বজনহিতকর সমাজতন্ত্রের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত।

প্রান্তিক সমাজের এই প্রতিবাদের (ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয়বিধ) কিছু রীতিনীতি কিন্তু মাঝেমধ্যে উভয় গোষ্ঠীকে ব্যাপক জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। বাউলদের গুহ্য সাধনা, জটিল তত্ত্বানুশীলন ও গানে দুর্বোধ্য সংকেতের ব্যবহার প্রায়শই এঁদের ক্ষুদ্র

উপদলে পরিণত করেছে, বৃহত্তর জনআন্দোলনে উন্নীত হতে দেয়নি। ফকির বা অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আবার সুধীর চক্রবর্তীর গবেষণায় ফিরে যেতে হয়। সুধীর অনুমান করেছেন—'এরা যুগে যুগে উচ্চবর্ণের দ্বারা ঘৃণিত ও দলিত। আলেম মুসলমান আর নৈষ্ঠিক হিন্দু বারে বারে দেহাত্মবাদীদের নিপীড়ন করেছে, ভেঙে দিয়েছে তাদের একতারা, পুড়িয়ে দিয়েছে আখড়া। মানুষগুলি তাই গভীর অভিমানেই কি তাঁদের গানে আনলেন রহস্যের ধূসরতা আর শব্দের আবরণ? ...তবে সবচেয়ে বড় কারণ সম্ভবত গুহ্য গোপন তত্ত্ব সরাসরি বলা যায় না বলেই এই রূপক-প্রতীক-শব্দ ঘটিত গূঢ় প্রয়োগ এ সব গানকে আচ্ছন্ন করে আছে। তাতে একটা মস্ত বড় ক্ষতি এই হয়েছে যে, সাধারণ শ্রোতারা দেহতত্ত্বের গানকে বহু সময় কৌতুকের বা রঙ্গের গান বলে গ্রহণ করেছে।' ('বাংলা দেহতত্ত্বের গান')

ঠিক একইভাবে দেখতে পাই, নকশাল আন্দোলনের বিভিন্ন দল-উপদলগুলি বিশাল জনসমুদ্র থেকে বিযুক্ত হয়ে, গোপন রণনীতি ও কৌশলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। যেন একধরনের গুহ্য সাধনায় নিমগ্ন পাহাড়-জঙ্গলের গুপ্ত আস্তানায়। অবশ্য এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে যে রাষ্ট্রশক্তির নিপীড়নই এদের ঠেলে দিয়েছে এই আত্মগোপনীয় রাজনীতির গিরিকন্দরে। সমাজের উচ্চবর্ণের উৎপীড়নের প্রতিবাদে যেমন বাউল-ফকিরেরা অহিংস গুহ্য সাধনায় নিভৃত আশ্রয় নিয়েছে, উচ্চশ্রেণি ও তাদের প্রশাসনের অত্যাচারের প্রতিরোধে নকশালরা সশস্ত্র গুপ্ত আন্দোলনের আড়ালে নির্বাসিত। এটা খুব দুঃখজনক যে মানবতাবাদের ও জনহিতকর আদর্শে ব্রতী হওয়া সত্ত্বেও এই উভয় গোষ্ঠীই ব্যাপক কোনো জন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। ধর্মের ক্ষেত্রে, ভক্তি আন্দোলনের সংস্কারের প্রয়াসের ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকারী আজকের বাউল ফকিরেরা। আর রাজনীতির ক্ষেত্রে অতীতের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের উত্তরপুরুষ নকশালরা। ভাবাদর্শে প্রসারতা, অথচ কর্মপদ্ধতিতে সংকীর্ণতা—এই পরস্পরবিরোধী প্রবণতা উভয়কেই কিছুটা পঙ্গু করে রেখেছে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র বলে আমরা বড়াই করি। কিন্তু দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিবাদস্পৃহার প্রকাশ ও বিকল্প জনকল্যাণমূলক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় তাদের প্রচেষ্টাকে অবদমন করে, বর্তমান সমাজের মাতব্বরেরা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের অধিকর্তারা কি গণতন্ত্রের মূল্যবোধকেই জলাঞ্জলি দিচ্ছেন না?

প্রথম প্রকাশ : *আরশিনগর* সংকলন-এ।
প্রকাশক : বাউল-ফকির উৎসব কমিটি, জানুয়ারি ২০১১

উনিশ শতকের বাংলায় লোকশিক্ষা ও বটতলা সাহিত্য

উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই কলকাতায় ছাপাখানার ব্যাপ্তি এবং বাঙালি মালিকানার প্রসার হতে থাকে। আদি উৎসস্থল শোভাবাজারের বটতলার বাঁধানো চাতাল (যার আশপাশেই ছাপাখানাগুলি প্রথম স্থাপিত হয়েছিল) ছাড়িয়ে, অল্পসময়ের মধ্যেই এই মুদ্রণশিল্প উত্তর ও মধ্য কলকাতার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল করায়ত্ত করে 'বটতলা' সাহিত্যের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। পরে কলকাতার বাইরেও—পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার অন্যান্য শহর থেকেও ওই ধরনের মুদ্রণালয় থেকে প্রকাশিত পুস্তিকা 'বটতলা' সাহিত্যের অঙ্গ বলে পরিগণিত হয়েছে। বিশেষ করে, ঢাকা শহরে চকবাজারের কেতাবপট্টি থেকে প্রকাশিত বইগুলিও এই সাহিত্যধারায় এক উল্লেখযোগ্য স্থান জুড়ে আছে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যেই, কলকাতা ও আশপাশের এই জাতীয় ছাপাখানা থেকে কমপক্ষে ১৪০০ বাংলা পুস্তিকা ও ইস্তাহার প্রকাশিত হয়। কোনো কোনো বই-এর ৩০, ০০০-এরও বেশি কপি ছাপানো হত—এত চাহিদা ছিল। এ সব বই-এর বিষয়বস্তু কেবলমাত্র *রামায়ণ, মহাভারত* ও রাধা-কৃষ্ণের কাহিনির মতো চির জনপ্রিয় পৌরাণিক উপাখ্যানই ছিল না। সমসাময়িক এক নিরীক্ষা থেকে জানা যায় যে গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, ব্যাকরণ ও চিকিৎসাবিদ্যার মতো বিষয় নিয়ে পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে *পঞ্চতন্ত্র* ও *হিতোপদেশ*-এর মতো নীতিকথামূলক গল্প, মুন্সেফ-উকিলদের সাহায্যার্থে জমি ও অন্যান্য আইন-সংক্রান্ত নির্দেশিকা থেকে *রতি বিলাস, রসমঞ্জরী* বা *বেশ্যারহস্য* গোছের আদিরসাত্মক কাহিনি, *শকুন্তলা*-র বাংলা অনুবাদ থেকে *হড়কো বউ-এর বিষম জ্বালা* বা *কি মজার শনিবার*-এর মতো প্রহসন, ইসলামি ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে লায়লা মজনু-র প্রেমের গল্প—এসবই ছিল বটতলার সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত।

তাই স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে বটতলার এক ব্যাপক পাঠকসমাজ সারা বাংলাদেশ জুড়ে ছড়িয়েছিল। এঁরা কারা ছিলেন? সমসাময়িক নিরীক্ষা থেকে জানা যায় উনিশ শতকের শুরুতে গ্রামাঞ্চলে বহু পাঠশালায় মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ছেলে-মেয়েদের অক্ষর পরিচয় ও প্রাথমিক শিক্ষায় হাতেখড়ি হত। এছাড়াও, বৈষ্ণব সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা ছিল। নিম্নশ্রেণির ও নিম্নবর্গের কিছু মানুষের মধ্যেও বিদ্যাচর্চার প্রচলন ছিল বলে জানা যায় তাঁদের হাতে লেখা পুঁথি থেকে।[১] তাই আমরা অনুমান করতে পারি যে, বাংলা ছাপাখানা স্থাপনের ঠিক পরেই বটতলা-প্রকাশিত পুস্তিকাগুলির এক ব্যাপক পাঠক-পাঠিকা সম্প্রদায় ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, স্বল্প-অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হিন্দু-মুসলমান, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী—এইসব শ্রেণি থেকেই এঁরা উঠে এসেছিলেন।

এটা মনে রাখা দরকার যে, বটতলা সাহিত্যের ভক্তরা শুধুমাত্র সে যুগের শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত পাঠকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না। এর এক ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল সারা বাংলাদেশ জুড়ে। যাঁরা পড়তে পারতেন না, তাঁরা শুনতেন বসে পাড়ার কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি যখন কাজ-কর্মের শেষে সন্ধ্যার সময় চণ্ডীমণ্ডপে বা কোনো গৃহস্থ ঘরের প্রাঙ্গণে, বটতলা প্রকাশিত ধর্মগ্রন্থ বা প্রেমকাহিনি পাঠ করে শোনাতেন। সমসাময়িক একজন পর্যবেক্ষকের ভাষ্য অনুযায়ী—

> বাংলা কাব্যে পুস্তকের মধ্যে কৃত্তিবাসের ঐ গ্রন্থ (রামায়ণ) সকলের গ্রাহ্য বিশেষতঃ মধ্যম লোক এবং দোকানদার লোকের মধ্যে। তাহাদের দিবসের কার্য্য সমাপ্ত হইলে তাহারা মণ্ডলাকারে বসিয়া ঐ রামায়ণের কোন এক অংশ পাঠ করে। বঙ্গদেশ মধ্যে এমত কোন দোকানদার নাই যে তাহারদের স্থানে ঐ কবিকৃত রামায়ণের কোন এক অংশ না পাওয়া যায়।[২]

সুলভ মুদ্রণযন্ত্র, সহজবোধ্য বাংলা ভাষা ও সস্তায় কাটতি—এই তিনটি ছিল বটতলা সাহিত্যের মূল সম্পদ। চিৎপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অলি-গলিতে, প্রায়ান্ধকার ঘুপচি ঘরে ছোটোখাটো ছাপাখানায় প্রাচীন কায়দায় মুদ্রাক্ষরগুলি হাতে সাজিয়ে বই ছাপানো হত। ছাপার কাগজও ছিল সস্তা। শ্রীরামপুর ও হাওড়ায় দুটি কাগজ তৈরির কল তৈরি হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। এখান থেকেই দেশি কাগজ জোগাড় করতেন বটতলার মুদ্রক ও প্রকাশকেরা।

এইসব বই যে ধরনের বাংলা ভাষায় রচিত হত তারও একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। 'সাধু' বাংলায় অনুসৃত ব্যাকরণ ও বানানের বড়ো একটা তোয়াক্কা করতেন না বটতলার লেখকরা। চলতি কথোপকথনে ব্যবহৃত শব্দ, কথা ও প্রবচনগুলি মুদ্রিত আকারে হুবহু অনুকরণ করা হত। উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লেখা হত অধিকাংশ সময়ই। এর ফলে, বটতলার বইগুলি সাধারণ মানুষ বা স্বল্প-শিক্ষিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সহজে বোধগম্য হত। আর একটা বিষয়ও লক্ষণীয়। বটতলার লেখকেরা যখন কবিতা লিখতেন, প্রায়শই পয়ার ছন্দ ব্যবহার করতেন।

তাই, পয়ারে কবিতা শুনতে অভ্যস্ত সাধারণ মানুষ বটতলা প্রকাশিত এইসব চটি বইগুলিকে সাদরে অভ্যর্থনা করতেন। বটতলা তাই সেই যুগের জনগণের সাহিত্য বলে যথার্থই দাবি করতে পারে।

লোকশিক্ষায় বটতলার অবদান

এতাবধি বটতলা প্রকাশিত পৌরাণিক উপাখ্যান, বা সমকালীন বাঙালি সমাজের ভ্রষ্টাচার ও ব্যভিচারকে বিদ্রূপ করে রচিত প্রহসন বা রহস্য-কাহিনি বা রোমাঞ্চকর 'গুপ্ত-কথা' জাতীয় পুস্তিকা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। এর থেকে অনেক সময়ই মনে হতে পারে যে সে যুগে বটতলা লেখক-প্রকাশকেরা হয় অতীতের ধর্মীয় নীতিকাহিনি কিংবা সস্তা চটুল রসের খোসগল্প বিতরণেই উৎসাহী ছিলেন। বস্তুত বটতলা তখনকার দিনে কুৎসা-কাহিনি ও পর্ণোগ্রাফির-ই নামান্তর বলে বিবেচিত হত শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীতে।

নিঃসন্দেহে, বটতলার লেখক-প্রকাশকেরা সমসাময়িক সামাজিক অনাচারকে আক্রমণ করে প্রহসন বার করেছিলেন, যাতে অনেক সময়ই কুৎসা-রটনা ও যৌনাত্মক সুড়সুড়ি দেবার প্রয়াস দেখা যায়। এ কথাও হয়তো ঠিক যে সে যুগে বটতলা প্রকাশিত রহস্য-কাহিনি ও 'গুপ্ত-কথা' শ্রেণির বই বেশি বিক্রি হত, চিরকালীন জনপ্রিয় কৃত্তিবাস-কাশীরামের রামায়ণ-মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনির পরেই।[৩]

কিন্তু এইসব বই ছাড়াও, বটতলা প্রকাশিত এক জাতীয় বই প্রত্যক্ষভাবে লোকশিক্ষার বাহন রূপে শহরে ও গ্রামে-গঞ্জে বিক্রি হত। এ সব বই সে সময়কার শিশুপাঠ্য বাংলা বানান ও ব্যাকরণের বই, বা নীতিকথামূলক পুস্তিকা থেকে স্বতন্ত্র ছিল। এগুলির পর্যালোচনা থেকে আমরা খোঁজ পাই এক ব্যাপক বিদ্যাচর্চার জগৎ—যা ছিল তৎকালীন বাঙালি দরিদ্র, স্বল্প-শিক্ষিত মানুষের জগৎ। গ্রামের বৈষ্ণবী ও পাঠশালা থেকে অক্ষরজ্ঞানে শিক্ষিতা মহিলা থেকে শুরু করে কারিগরি শিক্ষানবিশ, শহরাঞ্চলের সরকারি কাজে কর্মপ্রার্থী ও নিত্য-নতুন ব্যবসা এবং চাকুরিতে নিযুক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মচারী—এদের নানাবিধ চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাতে এগিয়ে এসেছিল বটতলা।

বটতলা থেকে প্রকাশিত এই জাতীয় শিক্ষামূলক সাহিত্যে একদিকে আমরা খুঁজে পাই খনার বচন ও সংসারে ও সামাজিক জীবনে মেয়েদের দৈনন্দিন আচার-আচরণ সংক্রান্ত উপদেশ, আবার অন্যদিকে দেখি উকিল-মোক্তার- দারোগাদের আইন বিষয়ে জ্ঞানদান। সে সময়কার বিভিন্ন বৃত্তিতে শিক্ষানবিশদের হাতেকলমে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়।

উল্লেখযোগ্য যে মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, বটতলার ছাপাখানা থেকে সস্তায় চিকিৎসাবিদ্যার বই বের হতে শুরু করে। বস্তুতপক্ষে, বরাবরই বটতলার চিকিৎসাবিষয়ক বইগুলি পাঠকদের স্বাবলম্বী করার চেষ্টায়, বা গরিবদের চিকিৎসায় নিযুক্ত ডাক্তারদের সুবিধার্থে

রচিত হত। যেমন ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত *চিকিৎসার্ণব*। এর দাম ছিল দুই আনা, এবং বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে যে এ বইটি প্রণীত হয়েছে সেইসব চিকিৎসকদের জন্য যাঁরা তাঁদের রোগীদের কাছ থেকে চার আনা মাত্র পারিশ্রমিক পান। এই বইটির কয়েক সহস্র কপি বিক্রি হয়েছিল। সমসাময়িক হলধর সেন রচিত *চিকিৎসা রত্নাকর* ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত, তিন খণ্ডে বের হয়েছিল—প্রতি খণ্ডের মূল্য চার আনা। পাঠকদের চিকিৎসা বিদ্যায় সুশিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে জনৈক রাজকৃষ্ণ মুখুজ্জে লিখেছিলেন *আত্মরক্ষা* নামে একটি চটি বই, ১৮৪৯ সালে যার দাম ছিল আট আনা। ১৮৫০ সালে জনৈক প্রেমচাঁদ চৌধুরি লেখেন *জলচিকিৎসা* নামে একটি পুস্তিকা—দাম পাঁচ আনা, যার মূল প্রতিপাদ্য ছিল লেখক নিজে জ্বর, বাত, হাম, বসন্ত, পৈটিক পীড়া ইত্যাদি ব্যাধির নিরাময়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে জলের প্রয়োগে আরোগ্যলাভ করেছেন। এইসব বইগুলিতে শুধুমাত্র অতীতের কবিরাজি ও হাকিমি চিকিৎসা-পদ্ধতির অনুবৃত্তি পাচ্ছি না, নব্য-প্রবর্তিত পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রভাবও দেখতে পাই। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, ১৮৫১ সালে কলকাতার মেডিকাল কলেজে বাংলায় শিক্ষাদানের জন্য একটি বিশেষ পাঠ্যশ্রেণি খোলা হয়। সরকারের তরফ থেকে মাসিক পাঁচ টাকা হারে পঞ্চাশটি ছাত্রবৃত্তি ঘোষণা করা হয়। স্বভাবতই, এর ফলে দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের, ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ বাঙালি সন্তানদের আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষালাভের সুযোগ খুলে যায়। এদের চাহিদা মেটাবার জন্য অজস্র বই বের হতে থাকে বটতলা থেকে—অনেক সময়ই ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের বাংলা অনুবাদ। যেমন, *ঔষধব্যবহারক* বার হয়েছিল মহেন্দ্রলাল প্রেস থেকে ১৮৫৪ সালে। এর রচয়িতার নাম পাচ্ছি—পি. কুমার, যিনি ওই সময় মেডিকেল কলেজে বাংলায় পড়াতেন। মেডিকেল কলেজের আর একজন শিক্ষক মধুসূদন গুপ্ত (১৮০০-৫৬) যিনি সে যুগে বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে প্রয়োজনে শবব্যবচ্ছেদ করতে সাহসী হয়েছিলেন, তাঁর বাঙালি ছাত্রদের সুবিধার্থে কিছু বই লিখেছিলেন যেগুলি ওই সব ছাপাখানা থেকে বের হয়—যেমন *শরীরবিদ্যা*, *চিকিৎসা-সংগ্রহ*, *ঔষধ কল্পাবলী*।

তাই দেখতে পাই, বটতলার এইসব বইয়ের পাঠকশ্রেণি উঠে এসেছিল গ্রামের পুরোনো কবিরাজ-হাকিম সম্প্রদায় থেকে, আবার এক নতুন সম্প্রদায় যারা পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার অনুশীলনে উৎসাহী ছিল, তাদের চাহিদা মেটাবার জন্যও বটতলা প্রস্তুত ছিল। বস্তুত ঐতিহ্যাশ্রয়ী জনপ্রিয় বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন আধুনিক প্রসঙ্গ—এই দুই-এর সহাবস্থান বজায় রেখে বটতলা এক অভূতপূর্ব ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করেছিল তার স্বর্ণযুগে (যা শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মশায়ের মতে ছিল ১৮৪০ হতে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ)।

ঠিক একই ভাবে অতীত ও বর্তমানের সহাবস্থান দেখা যায় বটতলা প্রকাশিত পেশা বা বৃত্তি-বিষয়ক বইগুলিতে, গ্রামের কৃষক-কারিগর শ্রেণির জন্য একদিকে ও শহরে বা মফস্‌সলে নিযুক্ত নতুন পেশাধারীদের জন্য অপরদিকে। সে যুগের কৃষ্ণনগর কলেজের

অধ্যাপক উমেশচন্দ্র দত্ত উনিশ শতকের তিরিশের দশকে তাঁর শৈশবে পাঠশালায় লেখাপড়া শেখানোর এক চমৎকার বিবরণী দিয়েছেন—

> দোকানদারের ছেলে মালীর, তেলীর, কামারের, ছুতোরের ছেলে আমার সহপাঠী ছিল; অনুলেখা পড়া শিখিয়াই তাহারা পাঠশালা পরিত্যাগ করিত।[৪]

কি ধরনের বই পড়ানো হত? সস্তা ছাপাখানার বই ওই অঞ্চলে 'আমড়াতলার ছাপা' বলে পরিচিত ছিল। উমেশচন্দ্রের স্মৃতিচারণ অনুসারে—

> হয়তো চারিজন ছাত্র বইগুলি ক্রয় করিত। খাতাপত্র লেখা; জরিপ চিঠি; জমা খরচ; জমাওয়াশিল বাকি; এই সমস্ত আমরা শিখিতাম।

যেমন জমিদারকে সম্বোধন করে চিঠি লিখতে গেলে, লেখার নিয়ম ছড়া আকারে মুখস্থ্ করানো হত ছাত্রদের। উমেশচন্দ্র একটা নমুনা দিয়েছেন—

> গাঁয়ের জমিদার যদি হয় মুসলমান, বন্দের সেলাম বলে লিখিবে তখন।[৫]

এর পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার ছত্রছায়ায় যে সব নতুন পেশার সূত্রপাত হয়, তার চাকুরেদের জন্যও বটতলা প্রস্তুত ছিল। তাই দেখি সারা উনিশ শতক ধরে জমি-সংক্রান্ত আইন, ফৌজদারি আইনসমূহ, উকিল-পুলিশ প্রভৃতি বৃত্তিভোগীদের জন্য নির্দেশাবলী সহজ ভাষায় বটতলা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। বইগুলির নাম থেকেই বোঝা যায় কাদের উদ্দেশ্যে এগুলি রচিত হত। যেমন—যদুনাথ মল্লিক রচিত *মাল-সংক্রান্ত আইন* (১৮৫৩), উকিলদের পরীক্ষা পাসের সাহায্যার্থে প্রণীত বলে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে। ১৮৫১ সালে প্রকাশিত *পুলিশ দর্পণ ও দারোগা গাইড*, পুলিশ সংক্রান্ত আইন-কানুনের বিবরণী, দারোগাগিরি পরীক্ষা পাসের জন্য প্রার্থীদের তৈরি করার উদ্দেশ্য রচিত।

আইন-সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষাদানের অভিপ্রায়ে বটতলার অনেক লেখক ও প্রকাশক বেশ অভিনব কায়দার শরণাপন্ন হতেন। পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় করার তাগিদে কখনো-কখনো তাঁরা এইসব নীরস আইন-কানুনের ধারা ও অনুবিধিগুলি বোঝাবার জন্য তাঁদের বইতে নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভাবন করতেন। এ প্রসঙ্গে সে যুগের স্বনামধন্য নাট্যকার-অভিনেতা অমৃতলাল বসুর এক অভিজ্ঞতার ঘটনা স্মরণীয়। বটতলার তৎকালীন বিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা বেণীমাধব দের পুত্র লালবিহারী দে তাঁর দোকান থেকে অমৃতলালকে একখানি নাটক পাঠিয়ে দেন পড়বার জন্য। নাটকটির নাম *আইনসংযুক্ত কাদম্বিনি নাটক*। অমৃতলাল এরপর তাঁর স্মৃতিচারণে বলছেন—

> ভাবিলাম না জানি কি রহস্যই ইহার মধ্যে আছে। ...পড়িয়া দেখিলাম কথোপকথনচ্ছলে সমস্ত পিনাল কোড খানা নাটকে পরিণত করার চেষ্টা!

বটতলার শিক্ষামূলক পুস্তিকার আলোচনা শেষ করার আগে, বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন

মেয়েদের জন্য রচিত চটি বইগুলি—যা এই যুগের নারীবাদী পাঠিকা ও গবেষকদের মনোযোগের যোগ্য। দুই-একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত অতীতের বাংলা কথ্য ঐতিহ্যের ধারাবাহী খনার বচন বটতলার বহু পুস্তকে উদ্ধৃত হত। ১৮৭৫ সালে, বরিশালের এমনই একটি বটতলা-জাতীয় সস্তা ছাপাখানা থেকে বের হয়েছিল *যোষিদ্বিজ্ঞান-নারীকুলের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ*। লেখিকা বসন্তকুমারী দাসী *অবশ্যজ্ঞাতব্য* বলে একটা তালিকা দিচ্ছেন, যেমন—

মচকানিতে চুন হলুদ, পুড়লে দেবে ছাগল দুধ
কাটলে চিতের পাতা চুর, পচলে কেটে করবে দূর।

এই সব প্রাচীন, মেয়েলি জগতে প্রচলিত চিকিৎসার ছড়া ছাড়াও, আর এক ধরনের বই প্রকাশিত হত যার উদ্দেশ্য ছিল উনিশ শতকের বাঙালি মহিলাদের নৈতিক আচার-আচরণে শিক্ষিত করে তোলা। যেমন ১৮৩৪ সালে জনৈক নীলরতন হালদার রচিত *দম্পতি-শিক্ষা* নামে একটি পুস্তিকা বের হয়, যাতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ব্যবহার ও কর্তব্যের উপদেশ দেওয়া হয়। লেখক বলছেন এসব উপদেশ প্রাচীন শাস্ত্রসম্মত। ঠিক একই ধরনের আর একটি পুস্তিকা বের হয় ১৮৫৪ সালে, যাতে বিবাহিতা মহিলারা স্বামীর প্রতি কীভাবে কর্তব্যপালন করবেন, তার এক তালিকা দেওয়া হয়। বইটির নাম *পতিব্রতোপাখ্যান*। যদিও লেখকের নামের সন্ধান পাচ্ছি না, ৭২ পৃষ্ঠার এই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়েছিল, এবং এও বিজ্ঞাপিত হয়েছিল যে রংপুরের জমিদার কালী চৌধুরী এই বইটির প্রশংসা স্বরূপ লেখককে পুরস্কার দান করেন। এই লেখক দাবি করছেন যে তিনি যা লিখেছেন তা সবই প্রাচীন শাস্ত্র থেকে নেওয়া।

প্রাচীন শাস্ত্র মানে কি মনুর নির্দেশ, যাতে স্ত্রীকে স্বামীর পদানত হয়ে থাকতে হত? বইগুলির নাম ও বিষয়বস্তু থেকে এই সন্দেহটাই প্রকট হয়ে ওঠে। উল্লেখযোগ্য, এই প্রবণতাটা শুধু বটতলার হিন্দু লেখকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সমসাময়িক মুসলমান লেখকের পুস্তিকাতেও দেখতে পাই তাঁদের অন্তঃপুরের মহিলাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য তাঁরা যেন অতিমাত্রায় উদ্যোগী। কলকাতার আহমদী প্রেস থেকে মুদ্রিত শেখ মুনশী চমিরুদ্দিন রচিত দোভাষী *বেদারেল-গাফেলিন* (১৮৪৮)-এ লেখক স্ত্রীকে উপদেশ দিচ্ছেন এই বলে যে তাঁর মনে রাখা দরকার যে স্বামী-ই একমাত্র প্রভু, এবং তাকে দৈহিক ও মানসিক, সবরকম পরিতোষ প্রদান স্ত্রীর কর্তব্য, বিনা প্রতিবাদে।

তথাকথিত দাম্পত্য শিক্ষা, বা বিবাহিতা নারীর গার্হস্থ্য কর্তব্য ও স্বামীর প্রতি অবিচল ভক্তি ও তার সেবা-যত্নের দায়িত্ব পালনের উপর এই যে ঝোঁক দেখা যায় তৎকালীন বটতলার পুরুষ লেখকদের রচনায়, তার পিছনে একটা সামাজিক নিরাপত্তাবোধ ও আশঙ্কা কাজ করছিল বলে মনে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের নারীদের জীবনে নানা ধরনের বিপর্যয় ও পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল যা অতীতের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ফাটল ধরায়। প্রথমত গ্রামীণ

অর্থনীতির ধ্বংসের ফলে দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য-তাড়িত অজস্রমহিলার কলকাতা শহরে এসে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ (যাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন হিন্দু কুলীন বংশের বিধবা) পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের সামনে একটা ভীতির কারণ স্বরূপ হয়ে উঠেছিল। আবার অন্যদিক থেকে পাশ্চাত্য মূল্যবোধে শিক্ষাবিস্তারের প্রভাবে নব্য শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতার (তৎকালীন চিন্তাধারা অনুসারে) প্রচার, রক্ষণশীল বাঙালিদের কাছে আসন্ন এক অমঙ্গল বলে মনে হয়েছিল। বিধবাবিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা—এগুলি এইসব বাঙালি সমাজপতিরা সুনজরে দেখেনি। এই মনোভাবেরই ছাপ পাওয়া যায় বটতলার অনেক প্রহসনে—যেমন রামকৃষ্ণ সেনের *হুড়কো বৌ-এর বিষম জ্বালা* বা রাধাবিনোদ হালদারের *পাসকরা মাগ*। মুসলমান লেখকরাও নিজেদের ঘরের মহিলাদের সমসাময়িক সমাজ-সংস্কার ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ওই ধরনের নানা প্রহসন ও উপদেশমূলক পুস্তিকা রচনা করেন।

ঔপনিবেশিক বাংলাদেশের জনচেতনায় বটতলার সামগ্রিক প্রভাব আলোচনা করতে গেলে তাই দেখতে পাই এর ভূমিকা আজকের প্রগতিশীল চিন্তাধারার মানদণ্ডে—সবসময় অবিমিশ্র সদর্থক ছিল না। আসলে মনে রাখা দরকার বটতলার লেখক ও পাঠকদের শ্রেণি ও সামাজিক অবস্থানের কথা ও তাঁদের রাজনৈতিক চেতনার স্তর। নিম্ন-মধ্যবিত্ত, দরিদ্র ও স্বল্প-শিক্ষিত সামাজিক অংশ থেকে এঁরা এসেছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজে যে ভাঙন ঘটে, এঁরা তারই প্রত্যক্ষদর্শী। এঁরা প্রহসনে ও কৌতুক নকশায় আর্থ-সামাজিক অনাচার ও মূল্যবোধ বিকৃতির বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাত করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, প্রাক্-ঔপনিবেশিক সামাজিক স্থিতিশীলতায় ফিরে যাবার তাগিদে এরা পুরোনো রক্ষণশীল আচার-ব্যবস্থা ও অনেক সময়ই নারী-বিদ্বেষী এবং জাতি-বৈষম্যমূলক সামাজিক অনুশাসনের প্রতি একটা 'নস্ট্যালজিক' আকুলতার টানেও জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাই বিধবাবিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা—এই ধরনের সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টাকে ওঁরা মনে করতেন বিজাতীয়। যে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা দেশের অর্থনীতি ও সমাজকে বিধ্বস্ত করেছে, সেই বৈদেশিক শাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় সামাজিক সংস্কারকে এঁরা প্রায়শই বহিরাগত ও বেমানান ভাবনা-চিন্তা ও আচার-আচরণের আমদানি বলে মনে করতেন।

এইসব দুর্বলতা সত্ত্বেও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই বটতলার সাহিত্যই কলকাতার ও গ্রামের শ্রমজীবীদের জ্ঞানপিপাসা ও চিত্তবিনোদনের দাবি মিটিয়ে এসেছে বহুবছর ধরে। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের ভাষায়—

> এই ছাপা পড়িয়াই আমাদের প্রপিতামহী-পিতামহীরা ইস্কুল-কলেজের ধার না ধারিয়াও তাঁহাদের ইংরেজী-পড়া পতিদেবতাদের তুলনায় সত্য করিয়া শিক্ষিত হইয়াছিলেন।[৬]

শুধু সে যুগে নয়, আজও গ্রামে-গঞ্জে বটতলার চাহিদা যথেষ্ট। শখের ডাক্তার-কবিরাজ *নাড়ীজ্ঞান শিক্ষা* পড়ে এখনও রোগী পরীক্ষা করেন বা *পেটেন্ট ঔষধ শিক্ষা* থেকে ওষুধ তৈরির

মালমশলার হদিশ পান। যাত্রাদলের বেহালা-বাদক ও তবলচির হাতেখড়ি হয় *বেহালা-শিক্ষা* বা *তরঙ্গিনী*, নামধেয় বটতলা মুদ্রিত বই থেকে। আধুনিক যন্ত্র-বিদ্যা শিখতে চান যাঁরা, তাঁদের জন্য বের হয়েছে *মোটর ড্রাইভিং শিক্ষা* ও *ট্রানজিস্টার গাইড*-এর মতো বই। আবার পুরোনো কারিগরি পেশার বিদ্যার্থীদের জন্য রয়েছে *সেলাই কাটিং শিক্ষা* বা *সহজ উলবোনা শিক্ষা*। মহসীন পীর বিরচিত *মুসকিল আসান ব্রতকথা* থেকে শুরু করে বিহারের জামশেদপুর নিবাসী বিপিন বিহারী মুখীর *ঝুমুর সঙ্গীত*—এসবই আজও বটতলার সস্তা ছাপাখানা থেকে বের হয়। কলেজ স্ট্রিটের মোড় পেরিয়ে মহাত্মা গান্ধি রোড ধরে হাঁটলে, চোখে পড়বে ছোটোখাটো বইয়ের দোকান, যেখানে এই জাতীয় বই পাওয়া যায়। আরও উত্তরে, চিৎপুর দিয়ে এগোলে, নাখোদা মসজিদের আশপাশে পাওয়া যাবে বটতলার ইসলামি বইয়ের দোকান। *হাকিমি চিকিৎসা পদ্ধতির*-র পাশাপাশি *মহাম্মদী পঞ্জিকা* বিক্রি হয় এখানে। অতীতের দোভাষী সাহিত্যের ভাষা ও রচনাভঙ্গির কিছু ছায়া এখনও আবিষ্কার করা যেতে পারে এইসব পুস্তিকায়। বটতলা থেকে প্রকাশিত *সচিত্র রামায়ণ* বা *আরব্য উপন্যাস*-এর পাঠক ও শ্রোতা এখনও আমাদের পল্লী-অঞ্চলে পাওয়া যাবে। স্বল্প-শিক্ষিত পাঠক ও নিরক্ষর গরিব শ্রোতৃমণ্ডলী আজও এদেশের জনগণের ব্যাপক অংশ, যাঁরা উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত ও দামি বইপত্র কিনতে অপারগ। এঁদেরই চাহিদার জন্য বটতলা আজও আমাদের দেশে বেঁচে আছে।

সূত্রনির্দেশ

১। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উনিশ শতকের শুরুতে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে এই ধরনের অনেক পুঁথি আবিষ্কার করেন, যাদের লিপিকার ছিলেন গয়লা, মাঝি, ধোপা শ্রেণির মানুষ। দ্রষ্টব্য—দীনেশচন্দ্র সেন-এর *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৬ (প্রথম প্রকাশ-১৮৯৬), পৃ. ৫৫৪।

২। *সমাচার দর্পণ*, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩০।

৩। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য বটতলা সাহিত্য নিয়ে তিনজন গবেষকের রচনা—যাঁরা এক্ষেত্রে পথিকৃৎ। প্রথম, প্রয়াত বিনয় ঘোষ, *কলকাতা কালচার*, কলকাতা, ১৯৫৬, দ্বিতীয়, প্রয়াত সুকুমার সেন, *বটতলার ছাপা ও ছবি*, কলকাতা, ১৯৮৪, তৃতীয়, শ্রীপান্থ, *বটতলা*, কলকাতা, ১৯৯৭।

৪। উদ্ধৃত—বিপিনবিহারী গুপ্ত, *পুরাতন প্রসঙ্গ*, কলকাতা, ১৩৭৩, পৃ. ১৫৬-৫৭।

৫। ওই, পৃ. ২০৪।

৬। সুকুমার সেন (পূর্বোদ্ধৃত), পৃ. ৫০।

প্রথম প্রকাশ : 'সাম্প্রতিক ইতিহাস চর্চা' সংকলন গ্রন্থে, মহিষাদল রাজ কলেজ, মেদিনীপুর, ২০০৫।
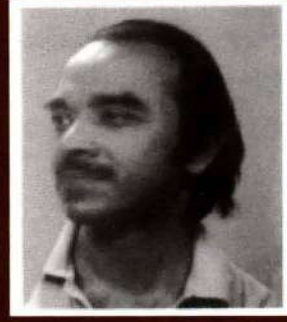
সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম কলকাতায় ১৯৩৬ সালে। লেখাপড়া কলকাতায়। পেশা হিসেবে প্রথম জীবনে ইংরেজির অধ্যাপনা ও পরে সাংবাদিকতার সূত্রে দিল্লিতে প্রবাস যাপন। সত্তরের দশকে নকশালপন্থী আন্দোলনে যোগদান ও হাজতবাস। কারামুক্তির পর দীর্ঘদিন 'স্বাধীন' সাংবাদিক রূপে জীবিকা অর্জন। আপাতত দেহরাদুনের পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা ও উনিশ শতকের বাংলা লোকসংস্কৃতি ও লোকায়ত ধর্ম নিয়ে গবেষণায় নিযুক্ত। এ বিষয়ে লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইংরেজিতে রচিত *পার্লার অ্যান্ড দ্য স্ট্রিট্* (১৯৮৯), *ডেঞ্জারাস আউটকাস্ট* (১৯৯৯), *ক্রাইম অ্যান্ড আরবানাইজেশন ক্যালকাটা ইন দ্য নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি* (২০০৬), এবং অনূদিত গ্রন্থ *থিমা বুক অফ নক্সালাইট পোয়েট্রি* (১৯৮৭)। বাংলায় *উনিশ শতকের কলকাতার অন্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য* (১৯৯৯) *অশ্রুত কণ্ঠস্বর* (২০০২)। এ ছাড়া বাংলা ও ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে গত চল্লিশ বছর ধরে। বাংলায় *অনুষ্টুপ* ও ইংরেজিতে *দি ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি* পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখে থাকেন।

প্রচ্ছদ রাতুল চন্দ রায়